কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমাদের জীবন

এই যন্ত্র-বুদ্ধির ভেতরের কিছু কৌশল

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমাদের জীবন

এই যন্ত্র-বুদ্ধির ভেতরের কিছু কৌশল

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমাদের জীবন

এই যন্ত্র-বুদ্ধির ভেতরের কিছু কৌশল

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

অনন্যা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
annayadhaka@gmail.com

© লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষরবিন্যাস
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ৬০০.০০ টাকা

ISBN 978 984 29380 6 1

Krittim Buddhimottar Sange Amader Jiban by Muhammad Ibrahim
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2026, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 600.00 Taka Only

USA Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে **অনন্যা**’র বই কি নতে ভিজিট করুন
www.anannyabooks.com

উ|ৎ|স|র্গ

এখন ও বিভিন্ন সময় টেলিভিশনে আমার বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণকারী এবং দর্শক-শ্রোতাদেরকে–
যাঁদের উচ্ছ্বাস, উৎসাহ এবং কৌতূহল আমাকে সবসময় অনেক প্রেরণা জুগিয়েছে।

ভূমিকা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এখন আমাদের জীবনের খুব কাছে চলে এসেছে। সেটি টের পাই যদি একটু মুখ তুলে তার দিকে তাকাই, বা আরো ভালো হয় যদি তার সঙ্গে কথা বলি। হ্যাঁ, রাস্তায় বেরুলে এআই চালিত চালকবিহীন ট্যাক্সি দেখতে পাই না একথা সত্য, যেরকম আমেরিকা বা চীনের অনেক নগরবাসী আজ দেখ্‌ছে; কিন্তু আমার স্মার্টফোনের মধ্যেই তার নানা কাজ দেখি। নিজের প্রিয় বিষয়ে খবর বা ভিডিওগুলো যখন না চাইতেই প্রত্যেকদিন ফোনের একেবারেই সামনে এসে হাজির হয়, সেই ব্যবস্থাটি তো সেই করে দিয়েছে– আমার পছন্দ-অপছন্দ বহুদিন ধরে লক্ষ করেছে বলে। আর ওই ফোনেই অনেকের মতো আমার রয়েছে চ্যাটজিপিটি- তাকে কোনোকিছু করে দিতে বল্‌লেই সে আলাদিনের দৈত্যের মতো তা সঙ্গে সঙ্গে করে দিচ্ছে। এটি তো এআইয়ের মধ্যেও আগের তুলনায় অনেক পারদর্শিতা নিয়ে এসেছে। অবশ্য চাওয়াগুলো এমন, যা লেখাজোখার মাধ্যমে এআই করে দিতে পারে। কিন্তু সেভাবেই পেয়ে যাই আমার দরকারি সবকিছু– যেমন কোনো বিষয়ে রচনা, আমার লেখাটি সম্পাদনা করে দেয়া ও স্বাস্থ্য পরামর্শ থেকে শুরু করে কোনো অঙ্ক করার ক্ষেত্রেও পরামর্শ দেয়া– সবকিছু। অন্যরা চ্যাটজিপিটির মতো ভিন্ন এআইয়ের মাধ্যমে একইভাবে চাহিবামাত্র পাচ্ছে ছবি, সঙ্গীত ইত্যাদি যেভাবে আঁকতে বা গাইতে বলে দেয় ঠিক সেইভাবে। তাহলে কী করে বলি যে এআই আমাদেরও জীবনের একেবারে কাছে আসেনি? তার বড় বড় কাজের কথা না হয় বাদই দিলাম।

এই বইটির উদ্দেশ্য হলো এমন ঘনিষ্ঠ এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটির বিষয়ে সহজ ভাষায় খোঁজখবর করা। তার মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ যে আছে, তা তো তার কাজেই বুঝছি, তার নামেও তা আছে। আর এই বুদ্ধি যে কৃত্রিম, তাও ওই নামই স্বীকার করে নিচ্ছে– যত বুদ্ধিই থাকুক, সে যন্ত্র বই তো নয়। যে বছরটি শেষ হলো সেই ২০২৫ এর সময়টিকে এই যন্ত্র-বুদ্ধির একটি সাধারণ খতিয়ান নেবার জন্য উপযুক্ত সময়, এমনটি অনেকেই মনে করছেন। মাত্র তিন বছর আগে আসা চ্যাটজিপিটির মতো ভাষাভিত্তিক এআই এই সময়ে অসাধারণ সৃষ্টিশীলতা দেখিয়েছে– এখন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেন আরো বিরাট লাফ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। অনেকে এই বছরটিকে বল্‌ছেন এআই এজেন্টের বছর। এআই এজেন্ট হলো প্রযুক্তিটির সাম্প্রতিকতম রূপ– যাতে সে বড় বড় কি ছু কাজ নিজে নিজে স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করতে পারছে। নিজেই একের পর এক নানা কাজ-কারবারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কাজটি

করতে পারে বলে সে এখন মানুষের এজেন্ট। এই নতুন সক্ষমতা থেকেই হয়তো বড় লাফটি সে দেবে। এই যন্ত্র-বুদ্ধির মধ্যেই হুঁশ করে কাজ করার সাধারণ বুদ্ধিও শিগ্‌গির একদিন চলে আসতে পারে মনে করছেন অনেকে। ইতোমধ্যে আমাদের কী হবে সেই চিন্তা এখন প্রবলভাবে সবার মধ্যে আস্‌ছে- যদি জীবিকার সব কাজ তার হাতে চলে যায়? কী হবে বেঁচে থাকার উপায়, কেমন হবে সেই সমাজ? এটি স্পষ্ট যে সবাইকে এআই সম্পর্কে জানতে হবে, জীবনের সবক্ষেত্রে যে পরিবর্তন– এটি আন্‌তে যাচ্ছে সেই সম্পর্কেও।

এআইয়ের যে বুদ্ধি, তা প্রকাশের অকুস্থল হলো কম্পিউটার। অবশ্য কম্পিউটারকে আমরা যেভাবে চিনি ও ব্যবহার করি, তা আমাদের জন্য দারুণ সব কাজ করতে পারলেও সে প্রোগ্রাম করে দেয়া নির্দেশমত শুধু চলে। তাই তার নিজের বুদ্ধির প্রশ্নটি ওভাবে ওঠে না। প্রোগ্রামগুলো অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ বিশেষজ্ঞরা লেখেন, কম্পিউটার তা বাস্তবায়ন করে ফলাফল দেয়। কিন্তু এআইয়ের ব্যাপারটা আলাদা। তাকে বাইরের জানা তথ্য থেকে নিজে শেখার উপযুক্ত করার জন্য এক রকম কাজের সীমিত প্রোগ্রাম করে দেয়া হয়, ওই তথ্য থেকে বাকি সব বিচার-বিশ্লেষণ অজানা ও অনির্দিষ্টভাবে সে নিজেই করে ফেলতে পারে– ওটি তারই বুদ্ধি। এই বুদ্ধি দিয়ে সে যেকোনো সমস্যায় আগাম পূর্বাভাস দিতে পারে, এখন নানা সৃষ্টিশীল কাজ করতে পারছে, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ-কারবার করতে পারছে। এই এআই নিজে কিন্তু শুধুই গণিত– কিছু গাণিতিক কৌশল, অপেক্ষাকৃত ছোট একটি প্রোগ্রামে তাকে দিয়ে দেয়া গাণিতিক কৌশলেই সে তথ্য থেকে শেখে এবং এত কিছু করে। কম্পিউটারের ভেতরে ওই কৌশলে কাজ করে করে আমাদের চাহিদা পূরণ করে। এভাবেই সে আমাদের কাছের বন্ধু হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে এমন ধারণাও সৃষ্টি করেছে যে, আমাদের এমন কোনো কাজ নেই, যা সে নিজে করতে পারবে না, আমাদের এমন কোনো অর্জন নেই, যা সে নিজেও অর্জন করতে পারবে না। সত্যিই অভাবনীয় সব অর্জনের মাধ্যমেই এই ধারণা সৃষ্টি করেছে, সঙ্গে বেশ কিছু ভীতিও সে আমাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে– আমাদের কাজগুলো তার কাছে চলে যাওয়ার ভীতি। বেশ কিছু কাজ ইতোমধ্যে এআইয়ের কারণে চলে যাচ্ছে বলে ভীতিটি বাড়ছে বৈকি।

তাই বলে এআইয়ের ব্যবহার মোটেও কমছে না; এটি ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে আর চমকপ্রদ সব ব্যবহার আরো যোগ হচ্ছে। কিন্তু ওইভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে তার কারণে কিছু বিড়ম্বনারও সৃষ্টি হয়েছে, যা সহ্য করে চল্‌তে হচ্ছে। আপাতত শুধু সতর্ক থাকা ছাড়া এসবের তেমন কোনো ভালো প্রতিকার নেই। একটি বিড়ম্বনা হলো উন্নত হবার ফলেই যেন এআই হঠাৎ হঠাৎ একেবারে সত্যের মতো করে ডাঁহা মিথ্যা বল্‌ছে। এআইয়ের করে দেয়া মামলার নথি আদালতে গিয়ে যদি মিথ্যা বলে ধরা পড়ে, তখন কী অবস্থা হতে পারে অনুমেয়। আর একটি বিড়ম্বনার সঙ্গে সবাই বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছেন। সেটি হলো প্রতারকের জন্য খুব সহজে ভুয়া খবর, ভুয়া ছবি, ভুয়া কণ্ঠস্বর ইত্যাদি সৃষ্টির সুযোগ করে

দেয়া। এআইয়ের এই দিকটির ভয়েও মানুষ অস্থির– কখন কোন ভুয়া জিনিসের ফাঁদে পা দিতে হয়। আরো একটি কারণে এআই ব্যবহারে সতর্ক হতে হচ্ছে। নানা সমাজে যেসব বৈষম্য আছে– লিঙ্গ-বৈষম্য, জাতি-বৈষম্য এসব সমাজের যাবতীয় তথ্যের মধ্যেও আছে। সেগুলো থেকে ট্রেনিং নিয়ে এআই যা বলে বা করে, তার ভেতরেও ওই বৈষম্য থেকে যায় এবং তা বাড়তেও পারে। যদিও এআইয়ের নানা সক্ষমতার কথা নিয়েই এই বই। তার মধ্যে এর বিড়ম্বনাগুলোও স্বাভাবিকভাবেই এসেছে, কারণ এগুলোও এখন আমাদের জীবনের অংশ।

এ বইতে এআইয়ের একটি ভেতরের দিকও আছে যা এর জীবন-সম্পৃক্ততার আলোচনার সঙ্গেই এসেছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এতে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যন্ত্র হয়েও এমন সব সক্ষমতা এটি কীভাবে পেলো। এর বুদ্ধির পেছনে কৌশলগুলো কী? গাণিতিকভাবে তৈরি এআই কেমন করে পড়ে, বোঝে, চেহারা চিনতে পারে, বিশ্লেষণ করে, ফলাফল দেয় সেই ক্রিয়াকলাপগুলো পাঠকের সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে সহজ উপস্থাপনায়। এর জন্য এক একটি খুব সাধারণ উদাহরণ নিয়ে এআইয়ের ভেতরে তার সমস্যা-সমাধানটি কীভাবে হচ্ছে তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলো এমন সরল বা তুচ্ছ সমস্যা যে, মানুষের কাছে তার সমাধান একেবারেই নস্যি; কিন্তু যন্ত্রকে এটি তার নিজস্ব কৌশলে সমাধান করতে হয়। সেগুলো বুঝলে বড় সমস্যা সমাধানে তার কাজেরও কিছু ধারণা মেলে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব ভেতরের কৌশল আরো ভালো বোঝার জন্য এ কাজের সঙ্গে তুলনীয় কোনো উপমা ব্যবহার করা হয়েছে– আমাদের নিত্যপরিচিত একবারেই জানা-বোঝার মধ্যে থাকা কোনোকিছুকে উপমা হিসেবে নিয়ে। ওভাবে কারিগরি খুঁটিনাটিতে বা গণিতের মধ্যে না ঢুকেও শুধু উদাহরণের ও উপমার ওপর নির্ভর করে এআইয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে কীভাবে বুদ্ধির মতো করে সমস্যার সমাধান হচ্ছে তার একটি সাধারণ পরিচিতি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি এআইকে তার ভেতর থেকে বোঝার জন্য কাজে আসতে পারে। কোনো উদাহরণকে কারো কাছে কম সহজ মনে হলে, তিনি এতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গিয়েও একটি সাধারণ ধারণা পেতে পারেন।

গত কয়েক দশক ধরে এআই ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এগিয়েছে। এ বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়গুলো এর এক একটি ধাপের সক্ষমতা ও ব্যবহার যেমন দেখিয়েছে, তেমনি তার মূল কৌশলগুলোও দেখিয়েছে; তার মধ্যে যেসব দুর্বলতা বা সমস্যা থেকে গেছে তাও। তথ্যভান্ডার থেকে ট্রেনিং নিয়ে যে মেশিন লার্নিং তা বহু বছর ধরে অদ্ভুত সব ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। বলতে গেলে এটি সব কাজের কাজি হয়েছে। সেসব কাজের কিছু পরিচিতি এ বইয়ে আছে। কিন্তু তিন বছর আগে ভাষার এআই এসে তাকেও চরম টেক্কা দিয়েছে– এতে এআই সক্ষমতার নতুন দিগন্ত যেম ন খুলে গেছে, তেমনি এই ভাষার এআই

অসম্ভব সৃজনশীলতা দেখাচ্ছে ওই আগের সব কাজেও। বইয়ের শেষের দিকের একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের নাম 'এআই চল্‌ছে'। এখানে বর্তমান বছরটিতে এসে এআইয়ের একটি বাস্তববাদী খতিয়ান নেবার চেষ্টা রয়েছে– এআই এই সময়ে এসে আসলে কোন্ খাতে কতখানি কাজ করছে। পুরো চিত্রটি দেখার জন্য উন্নত দেশে কী ঘট্‌ছে তার খবর বেশি নিতে হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছু অন্যান্য দেশের মতো আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। আজকের পরিস্থিতিতে কারা এআইকে সত্যি সত্যি কতখানি গ্রহণ করছে? বাসা-বাড়িতে এটি কতখানি এলো; ব্যক্তিগত জীবনে, অফিস আদালতে বা ব্যবসা বাণিজ্যে কোথায় কতখানি এটি ব্যবহৃত হচ্ছে– নিয়মিত অনেক পূর্ণ কাজে, অথবা সহায়ক হিসেবে আংশিকভাবে? চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে বা বিজ্ঞান গবেষণার ল্যাবোরেটরিতে এআই কতখানি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে? কিছু কিছু বিশ্লেষণ ও সমীক্ষার ভিত্তিতে তার বর্তমান অবস্থাটি দেখাটাই উদ্দেশ্য।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এআইয়ের প্রয়োগে অনেক দুর্দান্ত সব সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বাস্তব ব্যবহারকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। নানা কারণে এমনটি হচ্ছে; কোথাও মানুষের কাজকে এআইয়ের কাজে রূপান্তরিত করতে যে বড় বিনিয়োগ, সেটি এখনই লাভজনক মনে হচ্ছে না, কোথাও এআই এসে নতুন করে এমন কিছু সমস্যা সৃষ্টি করছে যে শেষ পর্যন্ত মসৃণ কাজের জন্য মানুষের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। সব সম্ভাবনার পুরো বাস্তবায়ন সবক্ষেত্রে না হলেও এআই কিন্তু কোথাও থেমে নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি বেশ দ্রুতলয়ে চল্‌ছে, অনেক ক্ষেত্রে হুড়মুড় করে এসে পড়ছে। এই চল্‌তে গিয়ে যাদেরকে কর্মচ্যুত করছে, সেই মানুষগুলোর মধ্যে দেখা দিচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

শিল্পী-সাহিত্যিকরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, এআই দিয়ে তাঁদের সৃজনশীলতাকে সিনেমায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলার অভিযোগ এনে। এসব সৃজনশীল মানুষের আরো অভিযোগ রয়েছে তাঁদের সৃষ্টি-কর্মগুলোকে এআই ট্রেনিঙে বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করে কার্যত চৌর্যবৃত্তি চালানো হচ্ছে বলে। এআই সৃষ্ট লেখা ছবি, সঙ্গীত, ভিডিও, সিনেমা এসব কি ওইসব মানব-সৃষ্টি থেকে একভাবে আত্মসাৎ করার ফল নয়? এআই কোম্পানিগুলো অবশ্য ট্রেনিং নেয়া আর আত্মসাৎ করাকে এক বলে স্বীকার করে না। আবার অন্য কিছু মানুষের– যেমন হাসপাতালের রুগীদের– ব্যক্তিগত তথ্য যেভাবে এআই ট্রেনিঙে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাও নৈতিকতাবিরোধী বলে মনে করছেন অনেকে। এই সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এআইকে চল্‌তে হচ্ছে। তার সঙ্গে পরিবেশের চিন্তাটিও বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে এআইয়ের বিশাল তথ্যভান্ডার যে সব ক্লাউড ডাটা সেন্টারে রাখা হচ্ছে, তার প্রচণ্ড রকম বিদ্যুৎ চাহিদার কারণে। যেভাবে আকাশচুম্বি হয়ে এআই উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ছে, সারা দুনিয়ায় এর ব্যবহার দ্রুত বাড় ছে, তাতে ডাটা সেন্টারে এই শক্তি চাহিদা যে কোথায় গিয়ে ঠেক্‌বে তা এখনই ভাবিয়ে তুলছে।

ব্যবহারকারীর নিজের পর্যায়েও যদি দেখি এআইয়ের সব প্রভাব সবার ওপর ভালো হচ্ছে না। বিশেষ করে শিশু-মনস্তত্ত্বের ওপর এর বিরূপ প্রভাব রীতিমত আতঙ্কের কারণ হয়েছে– কারণ এআই এখন শিশুরাও নিত্যব্যবহার করছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার প্রভাবে মানসিক বৈকল্যে ভুগছে। এআইয়ে উন্নয়নে স্বচ্ছতার অভাবে তার পেছনের কিছু কোম্পানির বেপরোয়া আচরণ ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে নীরবে বহু রকমের ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন আশঙ্কাও আছে। তাই এর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের কথা সব মহল থেকে উঠ্ছে। তবে এ পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং চীনই শুধু এর উন্নয়নকে স্বচ্ছ ও নিরাপদ রাখতে ব্যাপক ভিত্তিক আইন প্রণয়ন করেছে। এই সবগুলো দিকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে বইয়ের 'এআই চল্ছে' অধ্যায়ে। এআই আমাদের জীবনকে এতটাই বদলে দিতে যাচ্ছে যে, এর কোনো দিকে নির্লিপ্ত থাকার উপায় নেই।

কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে যেখানটিতে একেবারেই নির্লিপ্ত থাকা যাচ্ছে না, সেটি হলো এআইয়ের কারণে কাজ হারাবার আশঙ্কার দিকে। এর থেকে বল্তে গেলে কেউই আজ মুক্ত নয়, যদিও বাস্তবে যা ঘট্ছে, তা এখনো এতটা ভয়াবহ নয়। বরং বলা যায় এআই মানুষের কাজের প্রকৃতিটি দ্রুত বদলিয়ে দিচ্ছে– মানুষকে এখন এআইয়ের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হচ্ছে, এই সুবাদে বেশ কিছু নতুন ধরনের কাজও সৃষ্টি হচ্ছে। অনেককে অবশ্য এমন কিছু কাজের দিকে যেতে হচ্ছে, যেগুলো এআই এখনো ভালো করে না বলেই তাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে– যেমন যেসবে মানসিক সহমর্মিতা ও শারীরিক সূক্ষ্ম নড়াচড়ার দরকার হয়, তেমন কাজ। এআইয়ের কারণে কর্মচ্যুতি এড়াতে এসব বিকল্পের সুযোগ নিতে হলে এআইকে ভালোভাবে চিন্তে-বুঝতে হবে– বিশেষজ্ঞের মতো না হলেও অন্তত এক একটি পর্যায় পর্যন্ত এআই সাক্ষরতা অর্জন করার মাধ্যমে। এটি শুধু নিজের কর্মজীবনকে রক্ষা করার জন্য নয়, বরং এই মহা শক্তিশালী প্রযুক্তির সাহায্যে নিজেকে বর্ধিত করার সুযোগ নিতেও। এই বইটি লেখার পেছনে লেখকের একটি আকাঙ্ক্ষা হলো প্রাথমিক পর্যায়ের এআই সাক্ষরতার একটি সহায়ক বই যেন এটি হতে পারে; অন্তত বিষয়টির নানা দিকে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।

ওভাবেই এআইয়ের অ আ ক খ-গুলো বুঝে বুঝে এর অধ্যায়গুলো এগিয়েছে। শুরু হয়েছে কম্পিউটারের কাজের মৌলিক উপাদানগুলো কী আশ্চর্য রকম সরল সেটি দেখিয়ে, যা শুধু প্রোগ্রামিঙের নির্দেশকে সরল যান্ত্রিক ভাষায় নিয়ে গিয়ে কয়েকটি সহজ কাজ অতি দ্রুত বারবার করার মাধ্যমেই অসম্ভব দারুণ সব কাজ করতে পারে। কিন্তু সেটিকে তার বুদ্ধি হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু এর পর দেখি এআই কাজ করে কম্পিউটারের উল্টোদিক থেকে, প্রোগ্রাম করে দেবার অপেক্ষা না করে জানা তথ্য থেকে শিখে নিয়ে। এজন্যই এআই বুদ্ধিমান– মেশিন লার্নিং তার প্রাণ। তারপর সাম্প্রতিক কয়েক বছরে বড় ভাষার কাজ করে ওই মেশিন লার্নিং হয়েছে অনেক অনেক বেশি গভীর, যা তাকে সৃষ্টিশীলতা দিয়েছে– লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের সৃষ্টিশীলতা। এখন সে মানুষের মতো লিখতে পারে; সঙ্গীত, সাহিত্য,

শিল্প সৃষ্টি করতে পারে; নানা সমস্যার সমাধান দিতে পারে; চিকিৎসা করতে পারে; কলকারখানা চালাতে পারে।

এর ফলে ভবিষ্যতের কথাটি এখন আরো গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের মতো এআইয়ের সাধারণ বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান পাওয়ার কথা, যা আগামী দশকগুলোতেই খুবই সম্ভব। কিন্তু ওখানেই না থেমে মানুষকে ছাড়িয়ে যাবার কথাও কল্পনায় আনতে হচ্ছে। অতি শক্তিশালী সুপার-ইন্টেলিজেন্স হয়ে এআই বন্ধুসুলভ বা বৈরী যেকোনো অনিশ্চিত রূপ নেবার কথাও ভাবতে হচ্ছে, সুদূর কল্পনা হিসেবে।

এ নিয়ে বইয়ের শেষ অধ্যায়- 'এআই চলবে: আমাদের কী হবে?' শেষের প্রশ্নটি শুধু দূর ভবিষ্যতের জন্য নয়, কয়েক বছরের মধ্যে এআইয়ের কারণে মানুষের কাজ হারানোতে যে অর্থনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে, সে জন্যও। তার জন্য কী প্রস্তুতি আমাদের আছে? এ প্রস্তুতি হিসেবে একটি নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের কথা অনেকে ভাবছেন যার কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। এটি হয়তো অবশেষে সব মানুষকে নেহাত জীবিকার জন্য শ্রম দিয়ে যাওয়া থেকে মুক্তি দিয়ে মনুষ্যত্বের উচ্চতর চর্চাগুলোতে কাজ করার সুযোগ করে দেবে। ভবিষ্যতের এআইয়ের কল্যাণকর ও ভয়ঙ্কর যে নানা বিকল্প দৃশ্যকল্প আমরা এখানে হাজির করতে পেরেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে কল্যাণকরটির দিকেই হয়তো এগুতে পারবে দেশে দেশে মানুষের একটি বিশ্ব-সমঝোতা।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

জানুয়ারি, ২০২৬

সূচিপত্র

কম্পিউটারের কথিত বুদ্ধি কীরকম ১৩
মেশিনের শেখা থেকে পূর্বাভাস ২৮
সব কাজের কাজি ৫৭
বড় ভাষার সৃষ্টি উল্লাস ৮৪
রূপান্তরের ম্যাজিক: ভাষাকে ছাড়িয়ে সবখানে ১০৫
এআই যখন এজেন্ট ১৪৪
এআই চল্‌ছে ১৬২
এআই সাধারণ বুদ্ধি কতদূর? ২৩৩
এআই চল্‌বে: আমাদের কী হবে? ২৬৩

কম্পিউটারের কথিত বুদ্ধি কীরকম

তুরিং টেস্ট

আজকের যাবতীয় কাজের জাদুর কাঠি ডিজিট্যাল কম্পিউটার যখন তৈরিই হয়নি, তখন এ্যালেন তুরিং নামের এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ১৯৩০ এর দশকের শেষদিকে এর আদ্যোপান্ত সবকিছু কল্পনা করেছিলেন। তৈরি হলে কীভাবে এটি কাজ করবে ও অসাধ্য সাধন করবে, তার একটি অতি সহজ সরল নিয়ম তিনি উপমায় তুলেও ধরেছিলেন। সেই কম্পিউটারের প্রথম রূপ আসার কিছু পরপরই ১৯৫০ সালে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, এটি একদিন এমন জায়গায় পৌঁছবে যে, মানুষের আর কম্পিউটারের বুদ্ধিমত্তাকে আলাদা করা যাবে না। সত্যি সত্যি তেমন অবস্থা এসেছে কি না সেটি বোঝার জন্য একটি পরীক্ষার কল্পনাও করেছিলেন তিনি, যাকে এর পর থেকে তুরিং টেস্ট বলা হয়।

এই পরীক্ষায় একজন মানুষ বিচারক লিখে লিখে প্রশ্নোত্তর করেন দূরবর্তী একজন মানুষ ও একটি কম্পিউটারের সঙ্গে। তিনি আগে থেকে জানেন না কোন্ উত্তরটি মানুষ থেকে আসছে আর কোন্টি কম্পিউটার থেকে। কিন্তু আলাপের পরেও তিনি যদি সেটি উভয়ের উত্তরের গুণাগুণ থেকে না বুঝতে পারেন, তখন তাঁকে স্বীকার করতেই হবে যে, কম্পিউটার মানুষের মতোই বুদ্ধিমান। যাঁরা কম্পিউটারের অভাবনীয় অগ্রগতি অনুসরণ করে গেছেন, তাঁদের অনেকের মতে ২০১৪ সালে এটি অর্জিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন তারও অনেক আগেই তা হয়েছে। অর্থাৎ কম্পিউটার মানুষের মতো বুদ্ধি রাখে, অন্তত তুরিঙের দেয়ার সংজ্ঞা অনুযায়ী। আমরা দেখার চেষ্টা করবো অন্যরা একে কতখানি সঠিক মনে করেন। আর তুরিং টেস্ট আদৌ কম্পিউটারের বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট প্রমাণ কি না। তাছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) আসার আগে কম্পিউটারের কোনোরকম বুদ্ধিমত্তা থাকার সুযোগ আদৌ ছিল কি না। তবে তার আগে দেখি যাকে এতই বুদ্ধিমান বলে

মনে করা হচ্ছে সেই কম্পিউটার মূলত অতি সরল একটি যন্ত্র কীভাবে। তারপরও কী কৌশলে এটি দারুণ সব জটিল কাজ করে থাকে?

মৌলিক পর্যায়ে কম্পিউটার খুবই সরল

তার মৌলিক উপাদানের পর্যায়ে কম্পিউটার অতি সরল একটি যন্ত্র। এ পর্যায়ে এটি একইরকম অসংখ্য সুইচের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। সব সুইচের মতো এর প্রত্যেকটি অন্ আর অফ্ এই দুটির একটি অবস্থাতেই থাকতে পারে। অন্ থাকলে বলি এটির মান ১, আর অফ্ থাকলে বলি সেটি ০। এই দুইটি সংখ্যার প্রত্যেকটিকে অর্থাৎ সুইচের একটি অবস্থাকে বলি একটি বিট, বাইনারি ডিজিট কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ মাত্র দুটি সংখ্যায় গড়া যে সংখ্যা ব্যবস্থা (বাইনারি ব্যবস্থা) তাতে সেই দুই সংখ্যার প্রত্যেকটি একটি বিট। আমাদের দশ সংখ্যাভিত্তিক সংখ্যা ব্যবস্থায় যেমন ১ থেকে ৯ এবং ০ কে দিয়ে যেকোনো সংখ্যা লিখতে পারি, তেমনি দুই সংখ্যাভিত্তিক বাইনারি ব্যবস্থায়ও যেকোনো সংখ্যা লেখা সম্ভব পরপর শুধু ১ আর ০ সাজিয়ে। এসব সংখ্যা দিয়ে অক্ষর, চিত্রের এক একটি ক্ষুদ্র ফোঁটা ইত্যাদির প্রতিনিধিত্ব করিয়ে অঙ্কের কাজ ছাড়াও লিপি, ছবি ইত্যাদির বার্তাও ওই সুইচ অন্ আর অফ্ এর নিরিখে প্রকাশ করা সম্ভব। কম্পিউটার এগুলো নিয়েও কাজ করে, যদিও শেষ অবধি সেগুলোকে সংখ্যায় পরিণত করে বলেই তা লিখতে পারে, ও তা নিয়ে কাজ করতে পারে।

এরকম কয়েকটি সুইচকে এমনভাবে তার দিয়ে যোগ করে একটি বর্তনী তৈরি করা যায়, যাকে বলা হয় লজিক গেইট (যুক্তির দরজা)। যুক্তির দরজা বলার কারণ হলো ইনপুটে দেয়া ১ বা ০ সংখ্যা এই দরজা পার হলে অন্যদিকে আউটপুটে কী পাবো তা কোনো একটি যুক্তি বা নিয়মকে মেনে ঠিক হয়, বর্তনীটি এমনভাবেই তৈরি। এরকম একটি লজিক গেইটের নাম 'নট' গেইট (না)। এই নামের বর্তনীটির ইনপুটে যা থাকে, গেইটের কাজের মাধ্যমে আউটপুটে তা বিপরীতটি হয়ে যায়- ইনপুটে ০ থাকলে আউটপুটে ১, ইনপুটে ১ থাকলে আউটপুটে ০। এজন্যই নামটি হলো 'নট'। আর একটি লজিক গেইটের নাম 'এ্যান্ড' (এবং) গেইট। এতে বর্তনীর দুটি ইনপুটের প্রত্যেকটি ১ হলেই শুধু আউটপুট ১ হয়, বাকি সব ক্ষেত্রে আউটপুট ০ হয়। অর্থাৎ ইনপুটে ১ 'এবং' ১ থাকলে তবেই আউটপুট হ্যাঁ (১) পাব। উপমায় বলা যায় দুজন ড্রাইভার যেন একসঙ্গে একটি গাড়ি স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছে। প্রথমজন 'এবং' দ্বিতীয়জন একসঙ্গে সুইচ অন্ করলেই শুধু গাড়ি চালু হবে। আর একটি

লজিক গেইটের নাম 'অর' (অথবা) গেইট। ওতে ইনপুটের যেকোনো একটি ১ হলেই আউটপুট ১ হবে। অর্থাৎ ইনপুটে প্রথমটি 'অথবা' দ্বিতীয়টিতে ১ থাকলেই তবে আউটপুট হ্যাঁ (১) হবে। গাড়ির উপমায় বলা যায় দুজন ড্রাইভারের মধ্যে যেকোনো একজন সুইচ অন্ করলেই গাড়ি চালু হবে, অন্যজন অফ্ রাখলেও ক্ষতি নেই। অবশ্য দুজনই সুইচ অন্ করলেও গাড়ি চালু হবে– অর্থাৎ দুটি ইনপুটে ১ থাকলেও আউটপুট ১ হবে, একটিতে ১ থাকলেও যা হবে। আরো কিছু লজিক গেইট আছে, তবে এই 'নট্', 'অ্যান্ড', 'অর' এই তিনটারই নানা সমন্বয়ে ওগুলোকে তৈরি করা সম্ভব– এ সবই মৌলিক উপাদান, খুবই সরল।

সবরকমের গেইটগুলো থেকে নানা কয়েকটি বিভিন্নভাবে যুক্ত করে আরো কিছু সামান্য জটিলতর বর্তনী তৈরি করা হয়, যেগুলো গণিতের প্রথম চার নিয়মের মতো অঙ্ক করতে পারে। এমনি একটি হলো যোগ করার ব্যবস্থা যাকে বলে 'অ্যাডার'। এতে দুই ইনপুটে যা আছে, তা যোগ হয়ে আউটপুটে দেখায়। বাইনারি সংখ্যা সিস্টেমে যোগ করা শুরু হয় ১ আর ০, অথবা ০ আর ১, অথবা ১ আর ১, অথবা ০ আর ০ যোগ করে। ১ আর ১ যোগ করে যখন দুই হয়ে যায়, তখনো ওখানে ১ই লেখা হয়, বাকি এক হাতে থাকে পাশের পরবর্তী ঘরের সঙ্গে যোগ হবার জন্য– ঠিক আমরা যা দশটি সংখ্যা নিয়ে করি দশ সংখ্যার সিস্টেমে; এককের ঘরে যোগফল সংখ্যাটি নয় বা এর বেশি হয়ে গেলে ডানের সংখ্যাটি এখানে বসিয়ে বামেরটি হাতে রেখে দশকের ঘরে নিয়ে যোগ করি। অ্যাডার এভাবে ১ ও ০ এর মধ্যে যোগ করে হাতে থাকলে তা পরের ঘরে নিয়ে নিয়ে যেকোনো দুই বড় সংখ্যাও যোগ করতে পারে। তাছাড়া ইনপুটে ওভাবে পরপর এক সারি বিটের কোনোটি ০ কোনোটি ১ রেখে যেকোনো বড় সংখ্যা লেখা যায়, আউটপুটেও যেকোনো সংখ্যা এভাবেই দেখা যায়। কম্পিউটারের অন্য যে কোনো অংশেও ওভাবে যেকোনো সংখ্যা লেখা যায়।

অ্যাডার যেমন যোগ করে, লজিক গেইট দিয়ে তৈরি আর একটি বর্তনী তেমনি গুণ করে, তার নাম 'মালটিপ্লায়ার'। ওভাবে ভাগ করার জন্য আর একটি হলো 'ডিভাইডার'। আরো একটি বর্তনী আছে যাকে বলা হয় 'কমপারেটর' (তুলনাকারী), এটি দুটি সংখ্যা তুলনা করে ওদের মধ্যে প্রথমটি অপেক্ষাকৃত বড় হলে আউটপুট একরকম আসে, দ্বিতীয়টি বড় হলে অন্য রকম আসে। এই যে প্রথম চার নিয়মে অঙ্ক করতে পারা, শুধু এদের ভিত্তিতেই– সুইচের অন্ আর অফ্ থাকার অর্থাৎ ১ আর ০ এর ভাষায় যেকোনো ধরনের জটিলতর অঙ্কও করা সম্ভব। আসলে গণিতের যেকোনো জটিল কাজকে ভেঙে একে চার নিয়মে নিয়ে আসার উপায় গণিতবিদদের

জানা আছে। তা তাঁরা ভেঙে কম্পিউটারের জন্য সহজ করে দেন। যে প্রোগ্রামাররা কম্পিউটারকে নির্দেশ দেন, তাঁরা কার্যত ওভাবে ভেঙেই কম্পিউটারকে জটিল অঙ্ক করতে বলেন।

লজিক গেইটগুলো আসলে কী দিয়ে তৈরি? এগুলো সাধারণত সিলিকন সেমিকন্ডাকটর দিয়ে দিয়ে তৈরি পরিচিত ট্রানজিস্টর ছাড়া আর কিছু নয়– ওটি চমৎকার সুইচের কাজ করে এবং এক বা একাধিক মিলে দিব্যি লজিক গেইটও হয়। সিলিকনের পাতলা পাতের ওপর (চিপ) এরকম অসংখ্য ট্রানজিস্টর নানা বর্তনীতে অত্যন্ত ঘনীভূতভাবে তৈরির প্রযুক্তি আজ রয়েছে। ছোট্ট একটি চিপে দশ কোটি, এমনকি একশ কোটি ট্রানজিস্টর খচিত করে নেয়া আজ বিচিত্র কিছু নয়। ফলে বিস্তারিত জটিল অঙ্ক শুধু ওই চার নিয়মে করার জন্য যে অসংখ্য লজিক গেইটের প্রয়োজন হয়, তার জন্য কম্পিউটারে খুব অল্প জায়গাই লাগে– যে কারণে স্মার্টফোনে বা হাতঘড়ি সাইজের কিছুতেই বেশ সক্ষম কম্পিউটার উঠে আসতে পেরেছে। দিনদিন একে আরো ছোট জায়গায় আনা যাচ্ছে। অন্যদিকে অত্যন্ত বড় বড় কাজ করার উপযোগী সুপার-কম্পিউটার তৈরিও সম্ভব হয়েছে।

ওই লজিক গেইটগুলোর নানা সমন্বয় দিয়ে যাবতীয় অঙ্ক করানোকেই বলা হয় কম্পিউটারের প্রসেসিং। কম্পিউটারে যে কেন্দ্রীয় সিলিকন চিপগুলোতে মূল প্রসেসিঙের কাজ চলে তাকে বলা হয় সেন্টাল প্রসেসিং ইউনিট (সি পি ইউ)। ঠিক এমনি ভাবে সুইচ বা বিটের আর একটি বিরাট সমন্বয় থাকে 'মেমোরি' (স্মৃতি) নামক অংশে। এটি কম্পিউটারের ভেতরেও কিছু থাকে, আবার বাইরে থেকে সাময়িক ভাবে যোগ করা যায় পেনড্রাইভ ইত্যাদি রূপে। মেমোরির ব্যাপারটিকে আমরা একটি বুকশেল্‌ফের উপমায় দেখতে পারি- যার প্রত্যেক তাকে তাকে, খাঁজে খাঁজে নানা জায়গায় একটি লেবেল লাগিয়ে ঠিকানা দেয়া আছে। কোন্ ঠিকানায় আমরা ওই বিটের পর বিটে সাজানো তথ্যের স্মৃতি রাখছি তার হিসাব থাকে। ঠিক সেখানে থেকে ঠিকানা ধরে খুঁজে নিয়ে তথ্যকে এনে কাজে লাগাতে পারে কম্পিউটার। আমরা দেখবো সংখ্যার রূপে যেখানে শুধু অঙ্ক করার সংখ্যাই থাকে না, বরং সংখ্যায় রূপ দিয়ে লেখা-জোকার লিপি, ছবি, আওয়াজ সবই থাকতে পারে মেমোরিতে। আর তাতে থাকতে পারে কম্পিউটারকে কাজ করানোর জন্য দেয়া নির্দেশাবলিও।

এই যে নির্দেশাবলি, তাকে বলা হয় কম্পিউটারের প্রোগ্রাম– মানুষ প্রোগ্রামার এগুলো রচনা করেন, তা কম্পিউটারকে দিলে ওটি নির্দেশমতো কাজ করতে পারে।

এই নির্দেশ মেমোরিতে জমা থাকে। সি পি ইউ সেখান থেকে একে নিজের কাছে নিয়ে আসে। শেষ অবধি এগুলো বিটের পর বিটে সাজানো একটি প্যাটার্ন বই কিছু নয়, যা সরাসরি অ্যাডার, মাল্টিপ্লায়ার, কমপারেটর ইত্যাদিকে কাজ করায়। অঙ্কের ফলাফল যা আসে, তা আবার মেমোরিতেই জমা হয়, যেখান থেকে ব্যবহারকারী পায়, অথবা যা সরাসরি বাইরের কোনো যন্ত্রের মধ্যে কাজ করে।

প্রোগ্রামারের কাজ

প্রোগ্রামার একেবারে সাধারণ ইংরেজি বা বাংলার মতো মুখের ভাষার কাছাকাছিতে এবং সাধারণ অঙ্কের সংকেতে নির্দেশগুলো দেন, তবে তাকে একটু নিয়মবদ্ধ করে পাইথন, সি ইত্যাদি নানা প্রোগ্রামিং ভাষার নির্দেশে রূপ দিয়ে। প্রোগ্রামিং মানে এক কথায় হুকুম দিয়ে দেয়া নয়। অনেক ভেবেচিন্তে কাজকে ভেঙে ভেঙে ধাপে ধাপে নির্দেশ দিতে হয়, অনেকটা গাণিতিক সৌকর্যের সঙ্গে। এই ধাপগুলোকে বলা হয় অ্যালগরিদম। কম্পিউটারের মধ্যে গিয়ে অবশ্য 'কম্পাইলার' নামক একটি অংশ নির্দেশগুলোকে একেবারে বিটের ভাষায় ১ আর ০ এর ভাষায় অনুবাদ করে দেয়। কম্পিউটার শুধু বিটের ভাষাটাই বোঝে। বিটের ভাষাই লজিক গেইটের ইনপুটে গেলে তা কাজ করতে পারে। সাধারণ ভাষাকে বিটের ভাষায় পরিণত করাকে একটি ডিকশনারির উপমায় আমরা দেখতে পারি– যেখানে ডিকশনারির রচয়িতা কষ্ট করে এক ভাষার শব্দের বিপরীতে অন্য ভাষার শব্দ খুঁজে নিয়ে স্থাপিত করেছেন। শেষ অবধি সি পি ইউতে যাবতীয় অঙ্কগুলো করার পর প্রোগ্রামারের উদ্দেশ্যটিকে সফল করে ফলাফল পাওয়া যায়।

সঙ্গীতজগতের একটি উপমায় ব্যাপারটি দেখা যাক। এখানে প্রোগ্রামার হচ্ছেন সিম্ফোনি সঙ্গীতের সৃষ্টিকার একজন কম্পোজারের মতো। তিনি সিম্ফোনিটি রচনা করলেন সঙ্গীতের নোটের ভাষায়। অর্কেস্ট্রায় নানা বাদ্যযন্ত্রের যে বাদকরা একে বাস্তবায়িত করবেন তাঁরা ওই অ্যাডার মাল্টিপ্লায়ারের মতো। তাঁদের প্রত্যেককে সঙ্গীতের ট্রান্সক্রাইবার যার যার অংশের নোট তাঁর নিজের যন্ত্রের মতো করে ভেঙে দিয়েছেন যথাসময়ে নিজ যন্ত্রটি ওভাবে বাজাবার জন্য। এটি অনেকটা কম্পিউটারের কম্পাইলারের কাজের মতো, প্রোগ্রামারের ভাষাকে ভেঙে বিটের ভাষায় লজিক গেইটের কাছে নিয়ে গিয়েছে। অর্কেস্ট্রার যন্ত্রীরা যা বাজান, সেগুলো বাদ্যযন্ত্র– একেবারেই ধরাছোঁয়ার মতো শক্ত যন্ত্র। তেমনি লজিক গেইট, সি পি ইউ, মেমোরি

ওইসবও একেবারে ধরাছোঁয়ার মতো শক্ত যন্ত্র। এদেরকে নিয়েই কম্পিউটার নামক শক্ত যন্ত্রটি। এদেকে এজন্য বলা হয় হার্ডওয়্যার বা শক্ত জিনিস।

কিন্তু বাদ্যযন্ত্রকে এমনি এমনি বাজানো যায় না, তার পেছনে সঙ্গীত রচনা করতে হয়, যে কাজ হলো কম্পোজারের। ওই সঙ্গীত কিন্তু মোটেও ধরাছোঁয়ার মতো শক্ত কোনো জিনিস নয়, বরং বলা যায় মাথা খাটিয়ে রচনা করার মতো 'নরম' জিনিস। কম্পিউটারকে কাজ করাতে হলে সেরকম দরকার হয় প্রোগ্রামের, সেটিও মাথা খাটিয়ে প্রোগ্রামার রচনা করেন। এও একেবারে নরম জিনিস– তাই বলা হয় 'সফ্‌টওয়্যার'। ওই প্রোগ্রামই সফটওয়্যার যা হার্ডওয়্যারকে কাজ করায়। কম্পিউটার যদি হয় যন্ত্র, সফ্‌টওয়্যার হলো তার মন্ত্র।

এই বইয়ের পরের অধ্যায়গুলোতে আমরা যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে কথা বলবো, তা প্রায় সর্বাংশে সফ্‌টওয়্যারে গড়া– বুদ্ধির কাজে গণিতকে ব্যবহার করার মন্ত্র বলা যায় একে। তবে তাকেও বাস্তবায়িত করতে কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের দরকার হয়– মূলত সেই একই কম্পিউটার যার মৌলিক উপাদানগুলোকে আমরা বেশ সরল হিসেবেই দেখছি।

আজকের ছোট একটি সিলিকন চিপে যে শত কোটি ট্রানজিস্টর বা লজিক গেইট কাজ করে যায়, তার প্রত্যেকটি খুব সহজ সরল জিনিস। কম্পিউটারে এগুলোকে যেভাবে সব থেকে মৌলিক ও সরল পর্যায় থেকে আরো উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে অনেক সংখ্যায় সন্নিবেশিত করা হয় জটিলতাটা আসে সেখানেই। একেবারে সোজাসাপটা লজিক গেইটের পর্যায় থেকে একটু ওপরের পর্যায়ে সন্নিবেশ ঘটে অ্যাডার, মাল্টিপ্লায়ার ইত্যাদির পর্যায়ে। তারপর এগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করে চার নিয়মের অঙ্ক করা আর এক ধাপ ওপরের পর্যায়ে। তারপর আরো ওপরে সি পি ইউর পর্যায়ে প্রোগ্রামারের নির্দেশগুলো এসে কাজ করে নিচের ওই চার নিয়মের অঙ্কের মাধ্যমে। আমরা যদি প্রোগ্রামের পর্যায়গুলো দেখি কম্পিউটারে সত্যিকার প্রসেসিঙের পর্যায়ে এটি একেবারে সরল নিম্নতম পর্যায়ে বিটের ভাষায় নির্দেশ দেয়। এরপর একটি পর্যায় আছে, যাকে বলা হয় অ্যাসেম্বলী প্রোগ্রাম– মূল প্রোগ্রামারের নির্দেশ থেকে কম্পাইলারের অনুবাদে এটি পাওয়া যায়। আরো উচ্চতর পর্যায়ে হলো হাই লেভেল কোড– যা প্রোগ্রামাররা সাধারণত একেবারে মুখের ভাষার কাছাকাছি প্রোগ্রামিং ভাষায় রচনা করেন। এর ওপরেও একটি পর্যায় করে নেয়া হয় একেবারে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য যাঁরা প্রোগ্রামিং ভাষা জানেন না, বোঝেন না। এগুলো হলো অ্যাপস পর্যায়ে– আপনার কম্পিউটারে বা ফোনে ডাউনলোড করে

নিয়ে যা দু-চারটি লেখা নির্দেশ থেকে বা ছবির নির্দেশ থেকে বেছে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ কি না কম্পিউটারকে কিছু করার জন্য নির্দেশ সর্বোচ্চ পর্যায়ে আপনিও দিতে পারেন। ওটিই পর্যায়ক্রমে নামতে নামতে বিটের ভাষায় গিয়ে কম্পিউটারকে কাজ করাবে।

লিপি ছবি ইত্যাদি নিয়ে কাজ

এ পর্যন্ত বারবার বলা হয়েছে কম্পিউটার সংখ্যা লেখে এবং অঙ্ক করে। আসলেও তাই, কম্পিউটারকে সবকিছু সংখ্যা নিয়েই করতে হয়। প্রোগ্রামারের নির্দেশ শেষ পর্যন্ত সংখ্যার ভাষাতেই কার্যকর হয়। তাহলে এই যে কম্পিউটারের নানা কিছু লিখে দিই বা তার থেকে যে লেখা পাই, নানা ছবি দিই বা তার থেকেও ফল পাই; আওয়াজ, ভিডিও সবকিছু সেগুলোর কোথায় কী হয়? সেক্ষেত্রেও আসলে সবকিছুকে সংখ্যায় পরিণত করেই কম্পিউটারকে দিতে হয়– নির্দেশগুলোও শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ে সংখ্যায় নির্দেশ। যেমন কম্পিউটার যখন লিপিতে কোন শব্দ, অক্ষর ইত্যাদি পায় প্রতিটি অক্ষরের জন্য তার কাছে একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আছে। ওই অক্ষরটির জন্য এটি সেই সংখ্যাটাই মেমোরিতে জমা করে নেয়– এক সারি বিটের রূপে লেখা। এভাবে অক্ষরের পর অক্ষরে শব্দ, বাক্য সবকিছু সংখ্যার রূপে মেমোরিতে থাকে। এই লিপিকে নিয়ে কম্পিউটার যে কাজ করে তা আসলে অঙ্কের আকারেই করে। যেমন দুটি শব্দকে যদি তুলনা করতে চায়- কোন্ শব্দটি আকারে বড়– তখন যে আসলে তার সংখ্যাগুলোর তুলনা করে, যে ব্যবস্থা কম্পারেটার রয়েছে। শেষ অবধি সবই অঙ্কের কাজ।

একটি ছবির কথাই ধরি। যেকোনো ছবিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র আলোর ফোটায় ভাগ করে ফেলা যায়। এই প্রত্যেকটি ফোঁটাকে বলা হয় এক একটি পিক্সেল। প্রত্যেক পিক্সেলকে আবার তিনটি সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব করানো যায়। একটি সংখ্যা হলো লাল আলোর তীব্রতার সূচক, আরেকটি হলো সবুজ আলোর, এবং আরেকটি নীল আলোর। এই তিন রঙের তীব্রতার মিশ্রণে বোঝা যায় একটি পিক্সেলের রং ও তীব্রতা; তাই এই তিনটি সংখ্যা পিক্সেলটির সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কম্পিউটারে সত্যি সত্যি আলোর ফোঁটা যায় না, তার বদলে সেখানে লেখা হয় ওই ফোঁটার প্রতিনিধিত্বকারী তিনটি সংখ্যা। এভাবে ছবির সব পিক্সেলের জন্য সংখ্যাগুলো এবং পুরো ছবিটির জন্য সংখ্যাগুলোই হলো কম্পিউটারের জন্য ছবি। এই সংখ্যাগুলো নিয়ে কাজ করাই হলো ছবির ওপর কাজ করা। যদি ছবির আলোর তীব্রতা বাড়াতে চাই, কম্পিউটার তখন ওই সংখ্যাগুলোকে আরো বড় সংখ্যায়

রূপান্তরিত করে। যদি কম্পিউটারে ছবিটিকে ঘোরাতে চাই তখনো একটি অঙ্কই করতে হয় ওই সংখ্যাগুলোকে নিয়ে। সেটি অবশ্য অনেক জটিলতর অঙ্ক যাকে বলা হয় ম্যাট্রিক্স অ্যালজেব্রা। অনেকগুলো সংখ্যার সাজানো রূপকে বলা হয় একটি ম্যাট্রিক্স। এই জটিল অঙ্ককেও অবশ্য প্রথমে চার নিয়মে ভেঙে ফেলা যায়, এবং কম্পিউটার ওভাবেই অঙ্কগুলো করে– ছবি ঘুরে যায়।

এমনি ভাবে গান, সিম্ফোনি, কণ্ঠস্বর বা অন্য আওয়াজকেও সংখ্যায় পরিণত করেই কম্পিউটার তার ওপর অঙ্কের মতো করে কাজ করতে পারে। লিপি, অডিও, ভিডিও সবক্ষেত্রে একই কথা– শেষ পর্যন্ত তা অঙ্ক। কম্পিউটারকে অন্য রকম যুক্তির কাজও দেয়া হয়। যেমন প্রোগ্রামের নির্দেশ হতে পারে 'ক যদি খ থেকে বড় হয় তাহলে গ চালু কর'। তখন লজিক গেইটে গড়া কম্পারেটর বর্তনী ক ও খ এই দুটি সংখ্যাকে তুলনা করে। অপেক্ষাকৃত বড় সংখ্যা হিসেবে যদি ক'কে পায়, তাহলে সেরকম আউটপুট 'কন্ট্রোল' নামের আরেকটি বর্তনীর সাহায্যে গ'কে চালু করে দেয়। আর যদি অপেক্ষাকৃত বড় সংখ্যা হিসেবে 'খ'কে পায়, তাহলে যেই আউটপুট তা কিছুই করে না। এ কাজটি খুব কঠিন কিছু নয়, সরল পর্যায়েই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঠিক এই ক্ষমতাটিকে দিয়ে কম্পিউটারকে অনেক অনেক বৃহত্তর কাজে লাগানো যায়। এই যে 'এটি যদি ওটি থেকে বড় হয় তা হলে ঐটি করো' এই জাতীয় নির্দেশকে নানা রূপ দিয়ে সেই কাজগুলো করা যায়। যেমন দুটি শ্রেণির মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার জন্য এরকম শর্ত দেয়া যায় 'যদি এটি থেকে ওটি বড় হয় তা হলে বাম শ্রেণিতে যাও, নইলে ডান শ্রেণিতে যাও'। একই মূল শ্রেণির দুটি শাখা সৃষ্টি করা যায়। আবার একইভাবে প্রত্যেক শাখার দুটি প্রশাখা সৃষ্টি করা যায়। একই রকম শর্ত দিয়ে চক্রাকারেও কাজ করানো যায়। 'যদি এটিকে ওটি থেকে বড় পাও, তাহলে আগের জায়গায় ফিরে যাও এবং পরপর কাজগুলো আবার কর'। চক্রাকারে করার সময় যতক্ষণ চক্রের এক জায়গায় একটি নতুন সংখ্যা পাচ্ছে, ততক্ষণ তা চলতেই থাকতে পারে। অথবা যতক্ষণ ফলাফলটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে বড় হয়ে না যাচ্ছে চক্র চলতেই থাকে। সেখানেও সেই রকম শর্ত 'এটি যদি ওটির থেকে বড় হয় তাহলে থেমে যাও'। এমনিভাবে অনেক বড় বড় সক্ষমতা সৃষ্টি করা যায় যেসব কাজ কম্পিউটার বিদ্যুৎ গতিতে সম্পন্ন করতে পারে। কম্পিউটারকে দিয়ে কী করাবেন সেই নির্দেশ দেয়ার কাজ প্রোগ্রামারের।

প্রোগ্রামারদের বাহাদুরি

ডিজিট্যাল কম্পিউটারের যুগ যখন থেকে পাখা মেলেছে, সেই ১৯৫০ এর দশক থেকেই কম্পিউটার দুর্দান্ত সব কাজ করছে। সব কাজের পেছনে অবশ্যই ছিল সেই প্রোগ্রামাররা– যাঁরা বিস্তারিত নির্দেশ কম্পিউটারকে দিয়ে সেই কাজগুলো করিয়ে নিয়েছেন। প্রথম দিকে বড় কাজের মধ্যে উন্নয়ন ঘটেছে জটিল গাণিতিক প্রক্রিয়া সমাধান করে তার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা, রকেট প্রযুক্তি, ইত্যাদিকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত করা। যেমন মারণাস্ত্র বহনকারী একটি রকেট চালিত মিসাইল এক মহাদেশ থেকে ছুড়ে আর এক মহাদেশের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদন করা। প্রোগ্রামাররা সেভাবেই করণীয় সব কাজের জন্য কম্পিউটারকে নির্দেশ দিয়ে দেন। তবে পরের অন্যান্য কাজগুলো মানুষের বেশি প্রিয়।

বহুকাল থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেবার যে কাজটি নেহাত বায়ু-উত্তাপ বায়ুচাপ এই সবকিছুর পরিমাপের ভিত্তিতে কোনোরকমে দেয়ার চেষ্টা হতো, কম্পিউটার এমন দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিকেও মনোযোগ দিয়েছে। পদার্থবিদ্যা ও আবহবিদ্যার যে নিয়মগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বে রয়েছে প্রোগ্রামাররা সেগুলোকে ব্যবহার করে এমন গাণিতিক আবহাওয়া মডেল তৈরি করলেন, যাতে গত কিছুদিনের আবহ-তথ্য দিয়ে সামনের বেশ কয়েকদিনের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব। জটিল সব অঙ্ক করেই অতীতের তথ্য থেকে ভবিষ্যতের আবহাওয়া পাওয়া সম্ভব। প্রোগ্রামাররা সেই অঙ্ককে কম্পিউটারে কাজ করার উপযুক্ত করে ধাপে ধাপে ভেঙে তাকে দিলেন, আর কম্পিউটার নিমিষের মধ্যে অনেক জটিল অঙ্ক করার মাধ্যমে চট্ করে আগামী সাত দিনের পূর্বাভাস নিয়ে এলো। কম্পিউটার না থাকলে মানুষের পক্ষে এই অঙ্ক করে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হতো না। অথচ কম্পিউটারকে কঠিন অঙ্কও একেবারে যোগে বিয়োগে ভেঙে আরো অনেক দীর্ঘভাবে করতে হয়– নেহাত বিদ্যুৎগতিতে করে বলেই কথা।

ষাটের দশক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে কম্পিউটারের ব্যবহার গুরুত্ব পায়। ব্যবসার থেকে আসা তথ্যকে নানা ব্যবস্থাপনা কাজের উপযুক্ত করে সাজালে ওখানে মানুষ-কর্মচারীদের কাজের লাঘব হয়, সবকিছু অনেক দ্রুত ও নির্ভুল হয়। এভাবে অনেক কিছু একেবারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার সুযোগও সৃষ্টি হয়। যেমন ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন, প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার কর্মচারীদের বেতন হিসাবনিকাশ করে সময়মত তা দেয়ার ব্যবস্থা, বিমান-ট্রেন-বাস ইত্যাদির টিকেট রিজারভেশন, প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন হিসাবরক্ষণ ইত্যাদির কথা বলা যায়। প্রায় একইভাবে

কোম্পানির ব্যবসা পরিকল্পনায় আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলনই বলি কিংবা কারখানার কাঁচামাল সরবরাহের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গতিই বলি কম্পিউটারে সব সেরে ফেলতে পারলে এবং কী হলে কী হবে তা তুলে ধরতে পারলে বড় কর্তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ সহজ হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রোগ্রামার এতে করণীয় কাজগুলোর নির্দেশ ভেঙে ভেঙে করতে প্রোগ্রামের আকারে কম্পিউটারে দেন। এ কারণেই বড় বড় কাজ নিমিষের মধ্যে কম্পিউটার করে দেয়– হিসাবে ভুল হবার সুযোগ নেই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব হয়ে যায়। একদিকের তথ্য বা হিসাবের সঙ্গে অন্য কোনো দিকের গরমিল হলে সঙ্গে সঙ্গে তা ধরা পড়ে।

পাশাপাশি বেশ ভিন্ন ধরনের কাজেও কম্পিউটারের ব্যবহার দ্রুত এগিয়ে যায়। সেটি হলো কম্পিউটারকে দিয়ে বাস্তব ঘটনাকে অনুকরণ করানো– যাকে বলা হয় সিম্যুলেশন। অনেক ক্ষেত্রে মূল ঘটনা ঘটারই দরকার নেই। যেমন বিমানের যাত্রায় নানা ত্রুটির সমাধান শেখাবার জন্য তো বারবার বিমানকে ধ্বংস করা যাবে না, তাই শেখার কাজটি কম্পিউটার সিম্যুলেশনের মধ্যেই চলতে পারে। বিমান পরিচালনার খুঁটিনাটির ভিত্তিতে প্রোগ্রামাররা এই অনুকরণের নির্দেশগুলো লেখেন। পাইলটের সামনে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও আকাশ কেমন দেখাবে তার নির্দেশও। সেখানে যতবার ইচ্ছে দুর্ঘটনার উপক্রম করে নবীন পাইলটকে তা সামাল দেবার চেষ্টা করতে দেয়া হয়। কখনো তিনি পারেন, কখনো বিমান ধ্বংস হয়– অবশ্যই সবই সিমুলেশনে। আবার সুদূর তারার শেষ অবস্থায় এসে সেটি যখন সুপারনোভা হয়ে ফেটে যায়, তখন তার কোথায় কী ঘটে তা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ নিয়ে জানতে হলে পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির বিভিন্ন মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে তা কম্পিউটার সিম্যুলেশন করে দেখতে পারি। ওসব তত্ত্ব অনুযায়ী গণিতের কার্যক্রমে ওখানে কী ঘটবে বলে মনে হচ্ছে তা কম্পিউটার বলে দেয়। এখানেও প্রোগ্রামারকে দারুণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। তারার মধ্যে যে ঘটনার কথা হচ্ছে এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্ব, গণিতের নিয়ম এসবের নিরিখেই কিন্তু তাঁকে সিম্যুলেশনের প্রোগ্রামটি তৈরি করতে হয়। তাঁর প্রোগ্রামের প্রতিটি ধাপের সেই অ্যালগরিদমকে অনুসরণ করে কম্পিউটার সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশ করে দেখাবে এরপর তারার কোন অংশ কীরকম আচরণ করতে বাধ্য। একে গাণিতিক ফলাফল হিসেবে যেমন দেবে তেমনি নানা ভিডিও, ছবি, রেখাচিত্র, গ্রাফ ইত্যাদির মাধ্যমেও আমাদেরকে জানিয়ে দেবে। কেমন করে জানাবে তাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রোগ্রাম করে দিতে হয়েছে আগেই।

আজকাল এই সিম্যুলেশনের মাধ্যমে অন্য কোনো জগতের আবহ আমাদের কাছে চলচ্চিত্রে, আওয়াজে, এমনকি স্পর্শ বা ঝাঁকুনিতে এমনভাবে বাস্তবের মতো করে তুলতে পারে যে, সেটি আমাদের দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমরা নিজের বর্তমান জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুভব করি যেন সেখানে চলে গিয়েছি। এমনকি ওটিতে আচ্ছন্ন হবার মতো হেলমেট মাথায় পরি, পায়ে ও হাতে সংবেদী দস্তানা বা মোজা লাগিয়ে নিজের জায়গাতে হেঁটেও মনে হয় হয় ওই অন্য জগতেই যেন হাঁটছি, ঘুরে ফিরে ডানে বামে সে জগতের জিনিস দেখছি, সেখানে হোঁচট খাচ্ছি, স্পর্শ করছি। ওটি নিজে ঢাকায় থেকেও কায়রোর ইজিপশিয়ান মিউজিয়ামে প্রাচীন মূর্তি, মমি ইত্যাদি ঘুরে ফিরে দেখা যেমন হতে পারে, তেমনি মঙ্গল গ্রহে হাঁটাও হতে পারে। একে বলা হয় ভার্চুয়াল রিয়ালিটি অর্থাৎ কম্পিউটার সৃষ্ট বাস্তবতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই নতুন বাস্তবতা সৃষ্টির পেছনে রয়েছেন প্রোগ্রামাররা। তাঁরা যা দেখাতে চাচ্ছেন তাই দেখাচ্ছেন।

এই যে বিভিন্ন রকম কাজে কম্পিউটার অনেকদূর এগিয়ে গেছে, আমাদেরকে অভাবনীয় সব সহযোগিতা দিচ্ছে, তার সবকিছুতে মানুষ প্রোগ্রামারদের রচিত ধাপ ধাপ অ্যালগরিদমই শুধু অনুসৃত হয়েছে– শেষ অবধি গাণিতিকভাবে। কম্পিউটার নামক যন্ত্রটির এতে নিজ থেকে কিছু করার অবকাশ নেই। ওই যন্ত্র নিজ থেকে কিছু করতে পারে না, নির্দেশে দেয়া সুনির্দিষ্ট নিয়মই শুধু মেনে চল্‌তে পারে। সবকিছু একেবারেই নিয়মমত অবশ্যম্ভাবী ‘যদি ক হয় তবে খ হবে’ এমনি সব নিয়মে; এর ব্যতিক্রম কখনো হতে পারে না। নিজের শেখার কারণে কোনো ফলাফলকে কম্পিউটার বদলাতে পারে না, কোনো বিষয়ে নমনীয় হতে পারে না। কাজেই এর কাজের সব দায়িত্ব বর্তায় যাঁরা প্রোগ্রামিং করেন তাঁদের ওপর। সত্যিকার বিষয়টিকে, তার লক্ষ্যটিকে বুঝে নিয়ে সমস্যাকে ভেঙে ভেঙে তাঁদেরকে প্রোগ্রামটি লিখতে হয়। এ কাজের চ্যালেঞ্জ অনেক। যদিও আগের সমাধান হয়ে যাওয়া অনেক অংশ তাঁরা তৈরি অবস্থাতে পেয়ে তা নিজের অন্য সমস্যার প্রোগ্রামে ব্যবহার করতে পারেন, তবুও কাজটি কঠিন।

তাছাড়া প্রোগ্রামারকে অনেকগুলো সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। যেমন একই কাজ কম্পিউটার যাতে আরো সংক্ষেপে, আরো কম সময় ও মেমোরি লাগিয়ে করতে পারে, সেদিকে তাঁদেরকে নজর রাখতে হয়, কারণ কাজের অনুপাতে কম্পিউটারের মেমোরির আর সক্ষমতার আকারের যেমন সীমাবদ্ধতা থাকে, তেমনি অনেক বড় কাজের ক্ষেত্রে সময়েরও সীমাবদ্ধতা থাকে, তার বিদ্যুৎগতি সত্ত্বেও।

তাছাড়া তাঁকে মনে রাখতে হয় যে, তাঁর নির্দেশ কোনো মানুষের জন্য নয় যে, তাতে সামান্য ভুলত্রুটি থাকলেও তিনি বুঝে নিতে পারবেন। এটি কার্যকর করছে একটি যন্ত্র যে একটি কমা, বা একটি অক্ষর এদিক ওদিক হলেই কাজ করতে পারবে না, বরং সবকিছু গুবলেট করে ফেলবে। বড় কাজে প্রোগ্রামগুলোও হয় বেজায় দীর্ঘ– পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অনেক পৃষ্ঠায় অ্যালগরিদমগুলো একের পর এক। নিজের এই পুরো রচনা থেকে সামান্যতম ত্রুটিও খুঁজে বের করে একে নিরুপদ্রবে কম্পিউটারে বাস্তবায়িত হবার মতো অবস্থায় নিয়ে যাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়।

দক্ষ প্রোগ্রামারদেরকে সেজন্য খুবই উচ্চভাবে মূল্যায়ন করা হয়। বড় ও ধনী বিখ্যাত সব কোম্পানি, সব ব্যবসা বা সব কর্মযজ্ঞের হোতারা চান তাঁদের সব কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে করতে। ওতে যত রকমের কাজের অপারেশন রয়েছে সবকিছুকে বুঝে নিয়ে এর জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং তৈরি করার কাজ প্রোগ্রামারকেই করতে হয় বলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাঁদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সবক্ষেত্রে তাঁরা যেভাবে কম্পিউটারকে কাজ করান, তাতে কম্পিউটারের ভেতরে মানুষের বুদ্ধির মতো কোনো বুদ্ধি কি ঝিলিক দেয়?

এই কম্পিউটার কি আসলে বুদ্ধিমান?

সেই ১৯৫০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত কম্পিউটার প্রধানত যেভাবে কাজ করেছে, তার মধ্যে অনেকে মানুষের মতো বুদ্ধি লক্ষ করেছেন। অনেক সময় মানুষের ও কম্পিউটারের মধ্যে প্রভেদ খুঁজে না পেয়ে তাঁরা তুরিং টেস্টে কম্পিউটার পাশ করেছে বলে রায়ও দিয়েছেন। কিন্তু অন্যভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, ওই পাশ করাটি বাহ্যিক একটি ধারণামাত্র। অতীতে কম্পিউটারের যেসব উদাহরণ দেখে এরকম বাহ্যিক ধারণা হয়েছে, তার কয়েকটা দেখা যাক।

ষাটের দশকে এলিজা নামের একটি কম্পিউটার-চালিত রোবট খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এলিজাকে দাবি করা হতো মন খারাপের বা মনোরোগের উপশম করার জন্য পরামর্শ দেয়ার রোবট। এলিজা যেকোনো মানুষের সঙ্গেই এক রকম আলাপ চালিয়ে যেতে পারতো– তার সুখ দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারছে এরকমই মনে হতো। কিন্তু আসলে সে যা করতো তার সঙ্গে আলাপরত মানুষটির কথাটাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে উত্তর দিতো। এই কথার ভিত্তিতে সে উল্‌টো প্রশ্নও করতো। ওইটুকু করার জন্যই সে প্রোগ্রাম করা ছিল। আলাপের একটি উদাহরণ এরকম:

মানুষ : আমার মনটি আজ খারাপ।

এলিজা : তোমার আজ মন খারাপের কারণ কী?

এতে মানুষটির মনে হতে পারে যে, এলিজা তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ নিচ্ছে। আসলে কিন্তু সে তাঁর কথাটাই ঘুরিয়ে বল্‌ছে, এর বাইরে অন্য কিছু বলতে পারতো না।

প্রোগ্রামার তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন সুনির্দিষ্ট কিছু বাক্যের ছাঁচ। তার সঙ্গে আলাপরত মানুষের কথা সাধারণত কোনো না কোনো ছাঁচের সঙ্গে মিল্‌তো। তখন যেই ছাঁচের সঙ্গেই মিলিয়ে প্রোগ্রাম করা আছে, এমন একটি বাক্য ফিরিয়ে দেয়াটাই ছিল এলিজার কাজ। সেভাবেই সে মানুষের কথাটিকে ঘোরাত। ওই দিয়ে দেয়া ছাঁচগুলোর বাইরে তার কিছু করার ছিল না। তার কোনো বুদ্ধি ছিল না, যদিও অনেক মানুষ আলাপে মুগ্ধ হয়ে তা আছে বলেই ভাবতো। অথচ মানুষটির কথা সে মোটেই বুঝেনি বা বুঝে উত্তর দেয়নি।

আরেক ধরনের 'বুদ্ধির' কাজ কম্পিউটার করেছে, যা মানুষের সত্যি সত্যি কাজেও এসেছে। কিন্তু আসলে সেখানেও কোনো বুদ্ধি নেই। যেমন ডাক্তারের মতো রুগীর রোগ নির্ণয় করার কম্পিউটার; অথবা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তথ্য জানাবার মতো কম্পিউটার। রোগ নির্ণয়ের কথায় আসলে রুগীর শরীরের লক্ষণগুলো এবং রক্তের টেস্ট ইত্যাদিতে পাওয়া ফলাফলগুলো যখন কম্পিউটারকে জানানো হয়, তখন কম্পিউটার তাতে থাকা অনেক ছাঁচের সঙ্গে ওগুলো মিলিয়ে দেখে। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষণ ও কিছু সুনির্দিষ্ট টেস্ট ফলাফলের সংমিশ্রণেই তৈরি হয়েছে এক একটি ছাঁচ এর কোনোটির সঙ্গে মিলে গেলে কম্পিউটার একটি নির্দিষ্ট রোগ হয়েছে বলে তার আন্দাজের কথা জানায়। ওই ছাঁচগুলো এবং তার সঙ্গে জড়িত অসুখের নাম আসলে ডাক্তারী জ্ঞানসম্পন্ন প্রোগ্রামার কম্পিউটারে দিয়ে রেখেছেন। এই যে সুনির্দিষ্ট ছাঁচ ও তার সঙ্গে যে সুনির্দিষ্ট রোগ দেয়া আছে, তার ডানে বামে যাবার ক্ষমতা কম্পিউটারের নেই। এর একটি ছাঁচ হতে পারে জ্বর যদি এতটা হয়, সঙ্গে যদি কাশি থাকে, ব্লাড কাউন্ট যদি এত হয়, তাহলে রোগ এটি। আরেকটি হতে পারে জ্বর বেশি, কাশি নেই, ব্লাড কাউন্ট স্বাভাবিক, তাহলে রোগ ওইটি। এইরকম বহুতরো ছাঁচ দেয়া আছে বলে যেটির সঙ্গে মিলবে, সে-ই রোগ দেখাবে। কোনো রোগে রুগী যদি স্বাভাবিক লক্ষণ না দেখান, তাহলে সেটি আন্দাজ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ কম্পিউটারের নেই। কম্পিউটারটি রোগ নির্ণয়ের কথাটি যে ভঙ্গিতে বলে, তা শুনলে যেকোনো দক্ষ ডাক্তার বুঝবেন এটি কম্পিউটার থেকে আসছে, মানুষ-ডাক্তারের কাছ থেকে নয়। অর্থাৎ তুরিং টেস্টে এটি পাশ করবে না। সাধারণত রোগ নির্ণয়ে এরকম কম্পিউটারের সাফল্য এত বেশি যে মানুষ এতে অবাক হয়ে যায়, তার মধ্যে বুদ্ধি দেখতে পায়। কিন্তু এই প্রোগ্রামিঙের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন

রোগের প্রশ্ন উঠলে কম্পিউটারের করার কিছু থাকে না। মানুষ-ডাক্তার অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে হলেও কিছু ধরে নিয়ে চিকিৎসায় এগুতে পারেন, কম্পিউটার পারে না। অনেক রুগী দেখতে দেখতে ডাক্তারের ওই আন্দাজ করার ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু কম্পিউটারের বাড়ে না।

ইতোমধ্যে এই কম্পিউটারের জগতেই এসেছে একটি নতুন জিনিস– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা– আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই। একে নামই দেয়া হয়েছে বুদ্ধিমত্তা, কৃত্রিম হলেও। এটি কৃত্রিম, কারণ এখানেও মানুষের মতো চিন্তা, অনুভূতি বা আবেগের কোনো ছোঁয়া নেই (যদিও অনেক সময় সে রকম মনে হতে পারে)। এআই জিনিসটি সম্প্রতি অনেক উন্নত হয়ে একেবারে সহজে আমাদের নিজের কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য মজুত রয়েছে। কাজেই এটি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা তার বুদ্ধিমত্তার নানা পরিচয় পাচ্ছি। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আগে কম্পিউটারের যে বুদ্ধির ধারণার কথা বল্‌লাম সেরকম নয়। এর মধ্যে নিজের বুদ্ধির একরকম সত্যিকার পরিচয় আছে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলো কোথায়?

এআইয়ের বুদ্ধির মধ্যে যথেষ্ট নমনীয়তা আছে, কোনো প্রোগ্রামার তার কাজের জন্য একেবারে ছকবাঁধা নিয়ম করে দেননি। তার পক্ষে নিজেরই সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ আছে, তথ্য থেকে নিজেই শিখে তার মধ্যে বিশ্লেষণ করার সুযোগও আছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে তার পক্ষে মাঝেমধ্যে ভুল করারও অবকাশ আছে। এর সবই মানুষের বুদ্ধির বেশ কাছাকাছি গুণ, যদিও আগেই বলেছি এ বুদ্ধি কৃত্রিম, মোটেও মানুষের সমকক্ষ বুদ্ধি নয়। সাধারণ কম্পিউটারে তথাকথিত 'বুদ্ধি'র জন্য প্রোগ্রামারকে যা করতে হয় একটি উপমা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। ধরা যাক, সাধারণ কম্পিউটার চালিত একটি রোবট তৈরি করা হয়েছে। তাকে যদি বলা হয় 'এই লাল বলটি তুলে নিয়ে আস', তাহলে সে ঠিক তাই করে। প্রোগ্রামার তাকে এই যে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে ওই কথা শুনলে তাই করতে হবে। কিন্তু বলটির রং যদি একটু চটে গিয়ে কমলা রঙের ভাব ধরেছে এমন হয়, তাহলে বলের কাছে গেলেও সে ওটি আনবে না। তার নির্দেশের থেকে একটু ব্যত্যয় ঘটলেই সে আর কাজ করবে না।

এই সামান্য কাজের জন্য প্রোগ্রামারকে ধাপে ধাপে তার প্রত্যেকটি পরিস্থিতি মনে রেখে নির্দেশাবলি দিতে হয়েছে। নিশ্চিত করতে হয়েছে যে, রোবট লাল বলকে লাল হিসেবে চিনতে পারবে– তার ক্যামেরা লাল আলোকসংবেদী হবে এবং তা লাল হিসেবে গ্রহণ করবে। তারপর নির্দেশনা থাকতে হবে যে, রোবট বলটির কাছে যাবার

সময় সামনে কোনো বাধা এসে পড়লে কী করবে, বাধা না সরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, বাধা সরে গেলে আবার বলের দিকে এগুবে। বলটি ইতোমধ্যে কোন কারণে কিছুটা সরে গেলে কী করবে তাও নির্দেশে থাকতে হবে– সরে যেদিকে গেছে তা লক্ষ করে সেদিকে এগুবে, ক্যামেরায় দেখে। বলটি ক্যামেরার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে কী করবে– ক্যামেরা ঘুরিয়ে চারিদিকে দেখবে। বল তুলে নিয়ে আসার সময় একই রকম বাধা পাওয়া ইত্যাদির নির্দেশনা থাকতে হবে। অর্থাৎ কি না দুর্ভাগ্যক্রমে যা যা হতে পারে, তার সবকিছুর ব্যবস্থাপত্র প্রোগ্রামে থাকতে হবে।

শুধু রোবটটি কিছুটা পথ গিয়ে লাল বলটি চিনে তুলে আনার জন্য প্রোগ্রামারকে এত কিছু নির্দেশ দিয়ে দিতে হয়েছে। এখন চিন্তা করুন কম্পিউটারের কাজ যদি হয় একটি ব্যস্ত হাসপাতাল বা কারখানা চালানো। কী পরিমাণ নির্দেশনা প্রোগ্রামারদেরকে রচনা করতে হবে এইজন্য। বল আনার রোবটের যেমন নিজের কোনো বুদ্ধি নেই, তেমনি হাসপাতাল চালাবার কম্পিউটারেরও নিজের কোনো বুদ্ধি নেই– যদি না আজকাল তাতে এআই ব্যবহার করা হয়। আসলে এআই না থাকলে কম্পিউটারের পক্ষে সত্যি সত্যি হাসপাতাল বা কারখানা চালানো অসম্ভব হতো– নেহাত অনেক মানুষ কাজ করে বলেই ওগুলো চলে। কম্পিউটারের পক্ষে অসম্ভব হতো কারণ ওই আকারের খুঁটিনাটি প্রোগ্রাম আগে থেকে করা প্রায় অসম্ভব, এত বিচিত্র ঘটনা ওখানে ঘটতে পারে।

অন্যদিকে এআইয়ের ব্যাপারটিই আলাদা। এখানে প্রোগ্রামারদের পঁইপঁই করে নির্দেশ দেবার ব্যাপারটি নেই। তাঁদের কিছুটা কাজ এতেও আছে, কিন্তু তা এআইয়ের নিজের কাজের তুলনায় অতি কম। এআইয়ের কাজে প্রয়োজনীয় তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত যে সফ্টওয়্যার তার অ্যালগরিদমগুলো কম্পিউটারে চালু হলে তা নিজে নিজেই অনেক কিছু শিখতে, বুঝতে, তার মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে পেয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সেটি সে কীভাবে করে, কীভাবে ঘটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ, তাই নিয়েই এই বইয়ের বাকি অংশ।

মেশিনের শেখা থেকে পূর্বাভাস

উল্টোদিক থেকে সমাধান

আমরা দেখেছি কম্পিউটার কাজ করে প্রোগ্রামে দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী। আগে প্রোগ্রামার তাঁর অ্যালগরিদমে ধাপে ধাপে কাজের নির্দেশ দেন, পরে কম্পিউটার সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে ফলাফল দেয়। কিন্তু এআই নিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ উল্টো পদ্ধতি। ওই যে সব কম্পিউটারের ফলাফল নানা অসংখ্য তথ্য হিসেবে আমাদের নানা কম্পিউটারে, ইন্টারনেটে যুক্ত থেকে ডিজিট্যাল জগতেই আছে, সেগুলোর দিক থেকে অর্থাৎ উল্টোদিক থেকেই কাজটির শুরু। এআইতে এই তথ্য থেকে শিখে কম্পিউটার যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে, সমস্যার সমাধান করতে পারে। পুরো ব্যাপারটি যেন উল্টোদিক থেকে ঘটছে। প্রোগ্রামার কম্পিউটারকে কাজটির নির্দেশ দিচ্ছে না, বরং ইতোমধ্যে থাকা তথ্য থেকে শেখার মাধ্যমেই কম্পিউটার কাজটি করছে। এটি সম্ভব হচ্ছে তথ্য থেকে শেখার জন্য সফ্টওয়্যারের দেয়া কিছু কৌশলের অ্যালগরিদমে। এভাবেই এসে এআই কম্পিউটারের সক্ষমতায় অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে, সত্যি সত্যি তার নিজের মধ্যে একরকম বুদ্ধিরই যেন সৃষ্টি করেছে।

এই অজানার পূর্বাভাস পাওয়াটাই বুদ্ধির জগতের বড় কাজ, দুনিয়াকে বুদ্ধি ওভাবেই বোঝার চেষ্টা করে। গভীরতর ক্ষেত্রে এ কাজে আমাদের বড় সহায়ক হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে যেসব তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োগ করে নতুন ক্ষেত্রে আমরা ফলাফল পাই– একটি পূর্বাভাস বা একটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। প্রোগ্রামার যখন চান যে, কম্পিউটার এই পূর্বাভাসটি হিসাব করে বলুক, তখন তিনি বিজ্ঞানের ওই তত্ত্বটির ফরমুলা ইত্যাদির সমন্বয়ে গাণিতিক প্রোগ্রাম তৈরি করেন এবং তা ভেঙে ভেঙে দিয়ে দেন কম্পিউটারকে নির্দেশ দান হিসেবে। তখন হিসাব যতই কঠিন বা দীর্ঘ হোক না কেন, কম্পিউটার তা করে পূর্বাভাসটি দিতে পারে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব এখন অনেক প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছে– ওসব সুনির্দিষ্টভাবে জানার উপায় বলে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও এমন

অনেক কিছু রয়েছে, যার ওপর সেরকম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই। সেগুলো খুব সাধারণ বিষয়ও হতে পারে যেমন ব্যবসা বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি, অথবা খুব জটিল বিষয়ও হতে পারে যেমন প্রাকৃতিক কোনো রহস্য নিয়ে। দুজনের সাধারণ আলাপের মতো অতি সাধারণ বিষয়ের উদাহরণ নেয়া যাক। একজনের কথার উত্তরে আরেকজন কী বলবে তা মানুষ অনেকটা আন্দাজ করতে পারে বটে, কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে তার হুবহু পূর্বাভাস দেয়া অসম্ভব। কোনো প্রোগ্রামারের পক্ষেও এটি নির্ভুল নির্ণয় করার জন্য কোনো প্রোগ্রাম রচনাও অসম্ভব। কিন্তু এআই পারে এটির খুব ভালো আন্দাজ করতে। আরেকটি উদাহরণ নিই সুনির্দিষ্ট জানা যায় না এমন একটি জটিল প্রাকৃতিক সমস্যাকে নিয়ে।

জানা আছে যে, উদ্ভিদ সবসময় এক রকম খুব উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ নির্গত করছে, যা কানে শোনা যায় না, কিন্তু যন্ত্রে রেকর্ড করা যায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে শব্দে হেরফের হয়। যেমন উদ্ভিদে পানির অভাব থাকলে বা ওটি কোনোভাবে আহত হলে। কিন্তু কোন্ উদ্ভিদ কী পরিস্থিতিতে কেন কী শব্দ উৎপাদন করবে এ নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখনো নেই।

যেখানে বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব নেই, তা নিয়ে প্রোগ্রামার কম্পিউটারকে নির্দেশ দিতে পারেন না। আবার যদিও বা তত্ত্ব থাকে, কিন্তু তার হিসাবটি বেজায় দীর্ঘ ও জটিল– তখনো প্রোগ্রামারের জন্য ব্যাপারটি সহজ হয়না। তখনই এগিয়ে আসতে পারে এআইয়ে সেই উল্টোদিক থেকে আসা কৌশল। যেমন ওপরের উদাহরণে অনেক রকম উদ্ভিদের নানা নমুনা, যা বিভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে আছে তার থেকে নির্গত শব্দ রেকর্ড করা যায়। কোন্ শব্দের সঙ্গে কোন্ পরিস্থিতি জড়িত সে তথ্য থেকে এআই সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারকে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ওই সফ্টওয়্যারে দেয়া বিশ্লেষণ কৌশল আর ট্রেনিঙের কল্যাণে কম্পিউটার ওই উদ্ভিদ আওয়াজের ও তার পরিস্থিতির তথ্যগুলোর মধ্যে কিছু স্পষ্ট প্যাটার্ন উদ্‌ঘাটন করতে পারে। ফলে নতুন একটি উদ্ভিদ নমুনার নির্গত আওয়াজ থেকে সে বলতে পারবে উদ্ভিদটি কী পরিস্থিতিটিতে আছে। ওই তথ্যগুলোর গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিছুটা সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্ভাবনার হিসাবে এই পূর্বাভাস সে দিচ্ছে। তাত্ত্বিক কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই বলে সেটি কোনো প্রোগ্রামার কম্পিউটারকে দিয়ে এই পূর্বাভাস দেয়াতে পারতেন না। এআই সেটি পারছে। এআইয়ের যে জয়জয়কার, তা এ কারণেই। একটু পর আমরা দেখার চেষ্টা করবো এআইয়ের এই কৌশলগুলো কী।

যেই বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতার অভাবে এআইকে এগিয়ে আসতে হলো, এআই সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও দারুণ সব অবদান রাখছে। তেমনি এটি এখন অহরহ দারুণ অবদান রাখছে ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা পূর্বাভাস দিতে। মানুষের চেহারা, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি থেকে নিশ্চিতভাবে মানুষটিকে শনাক্ত করতে পেরে বাড়াচ্ছে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাও। এর সবকিছুকে সফলতার উচ্চে নিয়ে যেতে পেরেছে এআইয়ের একটি ব্যাপক ব্যবহৃত কৌশল– মেশিনকে অর্থাৎ কম্পিউটারকে ইতোমধ্যে থাকা তথ্যভান্ডার দেখিয়ে দেখিয়ে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা। মেশিন এভাবে তথ্য শেখে বলে পুরো কৌশলটিকে বলা হয় মেশিন লার্নিং।

মেশিন লার্নিং বলে দেয় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে কী আচরণ করবে, ডিএনএ'র বার্তাকে অনুসরণ করে কিছু উপাদানের শেকল আকারে যেই এক একটি প্রোটিন তৈরি হয় তার কোন্‌টিতে অসংখ্য ভাঁজ পড়া কীভাবে ঘটবে। এমনি অত্যন্ত জটিল বৈজ্ঞানিক জগতের পূর্বাভাস এই মেশিন লার্নিঙের মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও। তেমনি আবার স্মার্টফোনের ইউটিউবে গিয়ে যখন দেখেন আপনি যে ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন, ঠিক সেগুলোই সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে– তাও মেশিন লার্নিঙের নীরব কারসাজি। আপনি গত মাস বা তারো বেশি সময় ধরে কী কী ভিডিও দেখেছেন, তার থেকেই মেশিন আপনার পছন্দের ধরনটি শিখে নিয়েছে, এবং সেইমত কাজ করেছে। মেশিন লার্নিঙের সর্বশেষ উন্নয়নে দেখছি কেউ যদি কম্পিউটার প্রোগ্রাম করার মতো কোনো সমস্যা তাকে সরল ভাষায়ও বলে দেন, সে প্রোগ্রামিং বা কোডিং করার ভাষায় ধাপে ধাপে অ্যালগরিদমে প্রোগ্রামটি তৈরি করে দেবে– যা তিনি কম্পিউটারে যেকোন প্রোগ্রামের মতো বাস্তবায়িত করতে পারেন। এ যেন পুরো জিনিসটি ষোলকলায় পূর্ণ হওয়া। এআইয়ের আগে কম্পিউটারের ইনপুটেই আসতো মানুষের দেয়া প্রোগ্রাম, এটি কম্পিউটারে কাজ করে আউটপুট হিসেবে তথ্য দিতো। এখন মেশিন লার্নিং তথ্য থেকে শিখে ফলাফল হিসেবেই বরং নিজের তৈরি করা প্রোগ্রাম দিয়ে দিচ্ছে মানুষকে। একেবারে উল্টো যাত্রাই বটে।

মেশিন লার্নিঙের কথা এখন সবার মুখে মুখে, সঙ্গত কারণেই। সেই সঙ্গে ডাটা সায়েন্স, ডাটা এনালাইসিস, বিগ ডাটা ইত্যাদিও। মেশিন লার্নিঙের সাফল্যটির চাবিকাঠিতো এই তথ্যভান্ডারেই। তাই নানা নামের এই বিষয়গুলো আসলে নানা দিক থেকে একই ব্যাপারকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

মেশিন কীভাবে শেখে

যে মানুষ-বিশেষজ্ঞ তথ্য সাজিয়ে একটি সফ্টওয়্যার লেখার মাধ্যমে মেশিনকে শেখার সুযোগ করে দেন, তাঁকে মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, ডাটা সায়েন্টিস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। মূলত তিনিও একজন প্রোগ্রামার– কম্পিউটার কোডের ভাষায় সফ্টওয়্যারটি তৈরি করেন– যা মেশিনের কাজের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। এর জন্য শুরুতে তাঁকে সমস্যাটির প্রকৃতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা নিতে হয় তথ্য থেকে ট্রেনিং কীভাবে হবে তার। এতে কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতি থেকে বেছে নেবার সুযোগ আছে– যা আমরা দেখবো। এ কাজের সফ্টওয়্যারটি লিখতে গিয়ে এখন অবশ্য তাঁরা ইতোমধ্যে এর বহুল ব্যবহৃত অংশগুলোর সহায়তা পাচ্ছেন। মৌলিক অংশগুলো আজকাল মেশিন লার্নিং লাইব্রেরি নামে পরিচিত ভান্ডার থেকে পাওয়া যায়– রেডিমেইড হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই সফ্টয়্যার যে কাজগুলো করে তা যথারীতি গাণিতিকভাবেই কম্পিউটারে সম্পন্ন হয়।

ট্রেনিং বলতে যা বলা হচ্ছে সেটিও একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া– এর ধাপ ধাপ আলগরিদমগুলোর মাধ্যমেই সফ্টওয়্যার কম্পিউটারের মধ্যে কাজ করে গাণিতিক ভাবেই তথ্যের মধ্যে কিছু প্যাটার্ন উদ্‌ঘাটন করে। যে সমাধানটি আশা করা হয়, তা আসে ওই প্যাটার্ন খাটিয়ে নতুন কিছুর পূর্বাভাস দিতে পারার কারণে। এর সবই গণিতের মাধ্যমে ভার্চুয়াল জগতের কাজ– ধরাছোঁয়ার কিছু এতে নেই। আমরা অবশ্য আমাদের আলোচনায় বোঝার সুবিধার জন্য এগুলোর কিছু কিছু চিত্রকল্প ব্যবহার করবো। এমন সব নাম দেবো যাতে তার বাস্তব কোনো অবয়ব আছে মনে হতে পারে– কিন্তু মনে রাখতে হবে আসলে সবকিছু গণিতেই।

মেশিনকে ট্রেনিং দেবার প্রথম ধাপ হলো যে তথ্য থেকে মেশিন শিখবে তা খুঁজে নেয়া। একটি উদাহরণ দিয়ে এটি এবং এর পরবর্তী ধাপগুলো বোঝার চেষ্টা করি। মনে করি আমরা নানা দালান দেখে দেখে প্রত্যেকটি কত বড় ও তার দাম কত এটি জানতে শেখাচ্ছি। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হলো মেশিন যেন এরপর যেকোনো অন্য দালানেরও সাইজ জেনেই তার দাম বলে দিতে পারে। তথ্যগুলো সফ্টয়্যারকে দিতে হবে সারণির আকারে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো তথ্যভান্ডার হিসেবে।

সফ্টয়্যারে তথ্য সরবরাহ করার সঙ্গে সঙ্গে ওটি দালানের সাইজের সঙ্গে তার দামের সম্পর্ক নিয়ে কীভাবে কাজ করবে তার একটি গাণিতিক মডেলও সফটওয়্যারে দিতে হয়। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় সব দালানের কথা নিলে সাইজ বাড়ার

সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়ছে। এইক্ষেত্রে সব থেকে সরল মডেল হিসেবে সাইজ আর দামকে পরস্পর সমানুপাতিক ধরে নেয়া যায়– গ্রাফের একটি অক্ষে সাইজ ও অন্য অক্ষে দাম দিয়ে প্রত্যেকটি তথ্য একটি বিন্দু আকারে গ্রাফে স্থাপন করলে এবং সব বিন্দুকে যোগ করলে আমরা একটি সরল রেখা পাচ্ছি এমনই ধরে নেয়া হচ্ছে– যাকে বলা যায় সরল রৈখিক মডেল। সেক্ষেত্রে আমরা খুব সহজ একটি অঙ্কেও একে প্রকাশ করতে পারি, যেটি যেকোনো সরলরেখার সমীকরণ।

দাম = $a \times$ সাইজ $+ b$, যেখানে a ও b দুটি সংখ্যা।

তথ্যের মধ্যে প্যাটার্ন খোঁজাটুকু এক্ষেত্রে হলো a ও b এর জন্য সব থেকে ভালো মান নির্ণয় করতে পারা। ভালো মানের অর্থ হলো তা যেকোনো দালানের জন্য ওপরের সমীকরণ ব্যবহার করে প্রকৃত দামের খুব কাছাকাছি যেতে পারা। মডেলের অ্যালগরিদম ঠিক এই কাজটিই করে দেবে। এক্ষেত্রে a ও b বা এদের সঙ্গে সম্পর্কিত আরো অভ্যন্তরীণ কিছু নিয়ামকের মান বাড়িয়ে কমিয়ে দেখা হয়। এই সহজ উদাহরণে সরাসরি a এবং b হলো সেই নিয়ামক। ওই নিয়ামকগুলোকে বলা হয় ‘ওজন’ (ওয়েইট), কারণ এগুলো আসলে অভ্যন্তরীণ কিছু কিছু আংশিক ফলের কোনটি কত গুরুত্ব পাবে, তা নির্ধারণ করে। সফ্টওয়্যারের মধ্যেই এই নিয়ামকগুলোকে একটু একটু করে বাড়িয়ে কমিয়ে দেখার ব্যবস্থা থাকে। দেখা হয় কোন্ নিয়ামক কোন্ মানে থাকা অবস্থাতে পূর্বাভাস দেয়া দালানের দাম এবং প্রকৃত দামের পার্থক্য ন্যূনতম হয়। যতক্ষণ জানা তথ্য থেকে কোনো দালানের দামের ব্যাপারে অঙ্কের পূর্বাভাস দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, ততক্ষণ প্রকৃত দাম জানাই থাকে। ওভাবে জানা তথ্যগুলো থেকে ক্রমে ক্রমে সর্বোত্তম নিয়ামকগুলো স্থির হয়ে যায়। একেই আমরা বলছি তথ্য থেকে ট্রেনিং নেয়া। এভাবেই মেশিন নতুন পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিতে দেবার উপযুক্ত হয়।

ট্রেনিং শেষে একই বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির জন্য ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়ে যাওয়া সর্বোত্তম নিয়ামকগুলো (এইক্ষেত্রে যা a ও b এর মান) প্রয়োগ করে ফলাফলের পূর্বাভাস দেয়া যায়। ধরা যাক আমাদের এই উদাহরণে নতুন পরিস্থিতি হলো ১৮ হাজার বর্গফুটের একটি দালানের দাম কত হবে তা নির্ণয় করা। সর্বোত্তম নিয়ামক প্রয়োগে মডেল থেকেই সাইজটি দিলে এর সব থেকে সম্ভাব্য দামটি নির্ণিত হয়ে যাবে। অন্য কোনো উৎস থেকে যদি আমরা ওই ১৮ হাজার বর্গফুট একটি দালানের প্রকৃত দাম জানতে পারি ও মেশিন লার্নিঙে নির্ণিত দামের সঙ্গে যদি তা মিলে যায়, তা হলে বুঝবো যে ট্রেনিং, ভালো হয়েছে। আর যদি না মেলে তাহলে

ভালো হয়নি। ভালো হওয়াটি বহুলাংশে নির্ভর করবে অনেক তথ্যের ব্যবহার হয়েছে কিনা তার ওপর। সফ্‌টওয়্যারটি যেভাবে অতি দ্রুত অসংখ্যবার ওজনের মতো নিয়ামকগুলোর কোনটিকে একটু বাড়ালে ভালো ফলের দিকে যাচ্ছে, নাকি কমালে ভালো ফলের দিকে যাচ্ছে তা দেখে দেখে সর্বোত্তম ওজন স্থির করে ফেলতে পারে, তাতে পূর্বাভাসটি বেশ নিখুঁত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এই যে উদাহরণটি দেয়া হলো সেটি খুব সহজ। আর যে গাণিতিক মডেলটি মেশিন লার্নিঙের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি সরলতম মডেল। সবরকম উদাহরণের জন্য এই সরলরৈখিক মডেল ব্যবহার করা যাবে না– সেখানে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবহারের জন্য বেশি উপযুক্ত জটিলতর গাণিতিক মডেল রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে যে নিয়ামক বা ওজনগুলোর মানকে সর্বোত্তম করা হয়, যেভাবে তা করা হয়, সেসবও ভিন্নতর হবে। যেমন মডেলের গ্রাফিক চিত্ররূপের কথা ভাবলে তা ওই সহজ উদাহরণের মতো সরলরেখা না হয়ে, অন্য রকম বক্র রৈখিক মডেল, অথবা একেবারে একটি নেটওয়ার্ক বা জালের মতোও হতে পারে। এমন কিছু আমরা পরে দেখবো।

কতগুলো জিনিস অবশ্য মেশিন লার্নিংঙের সবক্ষেত্রে সত্য, ওপরের সহজ উদাহরণেও তা সত্য। মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার যিনি ট্রেনিঙের সফটওয়্যারটি তৈরি করে দিয়েছেন, ওভাবে ট্রেনিঙে সহায়তা করেছেন, সেই মানুষটি কিন্তু তাতে প্রত্যেকটি ধাপ, প্রত্যেকটি তথ্য নিয়ে করা কাজ একের পর একে পঁইপঁই করে তাতে বলে দেন্‌নি। তা করতে হলে তাঁর কাজ অসম্ভব হতো। তিনি যেটুকু প্রোগ্রামিং করেছেন সেটি খুব সংক্ষিপ্ত– এতে তিনি তথ্যগুলো মেশিনের কাছে তুলে ধরেছেন শুধু, সঙ্গে মেশিনের কাজের গাইডলাইনটি দিয়ে। এতে যে মডেলটি তিনি দিয়েছেন মেশিনের মধ্যে তা কার্যকর হয়ে তথ্যের ভেতর প্যাটার্ন খোঁজার কাজ করেছে। সবকিছু মডেল থেকেই ঘটেছে। তথ্যের প্যাটার্ন একবার পেয়ে যাবার পর অর্থাৎ সর্বোত্তম ওজনগুলো ঠিক হয়ে যাবার পর, মেশিন নিজেই যেকোনো নতুন পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিতে পারছে!

মেশিন লার্নিংকে কাজ করাতে মানুষকে যেটুকু প্রোগ্রামিং করতে হয়, তা এত কম যে, বলা যায় সবকিছু মেশিন নিজেই শিখেছে। এখানে বিশাল তথ্যভাণ্ডারটি পাওয়াটাই বড় কথা। তাছাড়া এর পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই– কী প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য মেশিন লার্নিঙের এই আয়োজন সেইটি জানা থাকা দরকার। এখানে মানুষের কাজের সঙ্গে বরং তার এক ধরনের মিল বেশি দেখা যায়। নানা

তথ্য দেখে তার থেকে নিজে নিজে শেখা– এ তো মানুষেরই কাজ, প্রোগ্রামিং-নির্ভর কম্পিউটার তো সেটি করতে পারে না। এজন্যই এআইকে বুদ্ধিমত্তার সম্মান দেয়া হয়েছে, কৃত্রিম হওয়া ও অনেক দিক থেকে মানুষের থেকে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও।

সাধারণ কম্পিউটার আর এআইয়ের মধ্যে পার্থক্যটি একটি উপমায় দেখা যাক। মনে করি একটি ছোট শিশুকে বিভিন্ন ফল চেনাতে চেষ্টা করছি। এজন্য একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দিতে পারি– যেমন 'যে ফল হলুদ রং এবং বাঁকা সেটি কলা'। শিশু ওই হলুদ রং ও বাঁকা হওয়া দেখে বুঝে এটি কলা। সাধারণ কম্পিউটার ওভাবে কাজ করে, প্রোগ্রামার যে নিয়ম বেঁধে দেন, সেটিই শুধু এটি অনুসরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রোগ্রামারকে সব ফলের জন্য নিয়ম বেঁধে দিতে হয়, তাঁকে ওই নিয়মগুলো জানতে হয়।

আমরা বরং সেই পথে না গিয়ে শিশুকে নানা ফল দেখতে দিতে পারি– ধরা যাক্ আপেল, কলা, আম, সফেদা এইসব। বিভিন্ন ফলের মধ্যে পার্থক্য শিশু নিজেই বের করে ফেলবে। মানুষ-বুদ্ধির মস্তিষ্কের জোরে শিশু এটি করতে পারে। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মেশিন লার্নিংও সেটিই করতে পারে গাণিতিকভাবে। এটি করতে গিয়ে তথ্যের ভেতর এমন সব সূক্ষ্ম সম্পর্ক বা প্যাটার্নের সন্ধান পায়, যা মানুষের বুদ্ধিতেও কুলায় না। যেমন এটি উদ্ভিদের আওয়াজের অর্থ খুঁজে পেয়েছে নানা উদ্ভিদে এ আওয়াজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এমনিভাবে মেশিন লার্নিং মানুষের পক্ষে কঠিন বা অসম্ভব অনেক কিছুকে সম্ভব করেছে।

যেমন ধরা যাক নগরের অত্যন্ত ব্যস্ত ট্রাফিকপূর্ণ রাস্তায় চালকবিহীন একটি গাড়িকে এটি নিজের বুদ্ধিতে নিরাপদে চলতে সক্ষম করেছে। এ গাড়ি রাস্তায় অন্য গাড়ি, পথচারী, অন্যের ভুল এমনি যত কিছুর সম্মুখীন হতে পারে, তার প্রত্যেকটি আগাম চিন্তা করে প্রত্যেকটির জন্য ধাপে ধাপে প্রোগ্রামিঙের নিয়ম বেঁধে দেয়া কোনো প্রোগ্রামারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এমনি অসংখ্য সত্যিকার গাড়ির বাস্তব অভিজ্ঞতায় পাওয়া অসংখ্য তথ্যের মধ্যে নানা প্যাটার্ন উদ্‌ঘাটন করে ফেলে মেশিন লার্নিং। কাজেই রাস্তায় ঘটা নতুন যেকোনো ঘটনাকে এমনি প্যাটার্নের সঙ্গে মিলিয়ে এই গাড়ি আগাম পূর্বাভাস দিতে পারে, এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। এইসব প্যাটার্ন এমন যেকোনো মানুষ ড্রাইভারের পক্ষেও অনেক সময় ঘটনা ঘটার পূর্ব মুহূর্তে মাথা খাটিয়ে আন্দাজ করা কঠিন। মানুষের কাছে লুক্কায়িত এমন প্যাটার্ন মেশিন লার্নিং ধরে ফেলতে পারে।

‘সিদ্ধান্তের গাছ’

মেশিন লার্নিঙে মডেল নির্বাচনটি যে মানুষকে সফ্টওয়্যারে করে দিতে হয়, তার একটি উদাহরণ আমরা আগে দেখেছি। দালানের সাইজের সঙ্গে তার দামের সম্পর্ক থেকে সূক্ষ্মতর প্যাটার্ন নির্ণয়ের জন্য যে মডেল নির্বাচিত হতে দেখেছি, তার চিত্রকল্প হলো সরলরেখা, যার গাণিতিক রূপটিই আসল কাজগুলো করেছে। তুলনামূলকভাবে কম জটিল অনেকগুলো সুবিধাজনক সমস্যার ক্ষেত্রে আর এক ধরনের মডেল প্রচুর ব্যবহৃত হয়, যার চিত্রকল্পকে বলা হয় ‘সিদ্ধান্তের গাছ’। তথ্যগুলোর বিশ্লেষণ করার সময় যদি প্রতি পদে পদে এক একটি হ্যাঁ/না উত্তর হবার মতো প্রশ্নের অবতারণা করা যায়, তখন এই মডেলটি খুবই উপযুক্ত হয়। এখন প্রশ্নের জড়িত তথ্যগুলোকে দুটি শাখায় বিভক্ত করে ফেলা যায়– যেগুলোর ক্ষেত্রে উত্তর ‘হ্যাঁ’ হবে সেগুলো এক শাখায়, আর যেগুলোর ক্ষেত্রে উত্তর ‘না’ হবে, সেগুলো অন্য শাখায়। এর একটি শাখায় যে তথ্যগুলো গেলো, সেগুলোকে আবার একটি ‘হ্যাঁ-না’ প্রশ্নের সম্মুখীন করলে ওইরকম শাখা বিভক্তি আবার ঘটবে। এমনিভাবে যদি নানা শাখার নিজেরও শাখায় বিভক্তি ঘটে এবং এর পুরো ব্যাপারটি যদি আমরা একটি শাখা-প্রশাখার রেখাচিত্রে এঁকে ফেলি, তখন পুরো চিত্রটিকে একটি উঁচু ঝাঁকড়া গাছের মতোই দেখাবে– সেইজন্য নামের মধ্যে ওই গাছ কথাটি আছে। আসলে ব্যাপারগুলো অবশ্য বিশুদ্ধ গণিতের। কম্পিউটারে দুটি সংখ্যা তুলনা করে কোনটি বড় সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে হয় এই শাখায় যাওয়া, নইলে অন্য শাখায় যাওয়া।

এভাবে শাখা থেকে আবার তারও শাখায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত মেশিন লার্নিঙের সিদ্ধান্তে অর্থাৎ পূর্বাভাসে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এ সিদ্ধান্ত যেন শেষ পর্যন্ত কাম্য অংশে পৌঁছানোর মতো। দুটি শাখা সৃষ্টির যেকোনো বিন্দুতে যে প্রশ্নটিকে হ্যাঁ ও না এর উত্তর দিয়ে দুই শাখা সৃষ্টি হয়, সেটি প্রায়শই একটি বড়-ছোট নির্ণয়ের প্রশ্ন হয়ে থাকে। যেমন প্রশ্নটি হতে পারে ‘বয়স কি ১৮ বছরের বেশি?’ ‘বেতন কি ৫০ হাজার টাকার কম?, এমনি কিছু। তখন ১৮ বছরের বেশিরা এক শাখায় ও ১৮ বছরের কমরা অন্য শাখায় যায়। একইভাবে বেতন ৫০ হাজারের নিচে যারা, আর তার ওপরে যারা। দুটি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করে ‘যদি এটি হয়, তাহলে ওটি কর” এমন নির্দেশ পালন করা যে কম্পিউটারের একটি মৌলিক কাজ, সেটি আমরা আগেই দেখেছি। একটি অতি সরল উদাহরণ দেখি।

মেশিন লার্নিংকে পূর্বাভাস দিতে হবে আবহাওয়ার উত্তাপ কত ঊর্ধ্বে গেলে কোনো লোক আইসক্রীম কিনবে। আইসক্রীম কোম্পানির কাছে প্রশ্নটির একটি অর্থ

থাকতে পারে। এর জন্য বহু রকম পরিস্থিতিতেই এক একটি তথ্যে উত্তাপ কত, মানুষটির টাকার সঙ্গতি আছে কি না, মানুষটি আইসক্রীম কিনেছে কি না। মেশিন লার্নিং কাজ করতে হলে বিপুল সংখ্যক তথ্যের প্রয়োজন হয়। আমরা অবশ্য এখানে শুধু বোঝার জন্য অল্প কয়েকটি তথ্য ব্যবহার করবো– যেগুলো নিচের সারণিতে দেয়া হলো।

ব্যক্তি	**উত্তাপ (০ সে)**	**সঙ্গতি আছে কি না**	**আইসক্রীম কিনেছে কি না**
ক	৩৫	হ্যাঁ	হ্যাঁ
খ	১৮	হ্যাঁ	না
গ	১৫	না	না
ঘ	২৮	হ্যাঁ	হ্যাঁ

আমরা এমন জায়গায় দুই শাখা সৃষ্টি করবো, সেখানে 'হ্যাঁ' উত্তরের সঙ্গে 'না' উত্তরটি স্পষ্টভাবে আলাদা করা যাবে। এটি ঠিক করার ক্ষেত্রে উত্তাপটি বেশ সহায়ক। উত্তাপ বেশি হলে যেমন ২৫ ডিগ্রির ওপরে হলে আইসক্রীম কেনার প্রবণতা বেশি হবে, এর থেকে কম হলে তা কম হবে কারণ তা ঠান্ডার পর্যায়ে পড়বে। কাজেই ২৫ ডিগ্রিতে শাখা করা সঙ্গত হবে। উত্তাপ ৩৫ ডিগ্রিতে শাখা সৃষ্টি ঠিক হবে না, কারণ ওই উত্তাপ এতো বেশি যে, এর নিচেও হ্যাঁ উত্তরের মানুষ প্রচুর থাকবে। কাজেই দুই শাখা সৃষ্টির প্রশ্নটির জন্য উত্তাপ কি ২৫ ডিগ্রির বেশি না কম' এই প্রশ্নটি উপযুক্ত হবে। হ্যাঁ হলে এই শাখায় যাও, 'না' হলে ওই শাখায় যাও। তবে 'টাকার সঙ্গতি আছে কি না" এই প্রশ্ন করে আর একটি শাখা বিভক্তির ব্যবস্থা করতে পারি। কারণ উত্তাপ বেশি হওয়া সত্ত্বেও অনেকে আইসক্রীম কিনছে না সঙ্গতি নেই বলে। কাজেই উত্তাপ ২৫ ডিগ্রির বেশি নিয়ে যেই শাখা, সেখানে নতুন শাখা বিভক্তি হলো সঙ্গতি 'হ্যাঁ' হলে এক শাখায়, 'না' হলে অন্য শাখায়। এই শেষের 'হ্যাঁ' এর দলটিই আইসক্রীম কিনবে মনে করা হয়।

তাহলে গাণিতিক ভাষায় সিদ্ধান্তের গাছের প্রকাশটি হবে

যদি উত্তাপ <২৫ তাহলে কেনা = না
তা যদি না হয়:
যদি সঙ্গতি = হ্যাঁ তাহলে কেনা = হ্যাঁ
তা যদি না হয়:
কেনা = না

সফ্টওয়্যারে শুধু এইটুকু প্রোগ্রামেই থাকে। ফলে ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তির তথ্যের ওপর এগুলো প্রয়োগ করা হয়। এবার যদি তথ্যের বাইরে অজানা নতুন ব্যক্তি ঙ এর ক্ষেত্রে মডেলটি প্রয়োগ করি:

ধরা যাক এতে তথ্য ইনপুট হলো– ব্যক্তি ঙ, উত্তাপ = ৩২° সে, সঙ্গতি = হ্যাঁ ওপরে সৃষ্ট সিদ্ধান্তের গাছের মধ্যে বিভিন্ন শাখার বিভক্তির মধ্যে এই তথ্য চালিয়ে দেখা যায়:

উত্তাপ <২৫ কি না? → না, কাজেই অন্য শাখায় যাও। সঙ্গতি = হ্যাঁ কি না? → হ্যাঁ → তাহলে ঙ মানুষটি আইসক্রীম কিনবেন, এটিই সিদ্ধান্ত। অথবা বলা যায় এটিই পূর্বাভাস। সিদ্ধান্তের গাছের মডেলটিকে একটি কুইজ খেলার উপমায় আমরা দেখতে পারি। খেলাটি হলো ২০টি প্রশ্ন আপনি করতে পারবেন যার উত্তরে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' শুনবেন। এর ভেতরেই আপনি মূল অজানা জিনিসটির বিস্তারিত পরিচয় পেয়ে যাবেন। যত কম প্রশ্ন করে পান তত ভালো। বেশ সুবিধাজনক মডেল এটি– অনেক রকম সমস্যা সমাধানে কাজে লাগে, অথচ একে বোঝাটাও খুব সোজা। তবে এমন সহজ সমস্যা মাঝে মাঝে বেশ গুরুত্ব রাখে বৈকি। যেমন 'এই মানুষটিকে ঋণ দেয়া যায় কি না?' এমন সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্তের গাছই যথেষ্ট। অথচ ব্যাংকের কাছে প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্তের গাছ মডেল একটু ভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করতে হতে পারে যেখানে উত্তরটি 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে সারা যায় না, সত্যি সত্যি একটি সংখ্যাকেই উত্তর হিসেবে পেতে হয়। ধরা যাক সেই উদাহরণটি হলো ছাত্র কত ঘণ্টা পড়াশুনা করলো সেই তথ্য থেকে তার পরীক্ষার নম্বরটি বলে দিতে পারা। বিশাল তথ্যভান্ডার থেকে বোঝার জন্য আমরা মাত্র কয়েকটি তথ্য বেছে নিলাম।

ছাত্র	কত ঘণ্টা পড়ে	পরীক্ষার নম্বর
ক	১	৪০
খ	২	৫০
গ	৩	৬৫
ঘ	৪	৭০
ঙ	৬	৮৫

সিদ্ধান্তের গাছ মডেলের সফটওয়্যারে যে অ্যালগরিদম, তা পড়ার ঘণ্টার এমন এক জায়গায় দুই শাখায় বিভক্ত করতে চাইবে, যেখানে নম্বরের পূর্বাভাস ভুল সবচেয়ে কম হবে।

যেমন এই বিভক্তিটি ২ ঘণ্টা পড়ার ক্ষেত্রে করি:

তাহলে ওপরের তথ্য অনুযায়ী '২ ঘণ্টার বেশি পড়ে কি না' এই প্রশ্নে 'না' এর শাখায় যাবে ক এর নম্বর ৪০ এবং খ এর নম্বর ৫০ যেগুলোর গড় নম্বর হবে ৪৫।

এই প্রশ্নে 'হ্যাঁ' শাখায় যাবে গ এর ৬৫, ঘ এর ৭০ এবং ঙ এর ৮৫; যেগুলোর গড় হবে ৭৩.৩।

এর থেকে একটি নিয়ম বেরিয়ে আসলোঃ

পড়ার ঘণ্টা ২ বা তার নিচে হলে নম্বরের গড় পূর্বাভাস হবে ৪৫।

আর এর অন্যথা হলে নম্বারের গড় পূর্বাভাস হবে ৭৩.৩। কিন্তু ভালো পূর্বাভাস দেবার জন্য এমন গড় যথেষ্ট নয়, এতে ভুল বড় হবার সম্ভাবনা বেশি, তাই ভুলটি কমাবার জন্য এর ভেতরে আরো শাখা সৃষ্টির কাজ করতে হবে– যেই শাখায় পড়ার সময় ২ ঘণ্টার বেশি। এখানে ভুল কমাবার জন্য ৪ ঘণ্টার বেশি হওয়াটাকেই নতুন দুই শাখা সৃষ্টির ভালো জায়গা মনে হতে পারে, চারজন ৪ ঘণ্টার বেশি পড়ে না তাদের নম্বর হলো ঘ এর (৪ ঘণ্টা) ৭০, গ এর (৩ ঘণ্টা) ৬৫, খ এর (২ ঘণ্টা) ৫০, ক এর (১ ঘণ্টা) ৪০, এদের গড় ৬৭.৫।

৪ ঘণ্টার বেশি পড়ে একজন, তার নম্বর ঙ এর (৬ ঘণ্টা) ৮৫, এর গড় ৮৫। তাহলে এই দুই পর্যায়ে শাখা গঠন করে সিদ্ধান্ত গাছের নিয়ম যা দাঁড়ালো।

পড়ার ঘণ্টা ২ বা তার কম → নম্বরের পূর্বাভাস = ৪৫

পড়ার ঘণ্টা ৪ বা তার কম → নম্বরের পূর্বাভাস = ৬৭.৫

এর কোনোটা না হলে → নম্বরের পূর্বাভাস = ৮৫

এখন মডেল অজানা ছাত্রের ক্ষেত্রে পূর্বাভাস দিতে প্রস্তুত।

চ এই অজানা ছাত্র ৩.৫ ঘণ্টা পড়ে, সে পরীক্ষায় কত নম্বর পাবে?

ওর তথ্য যদি মডেলের ইনপুটে দিয়ে মডেলের শাখা বিভাজন অনুসরণ করি।

২ ঘণ্টার সমান বা কম পড়ে কি না → না

৪ ঘণ্টার সমান বা কম পড়ে কি না→ হ্যাঁ→ নম্বর পূর্বাভাস = ৬৭.৫

আরেকজন অজানা ছাত্র ছ ৬ ঘণ্টা পড়ে, তার তথ্যও ইনপুটে নেই।

২ ঘণ্টার সমান বা কম পড়ে কি না → না

৪ ঘণ্টা সমান বা কম পড়ে কি না → না → নম্বরের পূর্বাভাস = ৮৫

এখানে মডেলে মাত্র ৬ জন ছাত্রের তথ্য থেকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে– তাই পূর্বাভাস খুব সূক্ষ্মভাবে শুদ্ধ হবে না। কিন্তু তথ্য যদি হয় হাজার হাজার ছাত্রের; তাহলে একই মডেলের পূর্বাভাস খুবই নিখুঁত হবে, কারণ এতে বহু বহু নতুন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টির সুযোগ থাকে বলে একেবারে সঠিক নম্বরে গিয়ে পৌঁছানো যায়। তবে

একটি জিনিস লক্ষণীয়। পূর্বাভাসে যেই নম্বর বলা হচ্ছে, সেটি একটি গড় মাত্র অর্থাৎ একটি আসন্ন ফল, কম্পিউটার যেমন করে ফর্মুলামত হিসাব করে সুনির্দিষ্ট ফল দেয়, সেরকম নয়। আসলে এআই সব সময় একটি আসন্ন বা সম্ভাব্য ফল দেয়। কিন্তু বহু তথ্যের কারণে সেটিই নিখুঁত হয়।

সিদ্ধান্ত গাছের দু'রকম ব্যবহার দেখলাম:

প্রথম ব্যবহারটি ছিল প্রকারভিত্তিক সমস্যার ক্ষেত্রে: হ্যাঁ না হিসেবে– যেমন পরীক্ষায় পাশ করবে কি না। দ্বিতীয় ব্যবহারটি হিসাবভিত্তিক সমস্যার ক্ষেত্রে; একটি সংখ্যায় উত্তর পেয়ে গেলাম– যেটি নম্বর। খেয়াল করুন ছাত্ররা কত ঘণ্টা পড়লে কোন্ পরীক্ষায় কত নম্বর পাবে এর কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম নাই, তবুও মেশিন লার্নিং এর পূর্বাভাস দিতে পারছে।

নিউরোনের জাল

গাছের মতো চিত্রকল্পে একটি মেশিন লার্নিং মডেল যেমন আমরা দেখলাম তার থেকে অনেক ব্যাপক ব্যবহারের আর একটি মডেলের চিত্রকল্প হলো নিউরাল নেটওয়ার্ক অর্থাৎ নিউরোনের জাল। নামটি এসেছে মানুষের মস্তিষ্কের অসংখ্য নিউরোন বা স্নায়ুকোষগুলো যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে, পরস্পরের সঙ্গে সিগন্যাল বিনিময় করে যেভাবে মস্তিষ্কে চিন্তার বুদ্ধির কাজ করে, এতে তারই অনুকরণ করা হয় বলে। এদিক থেকে সিদ্ধান্তের গাছের থেকে নিউরাল নেটওয়ার্ক কিন্তু আরো বেশি সার্থকনামা, কারণ এখানে সত্যি সত্যি মস্তিষ্কের স্নায়ুজালকে অনুকরণের চেষ্টা করা হয়েছে, অবশ্য সবই গাণিতিকভাবে। এটি মেশিন লার্নিঙের কাজগুলো করার জন্য একটি গাণিতিক মডেল যার চিত্রকল্পটি নিউরোন জালের মতো।

এই মডেলে এক একটি নিউরোনকে অনুকরণ করে যে গাণিতিক ভার্চুয়াল নিউরোন, তাকেও আমরা নিউরোনই বলবো। এই নিউরোনের প্রত্যেকটি আসলে সহজ কিছু অঙ্কের কাজ করতে পারে, এর সফ্‌টওয়্যারের কারণে। এখানে প্রত্যেক নিউরোন একটি ইনপুট নেয় সাধারণত অন্য আর একটি নিউরোন থেকে। প্রত্যেক নিউরোনের জন্য একটি 'ওজন' থাকে। এই ওজনের ব্যাপারটি আমরা আগে ওই মেশিন লার্নিঙের সরলরেখা মডেলের আলোচনায় দেখেছি। এই ওজন মানে তার গুরুত্ব, কতটা গুরুত্ব এই নিউরোনকে একটি বিশেষ তথ্যকে দেবে। অবশ্য প্রত্যেক নিউরোনের এই ওজন কমানো বাড়ানোর ব্যবস্থাও সফ্‌টওয়্যারে রয়েছে। এরকম অনেক নিউরোন রয়েছে বিশেষভাবে সাজানো এবং প্রত্যেকে আরো বহুটার সঙ্গে

সংযোগে ত্রিমাত্রিক স্থানের মধ্যে স্তরে স্তরে। গণিতের এই চিত্রকল্পটি আমরা একটু পরে বিস্তারিত দেখবো। অসংখ্য ভার্চুয়াল নিউরোনের জালে প্রত্যেকটির সঙ্গে অন্যগুলোর সংযুক্তি ও সিগন্যাল চলাচল এবং তাতে প্রত্যেকটির ওজনের হ্রাসবৃদ্ধির তুলনীয় হলো মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি নিউরোন-সংযুক্তির (সিনাপ্‌সের) সবলতার পরিবর্তন। মেশিন লার্নিঙের নিউরাল নেটওয়ার্কের আইডিয়াটিই এসেছে মস্তিষ্কের সত্যিকার তথ্য-প্রসেসিঙের প্রক্রিয়ার অনুকরণে। মস্তিষ্কে চিন্তার প্রক্রিয়ায় নিউরোনগুলোর পরস্পর-সংযুক্তির প্রান্তে সিনাপ্‌স নামক দরজা কখনো সবল কখনো দুর্বল হয়।

প্রত্যেকটি নিউরোন ইনপুট হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে এ তথ্যের জন্য নিজের 'ওজন' দিয়ে গুণ করে (ওজনটা একটি ভগ্নাংশ হয়, সর্বোচ্চ মান ১)। পরিস্থিতি অনুযায়ী এই গুণফলের সঙ্গে কিছু যোগ করতে হয়, অথবা তাকে কোনো গাণিতিক ফাংশানে ব্যবহার করে ফলাফলকে, অন্য কোনো নিউরোনে অথবা একেবারে শেষটির ক্ষেত্রে পুরো নেটওয়ার্কের আউটপুটে পাঠিয়ে দেয়। গাণিতিক ফাংশান মানে ওই জিনিসটাকে নিয়ে কোনো গাণিতিক রাশি। যেমন $x+1$ অথবা x^2 এই দুইটাই x এর এক একটি ফাংশান। ফাংশান অনেক সময় বেশ জটিল গাণিতিক রাশিও হতে পারে। এই সব ওজন, ফাংশান ইত্যাদির কাজের মাধ্যমেই তথ্যভান্ডারের মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়ার কাজটি চলে। কম্পিউটারের মেমোরিতে তথ্যের সারণি যেমন জমা থাকে, তেমনি তার সঙ্গে এক এক নিউরোনের পরিবর্তনশীল ওজনও জমা থাকে। সফ্‌টওয়্যার একে পরিবর্তন করলে পরিবর্তিত রূপে এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত হিসেবেও ওটি জমা হয়। এই কম্পিউটারেই অবশ্য মেশিন লার্নিং সফ্‌টওয়্যারটিও জমা থাকে– যার মধ্যে ওই মডেল, ফাংশান সব থাকে এবং তা কম্পিউটারকে সেভাবে মেশিন লার্নিঙের কাজগুলো করাতে পারে।

পুরো নিউরাল নেটওয়ার্কের চিত্রকল্পে বলতে পারি ত্রিমাত্রিক সজ্জায় স্তরে স্তরে সাজানো থাকে অনেক নিউরোন। একেবারে ওপরের তথ্য থেকে ইনপুট নেবার একটি স্তর থাকে। তার নিচে অনেকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে এই ইনপুটের প্রসেসিং ঘটে, যেগুলোর সঙ্গে বাইরের জগতের (যেমন তথ্যভান্ডারের) সরাসরি যোগাযোগ হয় না বলে তাদেরকে লুকানো স্তর বলা হয়। সবশেষের সবার নিচে আউটপুট স্তর থেকে পূর্বাভাসটি আসে। একজনের ফলাফলের জন্য বা কোনো প্রকারের বিশেষ তথ্যের জন্য আউটপুট স্তরের একটি নিউরোন নির্দিষ্ট থাকতে পারে। সব থেকে জরুরি বিষয় হলো প্রতিটি স্তরের প্রতিটি নিউরোনের মধ্যে তার নিজস্ব ওজন থাকা

এবং প্রসেসিঙের মাধ্যমে সে ওজন প্রয়োজনে বাড়িয়ে কমিয়ে নেয়া। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সফ্‌টওয়্যার ঘটানোর ব্যবস্থা করে। ওজনগুলো হলো এই মডেলের নিয়ামক। নিউরাল নেটওয়ার্কের কাজ বুঝতে একটি উদাহরণ নেয়া যাক।

ধরা যাক একজন ছাত্র দৈনিক কত ঘণ্টা ঘুমায় এবং কত ঘণ্টা পড়ে সেই তথ্য ট্রেনিঙের জন্য মেশিন লার্নিংকে দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আরো একটি তথ্য দেয়া আছে সে পরীক্ষায় পাশ করেছে কি না। উদ্দেশ্য হলো পাশ-ফেলের তথ্য নেই এমন একজন নতুন ছাত্রের ক্ষেত্রে অন্য দুটি তথ্য থেকে তার পাশ-ফেলের পূর্বাভাস পাওয়া। মনে করি ওই ছাত্রের তথ্য একটি অতি সরল নিউরাল নেটওয়ার্কে ব্যবহার করলাম। এটি একেবারেই কাল্পনিক একটি নেটওয়ার্কে, বাস্তবে কোনো মেশিন লার্নিঙ এত সরল নেটওয়ার্ক ব্যবহার হবে না। এতে ইনপুট স্তরে এবং লুকানো একটি স্তরে মাত্র দুটি করে নিউরোন রয়েছে এবং আউটপুট স্তরে আছে একটি। বাস্তব ক্ষেত্রে ছাত্রও একজন হয় না, অনেক হয়। মনে করি এই মুহূর্তে ইনপুট স্তরে ইনপুট হিসাবে আসলো ওই ছাত্রের তথ্য, সে ৪ ঘণ্টা পড়ে এবং ৮ ঘণ্টা ঘুমায়। সেখান থেকে এগুলো পাঠিয়ে দেয়া হলো প্রসেসিঙের কাজ করা লুকানো স্তরটিতে। ওই স্তরের নিউরোন দুটির প্রত্যেকটির এখনকার ওজন দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যকে গুণ করে নিলো। ধরা যাক আগে থেকে এই নিউরোনে পড়ার ঘণ্টার তথ্যের জন্য ওজন ০.৫ এবং ঘুমের ঘণ্টার তথ্যের জন্য ০.১ দেয়া আছে। এর ভেতর দিয়ে ধরে নেয়া হয়েছে যে পরীক্ষা পাশের জন্য কত ঘণ্টা পড়লাম তার গুরুত্ব কত ঘণ্টা ঘুমালাম তার চেয়ে বেশি, এজন্যই ওজনের এই তারতম্য।

দুই ক্ষেত্রেই তথ্যের মান আর ওজন গুণ হয়ে এবং তার যোগফল নিয়ে পড়া ও ঘুমানোর মিলিত তথ্যের মান দাঁড়ালো:

(৪×০.৫) + (৪×০.১) = ২+০.৪ = ২.৪

তথ্যের এই মানকে এখন মডেলের নির্বাচিত গাণিতিক ফাংশানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আগে সরলরেখার উদাহরণে যেমন আমরা দেখেছিলাম দালানের সাইজকে সরলরৈখিক ফাংশানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (a×সাইজ)+b, দালানের দাম পাওয়ার জন্য। এই নতুন উদাহরণটি এতটা সহজ সরলরৈখিক নয় বলে এখানে ওটি চলবে না। এখানে অসরলরৈখিক জটিলতর জুৎসই আরেকটি ফাংশান ব্যবহার করা হয় যার নাম সিগময়েড ফাংশান; যাঁরা উচ্চতর গণিতের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এটি চেনেন। ওপরে পাওয়া মিশ্র তথ্যের মানকে সিগময়েড ফাংশানের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলে ফলাফল হয় ০.৯৪। এই ফাংশানটির কাজ হলো তথ্যের

মানকে এ ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে পূর্বাভাসের মানে নিয়ে যাওয়া। এজন্য এটিকে সক্রিয়তার ফাংশানও বলা হয়। অর্থাৎ ওজন প্রয়োগের পর তথ্য-মান যা দাঁড়ালো তার থেকে গাণিতিকভাবে পূর্বাভাস খাড়া করা এই ফাংশানের কাজ। মডেলের উদ্দেশ্য ছাত্র পাশ করেছে না ফেল করেছে সেই পূর্বাভাস পাওয়া– কাজেই পূর্বাভাসের মানটি হতে পারে ১ (অর্থাৎ পাশ) অথবা ০ (অর্থাৎ ফেল)। ০.৯৪ মানটি ১ এর খুব কাছাকাছি বলে এটি মোটামুটি গ্রহণ করা যায়। ১ অথবা ০ ছাড়া অন্য কোনো মান ঠিক গ্রহণযোগ্য হবে না, কাজেই ০.৯৪ কে ১ এ পরিণত করার চেষ্টার জন্য ওই নিউরোনগুলোর ওজনে পরিবর্তন এনে দেখতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে এটি একজন ছাত্রের ওপর করা হয় না, অনেক ছাত্রের তথ্যকে নিয়ে করা হয়। আর নিউরাল নেটওয়ার্কের প্রতিটি স্তরে অনেক নিউরোন থাকে। তথ্যভাণ্ডারে যত ছাত্রের তথ্য আছে, সবার জন্য একই সঙ্গে ওজনের পরিবর্তনগুলো করতে হবে এবং দেখতে হবে যে সবার তথ্যকে হিসাবের মধ্যে নিয়ে নিউরোনগুলোর কী কী ওজনের জন্য প্রত্যেক ছাত্রের পূর্বাভাসের মান প্রকৃত মান ১ অথবা ০ এর থেকে ন্যূনতম পার্থক্যের মধ্যে আনা যায়। প্রত্যেক ছাত্রের আউটপুট একটি বিশেষ নিউরোনে আসে (আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য ছিলই একটি ছাত্র ও একটি নিউরোন)। সব ছাত্রের জন্য নির্ণিত আউটপুট আর তাদের প্রকৃত মানের ন্যূনতম পার্থক্য নানা নিউরোনে যেই ওজনগুলোর জন্য সম্পন্ন হবে– সেটিই হবে নানা নিউরোনের চূড়ান্ত ওজন। এবং সেগুলো এই মডেলের জন্য স্থায়ীভাবে মেমোরিতে জমা হয়ে যাবে। নিউরোন জালের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক নিউরোনের চূড়ান্ত ওজনের একটি প্যাটার্ন বা বণ্টন ওভাবে মেমোরিতে জমা ও স্থায়ী হয়ে যায়। ওভাবেই ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয়।

এখন পাশ-ফেল জানা নেই এমন নতুন কোনো ছাত্রের পড়ার ও ঘুমানোর তথ্য যদি নিউরাল নেটওয়ার্ককে দেয়া হয়, তখন এই সর্বোত্তম হিসাবে চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া মডেলের ওজনগুলো ব্যবহার করেই তার পূর্বাভাসের মান প্রতি ছাত্রের আউটপুটে পাওয়া যাবে। আগের অনেক ছাত্রের তথ্য দিয়ে ওজনগুলো নির্ধারিত হয়েছে বলে এই পূর্বাভাসটি বেশ নিখুঁতভাবেই পাওয়া যাবে ওই ছাত্রের আউটপুট– হয় ১ এর খুবই কাছে অর্থাৎ পাশ করেছে, অথবা ০ এর খুব কাছে অর্থাৎ ফেল করেছে। পড়ার ঘণ্টার আর ঘুমের ঘণ্টার কোনো অদ্ভুত মিশ্রণের ক্ষেত্রেও এটি খুব আস্থার সঙ্গে করা যাবে, কারণ ওজনের যে সূক্ষ্ম প্যাটার্ন মডেল নির্ধারণ করে ফেলতে পেরেছে তা আমাদের মনুষ্য-বুদ্ধির কাছে অবোধ্য লুকানো থাকলেও এমন বিষয়ও সে ধরে

ফেলতে পারে। যেমন কোন ছাত্র ৩ ঘণ্টা পড়ে ১০ ঘণ্টা ঘুমালে পাশ করবে কি না তা আমরা আস্থার সঙ্গে বলতে নাও পারতে পারি, কিন্তু নিউরাল নেটওয়ার্ক পারবে।

এখন একটু ফিরে গিয়ে আমরা দেখি সব ছাত্রের তথ্য নিয়ে মডেল কী কৌশলে নিউরাল নেটওয়ার্কের প্রত্যেক নিউরোনের ওজনগুলো সঠিকভাবে পরিবর্তন করে। এজন্য প্রত্যেকবার আউটপুটের সঙ্গে প্রতি ছাত্রের প্রকৃত জানা পাশ-ফেলের সম্ভাবনার মানের পার্থক্য ক্রমে কমে আসতে হয়। এই পার্থক্যকে বলা হয় ক্ষতি (লস্) বা ভুল। ধরলাম তথ্যভান্ডারের সব ছাত্রের জন্য একই সঙ্গে সর্বোত্তম ওজন বণ্টন পাওয়ার (প্যাটার্ন) চেষ্টায় শুরুতে কোনো ছাত্রের পূর্বাভাসের মান রয়েছে ০.৮৫। এর সঙ্গে প্রকৃত পূর্বাভাস যেটি হবার কথা তার সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য জানা সেই ১ এবং ০ এর পার্থক্য বা ক্ষতি রয়েছে। এখন প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ১ এর সঙ্গে অথবা ০ এর সঙ্গে পার্থক্যটি (ক্ষতি) কমতে কমতে একেবারেই ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়। এই ক্ষতি দূর করার জন্য যেভাবে নানা নিউরোনের বদলিয়ে বদলিয়ে দেখতে হবে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার জন্য দুটি গাণিতিক কৌশল ব্যবহার করা হয়। একটিকে বলা হয় 'উল্টো যাত্রা' (ব্যাক প্রপোগেশন) আর অন্যটিকে 'নামার হার' এই উভয়ের মাধ্যমে নিউরাল নেটওয়ার্ক নিজের ক্ষতি নিজে সামাল দেয়।

প্রথমে উল্টো যাত্রাটি দেখা যাক। সাধারণ তথ্যভান্ডার থেকে ইনপুট স্তরে আসা তথ্যগুলো নিচের লুকানো স্তরের ভেতর দিয়ে আউটপুটের দিকে অগ্রসর হয়– নিউরোন থেকে নিউরোনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে। এটি সম্মুখ যাত্রা। কিন্তু শেষ স্তরে আউটপুটে গিয়ে ক্ষতি আছে দেখলে এটি বরং আবার উল্‌টো পথে যাত্রা করে, ইনপুটের দিকে। এটি করার কারণ হলো বার বার এদিক ওদিক করে তাকে ওজনগুলোকে সর্বোত্তম অবস্থায় আনার সুযোগ দেয়া। কিন্তু প্রতিটি নিউরোনের ওজন কতখানি বাড়াবে কি কমাবে, এটি ওই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বুঝবে কীভাবে?

এখানেই আসে 'নামার হারের' কৌশলটি। একটি উপমা দিয়ে কৌশলটি বোঝানো যাক। মনে করি আমি একটি পাহাড়ের গায়ে ঢাল দিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করছি একেবারে ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে। কুয়াশার কারণে পাহাড়ের ঢাল বা আশেপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই নিচে নামাটি যেন মডেলের ক্ষতি কমাবার চেষ্টা। আমি পায়ে অনুভব করে করে নামছি লক্ষ্যটি হবে এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যেটি সমতল, যেখানে কোনো ঢাল নেই। এর মানে আমার নামা শেষ ওই সমতল জায়গায় পৌঁছার সঙ্গে নিউরাল নেটওয়ার্কের পরিস্থিতির তুলনা করলে সেটি হবে ন্যূনতম ক্ষতির (ভুল) আউটপুটে পৌঁছে যাওয়ার মতো। এর আগে পর্যন্ত ঢাল ছিল

বলে নামতে হয়েছে অর্থাৎ নিউরাল নেটওয়ার্ককে ওজন পরিবর্তন করতে করতে বারবার এদিক ওদিকে যেতে হয়েছে। পা দিয়ে ঢাল অনুভব করে করে নেমেছি প্রত্যেকবার ছোট একটি ধাপে নিচে নামার ঢালটির পরিমাণ বুঝে বুঝে। এটি আসলে পাহাড় বেয়ে আমার নামার হার বোঝা, নিউরাল নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে এর তুলনীয় হচ্ছে ওজন পরিবর্তন করা এবং এই ধাপে ঠিক কী হারে ক্ষতি বা ভুলটি কমছে তা বোঝা। এভাবে আমি নামতে থাকবো যতক্ষণ না সমতলে পৌছাই, অর্থাৎ যতক্ষণ না নামার ঢালটি ন্যূনতম হচ্ছে। এর মানে নিউরাল নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি থামবে তখন যখন প্রত্যেক ছাত্রের ক্ষতিটি ন্যূনতম হচ্ছে, অর্থাৎ এভাবে যখন প্রত্যেক নিউরোনের ওজন স্থায়ীভাবে চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

উল্টো যাত্রাই বলি আর নামার হারের কথাই বলি– সবই আসলে কিন্তু হচ্ছে গাণিতিকভাবে– সফ্টওয়্যারে মডেলে দেয়া নিয়মে। এদের উদ্দেশ্য একটিই– নিউরোনের ওজনগুলো সঠিকভাবে পরিবর্তন করতে করতে চূড়ান্ত ওজনগুলো পেয়ে যাওয়া। এখন পাশ-ফেল জানা নেই, এমন নতুন ছাত্রের পড়ার আর ঘুমানোর তথ্য মডেলে দিলেই ওটি যথারীতি ওই সুনির্দিষ্ট চূড়ান্ত ওজন অনুযায়ী হিসাব হয়ে আউটপুটের ফলাফলে হয় ১ (পাশ) অথবা ০ (ফেল) এর খুবই কাছাকাছি হবে।

চেহারা দেখে মানুষ চেনা

নিউরাল নেটওয়ার্ককে যেভাবে পূর্বাভাস দিতে দেখলাম, সেই পদ্ধতিই অনেক ধরনের সমস্যা সমাধানে নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে দুই ধরনের সমস্যায় নানাভাবে খুব বেশি ব্যবহৃত– এগুলোকে তাই দেখা যাক। এর একটি হলো চেহারা চিনে কোনো মানুষকে শনাক্ত করার কাজ এবং অন্যটি গলার স্বর শুনে এটি কার গলা সেটি শনাক্ত করতে পারা। কোনোভাবে ওই চেহারা বা ওই কণ্ঠ চেনে এমন মানুষ কিন্তু চট্ করে এ দুটি কাজই পারে। কথা হলো যন্ত্র এটি করতে পারে কি না। পারলে কীভাবে পারবে?

চেহারা চেনার ব্যাপারে যদি আসি, তাহলে তথ্যভাণ্ডারে আসতে হয় মানুষের ইমেজ। বোঝার খাতিরে ধরা যাক মানুষ মাত্র তিনজন– সায়মা, রাফি, ও মেসবাহ। তাদের প্রত্যেকের মুখমণ্ডলের নানা ইমেজের তথ্য রয়েছে। কম্পিউটারে গ্রহণযোগ্য হবার জন্য ইমেজগুলোর প্রত্যেকটি অনেক পিক্সেলে ভাগ করে প্রত্যেকটি পিক্সেল তিনটি সংখ্যার আকারে যাকে। ধরা যাক তিনটির মিশ্রণে পিক্সেলের উজ্জ্বলতার একটি সংখ্যা দেয়া থাকে (সাধারণত ০ থেকে ২৫৫ এর মধ্যে কোনো সংখ্যা)। এর সঙ্গে ইমেজের আরো কিছু বৈশিষ্ট্যও সংখ্যার আকারে থাকে– যেমন দুই চোখের

মধ্যে দূরত্ব, চোয়ালের কোণ, নাকের প্রশস্ততা, ইত্যাদি। এগুলোকে নিয়েই তথ্য সারনীটি তৈরি হয়, সেই সঙ্গে থাকে মানুষটির নাম ও পরিচিতি। তিনজনের এসব তথ্য নিউরাল নেটওয়ার্কের ইনপুটে দেয়া হয়। ধরা যাক সায়মার রয়েছে ৫০০ ইমেজ, রাফির ৬০০ ইমেজ এবং মেসবাহর ৪৫০টি ইমেজের তথ্য। প্রত্যেকের এই যে এতগুলো ইমেজ, তা বিভিন্ন কোণ থেকে আসা আলোতে তোলা বিভিন্ন উজ্জ্বলতার আলোর মধ্যে, বিভিন্ন মুখভঙ্গিতে, বিভিন্ন আলো-ছায়ায় নেয়া এমনি বহুতরো বৈচিত্র্যে থাকা ইমেজ।

প্রত্যেক ইনপুট যখন নিউরাল নেটওয়ার্কের পরবর্তী স্তরে যায়, সেখানকার প্রত্যেক নিউরোনে তার ওজন দিয়ে তাকে গুণ হয়। এখানে ওজন জিনিসটাই হলো তথ্যটি চেহারা চেনার ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব বহন করে সেটি অনুযায়ী একটি ভগ্নাংশ। শুরুতে একরকমভাবে প্রত্যেক নিউরোনে তথ্যের একটি প্রাথমিক ওজন আপাতত ঠিক করে নেয়া হয়। যেমন রাফির চোখের কোনায় একটি বক্রতা তাঁকে শনাক্ত করতে বেশ সহায়ক হয় বলে শুরুতে এটির তথ্যকে যেই ওজন দিয়ে গুণ করা, হবে তা একটু বড় ভগ্নাংশ হবে। শুরুতে এভাবেই নানাভাবে স্থির হয়ে থাকে ইতস্তত নানা প্রাথমিক ওজন। সব গুণফল যোগ করে তা গাণিতিক ফাংশানের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে পরের নিউরোনে পাঠানো হয়। এমনি করে করে শেষ পর্যন্ত আউটপুটে। সব ইমেজের এক এক ইমেজ থেকে আউটপুটে তার নিউরোনে যে পূর্বাভাস সংখ্যা পাওয়া যায়, তা সেই ইমেজগুলোর অধিকারী মানুষটির নামের সঙ্গে মেলার কারণে ১ এর কাছাকাছি হতে পারে, না মেলার কারণে ০ এর কাছাকাছি হতে পারে। তিনজনে সকল ইমেজকে একসঙ্গে হিসাবে নিয়ে বারবার উল্টো যাত্রা ও নামার হার প্রক্রিয়ায় নানা নিউরোনের ওজন উঠা-নামা এমনভাবে করে করে দেখা হয় যেন প্রত্যেকের প্রত্যেক ইমেজটির জন্য আউটপুট ১ অথবা ০ এর ক্রমেই আরো কাছে যায়। শেষ পর্যন্ত এগুলোর সব যখন ১ ও ০ থেকে ন্যূনতম পার্থক্য আসে, তখনকার ওজন বণ্টনটিই চূড়ান্ত হিসেবে মেমোরিতে চলে আসে। আগের উদাহরণে যেভাবে করা হয়েছিল এও অনেকটা সেভাবেই।

আউটপুটের স্তরে তিনটি নিউরোনের দিকে সবসময় মনোযোগ দিতে হয়– যার একটিতে আসে সায়মার পূর্বাভাস ফলাফল, আরেকটিতে রাফির এবং আরেকটিতে মেসবাহর। ট্রেনিং শেষ হয়ে চূড়ান্ত ওজন বণ্টন ঠিক হয়ে যাওয়ার পর তিনজনের যেকোনো একজনের সম্পূর্ণ নতুন একটি ইমেজ যদি ইনপুটে আসে তখন ওই ওজন বণ্টনের মধ্য দিয়ে প্রসেসিং হয়ে আউটপুটে তিনটি নিউরোনের কোনটিতে কী

ফলাফল আসে, তা দেখতে হয়। দেখা গেলো সায়মার জন্য নির্দিষ্ট নিউরোনে সেটি ০.৯৫ এবং রাফির ক্ষেত্রে ০.০৫ এবং এবং মেসবাহর নিউরোনে ০.০৩। কাজেই নতুন ইমেজটি সায়মার বলেই চিহ্নিত হবে। হয়তো সায়মাকে সারাক্ষণ দেখতে যেরকম দেখায় এই নতুন ইমেজ আপাতদৃষ্টিতে অনেক ভিন্ন। এমন হলেও তাকে শনাক্ত করতে নিউরাল নেটওয়ার্ক ভুল করবে না। ওই শত শত ইমেজ থেকে সূক্ষ্ম প্যাটার্নগুলো উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছে বলেই এরকম সঠিক পূর্বাভাস নিউরাল নেটওয়ার্ক দিতে পারে। এ যেন চেনা মানুষের সূক্ষ্ম চেহারা-বৈশিষ্ট্যগুলো জানা থাকলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভঙ্গিতে থাকলেও পরিচিত মানুষ তাকে চিনে ফেলে অনেকটা সে রকমের। যখন তথ্যভান্ডারে অনেক অনেক বেশি মানুষের বহু ইমেজ থাকে, তখন কোনো মানুষের পক্ষে কোনো ইমেজ শনাক্ত করা অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু নিউরাল নেটওয়ার্কের কাছে নয়।

এই যে চেহারা দেখে মানুষ শনাক্ত করা, হয়তো হাজার হাজার মানুষের মধ্য থেকে– তার অনেক বাস্তব প্রয়োগ আমরা অহরহ দেখি। এই মডেলের কারণে অফিসের গেইটে সঠিক চেহারা মানুষ এসে দাঁড়ালে গেইট খুলে যায়, এমনকি শীতের দিনে জবুথবু কান অবধি গরম টুপি, উঁচু করে দেয়া কোটের কলার সত্ত্বেও। অতি ভিড়ের মধ্যেও যদি কোনো অপরাধী মিশে থাকে, তবু ওখানে তার উপস্থিতি জেনে যাওয়া ও তাকে খুঁজে নেয়া সহজ হয়ে যায়– কারণ ভিড়ের ছবিতে তার চেহারাটি কোনোভাবে দেখা গেছে ও এটি নিশ্চিতভাবে শনাক্ত হয়েছে বলে। এআই চালিত একটি রোবট তার পরিচিত কাউকে দেখলে তাকে যে নাম ধরে সম্ভাষণ জানাতে পারে, সে তো এই কারণেই।

কণ্ঠস্বর শুনে মানুষ চেনা

এবার যদি কণ্ঠস্বর চেনার কথায় আসি এর মডেলটি প্রায় হুবহু একইভাবে কাজ করে। ছবিকে যেরকম আলোর বিন্দুতে ভাগ করে ফেলা হয় কণ্ঠস্বরের আওয়াজের তথ্যকে ভেঙে ফেলা হয় তার ফ্রিকোয়েন্সি, ওঠানামা, টোন, রিদম, কোয়ালিটি ইত্যাদি কিছু শব্দগুণের নিরিখে। একই মানুষের এই একই তথ্যগুলো নিতে হয় কথা বলার বিভিন্ন ভঙ্গির ভেতরে– আলাপে, বক্তৃতায় আবৃত্তিতে, গানে, চিৎকারে, কোলাহলের মধ্যে। এর কারণ এর সবই যেন মেশিন লার্নিঙের ট্রেনিঙে আসে, নতুন শনাক্তকালের পরিস্থিতি যেন বাধা না হয়। এর সবই সংখ্যার আকারে চলে আসে নিউরাল নেটওয়ার্কের ইনপুটে, নিউরোনে এগুলো যথারীতি ওজন ও ফাংশান দিয়ে

প্রভাবিত হয়ে পরের স্তরের নিউরোনে যায়। ট্রেনিঙের জন্য যত মানুষের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর সব তথ্যকে আগের প্রক্রিয়ায় ওজন বাড়িয়ে কমিয়ে আউটপুটে নিয়ে মানুষটির পূর্বাভাস-মান পাওয়া যায়। ওটির সঙ্গে প্রকৃত মানুষটির জন্য যা হওয়া উচিত তারই কণ্ঠস্বর হলে ১, এবং না হলে ০, এমনটির সঙ্গে পার্থক্যটি কমিয়ে আনাটাই লক্ষ্য। সবার তথ্যগুলোকে বারবার উল্টো পথে পাঠিয়ে ও নামার হার নির্ণয় কারে তথ্যভান্ডারের সব মানুষের তথ্যকে বিবেচনায় রেখে এটি করা হয়– যতক্ষণ পর্যন্ত না সবার জন্য পাওয়া ফলাফল ও প্রকৃত ফলাফলের পার্থক্য ন্যূনতম অবস্থায় আসে। এভাবে ট্রেনিং শেষ হয় এবং এ অবস্থার পুরো নেটওয়ার্কব্যাপী চূড়ান্ত ওজন বণ্টন স্থায়ী হয়ে যায়। এখন কার কণ্ঠস্বর তা জানা না থাকা কোনো স্বর যদি ইনপুটে দেয়া হয় এবং এটি ওই তথ্যভান্ডারের মানুষগুলো কারো হয় তাহলে আউটপুটের ফলাফল ওই মানুষটির আউটপুট নিউরোনে পাওয়া যাবে ১ এর খুবই কাছের একটি ভগ্নাংশ হিসেবে। আর বাকিদের নিউরোনে তা আসবে ০ এর খুব কাছাকাছি একটি সংখ্যা হিসেবে। মানুষটির কণ্ঠস্বর সনাক্ত হয়ে গেলো। স্বরটি যদি ওই তথ্যভান্ডারের অন্তর্গত কারো না হয় তাহলে সবার নিউরোনের আউটপুট ০ এর কাছাকাছি আসবে।

কণ্ঠস্বর চিনতে পারার দক্ষতা যে কতভাবে ব্যবহার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ভয়েস কমান্ড দিয়ে আমরা যখন ফোন, কম্পিউটার এমনি কিছুকে কাজ করাতে চাই এখন সেটি আগে নিশ্চিত হতে চায় আমি আসল লোক কি না, ওই ডিভাইসের বৈধ ব্যবহারকারী কি না। কণ্ঠস্বর শনাক্তের মধ্য দিয়েই সে ওটি করে। অ্যাপলের সিরি, গুগলের এসিস্ট্যান্ট, আমাজনের অ্যালেক্সা, এই যে সব চ্যাটবটের সঙ্গে আমরা কথা বলে কিছু জানতে চাই, কখনো কিছু কাজও করতে বলি তাকে, তাতে যে কেউ ডাকলে তারা সাড়া দেবেনা, বৈধ ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর হিসেবে চিনলে তবেই সাড়া দেবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতিও কণ্ঠ-আদেশে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন প্রতিবন্ধীরা তাদের হুইল চেয়ার মুখে আদেশ দিয়ে চালনা করতে পারেন– সেক্ষেত্রে হুইল চেয়ারকে তাঁর কণ্ঠস্বর অবশ্যই চিনতে হবে।

অন্য আর এক রকম প্রয়োগ হলো যেখানে কণ্ঠস্বর নকল করে কোনো জালিয়াতি করার চেষ্টা করা হয়, সেটি উদ্‌ঘাটন করা। যত ভালো নকলই করা হোক না কেন, নিউরাল নেটওয়ার্কের সূক্ষ্ম পূর্বাভাসকে ফাঁকি দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। একটি মজার ব্যাপার হলো মানুষের কণ্ঠস্বর প্যাটার্নগুলো পেয়ে গিয়ে নিউরাল নেটওয়ার্ক যেভাবে পূর্বাভাস দিতে পারে, তেমনি একই প্রক্রিয়ায় নবজাত শিশুর কান্নার কারণও

শনাক্ত করা সম্ভব। ধরা যাক কিছু নতুন শিশুদের কান্নার সঙ্গে তাকে নিয়ে কী করলে সে কান্না থেমেছে সেসবের তথ্য রেকর্ড করা হলো। তখন এসব তথ্য দিয়ে ট্রেনিং দেয়া হলে নিউরাল নেটওয়ার্ক শিশুর যেকোনো কান্নার ক্ষেত্রে পূর্বাভাস দিতে পারে, সে কান্না থামবে কী করলে। আরো অদ্ভুত বিষয় হলো উদ্ভিদের অশ্রুত আওয়াজ থেকে এটি বুঝতে পারে উদ্ভিদটি কী নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে– অনেকটা ওই শিশু কী নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে বোঝার মতোই।

ওপরের প্রথম বিষয়টিতে ধরা যাক দু'তিন মাসের বা তারো ছোট কোনো বাচ্চার কান্না থামানো যাচ্ছে না। মা চেষ্টা করছেন কান্নার কারণটি জেনে এর প্রতিকার করতে। মায়ের ও অন্যান্যদের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে এরকম শিশুর কান্না সাধারণত তিনটি কারণে ঘটে– খিদে পেয়েছে বলে, পেটে ব্যথা হলে, আলাদা না থাকতে চেয়ে কোলে উঠতে চায় বলে। সাধারণত মা বা অন্য কোনো যত্নকারী কান্না শুনে বুঝতে পারেন না এর মধ্যে কোন্‌টি আসল কারণ; তাঁরা একটির পর একটি ধরে নিয়ে সেভাবে থামাতে চেষ্টা করেন। মেশিন লার্নিং এর সমাধানে এগিয়ে এসেছে। এখন ছোট একটি ডিভাইস পাওয়া যাচ্ছে যাতে শিশুর কান্না রেকর্ড হয়ে গিয়ে তাতে পূর্বাভাস পাওয়া যায় কান্নাটি ওই তিন কারণের কোন্‌টিতে হচ্ছে। তিনটি আলোর যেকোনো একটি জ্বলে উঠে তা জানিয়ে দেয়।

এটি সম্ভব হয়েছে তথ্যভান্ডারে এরকম অনেক নবজাতকের কান্নার রেকর্ডকে তথ্য হিসেবে নিয়ে। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কোন্ কান্নাটি কীভাবে সফলভাবে থামানো গেছে, সেই তথ্যটিও অন্তর্ভুক্ত করা গেছে। কোনটিতে দুধ খাওয়ালে, কোন্‌টিতে পেটের ব্যথার উপশমে ব্যবস্থা নিয়ে, কোন্‌টিতে কোলে তুলে নিয়ে। এই তথ্যগুলোই নিউরাল নেটওয়ার্কের ট্রেনিঙে ব্যবহার করা হয়েছে। কণ্ঠস্বরের মতো কান্নার শব্দগুণ তথ্যকেই নেটওয়ার্কে নানা নিউরোনের ওজন কমিয়ে বাড়িয়ে দেখা হয়েছে এক্ষেত্রে এটি কোন্ মানুষের তা নয়, বরং কোন্ সমস্যার তা। আউটপুটে তিন সমস্যার তিনটি নিউরোন থাকলে প্রত্যেকটি কান্নার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে পূর্বাভাসের মানকে প্রকৃত মান ১ বা ০ এর যথাসম্ভব কাছাকাছি আনতে। সব কান্না মিলিয়ে যে সর্বোত্তম অবস্থার ওজন বণ্টন স্থায়ী হয়ে গেছে, সেটি যেকোনো নতুন শিশুর নতুন কান্নার প্রকৃতি জানতে ব্যবহার হয়েছে। এবার একটি ক্ষেত্রেই শুধু ১ এর খুব কাছাকাছি মান পাওয়া যাবে, বাকি দুটির ক্ষেত্রে ০ এর খুব কাছাকাছি। অন্তত প্রায় ৯৫% ক্ষেত্রে যে কারণ মেশিন দেখাচ্ছে, তার প্রতিকার করলে শিশুর কান্না থেমে যায়।

ঠিক একই কৌশল উদ্ভিদের অশ্রুত আওয়াজের মানে বোঝার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, অনেক উদ্ভিদই সারাক্ষণ খুব উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির আওয়াজ নির্গত করে, যা কানে শোনা না গেলেও সংবেদী মাইক্রোফোনে গ্রহণ করে রেকর্ড করা যায়। দেখা গেছে যে, বিশেষ কোনো পীড়ন এই উদ্ভিদের ওপর করা হলে ওই আওয়াজের নানা গুণে পরিবর্তন ঘটে। ওরকম তিনটি অবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বড় আওয়াজে বড় পরিবর্তন আসে বলে। এর একটি হলো উদ্ভিদ স্বাভাবিক অবস্থায় সু-স্বাস্থ্যে আছে, আরেকটিতে পানির অভাবে উদ্ভিদ কষ্ট পাচ্ছে, তৃতীয়টি হলো উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড ইত্যাদিতে ধারালো কিছুর কারণে আহত হয়েছে- যেমন পোকায় কেটেছে। শিশুর কান্নার সঙ্গে এর তুলনা করা যায়– যেক্ষেত্রে শিশু যেন নানা অবস্থায় থাকা উদ্ভিদ আর তার অশ্রুত আওয়াজ হলো সেই কান্না। একই অনেক উদ্ভিদ, যা ওই তিন অবস্থার কোনো একটিতে রাখা আছে তার আওয়াজ-তথ্য এবং অবস্থা-তথ্যকে নিউরাল নেটওয়ার্কের ইনপুটে দেয়া হয়েছে। একই নিয়মে এসব তথ্যে ট্রেনিং সম্পন্ন হবার পর অজানা অবস্থায় আছে এমন উদ্ভিদের আওয়াজ ইনপুটে দিলে বোঝা যাবে ওই তিনটির মধ্যে তার অবস্থাটি কী। শিশুর ক্ষেত্রে কান্না ইনপুট দিয়ে যেভাবে কান্নার কারণের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল হুবহু সেভাবে।

উত্তর দিয়ে দেয়া ও উত্তর ছাড়া ট্রেনিং

এ পর্যন্ত আমরা মেশিন লার্নিঙের যে পদ্ধতি দেখলাম আর যতগুলো উদাহরণ দেখলাম, তার সবগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য্য আছে– এতে তথ্যটি কার সে উত্তর দেয়া থাকে। ইনপুটে দেয়া সব তথ্যের কোন্‌টি কার, অথবা কোন্ পরিস্থিতির সেই উত্তর তথ্যের মধ্যেই দেয়া থাকে। নতুন অজানা ক্ষেত্রে সেই উত্তর মডেলটির থেকে জানতে চাই, কিন্তু জানা তথ্যভান্ডারের ব্যবহৃত ক্ষেত্রে উত্তর দেয়াই থাকে। যেমন চেহারা শনাক্ত করার জন্য সায়মার যে ৫০০টি ইমেজ তথ্যভান্ডারে দেয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে এটি যে সায়মার সে কথা উল্লেখ আছে। সেজন্যই ট্রেনিঙের সময় আউটপুটে পূর্বাভাস মানের সঙ্গে প্রকৃত মানের পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব হয়েছে। এটি যে সায়মার ইমেজ, একথা জানা আছে বলেই তার প্রকৃত মান আমরা ১ বলে জানি। এ যেন অঙ্কের প্র্যাকটিস করার সময় প্রত্যেকটি অঙ্কের উত্তর দেয়া থাকলে আমাদের পক্ষে যেমন শিখতে সুবিধা হয়, সেরকম। উত্তর দেয়া থাকে না যখন একটি নতুন অঙ্ক ওই নিয়মমত করে উত্তরটি বের করতে হয় তখন। কোনো একটি নতুন ইমেজ জানা কারো সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না সেটি বোঝার

জন্য যখন ট্রেনিংপ্রাপ্ত মডেলটি ব্যবহার করার সময়ও উত্তর আগে থেকে জানা থাকে না। ট্রেনিঙের সময় উত্তর দিয়ে দেয়াটি যেন তথ্যের সঙ্গে একটি লেবেল লাগিয়ে দেয়া যে ওটি কার। যেন সায়মার প্রত্যেকটি ইমেজের সঙ্গে লেবেল সাঁটা আছে সায়মার নামে। এজন্য একে বলা হয় লেবেল দেয়া ট্রেনিং অথবা তদারকিতে থাকা ট্রেনিং (সুপারভাইজ্‌ড ট্রেনিং)।

সব পরিস্থিতিতে কিন্তু তথ্যের সঙ্গে এভাবে উত্তর বলে দেয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় বেশ সোজাসাপটা সমস্যাতেও তথ্যের ধরনের কারণে তা সম্ভব হয় না, অন্যত্র তথ্যভান্ডারের ব্যাপকতা ও বিশালতার কারণেও তা হয় না। সেক্ষেত্রে মেশিন লার্নিংকে উত্তর ছাড়াই তথ্য থেকে অন্যভাবে প্যাটার্ন আবিষ্কার করে পূর্বাভাস দিতে হয়। তাতে হয়তো পূর্বাভাসটিও সরাসরি না হয়েও একটু অন্যভাবে আসে, কিন্তু তাও দারুণ বুদ্ধির কাজ। এই উত্তর না থাকা ট্রেনিঙকে বলা হয় লেবেলবিহীন ট্রেনিং বা তদারকিবিহীন ট্রেনিং (আন্‌সুপারভাইজ্‌ড)।

একটি খুব সহজ ও সাধারণ উদাহরণ দিয়ে উত্তর দেয়া এবং উত্তর না দেয়া ট্রেনিঙের পার্থক্যটি আরো ভালো বোঝার চেষ্টা করি। ধরা যাক, বিভিন্ন রকম ফলের তথ্য থেকে মেশিন লার্নিং ট্রেনিং নিচ্ছে এবং সেটি উত্তর দিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে। তাহলে তথ্য সারণিতে প্রত্যেকটি ফলের একটি ছবি থাকবে এবং পাশে তার নামটিও থাকবে। যেমন আপেলের ছবি ও নামটি। অবশ্য এর সবই সংখ্যায় পরিণত করেই মডেলের ইনপুটে দেয়া হয়। তেমনি কলার ছবি আর কলা নামটি, আঙুরের ছবি এবং নাম– এমনি বিভিন্ন ফল। এরকম অনেক ফলের তথ্য সারণিতে থাকলে ট্রেনিং শেষে যেকোনো একটি ফলকে চেনার জন্য তার ছবি দেখালে মডেল বলে দেবে ফলটি কী? মেশিন লার্নিং সরলতর যেকোনো গাণিতিক মডেল এর জন্য ব্যবহার করতে পারলেও এক্ষেত্রে ধরে নিই যে, নিউরাল নেটওয়ার্কই ব্যবহার করা হয়েছে। সব ফলের তথ্য একসঙ্গে নিউরোনে হিসেবে নিয়ে দেখা হবে ঠিক কী রকম ওজন বণ্টনের জন্য প্রত্যেকটি ফলের আউটপুট নিউরোন সেই ফলের জন্য প্রকৃত যে মান ১ এর সবচেয়ে কাছে কী অবস্থায় যাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ যে ফলের নাম আছে, তার সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে। এটিই সর্বোত্তম ওজন বিন্যাস প্যাটার্ন। এখন যেকোনো ফলের ছবি ইনপুট দিলেই তার নিউরোনে ১ এর কাছাকাছি দেখিয়ে জানিয়ে দেবে ফলটি কোনটি। মূল তথ্যে প্রত্যেক ফলের সঙ্গে তার নাম বা উত্তর দেয়া ছিল বলেই এসব সম্ভব হলো।

কিন্তু এবার এই উদাহরণটিই একটু অন্যভাবে নেয়া যাক। মনে করি তথ্যের মধ্যে ফলের ছবি দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার নাম দেয়া হয়নি– অর্থাৎ কি না এটি উত্তর

না দেয়া ট্রেনিং হবে। কিন্তু আগের পদ্ধতিতে এর থেকে কোনো অজানা ফলের পরিচিতির পূর্বাভাস মিল্‌বে না। তবে তথ্যের থাকা প্রত্যেকটি ফলের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলোর নিরিখে ফলগুলো কতগুলো দলে বিভক্ত করে ফেলা যায়। যেমন ধরা যাক একটি দলে অন্তর্ভুক্ত হলো আপেল ও টম্যাটো- উভয়ের আকার গোল, সাইজ মাঝারি এবং রং লাল বলে। অন্য একটি দলে আছে শুধু কলা– লম্বা ও হলুদ। আরো একটি দলে আছে আঙুর আর জাম– ছোট, গোলাকার, রং বেগুনি। এমন মডেল ব্যবহার করতে হবে যে মডেল নিজে নিজেই ফলগুলোকে ওসব নানা দলে ভাগ করে ফেলতে পারে শুধু তাদের ছবির তথ্য থেকেই; অর্থাৎ কি না ছবি থেকে প্রত্যেকটির রং আকার আয়তন ইত্যাদি বুঝে ফেলে সেই অনুযায়ী। ফলে দলে বিভাজনটি এমন হবে, যেন একটি দলের অভ্যন্তরের সদস্যগুলোর পরস্পরের মধ্যে মিল যেমন বেশি হবে তেমনি এক দলের সদস্যদের সঙ্গে অন্য দলের সদস্যদের প্রচুর অমিল থাকবে। কীরকম দল সেগুলো হবে তা নির্ভর করে মডেলটির উদ্দেশ্যের ওপর। সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ীই মডেলের সফ্‌টওয়্যারে অ্যালগরিদম রচিত হয়। যেমন ফলের মডেলটির লক্ষ্য হতে পারে দোকানে বা বাক্সে কোন্ ফলগুলোকে একসঙ্গে রাখা যাবে। সেক্ষেত্রে ফলের রং, সাইজ ও আকৃতি দল-বিভক্তিতে গুরুত্ব পাবে। ওভাবে দল বিভক্ত করলে শেষ অবধি মডেল যা বলে দেবে, তা হলো একটি নতুন ফল আনলে আসলে তা কোন্ দলের সদস্য। মডেল যদি এটি ঠিক করে দেয়, তাহলে জেনে যাব ফলটিকে কোন বাক্সে রাখা উচিত। এভাবে উত্তর না দিয়ে দেয়া সমস্যায়ও শ্রেণিবিভাজনের মাধ্যমে সমাধান দিয়ে মেশিন লার্নিং দারুণ সব কাজ করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্নটি হলো সফ্‌টওয়্যার নিজে নিজে তথ্যভান্ডারকে এভাবে নানা দলে বিভক্ত করে কীভাবে? উত্তর না দেয়া সমস্যার এমন কিছু সত্যিকার উদাহরণ নিয়ে আমরা এ প্রশ্নের উত্তরটি পাওয়ার চেষ্টা করবো। একটি উদাহরণ হলো সুপারমার্কেটের ক্রেতাদের নিয়ে। কোম্পানি চেষ্টা করছে ক্রেতাদের প্রকৃতি ও আচরণ সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য জোগাড় করে কী কী ভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের ক্রেতাদের চাহিদা মেটানো যায় তা জেনে নিতে। এই লক্ষ্যটিই মডেলকে দেয়া হয়েছে। সমস্যাটিই এমন যে, এক্ষেত্রে প্রত্যেক তথ্যের সঙ্গে উত্তর বলে দেয়া সম্ভব নয়– কোন্ তথ্যটি কোন ক্রেতার। তাই লেবেলবিহীন ট্রেনিং অর্থাৎ উত্তর না দেয়া ট্রেনিংই ভরসা। মডেল যা করবে তা কোন বিশেষ ক্রেতা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া নয় বরং সব ক্রেতাদের তথ্য থেকে তাদেরকে বিভিন্ন দলের প্যাটার্নে ভাগ করে ফেলাই হবে তার

কাজ। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা মাত্র চারজন ক্রেতা ও তাদের মাত্র দুটি আচরণের কথা তথ্য সারণিতে রাখি। ক্রেতা চারজন ক, খ, গ, ঘ এবং আচরণ দুটি হলো মাসে কত ডলারের বাজার এই সুপারমার্কেট থেকে করে, আর মাসে কতবার ওখানে যায়। ধরা যাক তথ্যগুলো এরকম।

ক্রেতা	কত ডলার	কতবার
ক	২০০	২
খ	৮০০	৮
গ	২২০	১
ঘ	৭৫০	৯

আসলে এই সারণিতে বোঝার সুবিধার জন্য নাম দিলেও কোন্ আচরণগুলো ক'য়ের বা কোন্গুলো খ'য়ের, প্রকৃত ক্রেতার নাম তথ্যে থাকবে না, মডেলকে সফ্টওয়্যার বলে দিয়েছে শুধু আচরণ যাদের একইরকম তাদেরকে একই দলে রাখতে হবে। চার জন মাত্র ক্রেতা হলে তা মডেলকে দেয়ার দরকার হতোনা যে কেউ দেখেই ঠিক করতে পারতো। বাস্তবিক ক্ষেত্রে আসলে ক্রেতা থাকে হাজার হাজার, আমরা নিজেরা বোঝার সুবিধার জন্য চারজন ধরে নিয়েছি। আর আচরণের সংখ্যাও প্রকৃত ক্ষেত্রে মাত্র দুটিতে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে। আমাদের সংক্ষিপ্ত উদাহরণটিতে মডেলের ওপর দায়িত্ব এই চারজন ক্রেতাকে আচরণ অনুযায়ী দুটি দলে ভাগ করা। এর জন্য মডেলকে তথ্য সারণির যেকোনো দুজন ক্রেতার তথ্যকে বেছে নিতে হবে, যার প্রত্যেকটি এক একটি দলের কেন্দ্রবিন্দু হবে। অন্য যে তথ্য এই কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছিতে থাকবে, সেটি এর সঙ্গে একই দলের হবে। প্রথমে কেন্দ্রবিন্দুগুলো বেছে নেয়াটি হবে ইতস্তত ভাবে অথবা অনেকটা লটারির মতো করে। মডেলের পক্ষে গাণিতিকভাবে এটি করা সম্ভব। ধরা যাক্, ওভাবে কেন্দ্রবিন্দু ১ নির্বাচিত হলো ২০০ ডলার ব্যয় ও ২ বার ভিজিটের তথ্য। আর কেন্দ্রবিন্দু ২ হিসেবে নির্বাচিত হলো ৮০০ ডলার ব্যয় ও ৮ বার ভিজিটের তথ্য। অন্য কোন্ তথ্যটি কেন্দ্রবিন্দু ১ এর কাছে? গাণিতিক তুলনা করে মডেল বুঝে ফেলবে যে, সেটি ২২০ ডলার ব্যয় ও ১ বার ভিজিট নিয়ে তথ্য। কীভাবে বুঝে ফেল্বে তা নিচে দেয়া হয়েছে। কাজেই এই তথ্যগুলো কেন্দ্রবিন্দু ১ এর সঙ্গে মিলে দল ১ গঠিত হবে। অন্যদিকে ৭৫০ ডলার ব্যয় ও ৯ বার ভিজিট নিয়ে তথ্য কেন্দ্রবিন্দু ২ এর কাছাকাছি বলে এই দুইয়ে মিলে দল ২ গঠিত হবে। আমরা একনজর দেখে বুঝলেও মেশিন যেকোনো তথ্যের কাছাকাছি কোন্টি সেটি কীরকম অঙ্কের মাধ্যমে বুঝতে পারে সেটি একটু দেখি।

দুজন ক্রেতার তথ্যের মধ্যে যে পার্থক্য, এ দুটি কত কাছে তাকে বলতে পারি দূরত্ব। মডেলের অঙ্কটি তা হলে হবে কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে অন্য তথ্যের ব্যবধান: দূরত্ব =

$$\sqrt{(\text{কেন্দ্র বিন্দুর তথ্যে ব্যয় − অন্য তথ্যে ব্যয়})^2 + (\text{কেন্দ্র বিন্দুর তথ্যে ভিজিট− অন্য তথ্যে ভিজিট})^2}$$

এভাবে অঙ্ক করে নানা ক্রেতার জন্য নানা কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরত্ব

ক্রেতা ক : কেন্দ্রবিন্দু ১ থেকে দূরত্ব = ০ ; কেন্দ্রবিন্দু ২ থেকে দূরত্ব = ৬০০

ক্রেতা খ : কেন্দ্রবিন্দু ১ থেকে দূরত্ব = ৬০০ ; কেন্দ্রবিন্দু ২ থেকে দূরত্ব = ০

ক্রেতা গ : কেন্দ্রবিন্দু ১ থেকে দূরত্ব = ২০ ; কেন্দ্রবিন্দু ২ থেকে দূরত্ব = ৫৮০

ক্রেতা ঘ : কেন্দ্রবিন্দু ১ থেকে দূরত্ব = ৫৫০ ; কেন্দ্রবিন্দু ২ থেকে দূরত্ব = ৫০

এসব দূরত্ব থেকে মডেল কেন্দ্রবিন্দু থেকে সব থেকে কম দূরত্ব অনুযায়ী ক্রেতা ক এবং ক্রেতা গ দল ১এ ফেলবে। আর ক্রেতা খ ও ক্রেতা ঘ'কে দল ২ এ ফেলবে।

যদি সারণিতে ক, খ, গ, ঘ এর মত হাজার হাজার ক্রেতার তথ্য থাকতো আর আচরণের সংখ্যাও যদি দুই না হয়ে অনেক হতো তখনো ঠিক একই এরকম অঙ্ক করে দূরত্বগুলো বের করে বলতে পারতাম কোন্ কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি থাকার জন্য কোন ক্রেতার তথা কোন্ দলে থাকবে। অঙ্কগুলো মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলা কম্পিউটারের জন্য খুবই সহজ। যদি দুই দলের পরিবর্তে আরো নানা দলে ভাগ করতে চাই তা হলে লটারির মতো করে দুইয়ের বেশি কেন্দ্রবিন্দু বাছাই করলেই হলো। আপাতত আমরা দুই দলেই থাকি।

এই যে লটারির মতো করে ইতস্তত দলের প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু নির্বাচন করলাম তাতে মডেলের কাজে একটি অনিশ্চয়তা ঢুকে গেলো। একে আরো নিশ্চিত কিছু করতে হবে। ইতস্তত প্রথম নির্বাচনকে নেহাত একটি শুরু হিসেবেই নিতে পারি। এরপর এগুলোকে গাণিতিকভাবে সংশোধন করে নতুন কেন্দ্রবিন্দু পেতে হবে।

এজন্য নতুন একটি কেন্দ্রবিন্দু পাবো দল ১ এর দুই সদস্য কও গ এর তথ্যগুলোর গড় বের করে– দলের কেন্দ্রবিন্দু তো সবসময় সব সদস্যদের গড়ের জায়গাতেই হওয়া উচিত। ক ও গ এর তথ্যের এই গড় হলো দুই ব্যয়ের গড় ২১০ ডলার দুই ভিজিটের গড় হলো ১.৫। এই সংশোধিত ব্যয় ২১০ ভিজিট ১.৫ হলো দল ১ এর নতুন কেন্দ্রবিন্দু ১। এভাবে দল ২ এর দুই সদস্য খ ও ঘ এর তথ্যের গড় করে সংশোধিত ব্যয় ৭৭৫, ভিজিট ৮.৫ হলো দল ২ এর নতুন কেন্দ্রবিন্দু ২। এখন ওই যে প্রত্যেক ক্রেতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে অন্য তথ্যগুলোর দূরত্ব নির্ণয় করা হয়েছিল সেই অঙ্কটি আবার করা হবে, কিন্তু এবার নতুন কেন্দ্রবিন্দু দুটি ব্যবহার করে। ফলে যার যার কেন্দ্রবিন্দুর থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব অনুযায়ী এবার কোন দলে কে

কে পড়বে, সেটি পুনর্বিন্যাস করতে হতে পারে। কেন্দ্রবিন্দু আরো সংশোধন করে এই একই কাজ বার বার করা হবে পুনর্বিন্যস্ত সদস্যদের আবার নতুন গড় বের করে করে নতুন নতুন কেন্দ্রবিন্দু দুটি সৃষ্টির জন্য। প্রত্যেকবার দলে আরো পুনর্বিন্যাস দরকার হতে পারে– এভাবে দলও ক্রমাগত সংশোধন হবে– দলগুলো আরো সুগঠিত হবে। সুগঠিত হবার মানে হলো দলে সদস্যরা যথাসম্ভব ওই দলের কেন্দ্রবিন্দুর খুব কাছাকাছি একটি ঘন বুনোটের ঝাঁক গঠন করবে। আর অন্য দলের কেন্দ্রবিন্দু থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে যাবে– দলগুলো আলাদা ভাবে আরো ভালো বোঝা যাবে। এভাবে করে যেতে হবে যতক্ষণ না নতুনভাবে করার পরও দলের বিন্যাসে নতুন আর কোনো পরিবর্তন না আসে। আমাদের এই অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে অবশ্য বিন্যাস পরিবর্তন হবার সুযোগ কম বলে বারবার এটি করতে হবে না। তবে অনেক ক্রেতার তথ্যের ক্ষেত্রে এ কাজ বারবার করে বহুবার করতে হবে দলগুলোর বহু সদস্যকে অপরিবর্তনীয় ঠাস বুনোটে আনতে। কাজটি আরো করে নতুন কোনো পরিবর্তন আর না আসলে ব্যস, মডেলের কাজ ওখানেই শেষ– এই দুই দলে স্পষ্ট বিভক্ত করতে পারাটাই মডেলের কোনো প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া।

এভাবে মেশিন লার্নিং থেকে ক্রেতাদের আচরণগুলোকে দুটি দলে পেয়ে কোম্পানির কী লাভ হলো? লক্ষ করলে দেখা যাবে আমাদের উদাহরণে দল ১ এর সদস্য ক্রেতারা সুপারমার্কেট খরচ করে কম, সেখানে যায়ও কম। অন্যদিকে দল ২ এর সদস্যরা খরচ করে অনেক বেশি, যায়ও অনেক বেশি বার। কাজেই ক্রেতাদের জন্য কোম্পানি কৌশল নির্ধারণ দুই দলের জন্য একই হলে সুবিধা হবে না– প্রথম দলের অনুকূলে করলে তা দ্বিতীয় দলের উপযোগী নাও হতে পারে। উল্টোটি করলেও সুবিধা না হতে পারে। দুই দলের জন্য দুই ভিন্ন কৌশল চাই। প্রথম দলকে আরো বারবার এসে বেশি খরচ করতে উৎসাহিত করতে হবে এই বার্তা দিয়ে যে এখানে সুলভে অনেক জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ঘনঘন মূল্য ছাড় আসছে। এই বার্তা তাদেরকে বারবার এমন জায়গায় বিজ্ঞাপিত করতে হবে, যেগুলো এই দলের সদস্যরা বেশি দেখার কথা। দ্বিতীয় দলের সদস্যদেরকে কিছুটা ভিআইপি মর্যাদা দিয়ে ধরে রাখতে হবে তারা যেন কিছুতেই অন্য দোকানে চলে না যায়– কারণ ওরা ব্যয় করছে বেশি, দোকানে আসছেও বেশি। প্রায়ই বিভিন্ন সময় তাদের উপহার ইত্যাদি দিয়ে খুশি রাখতে হবে। তাদের জন্য উচ্চ গুণাগুণের নতুন নতুন পণ্য আনতে হবে। মেশিন লার্নিং হাজার হাজার ক্রেতার মধ্য থেকে এই প্যাটার্নগুলো উন্মোচিত করে না দিলে কোম্পানি এই দল বিভাজনটি নিখুঁতভাবে বুঝতে পারতো না।

ইচ্ছে করলে এই উদাহরণের গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলো আমরা গ্রাফের চিত্রকল্পে আরো চাক্ষুষ করে তুলতে পারি, বিশেষ করে যেখানে ক্রেতার সংখ্যা বেশি। তাতে গ্রাফে স্পষ্ট দেখা যাবে ক্রেতার তথ্যদুটির প্রতিনিধিত্বকারী বিন্দুগুলো কেমন করে এক এক জায়গায় ঝাঁক বেঁধে একত্র হয়েছে। দুটি স্পষ্ট ঘন সংবদ্ধ ঝাঁক একটি অন্যটির থেকে মোটামুটি আলাদা। সাধারণভাবে একটিতে বিন্দুগুলো ব্যয়ের অঙ্কের দিকেও কম, ভিজিটের অঙ্কের দিকেও কম। অন্যটিতে উভয়টিতে বেশি। গ্রাফটি দেখে কোম্পানি সহজেই তার বহু সংখ্যক ক্রেতার প্রকৃতি তাদের দুই দলের বিভক্তিটি চট্ করে করে বুঝে ফেলবে।

উত্তর না দিয়ে দেয়া মেশিন লার্নিং ট্রেনিঙের আর একটি খুবই ভিন্ন ও খুবই প্রয়োজনীয় উদাহরণ দিই। এটি ব্যাংকে জালিয়াতি ধরে ফেলার জন্য তৈরি একটি মডেলে। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে অনেক টাকা ঋণ হিসেবে তুলে নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যাবার একটি আশঙ্কা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ করে থাকে। তাই এই মডেল চেষ্টা করে কোনো ক্রেডিট কার্ডধারী ব্যক্তি এই কার্ডের ব্যতিক্রমী ও সন্দেহজনক কোনো ব্যবহার করছে কি না তা ধরে ফেলতে। সব ব্যবহারকারীর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের তথ্যাবলী ব্যাংক তথ্যভান্ডার হিসেবে সংরক্ষণ করে। এতে প্রত্যেক ব্যবহারে টাকার পরিমাণ, ব্যবহারের কারণ, ব্যবহারের স্থান, কাল, কত ঘন ঘন ব্যবহার হচ্ছে ইত্যাদি সব তথ্য থাকে। ধরা যাক মডেল আগের উদাহরণের মতোই তথ্যগুলোকে স্পষ্ট কয়েকটি দলে বিভক্ত করে ফেল্লো ওইরকম অংশগুলো বারবার করে গিয়ে। দলগুলো নিম্নরূপ:

দল ১: নিজের শহরেই ব্যবহার করেন, সাধারণত সাংসারিক দৈনন্দিন ব্যয় হিসেবে। দল ২: ঘন ঘন ভ্রমণ করেন বলে বিজনেস ক্লাস বিমান টিকেট কেনেন, বিদেশে দামি হোটেলের ভাড়া দিতে প্রায়ই বড় বড় পরিমাণে ব্যবহার করেন। দল ৩: হঠাৎ বিদেশে থেকে বড় বড় অঙ্কের ব্যয় করেন একই দিনে বারবার প্রধানত স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি কিনতে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকের প্রথম দুটি দল নিয়ে কোনো ভাবনা থাকবে না, তার যত আশঙ্কা হবে তৃতীয় দল নিয়ে– স্পষ্টত এর সদস্যরা দ্রুত অনেক অনেক টাকা ব্যাংক থেকে ওভারড্রাফ্ট ঋণ হিসেবে কার্ড দিয়ে তুলে সহজে কিনতে পারার ও সংরক্ষণ করার মতো সোনার অলঙ্কার ইত্যাদির মতো হালকা জিনিসে পরিণত করে উধাও হয়ে যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এটি আশঙ্কা মাত্র, সত্যি নাও হতে পারে। তবে সাবধানের মার নেই। ব্যাংক এই দলে পড়া যেকোনো একাউন্টধারীর যেকোনো বড় অঙ্কের কার্ড ব্যবহারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করে দিতে পারে। এভাবে হাজার হাজার সৎ একাউন্টধারীদের মধ্যে দু'চারজন সম্ভাব্য

জালিয়াতের ক্ষেত্রে আগাম ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষতি সীমিত করতে পারে। সবই ঘট্ছে একেবারেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ব্যাংকের কোনো মানুষকে এ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় না– সবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা করছে। তার জন্য তথ্যভান্ডারের প্রত্যেক একাউন্টধারী তথ্যের সঙ্গে তার পরিচয়ের লেবেল দিয়ে রাখা বা উত্তর দিয়ে দেয়ার প্রশ্নটিও উঠবে না। শুধু দলে বিভক্ত করেই মেশিন লার্নিং তার উদ্দেশ্য সাধন করছে। এটি লেবেলহীন বা উত্তরহীন বা আন্‌সুপারভাইজ্‌ড এআই ট্রেনিঙের একটি সুন্দর উদাহরণ।

সব কাজের কাজি

আজকের দিনে দুনিয়ার অনেক কাজের কাজিটি হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আরো বিশেষভাবে বল্‌লে মেশিন লার্নিং। এসব কাজের দায়িত্বে মানুষই ছিল, এখনো আছে; কিন্তু মানুষের থেকে অনেক নিখুঁতভাবে করার কারণেই কাজগুলো এই নতুন কাজির কাছে চলে যাচ্ছে। চেহারা দেখে কাউকে চেনা বা কণ্ঠস্বর শুনে কাউকে শনাক্ত করা মানুষ সবসময় করে। আমরা দেখেছি মেশিন লার্নিং সেটি আরো কত সূক্ষ্মভাবে করছে। এমনকি যেখানে মানুষের প্রবেশাধিকারই নেই সেই উদ্ভিদের অশ্রুত কান্নার শব্দ চেনার মতো কাজ করতেও তাকে দেখেছি। এমনি আরো অনেক কাজে তার অদ্ভুত সাফল্য দেখার মতো, অনেক ক্ষেত্রে এটি জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছে অথবা পালটে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব ধরনের কাজ করতে গিয়ে এআই মডেলের চিত্রকল্প হলো নিউরাল নেটওয়ার্ক। অবশ্য সরলতর কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'সিদ্ধান্তের গাছ' কিংবা সরলরৈখিক মডেলের মতো অনেক সোজাসাপটা মডেলেও কাজ হচ্ছে।

সবক্ষেত্রেই মডেলের নিয়ামকগুলোকে, যেমন ওজন বণ্টনকে এমন সর্বোত্তম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় যে, তাতেই পূর্বাভাসের প্যাটার্নটি ভেসে ওঠে। যে অনেক তথ্য থেকে মডেলকে ট্রেনিং দেয়া হয় তাদের সম্মিলিত প্রভাবেই ওই সর্বোত্তম অবস্থাটি সৃষ্টি করে প্যাটার্নটি উদ্‌ঘাটিত হয়। অজানা নতুন ক্ষেত্রের পূর্বাভাসটি আসে এই ঠিক হয়ে যাওয়া প্যাটার্ন থেকেই। নানা ক্ষেত্র থেকে এমনি কাজের কিছু উদাহরণ নেয়া যাক।

চালকবিহীন গাড়ি

যদি একটি উদাহরণের কথা বলি যা মানুষকে সম্প্রতি দারুণ হকচকিয়ে দিয়েছে, তা হলো চালকবিহীন গাড়ি। এই কথাগুলো যখন লিখছি তখন যুক্তরাষ্ট্রের এবং চীনের বড় বড় কিছু শহরে চালকবিহীন ট্যাক্সি অন্যান্য সব গাড়ির মধ্যেই নিয়মিত চলাচল করছে– সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলেস, ফিনিক্স, অস্টিন, আটলান্টা, বেইজিং,

সাংহাই, গুয়াংজু, শেনজেন, উহানে। প্রতিদিন নতুন নতুন শহর এ তালিকায় যোগ হচ্ছে। হয়তো শিগ্‌গির একদিন মানুষ-ড্রাইভার চালিত ট্যাক্সি থাকবে না, হয়তো সেরকম মানুষ চালিত যেকোনো গাড়ির সংখ্যাও মুষ্টিমেয় হয়ে পড়বে।

ওসব শহরে আপনি ফোনে কল দিয়ে এরকম একটি ট্যাক্সি ডাকলে এমন গাড়ি এসে হাজির হবে, যাতে কেউ নেই। আপনি ফোনে টেক্সট করে অথবা মুখের কথায় গাড়িকেই গন্তব্যটি বলে দিলে এটি আপনাকে সব থেকে সহজ পথে সেখানে নিয়ে যাবে। ব্যস্ত নগরীর সড়ক দিয়ে, সব ট্যাফিক সিগন্যাল মেনে, রাস্তার সব চিহ্ন দেখে সব বিপদ এড়িয়ে, সব ট্রাফিক জ্যামে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে এটি আপনাকে গন্তব্যে নামিয়ে দেবে। ভাড়া সাধারণ ড্রাইভার চালিত গাড়ি বা উবারের কাছাকাছি– বরং একটু কমের দিকেই। নিরাপত্তা শত ভাগ, এ পর্যন্ত দেখা গেছে দুর্ঘটনা মানুষ চালিত গাড়ির তুলনায় নগণ্য।

এটি মেশিন লার্নিঙের কীর্তি। যদি কেউ কল্পনা করতো যে প্রোগ্রামাররা সম্ভাব্য সবকিছুর নির্দেশ একবারে দিয়ে কোথায় কী করতে হবে বলে নিয়ম বেঁধে দিয়ে এরকম চালকবিহীন গাড়ির ব্যবস্থা করবেন– সেটি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হতো। কারণ এত অসংখ্য রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যে, তার আগাম প্রোগ্রাম সম্ভব নয়। বরং মেশিন অর্থাৎ কম্পিউটার তার এআই মডেলের সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাস্তব অসংখ্য ড্রাইভার চালিত স্বাভাবিক গাড়ি চালনা থেকে ট্রেনিং নিয়ে শিখেছে বলেই তা সম্ভব হয়ে হয়েছে। ওই তথ্য নিউরাল নেটওয়ার্কে বিশ্লেষণ করে উদ্ঘাটিত প্যাটার্ন থেকে সবকিছুর পূর্বাভাস দিতে পারছে, তাই এ গাড়ি ব্যস্ত রাস্তায় চলতে পারছে।

ধরা যাক রাস্তার পথচারী পারাপারে ফুটপাতের কিনারায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝতে হবে তিনি রাস্তায় নামবেন, না এমনিতেই দাঁড়িয়ে আছেন। এটি তিনি নামার আগেই বুঝতে না পারলে গাড়ি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে ব্রেক কষবে, না যেমনি যাচ্ছেন চলে যাবে। একই ভাবে সামনে খুব কাছাকাছি যে গাড়ি চলছে, বা পেছনের যে গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে তার মতিগতিও আগাম বোঝা খুব দরকার। আবার খুব সাধারণ সব জিনিসের নানা রূপের সঙ্গেও পরিচিতি থাকা চাই– অনেক সময় যা অপ্রত্যাশিতভাবে আসে। কোন্‌টি রাস্তা, কোন্‌টি ফুটপাত, কোন্‌টি সাময়িক ডাইভারশন, সামনে কোন্‌টি দুর্ঘটনা এসব মানুষ ড্রাইভারের পক্ষে বুঝতে পারা নস্যি; কিন্তু চালকবিহীন গাড়ির জন্য আগাম বোঝা খুবই চ্যালেঞ্জিং।

চলার প্রতিমুহূর্তে গাড়ির চোখ-কানরূপী ক্যামেরা-মাইক্রোফোন ইত্যাদি দিয়ে যেসব তথ্য আসছে তার প্রত্যেকটিকে নিউরাল নেটওয়ার্ক প্যাটার্নে দিয়ে আগাম বুঝে

ফেলে সেই অনুযায়ী চল্‌তে হচ্ছে। সেই চোখ-কান হিসেবে খুব সূক্ষ্ম ক্যামেরা তো চারিদিকে থাকেই, সেই সঙ্গে থাকে লেজার সন্ধানী লাইডার, রেডিও সন্ধানী রাডার ইত্যাদিও। সবকিছু থেকে আসা তথ্য নিউরাল নেটওয়ার্কে ফিল্টার হয় বলেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়। ওই যে হাজার চেহারার মধ্যে একটি চেহারাকে চট্‌ করে শনাক্ত করার যে কৌশল তার থেকে খুব আলাদা কিছু নয়, সবকিছু চিনে চলার এই কৌশল।

উদাহরণস্বরূপ মেশিন লার্নিঙে ট্রেনিঙের সময় গাড়ির সফ্‌টওয়্যার– অনেক বাইসাইকেল বিভিন্ন সময়ে এর পাশ দিয়ে গেছে, সামনেও চলে এসেছে– এমন বহু ভিডিও-তথ্য শেখার কাজে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর ফলে এখন বৃষ্টি বা কুয়াশায় কোনো বাইসাইকেল খুব আবছা দেখা গেলেও, অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে খুব দ্রুত পথের মধ্যে উদয় হলেও গাড়ি সময়মতো বুঝতে পারে ওখানে একটি বাইসাইকেল যাচ্ছে– ওই একেবারে রাখাঢাকা চেহারা দেখেই লোক চিনে ফেলার মতো। এক্ষেত্রে আবছা আলোতে ক্যামেরা যেখানে অত সংবেদী নয়, সেখানে লেজারের লাইডার সেন্সর হিসেবে ভালো কাজ করে। ক্যামেরা, লাইডার, রাডার সব সেন্সর থেকে আসা তথ্যকে একত্র মিশিয়ে বেশ জটিল পরিস্থিতিকেও শনাক্ত করা সম্ভব হয়। নিউরাল নেটওয়ার্ক যেন একটি গভীর বুদ্ধির কাজ করে– মানুষ ড্রাইভার মাথা খাটিয়ে যেভাবে বুঝতে পারে, অনেকটা সেভাবে।

গাড়ির নিজের অবস্থানটি প্রতি মুহূর্তে নির্ণয় করতে হয়। এজন্য রাস্তার একটি ডিজিটাল ম্যাপ সফ্‌টওয়্যারে দেয়া থাকে। চলার সময় গাড়ি আশেপাশের বিভিন্ন দালান, স্থাপনা, বিলবোর্ড ইত্যাদি যেসব বিশিষ্ট জিনিস দেখতে পায় তার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সে ওই ম্যাপকে মেলায়। এই মেলানোর কাজটিও মেশিন লার্নিঙের। এই শহরে ঘুরে ঘুরে ড্রাইভার চালিত গাড়ির ভিডিও-তথ্যের ওপর ট্রেনিঙের সময়েই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল ম্যাপের কোন জায়গার সঙ্গে দেখা কোন্‌ দালানটি মিলবে। এটি তাই এখন মডেলের অতি চেনা।

আরো বড় কাজ হলো অন্য গাড়ি, সাইকেল, পথচারী এমন সম্ভাব্য সবার পরবর্তী গতিবিধিগুলোর পূর্বাভাস পাওয়া। এতে ওই মুহূর্তের ঠিক আগে তাদের বেগ, দিক ইত্যাদি নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা প্রয়োজন। যেমন এই সাইকেলটি কি এখন বামে ঘুরতে যাচ্ছে? ফুটপাতের কিনারায় এই পথচারী কি এখন রাস্তায় নামবেন, তিনি কি থেমেই যাবেন? নাকি তাঁর রাস্তায় নামার ইচ্ছেটা আছে এখনো? এমনি ধরনের প্রশ্নের উত্তরের সিদ্ধান্ত ঠিক সময় নিতে না পারলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। এসব ক্ষেত্রে মেশিন লার্নিঙের কিছু কিছু বিশেষ রূপ ব্যবহার করা হয়, মূল

ব্যাপারটি কিন্তু একই থাকে। যেমন আগে চলাচলে যে তথ্য ট্রেনিঙে পাওয়া গেছে, তাতে এমনি সাইকেল আর এমনি পথচারীর নানা মনোভাব, ভঙ্গি সবই রয়েছে। ওদের থেকে নিউরাল নেটওয়ার্কের ওজন বিন্যাসের যে প্যাটার্ন স্থায়ী হয়ে গেছে প্রতিটি নতুন অবস্থার পূর্বাভাস তাতেই ধরা পড়ছে। এমনিভাবে যত রকম পরিস্থিতি হতে পারে তার সবেরই পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

ট্রেনিঙে ওই নগরীর সাধারণ পরিস্থিতিগুলোও নিউরাল নেটওয়ার্কের হিসেবের মধ্যে এসে গেছে– কর্মদিনে, বা ছুটির দিনে কোন্ রাস্তায় কেমন জ্যাম হয়, বিকল্প রাস্তা হিসেবে কোন্‌টি ভালো হয় সবকিছু। নগরীর ভেতরে বা বাইরে মহাসড়কগুলোর ক্ষেত্রেও তাই। গাড়ি চালানোর যত আইনকানুন আছে, চিহ্নের মাধ্যমে রাস্তার বিভিন্ন বিপদসংকেত, কীরকম মোড়ে কোন্ দিক থেকে আসা গাড়িকে অগ্রাধিকার দিতে হয়, কোথায় অবশ্যই থেমে যেতে হয়, এগুলো মানুষ-ড্রাইভার চালিত গাড়ির হাজার হাজার ঘণ্টা চালনার ভিডিও থেকে ট্রেনিঙে ব্যবহার করা হয়েছে।

অবশ্য স্বয়ংক্রিয় গাড়ির সবকিছু যে মেশিন লার্নিং সংক্রান্ত, তা নয়। গাড়ির নিয়ন্ত্রণ, ডানে বামে যাওয়া, ব্রেক কষা, গতি বাড়ানো-কমানো ইত্যাদির জন্য সাধারণ কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলগুলোই যথেষ্ট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন নেই। যেমন গাড়ি সবসময় নিজের লেইনের রেখা বরাবর রাখার দায়িত্ব ক্যামেরার মাধ্যমে রেখা দেখে ওই ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয় সংশোধন ব্যবস্থাকে দেয়া যায়।

অনেক কিছু সরাসরি কম্পিউটার প্রোগ্রামিঙের দ্বারাই করা যাচ্ছে। যেমন লাল আলোতে থামা; বড় রাস্তার সঙ্গে সমকোণে ক্রসিঙে মিলেছে সেই ‘স্টপ’ চিহ্নে থেমে দেখা বড় রাস্তায় কোন গাড়ি যাচ্ছে কিনা; পেছনে এ্যাম্বুলেন্স থাকলে একেবারে ফুটপাত ঘেঁষে এক পাশে সরে গিয়ে প্রায় থেমে যাওয়া, ওটি পার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। এইসব নিয়ম প্রোগ্রামাররা কোডিং করে দিয়েছে গাড়ির কম্পিউটারে। ওটির নির্দেশ মেনেই এসব করা যায়– এআইয়ের দরকার হয় না। তবে যেহেতু রাস্তার সম্ভাব্য অসংখ্য ঘটনার আগাম কোডিং সম্ভব নয়, কাজেই আজকের চালকবিহীন গাড়ির প্রধান কৃতিত্ব মেশিন লার্নিঙের।

কিন্তু মেশিন লার্নিং যদি কোনো বিরল কারণে ব্যর্থ হয়, কম্পিউটার কোডিং করা নিয়ম-বাঁধা নির্দেশগুলোও যদি ব্যর্থ হয়, তখন চালু হয় শেষ মুহূর্তের নিরাপত্তা। ওটিও অবশ্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম। যেমন কোনো অদ্ভুত কারণে ওই স্টপ চিহ্নিত ক্রসিঙে গাড়ি থামতে চাচ্ছে না, এগিয়ে যাচ্ছে। তেমনটি ঘটার উপক্রম হলে তাহলে

এই শেষ সতর্কতা বাকি সব নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে গাড়িকে থামিয়ে দেয়। এ পর্যন্ত সবদিক থেকে স্বয়ংচালিত এই গাড়ি ড্রাইভার চালিত গাড়ি থেকে বেশি নিরাপদ দেখা গেছে। মানুষ চালক বেপরোয়া হতে পারে, খামখেয়ালি হতে পারে, ঘুমিয়ে পড়তে পারে– মেশিন লার্নিং আর কম্পিউটার প্রোগ্রামের তা হবার সুযোগ নেই।

রোবট সহকারী

মানুষের রোবট সহকারী হয়ে যন্ত্র কাজ করছে বহুদিন ধরে। এক সময়ের একেবারে স্প্রিঙে দম দেয়া যান্ত্রিক পুতুলের মতো থেকে শুরু করে, প্রোগ্রাম করা ডিজিট্যাল কম্পিউটার চালিত রোবট পর্যন্ত এর দীর্ঘ ইতিহাস ও প্রকারভেদ। কিন্তু মেশিন লার্নিং যুক্ত হবার পর থেকে এর মধ্যে গুণগত পরিবর্তন এসেছে– এরা এখন বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। এই শেষের রোবটদের পরিচালনা ওই চালকবিহীন গাড়ির থেকে খুব ভিন্ন নয়। সহকারী হিসেবে আজকের রোবটরা হাসপাতালের মেডিক্যাল কর্মী বা বাড়ির পরিচারিকা হওয়া থেকে শুরু করে অফিসের অভ্যর্থনাকারী বা তথ্যদাতা হিসেবে অহরহ কাজ করছে– প্রায়শই বেশ বন্ধুসুলভ মানব-মানবীর অবয়বে। গাড়ির মতোই ওরা ওদের চারপাশের সবকিছুকে অনুধাবন করতে পারছে ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, স্পর্শ-সেন্সর, লেজার উদ্‌ঘাটক (লাইডার) ইত্যাদির মাধ্যমে।

এভাবে নানা পরিস্থিতিতে যা দেখলো, শুনলো, স্পর্শ করলো তার বড় তথ্যভান্ডার থেকে ট্রেনিং পাওয়া নিউরোন নেটওয়ার্ক যখন নতুন কিছু দেখে, শোনে বা স্পর্শ করে সে অনুযায়ী প্যাটার্ন থেকে তার সম্পর্কে পূর্বাভাস পায় এবং পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সেই ভাবে বিক্রিয়া করে।

এই যে অনুধাবন, এই যে বিক্রিয়া, এসব খুব সাধারণ কাজের জন্যও হতে পারে। যেমন একটি বুদ্ধিমান ভ্যাকুয়াম ক্লিনার সারা ঘর ঘুরে ঘুরে ধুলাবালি পরিষ্কার করছে, আসবাবপত্রে বাধা পেলে সরে যাচ্ছে, বরং আসবাবগুলোও পরিষ্কার করছে, ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে গেলে নিজেই বিদ্যুৎ সকেটে গিয়ে সংযুক্ত হয়ে চার্জ নিয়ে নিচ্ছে– এ এখন সাধারণ দৃশ্য। আবার উন্নততর রোবট এখন মানুষের অবয়বে আবাস বা বাসায় কাজ করছে, কোথাও প্যাকেট ডেলিভারি দিয়ে আসছে– প্রাপকের চেহারা দেখে নিশ্চিত হয়ে হাতে হাতে দিয়ে আসছে। গাড়ির মতো এরাও পাওয়া সব সিগন্যালকে সমন্বিত করতে শেখে। যেমন বেশি আলোতে কিংবা আবছা আলো-আঁধারে কখন কোন্ পরিবেশে ক্যামেরা নাকি লাইডারের ওপর বেশি ভরসা রাখতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

যেমন মনে করি হাসপাতালের রোবট-কর্মী রুগীর জন্য তার ওয়ার্ডে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে। এরকম কাজের জন্য হাসপাতালের করিডর, সিড়ি, কামরা, স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সবকিছুর ম্যাপিং ওই রোবটের কাছে আছে– তার কম্পিউটারে, মেমোরিতে। এর মধ্যে স্বাভাবিক সময়ে ওসব জায়গায় যা ঘটে– নার্সদের ও ভিজিটরদের আনাগোনা, বড় ট্রলি ঠেলে নিয়ে যাওয়া, হুইল চেয়ারে রুগী নিয়ে যাওয়া– এসব ঘটেছে এবং তা সব আগে থেকে নির্ধারিত নয়। আমাদের রোবট ওষুধবাহীকে এসবের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। এর ভেতরে তাকে চলতে হবে, থামতে হবে, পাশ কাটাতে হবে, কামরার দরজা খুলতে হবে। মেশিন লার্নিঙের বদৌলতেই এটি এর প্রত্যেকটির পূর্বাভাস দিয়ে সেভাবে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এমনকি এ রোবট কোনোকিছু ধরলে কত শক্ত বা নরমভাবে ধরবে সেই সিদ্ধান্তটিও এরকম পূর্বাভাস থেকে আসতে হয়, নইলে শুধু জিনিসপত্রের ক্ষতি নয়, মানুষের শরীরেও ক্ষত হতে পারে।

মানুষের সঙ্গে প্রায় মানুষের মতো আচরণ করতে পারার দিকটিই হলো রোবট সহকারীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। এদিকটি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের কথার অনুধাবন এবং অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি ইত্যাদি থেকে তার অবস্থার পূর্বাভাস দিয়ে সে অনুযায়ী বলতে ও করতে পারছে রোবট। যেমন নির্দেশের স্বরে যদি কেউ কিছু বলে তাহলে 'জি আচ্ছা, এক্ষুণি করছি' বলা; আবার অন্তরঙ্গ বন্ধুসুলভ কিছু অনুরোধ করলে বলা 'তোমার জন্য অবশ্যই করবো'– এই যে কথার স্বরের বা টোনের পার্থক্য করতে পারা যেমন একটি মানব-সদৃশ প্রতিক্রিয়া তেমনি আরো অন্য প্রতিক্রিয়ায় আরো জরুরি বিষয়ও আছে। হাসপাতালে রুগি হাঁচি কাশি দিচ্ছে রোবট সহকারী সঙ্গে সঙ্গে তাকে রুমাল, পানি এগিয়ে দিচ্ছে, আলগোছে কাঁধে হাতে রাখছে এগুলো এখন মেশিন লার্নিঙের বুদ্ধিতে সম্ভব। অনুরূপ ধরনের অসংখ্য তথ্য থেকে ট্রেনিং নেবার ফলেই এসব সম্ভব হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের আগেও কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত-রোবট ছিল কিন্তু এগুলো সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামিঙের কারণে সুনির্দিষ্ট কাজই করতে পারতো– নির্দিষ্ট পথে চলা, বাধা পেলে ঘুরে যাওয়া, বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট মৌখিক নির্দেশে নির্দিষ্ট কাজ করা। ওতে নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার কোনো ব্যবস্থা থাকতো না। মেশিন লার্নিং ব্যবহারের পর এ রোবট বদলে গেছে। এখন তাদের মানব-সদৃশ আচরণ নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যই। বাস্তবে সত্যি সত্যি ব্যবহৃত হয়ে বেশ পরিচিত হয়েছে এমন কিছু এআই রোবট সহকারীর কথা বলা যাক।

পীপার রোবট– পাবলিক সহায়তার জন্য: সুপারমার্কেট, ব্যাংক, শোরুম, বিমানবন্দর এমনি সব জায়গায় গ্রাহকদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নানা রকম সেবা দেবার এই রোবট সহকারী জাপান ও ইউরোপে বেশ কিছু সংখ্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যেক জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট তথ্য, নির্দিষ্ট রকম সেবা ব্যবহার করে এগুলোর বিভিন্নটিকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে– তাই সে কাজগুলো ভালো পারে। সৌজন্যমূলক কিছু আলাপ করা, তথ্য দেয়া, প্রশ্নের উত্তর দেয়া– যেমন সুপারমার্কেটে রান্নার সরঞ্জাম কোন্ তলায় পাওয়া যাবে, লিফ্‌ট কোন্ দিকে এমনি কিছু। ব্যাংক ইত্যাদি জায়গায় গ্রাহকদের যাঁরা প্রায়ই আসেন, তাঁদের চেহারা মনে রেখে নাম ধরেই সে স্বাগতম জানায়।

টেমি রোবট– অফিস সহকারী: রোবটটি যে জায়গায় কাজ করে, সেখানকার ভেতরের ম্যাপিং নিজের মেমোরিতে থাকে বলে উপরিওয়ালাকে অফিসের নানা জায়গায় সে অনুসরণ করতে পারে, তাঁর থেকে মৌখিক নির্দেশনা নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে। সাধারণত নানা তথ্য দেয়া, কম্পিউটার থেকে নানা ডকুমেন্ট বের করে দেয়া, নানা এ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়া এসবই কাজ। তবে হালকা ওজনের কাগজের ফাইলও নাড়াচাড়া করে সাজাতে পারে, বহন করতে পারে।

মক্সি রোবট– হাসপাতাল সহকারী: হাসপাতালে সঠিক জায়গার মধ্যে ওষুধ, টেস্ট স্যাম্পল ইত্যাদি আনা নেয়াটাই প্রধান কাজ। এজন্য দীর্ঘ জটিল পথের সব পরিস্থিতি সামাল দিয়ে চলতে পারে। এই রোবট ব্যবহার করার ফলে হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ আরো জরুরি চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ করার বেশি সময় পাচ্ছে।

স্ট্রেচ রোবট– গুদামের শ্রমিক: এরা ট্রাক থেকে মাল নামিয়ে সেগুলো বাছাই করে বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার বিভিন্ন কনভেয়ার বেল্টে তুলে দিতে পারে। ছোট বাক্সকে কীভাবে নাড়াচাড়া করবে, বড় বাক্সকে কীভাবে করবে, খুব ভারিগুলোকেই বা কীভাবে, তা বুঝতে পারে বাক্সটিকে দেখে ও একটু নাড়িয়ে দেখে। বড় সুবিধা হলো মানুষ-শ্রমিকের মতো ক্লান্ত বা আহত হবার সুযোগ সেইভাবে নেই।

কারখানায় উৎপাদনে মেশিন লার্নিং

বেশ কিছুদিন ধরে রোবট-শ্রমিকরা উন্নত বিশ্বের কারখানায় উৎপাদনের কাজ করছে– সেগুলোতে এআই ছিল না। এআই এসে পুরো ব্যাপারটি অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। এখন শুধু হাতিয়ার বা যন্ত্র চালনায় নয়, কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থায় সবক্ষেত্রে রোবট-শ্রমিক কাজ করছে। রোবট শ্রমিক এখন রোবট বলতে যে কথা মনে পড়ে, সেইরকম একেবারে জড়যান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্ট কাজ করছে না, বেশ একটু

এদিক ওদিক ছোট ছোট সমস্যা সমাধান করতে করতে কাজ করে– যেমন কিছু সরে গেলে ঠিক করে দেয়, কিছু পড়ে গেলে বুঝতে পেরে উঠিয়ে নেয়। মেশিন লার্নিং পরিস্থিতি বুঝে যে পূর্বাভাস দেয়, সেটি রোবটের হাতকে বা শরীরকে সঠিকভাবে চালনা করতে থাকে। উৎপাদনে ত্রুটি নির্ণয়ে কাজটিও নিখুঁতভাবে করতে পারছে। যেমন সদ্য তৈরি একটি স্মার্টফোনের স্ক্রীনে সামান্যতম ক্ষুদ্র একটি আঁচড়ও তা উদ্‌ঘাটন করে ফেলতে পারে, এবং চট্ করে সরবরাহ লাইন থেকে ফোন্‌টিকে সরিয়ে ফেলতে পারে।

কারখানার ফ্লোরে উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বড় কাজ হলো যন্ত্রপাতির কোথাও কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বিকল হবার উপক্রম হলে কোথায় হচ্ছে তা দ্রুত নির্ণয় করা এবং সময়মত তা মেরামত ও বদলানোর কাজ করা, যাতে উৎপাদন প্রবাহ যথাসম্ভব অব্যাহত রাখা যায়। এজন্য নিউরাল নেটওয়ার্ককে অতি সূক্ষ্ম সব আলামত আগে থেকে বুঝতে হয়– বড় যন্ত্রের গভীরে কোথাও সামান্য শব্দ, কম্পন, উত্তাপ পরিবর্তন ইত্যাদি ওখানে লাগানো সেন্সর থেকে বুঝে নিতে হয়। আগেই এসবের বহু রকম বৈচিত্রে বিশাল তথ্যভান্ডার গড়া রয়েছে বলে তার থেকে ট্রেনিং প্রক্রিয়া এগুলোর পূর্বাভাস দিয়ে কোথায় কোন্ যন্ত্র কী হারে বিকল হবার উপক্রম হয়েছে তা বুঝে ফেল্‌তে পারে; এবং যথাসময়ে সঠিক জায়গায় সতর্কবার্তা পাঠিয়ে তার প্রতিকার করতে পারে।

উৎপাদনের নজরদারিটি কারখানার ফ্লোর পর্যায়ে একটি বড় কাজ– মানুষ-সুপারভাইজার থেকে এ কাজও এআই বেশ কিছুটা নিয়ে নিতে পারছে। কারখানার বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোন একটিতে যদি উৎপাদন হার ধীর হয়ে পড়ে তার প্রভাব অন্যান্যগুলোকেও ধীর করে ফেলে। এমনটি ঘটলে মেশিন লার্নিং সঙ্গে সঙ্গে টের পায় ঠিক কোন্ জায়গায় কী কারণে তা হচ্ছে। নানা কনভেয়ার বেল্টের ওপর উৎপাদিত বস্তুগুলোর সংখ্যা ও তাদের চলাচল অগ্রগতি মেপে নিউরাল নেটওয়ার্ক বুঝে ফেলে সমস্যাটি কোন্ জায়গায়। এর যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এটি চেষ্টা করে সবকিছুকে সর্বোত্তম অবস্থায় রাখতে। এরকম সর্বোত্তম পরিস্থিতিতে ধরে রাখার জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক যে খুবই উপযুক্ত, তা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। কাঁচামাল, এনার্জি, সময় ইত্যাদির অপচয় যেন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায় সেটিও এ ধরনেরই একটি কাজ।

উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশাল পরিবর্তন আনার সুযোগ এভাবে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের বেকারত্বের সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক আরো কিছু কারণে এর পুরো সম্ভাবনা এখনো পুরাদমে বাস্তবায়িত না হলেও, শিগ্‌গির যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে তার

বেশ কিছু উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে এআই অনেক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার কয়েকটি দেখা যাক।

তেস্‌লা কোম্পানির গাড়ির গিগা ফ্যাক্টরি (অস্টিন, টেক্সাস, যুক্তরাষ্ট্র): এখান থেকে তেসলার কয়েকটি মডেলের ইলেকট্রিক গাড়ি তৈরি হচ্ছে। মেশিন লার্নিংসমৃদ্ধ রোবট-কারিগররা গাড়ির প্রতিটি অংশ খুব সূক্ষ্মভাবে চেক করে, অংশগুলো একটির সঙ্গে আর একটি জুড়ে তার কার্যক্ষমতাও পরীক্ষা করে। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম অবস্থায় রাখতে এরাই কাজ করছে। এজন্য এসব রোবট-কারিগরের নিউরাল নেটওয়ার্কের যে ট্রেনিং তাও এখানে নিজের উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট তথ্যভান্ডার থেকে তথ্যের ভিত্তিতে দেয়া হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি বা ধীর গতি যেন নিজ থেকেই সংশোধিত হতে পারে, সেজন্য শেষ প্রান্তে সরবরাহের সময়কার নিয়ামকগুলোকে ঘুরিয়ে আবার শুরুতে নিয়ে আসা হয় একটি ফীডব্যাক লুপের মতো ব্যবস্থায়। ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এমন ফীডব্যাক লুপ নিজেই নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে। মানুষ-কারিগর একেবারে বাদ যায়নি– উভয়ের মিশ্র ব্যবস্থায় উৎপাদন চল্‌ছে।

সীমেন্স ইলেকট্রনিক ওয়ার্কস (অ্যামবার্গ, জার্মানি): বহু রকমের ইলেকট্রনিক ডিভাইস এখানে তৈরি হয় উৎপাদন ব্যবস্থা অনেকটাই স্বয়ংক্রিয়। যেসব উৎপাদন যন্ত্র তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে অসংখ্য সেন্সর যা প্রত্যেকটি কাজে কড়া নজর রাখছে, এবং যেকোনো ব্যত্যয় ধরে ফেল্‌ছে। এই স্বয়ংক্রিয়তার অনেকটাই মেশিন লার্নিঙের কল্যাণে। উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়ায় যে বিপুল তথ্য তৈরি হচ্ছে, তার বিশ্লেষণ সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। মেশিন লার্নিঙের ট্রেনিং প্রক্রিয়াতেও এসব তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

বোশ্‌ কোম্পানির স্মার্ট কারখানা: একই কোম্পানির এরকম কারখানা প্রধানত জার্মানিতে বেশ কিছু জায়গায় রয়েছে । এগুলোতে মোটরগাড়ির অংশ, নানা রকম সেন্সর থেকে শুরু করে বাড়িতে ব্যবহার্য নানা বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম তৈরি হয়। মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে সবকিছুর উৎপাদনকে সর্বোত্তম অবস্থায় রাখা হয়। যেকোনো ব্যত্যয়ী ঘটনার পূর্বাভাস এভাবেই পাওয়া যায়– যেমন কোন অংশে এনার্জি খরচে অপচয় হচ্ছে কি না বা কাঁচামাল ব্যবহারেও কোনো অপচয়। ফলে ক্ষতি হবার আগেই এগুলো শুধরে নেয়া যায়। সবকিছু কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে কোথাও উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন নতুন কৌশল বা নতুন উন্নয়ন সম্ভব হলে তাকে অন্য কারখানায়ও তাৎক্ষণিকভাবে চালু করার সুবিধা হয়।

কারখানায় আদ্যোপান্ত ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম রাখার জন্য যা করা শুরু হয়েছে, সেটি এখন সেবা খাতেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যেমন আধুনিক ব্যস্ত বিমান বন্দরে বিশাল সংখ্যক যাত্রী ও বিপুল পরিমাণে কার্গোর ব্যবস্থাপনাকে এখন কৃত্রিম

বুদ্ধিমত্তার সাহায্যেই সুসমন্বিত ও সর্বোত্তম অবস্থায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। একই সঙ্গে ওতে কোন এক বা একাধিক সিস্টেমে অকার্যকর অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বা দুর্ঘটনা দেখা দেয়াটিকে একেবারে ন্যূনতমে নামিয়ে আনতে পারছে মেশিন লার্নিং।

ব্যবসায়িক বা অন্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

ব্যবসার ক্ষেত্রে মেশিন লার্নিং ব্যবহার একটি ব্যবসা প্রকল্পের একেবারে কৌশলগত পরিকল্পনা থেকেই শুরু হয়। এরকম পরিকল্পনার জন্য প্রাসঙ্গিক পণ্য বা সেবার চাহিদার পূর্বাভাস পাওয়া, এ নিয়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রেক্ষিত রচনা করে দেখা জরুরি। এসব কাজে নিউরাল নেটওয়ার্ক চমৎকার ভূমিকা রাখে। তাছাড়া ব্যবসার প্রতিটি কার্যক্রমকে সর্বোত্তম দক্ষতার মধ্যে রাখার ব্যাপার তো রয়েছেই। উদাহরণস্বরূপ সুলভে সবরকম পণ্য বিপণনের কোম্পানি ওয়ালমার্টের অসংখ্য দোকানের মধ্যে সংযোগকারী নেটওয়ার্ক এগুলোকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা সহজ করে দিয়েছে। প্রতিটি দোকানে কোন্ সময় কী কী আইটেমের কীরকম স্টক গড়ে তুলতে হবে তার আগাম পরিকল্পনা এক জায়গাতেই হতে পারছে– সবখান থেকে তথ্য এনে। চাহিদা ও স্টকের পরিমাণের ভিত্তিতে পূর্বাভাস নিয়মিতভাবেই এআই দিয়ে যেতে পারে।

মেশিন লার্নিং খুবই উপযোগী হয়ে পড়ে যখন ব্যবসার আর্থিক পরিচালনায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণ নেয়ার যোগ্যতা, জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন, যেকোনো ব্যতিক্রম সম্ভাবনা ইত্যাদি নির্ণয় করার কাজগুলো সামনে আসে। এসব ক্ষেত্রে শুধু মানুষ ব্যবসা-পরিচালকের মাথা খাটানোর থেকে বরং স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিন লার্নিঙের ওপর নির্ভর করাকে প্রায়ই বেশি উপযোগী মনে করা হয়। হিসাবরক্ষণ ও অডিটের মধ্যেও বিষয়টির অগ্রগণ্যতা রয়েছে। সরাসরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান না হয়েও আরো বহু রকম প্রতিষ্ঠান চালনার ক্ষেত্রে এসব বিষয় প্রযোজ্য।

এইসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন নিয়মিত যে কাজগুলো পৌন:পুনিকভাবে করতে অনেক মানুষ ব্যস্ত থাকেন, সেসব কাজে সহায়তায় এআই এগিয়ে আসতে পারছে। যেকোনো সভার কার্যবিবরণী লেখা, বর্ণনা করে বা ফরম পূরণ করে রিপোর্ট তৈরি এবং তা যথাস্থানে উপস্থাপন করা, রিপোর্টের সারমর্ম করা, এমনিতরো নানা রকম কাজের জন্য এআই এখন হাতের কাছেই রয়েছে। অন্যদিকে উচ্চতর নীতি নির্ধারণে বিভিন্ন বিকল্প তৈরি করা, সেখানে থেকে সর্বোত্তম বিকল্পটি বেছে নেয়ার মতো অতি জরুরি কাজও এআই করছে। যদিও শেষ অবধি মানুষ-কর্মকর্তা এসব অনুমোদন করবেন, তা তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেয়া এখন বুদ্ধিমানের কাজ। বড় ছোট

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দপ্তর, অধিদপ্তর, সচিবালয়, ইত্যাদি নানা কিসিমের যে মহাকর্মযজ্ঞ তার প্রকৃতি যে এর ফলে দারুণভাবে বদলে যাবে, সেটি প্রায় নিশ্চিত।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা

রোগ নির্ণয়ঃ চিকিৎসার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে যে বিষয়টি সব থেকে সামনে আসছে, তা হলো মেডিক্যাল ইমেজের তাৎপর্য অনুধাবন। রোগ নির্ণয়ে এখন নানা রকম ইমেজিং ব্যবহার হচ্ছে, যেসব কি না শরীরের অভ্যন্তরের তাৎপর্যপূর্ণ ছবি। এভাবে সাধারণ এক্সরে-তে দ্বিমাত্রিক ছবি, সিটি স্ক্যানে চারিদিক থেকে এক্সরে ছবি নিয়ে তার ত্রিমাত্রিক রূপ কম্পিউটারের সাহায্যে গড়ে তোলা, এম আর আইতে আরো সূক্ষ্ম নাজুক পরিবর্তনের পরিস্থিতি নিয়ে সূক্ষ্ম তথ্যসম্পন্ন ত্রিমাত্রিক ইমেজ পাওয়া যায়। ইমেজগুলো পাওয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো কী নির্দেশ করছে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারাও রোগ নির্ণয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রক্ত, মূত্র ইত্যাদি নানা নমুনা থেকে পরীক্ষা করে যা পাওয়া যায়, বা বিশেষ টিশ্যু পরীক্ষা করে তার বিশ্লেষণ, যা তথ্য অথবা ছবি হিসেবে পাওয়া যায়– ওসবেরও ব্যাখ্যা করতে পারাটাও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ডাক্তার তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে এটি করেন। এখন মেশিন লার্নিং এ কাজ তাঁর চেয়েও দ্রুত ও নিখুঁতভাবে করছে।

মেশিন এটি পারে, কারণ অসংখ্য রুগীর ক্ষেত্রে ইমেজ তথ্য ও তার যে ব্যাখ্যা এসেছে সেগুলো থেকে সে ট্রেনিং পেয়েছে। প্রকারান্তে সেও কোনো একজন মানুষ-ডাক্তারের থেকে অনেক বেশি রুগীর ক্ষেত্রে তার ট্রেনিঙের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করছে। নিউরাল নেটওয়ার্ক এই তথ্যে থাকা সবকিছুর সমন্বয়ে নিজের চূড়ান্ত ‘ওজন’ বণ্টন পেয়ে যায়। এখন নতুন রুগীর ক্ষেত্রেও ইমেজ তথ্যগুলো নিউরাল নেটওয়ার্ককে দিলে ওই চূড়ান্ত বণ্টনের ওজনগুলো দিয়েই প্রসেসিং হয়ে নেটিওয়ার্কের আউটপুট বলে দেবে ইমেজের কোন্ অংশ কী বলার চেষ্টা করছে। মনে রাখতে হবে সব ছবির মত এই ইমেজগুলোকেও আলোর ফোটার পিক্সেলে ভাগ করে ফেলে তার প্রত্যেকটির আলোর তীব্রতার মানের যে সংখ্যা সেগুলোকেই নিউরাল নেটওয়ার্ক ইনপুট হিসেবে নেয়। নেটওয়ার্ক, তথ্য, সবই গাণিতিক রূপে আছে। আর গাণিতিক কাজের মাধ্যমেই রোগ নির্ণয়ের ফলাফলটি আসে; যদিও শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী ভাষায় অনুবাদ হয়েই।

মানুষ-ডাক্তার পাশ করে ডাক্তারী লাইসেন্স পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ইমেজ দেখে মতামত দেবার জন্য বিশেষজ্ঞের লাইসেন্স পেয়েছেন। কাজেই তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত বলে স্বীকৃত। কিন্তু এআই যখন একই ব্যাপারে তার মতামত দেয় সেটিও ওভাবে গ্রহণযোগ্য হবে কি না। এআইয়ের বিশেষ বিশেষ

মডেলের সফ্‌টওয়্যার রোগ নির্ণয়ে এমন সাফল্য দেখিয়েছে যে সেগুলোকে তাদের কাজের অনুমোদন দিয়েছে সর্বোচ্চ অনুমোদন কর্তৃপক্ষ। উদাহরণ হিসেবে প্রোস্টেট ক্যানসারের পূর্বাভাস দেবার মডেল পাইজ এআই যুক্তরাষ্ট্রের মেডিক্যাল অনুমোদন দেবার কর্তৃপক্ষ এফ ডি আইয়ের অনুমোদন পেয়েছে। প্রোস্টেট থেকে টিশ্যু নিয়ে তার যে কোষকলা বিশ্লেষণের তথ্য তার কোন্‌টি ক্যানসার নির্দেশক, কোন্‌টি তা নয়, সেই তথ্য মিলে বহু রুগীর থেকে পাওয়া তথ্যভান্ডার এই মডেলের ট্রেনিঙে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে নতুন রুগীর ক্ষেত্রে ফলাফলের পূর্বাভাস এটি দিতে পারে। কোষকলা বিশ্লেষণে ফলাফলটি পাওয়া মোটেও সোজাসাপটা কিছু নয়– বেশ জটিল। ওই জটিলতা থেকেই মডেল সেই পূর্বাভাস বের করে আনে– বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যেভাবে মেধা খাটিয়ে সেটি আনেন।

ইমেজ, স্ক্যান, টিশ্যু-স্লাইড ইত্যাদির তথ্য থেকে রোগ নির্ণয়ের মধ্যেই কিন্তু এআই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ নেই। এছাড়াও রোগের সাধারণ সব লক্ষণ থেকে ডাক্তার যেভাবে রোগ নির্ণয় করেন, এআইও তা করতে পারে। সাধারণত গায়ের উত্তাপ, রক্তচাপ, হার্ট স্পন্দন-হার, জিহ্বা-চোখ-ত্বকের রং, রুগী অনুভব করেন এমন কোনো ব্যথা বা অনুভূতির তথ্য, এবং আগে থেকে করা আছে এমন কোনো টেস্টের ফলাফল (যেমন রক্তকণিকার গণনা), মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানদের দেয়া রিপোর্ট, এক একজন রুগীর ক্ষেত্রে এসবই তথ্য। এমনি অনেক রুগীর প্রত্যেকের তথ্য এবং তাঁর নির্ণিত রোগের তথ্য থেকে এআই নতুন রুগীর রোগ নির্ণয় করতে পারে। ওই তথ্যগুলো দিয়ে নিউরাল নেটওয়ার্কের ট্রেনিং হয় বলেই তাতে নতুন রুগীর তথ্য থেকে রোগের পূর্বাভাস দেবার সক্ষমতা আসে। তথ্যগুলো সারণির আকারে সাজিয়ে নিউরাল নেটওয়ার্ককে দিলেই হলো। মডেল তার পূর্বাভাসে রোগের নাম বলে দেবে। আসলে রোগের লক্ষণের তথ্যগুলো কিছু প্রশ্নের আকারে সাজিয়ে দেবার ও সেগুলোর উত্তর দেবার ব্যবস্থা রেখে একে একটি অ্যাপের আকারে উপস্থাপিত করা যায়, যা স্মার্টফোনেই থাকতে পারে। এমনি একটি ফোন দিয়েই শত শত মানুষের রোগ নির্ণয় করা যায় মুহূর্তের মধ্যে। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে যেখানে ডাক্তার নাই এমন জায়গায় মানুষের রোগ আন্দাজের এটি চমৎকার ব্যবস্থা। তার ওপরে রুগী থেকে ওই লক্ষণের তথ্যগুলো পেতে যদি ফোনের সঙ্গেই নানা সেন্সর থাকে, তাহলে তথ্যগুলো সরাসরি অ্যাপে চলে যেতে পারে। রুগীর শরীরের উত্তাপ, রক্তচাপ, নাড়ি স্পন্দন-হার ইত্যাদি মাপার সেন্সর স্মার্টফোনে যোগ করা কঠিন নয়। এমনকি এক ফোঁটা রক্ত থেকে কিছু কিছু রক্তের পরীক্ষাও এআইয়ের সাহায্যে সেন্সর করতে পারে।

রোবট সার্জন: রোবট সার্জন রুগীর দেহে অস্ত্রোপচার করছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই, সাধারণত মানুষ সার্জনের উপস্থিতিতেই। নিয়ন্ত্রণটি তখন মানুষ সার্জনের হাতেই থাকতো। আগে প্রোগ্রাম করা কম্পিউটার রোবট সার্জনের প্রতিটি কাজ চালনা করতো, সবরকম অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি প্রোগ্রামে আনা সম্ভব নয় বলে তার নির্ভুলতা নিশ্চিত হতো না। এখন মেশিন লার্নিং সার্জনের ছুরির সঙ্গে ক্যামেরা ও সেন্সর প্রতিটি অবস্থায় এরপর কী আসছে, ছুরি কী স্পর্শ করতে যাচ্ছে তার পূর্বাভাস দিতে পারে। ওই যেকোনো মানুষের চেহারা চিনে নেবার যেই কৌশল, অনেকটা ওভাবেই পূর্বাভাস আসে। এর জন্য ট্রেনিং নেয়া হয়েছে ঠিক এমনি অনেক মানুষ সার্জনের করা অস্ত্রোপচারের প্রত্যেকটি পর্যায়ের কাজ ভিডিও ক্যামেরায় ধারণকৃত রেকর্ডের তথ্য থেকে। রোবট সার্জন তার নতুন একটি অস্ত্রোপচারে কোনো নাজুক অংশ যেমন রক্তনালি, স্নায়ু, লসিকানালি ইত্যাদিতে ছুরি স্পর্শ করার আগেই পূর্বাভাস এসে তা থামিয়ে দেয়। অস্ত্রোপচারের একটি আদর্শ কম্পিউটার সিম্যুলেশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে ওটিকে অনুকরণ করে রোবট সার্জন অগ্রসর হতে পারে।

এই সবকিছুর সমন্বয়ে কিছু কিছু অপারেশনের জন্য নিয়মিত ব্যবহারযোগ্য মডেল গড়ে তোলাও হয়েছে। মূত্রতন্ত্র ও ধাত্রীবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন একটি মডেলের নাম দ্যা ভিঞ্চি সিস্টেম। এরকম তৈরি মডেল বেশ ব্যবহৃতও হচ্ছে। রোবট সার্জন মেশিন লার্নিঙের সুবিধা নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম অংশ কেটে ও রক্তনালি ইত্যাদির কম ক্ষতি করে কাজগুলো করতে পারে বলে তাতে দ্রুততর সুস্থতা আশা করা যায়। তাই আগামী দিনগুলোতে হয়তো এর চাহিদা বাড়বে।

হাসপাতাল পরিচালনা: এআইয়ের আরো এক ধরনের ব্যবহার চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঘটে পুরো হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনাকে একসঙ্গে নিয়ে। হাসপাতালে যে সুযোগ-সুবিধাগুলো রয়েছে তার সর্বোত্তম ব্যবহারটি হলো এর একটি লক্ষ্য। ঠিক কত দিন কোন্ রুগীকে হাসপাতালে রাখা প্রয়োজন, বিশেষ করে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) কাকে নেয়া দরকার, কতদিন রাখা দরকার, এগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অথচ ব্যস্ত হাসপাতালে এ সিদ্ধান্ত সারাক্ষণই নিতে হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিবেচনাগুলো প্রত্যেক রুগীর সর্বশেষ তথ্য থেকে যথাসম্ভব আগে সিদ্ধান্ত দিতে পারলে এটি চিকিৎসা, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, রুগী ও তার পরিবার সবার জন্যই সুবিধাজনক হয়। তাছাড়া হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার দিক এবং একটি অত্যন্ত জটিল প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক কেন্দ্র হিসেবে তার দৈনন্দিন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাকে সমন্বিতভাবে সর্বোত্তম অবস্থায় রাখার কাজটি এআইয়ের পক্ষে যেভাবে সম্ভব, অন্যথা নয়।

জনস্বাস্থ্যঃ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে শাখায় দ্রুত বড় উন্নয়ন ঘটাতে হলে এআই ছাড়া উপায় নেই তা হলো জনস্বাস্থ্য। দেশজোড়া এমনকি বিশ্বজোড়া ব্যাপক মানুষের স্বাস্থ্য-তথ্যের ভিত্তিতে ট্রেনিং করা মেশিন লার্নিঙের এখানে স্বাভাবিক সুবিধা রয়েছে। মৌসুমি ছোঁয়াচে রোগের বিস্তার রোধ, মহামারি-অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি অত্যন্ত সহায়ক হয়। সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ যখন বিশ্বজুড়ে মহাবিপর্যয় ঘটাচ্ছিলো, তখন এই বিষয়টি খুব সামনে চলে এসেছিল।

ইতোমধ্যে নানা উদাহরণে আমরা দেখেছি মেশিন লার্নিঙের সক্ষমতা হলো যাবতীয় তথ্যের মধ্যে প্যাটার্ন উদ্‌ঘাটন করা, কখনো নানা দলে বিভক্ত করা। তখন সেখানে যদি ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা নিয়ে একটি দল আলাদাভাবে দেখা যায়, সেটি চট্ করে ধরা পড়ে যায়। এমনিভাবে সাধারণ স্বাস্থ্য ও সংক্রমণ গণতথ্য থেকে পাওয়া এমন ব্যতিক্রমী ঘটনা একেবারে শুরুতেই সতর্কতার ঘণ্টা বাজাতে পারে, যেমন কোভিড-১৯ এর মতো নতুন কোনো বড় হুমকিতে। সেটির উৎসটি বুঝে ফেলে সেখানকার অল্প পরিসরে থাকা মানুষদেরকে বাকি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে দ্রুত তা বৈশ্বিক পরিবেশে চলে যাওয়াকে রোধ করতে পারে। রোগের বিস্তার ঘটলে তার প্যাটার্নটিও দ্রুত আবিষ্কার সম্ভব। তখন কোথায় বড় রকম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে হবে; কোথায় টিকা, ওষুধ, সরঞ্জামের দ্রুত মজুত গড়তে হবে তা বোঝা যায়।

কোভিড-১৯ এর শুরু থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এরকম একটি মডেল দিয়ে দেশে দেশে জনস্বাস্থ্যের একটি আয়োজন গড়ে তুলেছিল জিআইএস আরএস নামে গড়ে তুলেছিল। পুরো নামটি হলো গ্লোবাল ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স অ্যান্ড রেসপন্স সিস্টেম অর্থাৎ বিশ্ব ইনফ্লুয়েঞ্জা নজরদারি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ওই সময় এবং অতিমারি স্তিমিত হওয়ার পর এ সিস্টেমের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে যে কাজ হয়েছে, সেটি ভবিষ্যতের সতর্কতাকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। জনস্বাস্থ্যের আরো বহুতরো বিষয়ে এরকম এআই তদারকি ও প্রতিরোধ গঠন করা সম্ভব।

বিজ্ঞান গবেষণা

বিজ্ঞান গবেষণায় প্রতিটি পর্যায়ে বিজ্ঞানীকে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। তাই সেখানে যে এআইয়ের সহায়তা নেয়া হচ্ছে, তার প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। শুরুতে গবেষণার সমস্যাটি চিহ্নিত করার জন্য ব্যাপকভাবে পূর্বেকার প্রাসঙ্গিক সব গবেষণা নিবন্ধ খুঁজে দেখে ফেলা দরকার। এ বিষয়ে কতখানি গবেষণা হয়ে গেছে, কতখানি বাকি আছে এসব জানা দরকার। এখন উন্নত মেশিন লার্নিং ইন্টারনেটে যুক্ত সকল তথ্য-উৎস, যাবতীয় জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনা থেকে প্রয়োজনীয়গুলো বের

করে শুধু ফেলে না, প্রাসঙ্গিক নিবন্ধগুলোর সার-সংক্ষেপ, পারস্পরিক তুলনা ইত্যাদি সৃষ্টি করে গবেষণার উপযুক্ত সম্ভাব্য বিষয়গুলো বিজ্ঞানীর কাছে তুলে ধরতে পারে। যথেষ্ট বিচক্ষণ ভাবে কোন্ কোন্ জায়গায় পূর্বের গবেষণায় শূন্যতা রয়েছে, তা ধরিয়ে দেয়ার জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে। এ কাজে বিস্ময়কর ক্ষমতা রাখে মেশিন লার্নিঙের আধুনিকতম রূপ– বড় ভাষা মডেল, যেটি আমরা পরে দেখবো। তাছাড়া উত্তর না দেয়া ট্রেনিঙে নিউরাল নেটওয়ার্ক যে কীভাবে তথ্যগুলোকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে ফেলতে পারে, তা আমরা দেখেছি। গবেষণা হয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলোর এই বিভিন্ন দলের মাঝখানে গ্যাপের মধ্যে এখনো কোনো গবেষণা-সমস্যা রয়েছে কি না তা এই পদ্ধতিতেই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

আইরিস এআই নামের একটি মেশিন লার্নিং মডেল বিজ্ঞান গবেষণার এরকম কাজের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি প্রাসঙ্গিক সব প্রকাশনা খুঁজে, পড়ে, গবেষণার জন্য নতুন আইডিয়া ও সেজন্য এক্সপেরিমেন্টের পরিকল্পনাও দিয়ে দিতে পারে। এরকম মডেল শুধু গবেষণার সম্ভাব্য সমস্যাটিই চিহ্নিত করছে না, ইতোমধ্যে জানা তথ্য থেকে সেই সমস্যার সমাধানে কীরকম একটি আপাত-তত্ত্ব খাড়া করা যায়, তারও একটি রূপরেখা দিয়ে দিতে পারে। সেই তত্ত্ব থেকে যুক্তিতে বা গণিতে যেসব ঘটনা ঘটতে পারে, তা যাচাইয়ের জন্য এক্সপেরিমেন্টের পরামর্শ আসতে পারে, বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে এক্সপেরিমেন্ট বাছাই করে নেবার সুযোগও দিতে পারে। এক্সপেরিমেন্টর পুরো ডিজাইনটিই তার থেকে আসতে পারে– বিশেষ করে মেশিন লার্নিঙের যে আধুনিকতম রূপের কথা বল্‌লাম তার থেকে। আপাত-তত্ত্বের থেকে গাণিতিক পূর্বাভাসে পাওয়া ফলাফল যদি এক্সপেরিমেন্টে না হয়ে অন্য কোনো পদ্ধতিতে যাচাইয়ের সুযোগ থাকে তার পরামর্শও এখান থেকে আসতে পারে (যেমন সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবেচনা করে যাচাই)।

এক্সপেরিমেন্টের পরামর্শের উদাহরণে ধরা যাক এতে দেখার বিষয় হলো শরীরের একটি টার্গেট প্রোটিনের সঙ্গে ওষুধের কোন্ অণুটি সহজে গিয়ে বন্ধন নিতে পারে, সেটি নির্ণয় করা। মেশিন লার্নিঙের নিউরাল নেটওয়ার্ক কোন্ অণু এ বন্ধন সহজে নিতে পারে, তার পূর্বাভাস বলে দিতে পারে। এর কারণ আগে থেকে জানা অনুরূপ টার্গেটের সঙ্গে কোন্ অণুগুলো বন্ধন নিয়েছে, কোন্‌গুলো নিতে ব্যর্থ হয়েছে, তার বিপুল তথ্য থেকে ট্রেনিং নিয়ে এটি তার প্যাটার্ন বের করে ফেলতে পেরেছে এবং সে অনুযায়ী অণু বাছাই করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে মানুষ-বিজ্ঞানীকে একে একে বিভিন্ন অণু সত্যি সত্যি প্রয়োগ করে করে দেখতে হতো কোন্‌টি বন্ধন নেয়– তার প্রত্যেকটির জন্য লাগতো অনেক সময়, শ্রম ও অনেক ব্যয়।

এবার দেখা যাক তরুণতর যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করছেন, তাঁদেরকে কী সহায়তা এআই দিচ্ছে। পৌন:পুনিক কাজগুলো এআইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাঁরা এখন আরো বিচক্ষণ কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁদের মত এখন কম্পিউটার সরাসরি তথ্য পেয়ে অথবা ক্যামেরা দিয়ে দেখে এক্সপেরিমেন্টে যন্ত্রপাতির রিডিং নেয়, কোনো রিডিং উল্টাপাল্টা আসলে বা যন্ত্রপাতিতে সমস্যা দেখা গেলে ত্রুটি নির্ণয় করে তার সমাধান করে। মাপজোকের প্রত্যেকটি যন্ত্র সুনির্দিষ্ট ক্যালিব্রেশনের মধ্যে আছে কি না সব সময় তা নিশ্চিত করে– যেমন স্কেলের আসল শূন্যটি ০ লেখা জায়গাতেই আছে কিনা। নিউরাল নেটওয়ার্ক নতুন তথ্যের মধ্যে ব্যতিক্রমী কোনো দল খুঁজে পেলে সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবাণী দেয়। সেটি কৌতূহলোদ্দীপক কিছু হতে পারে, আবার এক্সপেরিমেন্টের কোনো পদক্ষেপে অবাঞ্ছিত কিছু ঢোকার ফলেও হতে পারে। যেমন এআইয়ের কম্পিউটার-দৃষ্টি অণুবীক্ষণের তলায় স্লাইডের ওপর কিছু ব্যাকটেরিয়ার কলোনি দেখছে। এর নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যাকটেরিয়াগুলোকে নানা দলে বিভক্ত করে ফেল্‌লো তার মেমোরিতে গাণিতিক ভাষায়। কিন্তু লক্ষ করলো একটি অপ্রত্যাশিত দলে যারা আছে, তারা মোটেই ব্যাকটেরিয়ার মতো আচরণ করেনি বলে অন্য সব দল থেকে তার ফলাফল অনেক দূরে– একরকম প্যারাসাইটের (পরজীবী) ফলাফল যেমন হবার কথা সেরকম। বুঝলো এই স্লাইডটি গবেষণায় রাখা যাবে না– এটি দূষিত হয়েছে। সেই মতো সংকেত জানিয়ে দিলো। হয়তো প্যারাসাইটের তুলনামূলক সংখ্যা এত কম যে, মানুষ-বিজ্ঞানী অণুবীক্ষণে একে আলাদা করতেই পারতেন না, কিন্তু মেশিন লার্নিং তো সূক্ষ্মভাবে টের পায় চোখে দেখে নয়, গাণিতিক বিশ্লেষণে।

গবেষণা সহকারীরা ল্যাবোরেটরিতে নিয়মবাঁধা যেসব কাজ নিজের হাতে করেন, সেগুলোর জন্য প্রোগ্রাম করা কম্পিউটার চালিত ল্যাব-রোবটও করতে পারে। ধরা যাক্, এই রোবট একটি কেমিক্যালের সঙ্গে একটু একটু করে অন্য একটি কেমিক্যাল মেশাচ্ছে। যেই মুহূর্তে তার রং পরিবর্তিত হয়ে গেলো তক্ষুণি মেশানো বন্ধ করে দিলো। এজন্য কতখানি মেশাতে হলো তার পরিমাণ রেকর্ড করে রাখে, এইসব কাজ করা– ঢালা, রং দেখা, আয়তন মাপা এগুলো নির্দেশ দেয়া কম্পিউটারের পরিচালিত রোবটের জন্য কঠিন নয়। ডিএনএর বিশেষ কোনো জিনের কোডিং অনুযায়ী বিশেষ প্রোটিন সংশ্লেষণের যে ল্যাবোরেটরি, তাতে অনেকগুলো কাজ ধাপে ধাপে গবেষণা-সহকারীকে করতে হয়। এখন ল্যাব জিনিয়াস নামের একটি রোবট তৈরি হয়েছে শুধু এরকম প্রোটিন ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবে ওই কাজগুলো করার জন্য।

বিজ্ঞানের কোনো কোনো গবেষণায় তুলনামূলকভাবে মেশিন লার্নিঙের ব্যবহার বেশি হচ্ছে; যেমন প্রোটিন সংশ্লেষণে প্রোটিনের সঠিক জটিল ভাঁজগুলোর পূর্বাভাস

দেবার কাজে। প্রায় ওভাবেই সঠিক ওষুধ উপাদান খুঁজে পাওয়ার কাজেও মেশিন লার্নিং খুব উপযোগী হচ্ছে। বিভিন্ন যে অণুগুলোতে ওষুধের গুণ রয়েছে মনে করে শরীরে কোনো বিশেষ জায়গার সঙ্গে তা বন্ধন গঠন করে কি না সে সম্পর্কে মেশিন লার্নিং পূর্বাভাসের কথা আগেই দেখেছি। প্রোটিনে দীর্ঘ এমাইনো এসিডে গড়া শেকলকে দুমড়েমুচড়ে অসংখ্য রকম ভাঁজ সম্ভব, বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে আকর্ষণের কারণে। তার মধ্যে কোন্ ভাঁজগুলো সত্যিকার প্রোটিন দেবে, তা সনাতন ভাবে নির্ণয় করতে একটি একটি করে করে প্রাসঙ্গিক পরীক্ষায় দেখতে হতো, যা খুবই শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। এখন আলফা ফোল্ড নামের একটি মেশিন লার্নিং মডেল ক্রমে আরো উন্নত রূপে আসছে। এটি অতি দ্রুত স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রোটিনের সঠিক ভাঁজগুলো পেয়ে যায়, অতীতে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণায় ওরকম বিভিন্ন রকম শেকল ও তাদের সঠিক ভাঁজের তথ্য থেকে ট্রেনিং পাওয়ার কারণে।

জ্যোতির্বিদ্যার থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। দূর-তারার গ্রহের আবিষ্কার হচ্ছে বেশ কিছু বছর ধরে। সেসব কোনো কোনো গ্রহ পৃথিবীর মতো বলে তাদের বিষয়ে বিজ্ঞানীদের এখন দারুণ আগ্রহ। কিন্তু ওখানে কোন গ্রহ আবিষ্কার সহজ নয়– তারার আলোর তুলনায় গ্রহ এত নিষ্প্রভ যে, সেটি দেখা যায় না। কিন্তু তারার চারিদিকে ঘোরার সময় গ্রহটি আমাদের ও তারার মাঝে আসলে ওই তারার আলো কমে যায়, সামনে থেকে সরলে আবার বাড়ে। এই বাড়াকমা দেখে গ্রহ ধরা পড়ে। ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত গ্রহ থেকে তারার আলোর বাড়াকমার যে বহু তথ্য রয়েছে, ওগুলো থেকে মেশিন লার্নিং ট্রেনিং পেয়েছে। এবার যেকোনো নতুন তারার আলোতে এমন বাড়াকমা পেলে তাকে ওই প্যাটার্নে ফেলে কোনো গ্রহের বিস্তারিত পূর্বাভাস দিতে পারে। এভাবে মেশিন লার্নিং গ্রহ আবিষ্কার করতেই শুধু পারে না ওই গ্রহ সম্পর্কে নানা তথ্য দিতে পারে, ওই সূক্ষ্ম প্যাটার্ন থেকে। পর্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্বিদ আজ আর একা নন্, এআই তার পাশে আছে।

সাংবাদিকতা ও তথ্যপ্রযুক্তি

মেশিন লার্নিং সাধারণ তথ্যপ্রবাহের মধ্যে হঠাৎ একটি ব্যতিক্রমী ও সম্ভাব্য গুরুত্ব বহনকারী খবরকে চিহ্নিত করতে পারে। সংবাদের ভোক্তাদের দিক থেকে অলক্ষ্যে কী ধরনের খবরের প্রতি বেশি ঝোঁক আসছে, তা এআই ধরে ফেলতে পারে তখনো মানুষ-সাংবাদিকের কাছে অনুভূত হবার আগেই। উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত সংবাদ সংস্থা রয়টারের রয়েছে নিউজ ট্রেইসার (সংবাদসন্ধানী) নামে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল, যা অসংখ্য এক্স হ্যান্ডেল (আগের টুইটার) খুদে বার্তা চলাচালি থেকে উদ্‌ঘাটন করে ফেলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদ্য সংবাদ (ব্রেকিং নিউজ)। অসংখ্য খুদে

বার্তার মধ্যে কোনো কোনো একটির অভ্যন্তরে বড় খবর লুকিয়ে আছে এমন কিছু ধরে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়। মডেলের নিউরাল নেটওয়ার্ক প্রত্যেক বার্তাকে তার প্যাটার্নে ফিল্টার করতে পারে বলেই এটি সম্ভব হয়।

আজকাল উন্নততর মেশিন লার্নিঙের মাধ্যমে শুধু খবর খুঁজে নেয়া নয়, এ খবরের পেছনের তথ্যগুলোর সত্যতা ও উৎস নির্ণয় করে ফেলা যাচ্ছে। এসব উৎসের পরস্পরের বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকলে সেটিও উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সংবাদের স্টাইল সম্পর্কে ভোক্তা-চাহিদার পরিবর্তনের উদ্‌ঘাটনটিও মডেল করছে। সে চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবাদের পরিবেশনার বিষয়েও মেশিন লার্নিং দিগদর্শিকা হতে পারে। এজন্য তাকে ট্রেনিং পেতে হয় সাম্প্রতিককালে ভোক্তাদের চিন্তা-ভাবনা এবং পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপক তথ্য থেকে। বিচক্ষণ সম্পাদক ও সাংবাদিকরা এরকম পরিবর্তন উদ্‌ঘাটন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের পরিবেশনে পরিবর্তন সবসময় করে এসেছেন। কিন্তু এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে দিয়ে দারুণ সহায়ক হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্ট আজকাল ঠিক এ কাজের জন্যই একটি মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করছে, যার নাম হেলিওগ্রাফ। এ পত্রিকায় বছরে যত সংবাদ রিপোর্টিং হয়, তার মধ্যে শত শত রিপোর্টিং এই মডেলই সংগ্রহ করছে ও লিখে দিচ্ছে। আপাতত এর নীতিটি হলো এমন প্রচুর পাঠক রয়েছেন, যাঁদের চাহিদা মূলধারার নয়, সে চাহিদা পূরণের জন্য একজন সাংবাদিক নিয়োগ করা পত্রিকাটির জন্য ব্যয়বহুল হবে। তাই সংবাদ যাচাই করার আর সে বিষয়ে লেখার দায়িত্ব হেলিওগ্রাফের ওপর ছেড়ে দিলেও তার কাজের মান পত্রিকাটির উপযুক্ত হয়।

আরো কিছু বৃহত্তর তথ্য চলাচলের ক্ষেত্রে রয়েছে এআইয়ের এখন অনেক দায়িত্ব। তার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো সাইবার নিরাপত্তা। হ্যাকিঙের মতো সাইবার আক্রমণ ও সাইবার অপরাধ এখন একটি বড় ঝুঁকি। কিন্তু নিউরাল নেটওয়ার্কের প্রতিরক্ষা এরকম আক্রমণের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন নিউরাল নেটওয়ার্ক যদি কোনো তথ্য চলাচল সিস্টেমে সাধারণভাবে আসা যাওয়া তথ্যের পরিমাণ (ট্রাফিক) যেভাবে ওঠানামা করে তাতে ট্রেনিং পায়, তাহলে এগুলোকে বিভিন্ন দলে ভাগ করতে পারে। যদি কখনো এটি অস্বাভাবিক অত্যন্ত উচ্চ ট্রাফিকের একটি দল পায়, তাহলে সেটিকে সাইবার অ্যাটাকের কারণে হচ্ছে বলে ধরে নিতে পারে। তখন সঙ্গে সঙ্গেই সেই দলকে, অর্থাৎ ট্রাফিকের সেই অংশকে নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে অকার্যকর করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ডার্ক ট্রেইস নামের একটি মডেল এভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাইবার হুমকিকে মোকাবিলা করছে। অনেক সময় তথ্য নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হার্ডওয়্যার, কম্পিউটার বা অন্যান্য

যন্ত্রপাতির কোনো সমস্যা পুরো নেটওয়ার্ককে সমস্যায় ফেলতে পারে। এজন্য এসব হার্ডওয়্যারে সাধারণত এমন সেন্সর লাগানো থাকে, যার থেকে তথ্য নিয়ে মেশিন লার্নিং নিজেকে প্রশিক্ষিত করতে পারে এবং নতুন কিছু কোথাও ঘটলে হার্ডওয়্যারের সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারে।

একটি প্রতিষ্ঠান বা একজন ব্যক্তি যখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তথ্য পায়– ইমেইল, পিডিএফ ফাইল, ইমেজ ইত্যাদি, এগুলোর ব্যবস্থাপনা প্রায়ই সুসমঞ্জস হয় না। যেমন উদাহরণস্বরূপ অনেক অবাঞ্ছিত ইমেইল আসে (স্প্যাম) যার কারণে জরুরি ইমেইলটি হারিয়ে যায়। আর এটি নিউরাল নেটওয়ার্কের জন্য সহজতম একটি সমস্যা– স্প্যামগুলোকে চিহ্নিত করে সরিয়ে ফেলার কাজটি। ওভাবে অন্যান্য তথ্যগুলোকেও সুসজ্জিত, সর্বোত্তম অবস্থায় নিরাপদ রাখার কাজে মেশিন লার্নিং অত্যন্ত পটু। আজকাল ক্লাউড নামে দূরবর্তী কোনো তথ্য সংরক্ষণ ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ তথ্য জমিয়ে রাখার সুযোগ থাকে, যেখানে জমা রেখে ও প্রয়োজনে নিয়ে এসে কম্পিউটার নিজের কাজ করতে পারে। এর জন্য গুগলের মতো বড় প্রযুক্তি কোম্পানি যেমন বিশ্বজোড়া গ্রাহকদের তথ্য সংক্ষেণের জন্য বিশাল ক্লাউড তৈরি করে রেখেছে, তেমনি যেকোনো একটি প্রতিষ্ঠানও নিজস্ব ক্লাউড তৈরি করে তার ব্যবস্থাপনা করতে পারে। মেশিন লার্নিঙের সাহায্য ছাড়া কোনোরকম ক্লাউডে সর্বোত্তম অবস্থায় তথ্য সংরক্ষণ, পরিবেশন ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব হতো না। বড় চ্যালেঞ্জ হলো সংবেদনশীল তথ্যকে নিরাপদে রাখা, আইনের মধ্যে থাকা, এর যে ব্যয় ও আয় তাকে সর্বোত্তম অবস্থায় রাখা। ক্লাউড ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট এমনি একটি মডেলের নাম স্নো ফ্লেইক।

আর্টস ও বিনোদন

সিনেমা: জনপ্রিয়তার বিবেচনায় এখানে সিনেমাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত, এবং এআইয়ের দ্বারা আর্ট-সম্ভাবনাগুলো অনেক দূর যাওয়ার ব্যাপারেও এর অগ্রগণ্যতা রয়েছে। জনপ্রিয় টেলিভিশন প্রডাকশনগুলো সম্পর্কেও একই কারণে এই কথা বলা চলে। আধুনিকতম মেশিন লার্নিং সিনেমার গল্প লেখা থেকে শুরু করে চিত্রনাট্য রচনা, দৃশ্য পরিকল্পনার যাবতীয় কাজ নিজের হাতে নিয়ে আসতে পারছে। আর সিনেমাতে এসব কাজ এআইয়ের কাজের প্রারম্ভিক অংশমাত্র। সে সঙ্গে সত্যি সত্যি চলচ্চিত্রে এসবের বাস্তবায়নে মেশিন লার্নিং আরো অনেক কিছু করতে পারে। সিনেমাতে যিনি বিনিয়োগকারী তাঁর পছন্দের সঙ্গে মিল রেখে হাজারো সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্যের তথ্য থেকে ট্রেনিং নিয়ে সমৃদ্ধ মডেল খুবই শিল্পসম্মত ও মৌলিক একটি গল্পের প্লট ও চিত্রনাট্য দিতে পারে। তারপর সেটির বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

অনুযায়ী নির্মিত সিনেমাটি দর্শকদের মধ্যে কী কী রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, কতটা দর্শক টানতে পারে, কতটা ব্যবসা-সফল হতে পারে, সেই পূর্বাভাসগুলো দিয়ে দিতে পারে সত্যি সত্যি তৈরির আগেই। কাজেই বিনিয়োগকারী সবকিছু জেনে বেশ আস্থার সঙ্গেই এগুতে পারেন। প্রাথমিক পরিকল্পনাকে বিশ্লেষণ করে তৈরির আগেই পারিপার্শ্বিকতার নিরিখে সিনেমার সাফল্যের পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য সৃষ্ট একটি পরিচিত মডেলের নাম স্ক্রিপ্ট বুক।

সিনেমার পর্দায় যাঁদেরকে অভিনয় করতে দেখছি তাঁদের ব্যাপারেও এখন এআই হস্তক্ষেপ করতে পারছে– নির্মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী, তাঁর নতুন সিনেমায় যাঁদেরকে অভিনয় করতে দেখছি এই নতুন চিত্রনাট্য অনুসরণ করে, তাঁরা হয়তো জনমনে হৃদয় কাঁপানো দুর্দান্ত সব অভিনেতা-অভিনেত্রী। কিন্তু তাঁরা আসলে এই ছবিতে অভিনয় করেননি, সেটি সম্ভবও ছিলনা। সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এখন এমন অভিনয়ের বয়স ছাড়িয়ে গেছেন অনেক বছর হয়ে গেছে, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো বেঁচেও নেই। এই অদ্ভুত ঘটনাটি সম্ভব করেছে মেশিন লার্নিং। এটি এই জননন্দিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সত্যি সত্যি অভিনীত আগেকার বহু সিনেমা থেকে ট্রেনিং করার ফলেই হুবহু তাঁদের চেহারা, কণ্ঠস্বর, অভিনয়-ভঙ্গিকে আজকের সিনেমাটির মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

পুরানো অভিনয়ে ট্রেনিং করে তাকে বর্তমান অভিনয়ে রূপ দেয়া– কীভাবে এ অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়? এর একটি উপায় হলো আজকের আধুনিকতম মেশিন লার্নিং যেভাবে এক একটি করে ফ্রেম তৈরি করে পুরো একটি ভিডিও নির্দেশমত বানিয়ে ফেলতে পারে সেই সক্ষমতা ব্যবহার করে। তারপর মেশিন লার্নিং সেই বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনীত শত সিনেমা থেকে সেই বয়সের তাঁদের চেহারা ও অভিনয় বৈশিষ্ট্যসমূহকে কিছু প্যাটার্নে নিয়ে আসে। এই প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে তাঁদের পুরানো বৈশিষ্ট্যগুলোতে বর্তমান সিনেমার চরিত্রগুলোর অভিনয়ে নানাভাবে আরোপ করে মেশিন লার্নিং। ওসময় এমনভাবে উভয়ের তুলনা করে যায় যতক্ষণ না উভয়ের মধ্যে পার্থক্য একেবারে ন্যূনতমে পরিণত না হয়ে যাচ্ছে। যতদিন ওভাবে কৃত্রিম অভিনয় মেশিন লার্নিং মডেলে সম্ভব ছিল না তখন অন্য অভিনেতার দ্বারা অভিনয় করিয়ে তার ওপর বাকি কাজ হয়েছে। এখন আধুনিকতম এআইয়ে লিখিত বর্ণনা থেকে কৃত্রিম ভিডিও সৃষ্টি সম্ভব হওয়াতে নতুন কোনো অভিনয়ই প্রয়োজন হয় না।

অন্যদিকে যে বিখ্যাত নায়ক নায়িকারা আজ বয়সের কারণে বেশি বয়সের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তাঁদেরকে দিয়েই আবার তরুণ-তরুণী নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় সম্ভব করেছে মেশিন লার্নিং। যত বয়সই হোক, তাতে তাঁর

তরুণতর চেহারা, অভিনয় ভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের অনেকগুলোর সূক্ষ্ম উপস্থিতি থাকে, যা মেশিন লার্নিঙের চোখ এড়ায় না। ওদিকে তাঁদের তরুণ বয়সের শত শত অভিনয়ের যেগুলোতে মেশিন লার্নিং ট্রেনিং নিয়েছে, সেখানেও এই বৈশিষ্ট্যগুলো বরং আরো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে তার নিউরাল নেটওয়ার্ক। এখন নিউরাল ফেশিয়াল ম্যাপিং নামের একটি মেশিন লার্নিং মডেল আগের অভিনয়ের মুখের পেশির প্রতি বিন্দুতে সংকোচন-প্রসারণ, অভিনয়-বৈশিষ্ট্যের নানা দিকগুলো এই নতুন অভিনয়ের উপযুক্ত জায়গায় আরোপ করতে পারে এক রকম ম্যাপিঙের মতো। সবই ঘট্ছে অভিনয়গুলোর ডিজিট্যাল সংস্করণে ছবির প্রত্যেকটি ফ্রেমের ওপর। কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রেও ওই একই কাজ করা হয়। বৃদ্ধ যে তরুণের অভিনয় আগেও নানা সিনেমায় বহুদিন ধরে করেনি, তা নয়। সেটি করা হতো চেহারায় খুবই কুশলী রূপ-সজ্জার মাধ্যমে। তবে বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে মেশিন লার্নিঙের কাছে ওই প্রচেষ্টা নস্যি।

উদাহরণস্বরূপ ২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়া একটি খুব ব্যতিক্রমী হলিউড সিনেমার কথা উল্লেখ করা যায়, যার নাম হেয়ার (এখানে)। ১৯৯৫ সালের ফরেস্ট গাম্প ছবিটিতে টম হ্যাঙ্কস ও রবিন রাইট এ দুজন বিখ্যাত শিল্পীর অভিনয়ে মুগ্ধ হন্নি এমন দর্শক কম আছে। তখন দুজনেরই তরুণ বয়স। আজ তাঁরা বয়োবৃদ্ধ, যদিও অভিনয় বরাবর করে আসছেন এখন পর্যন্ত। অবশ্য একসঙ্গে দুজনকে ওই ফরেস্ট গাম্পের পর আর কোনো ছবিতে দেখা যায়নি। এতদিন পর হেয়ার ছবিতে সেটি ঘটলো। তাও আগাগোড়া ছবিতে বলতে গেলে একই বাড়ির একই কামরাতে তাঁদের দুজনকে এখানে দেখা গেলো বিভিন্ন বয়সে পরস্পরের সঙ্গে আলাপে অভিনয় করে যেতে। সেই কিশোর-কিশোরী বয়স থেকে আজকের বয়োবৃদ্ধ বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ের সেই অভিনয়। প্রত্যেকটিতে তাঁরা ঠিক সেই বয়সে যেমন ছিলেন, তখনকার সিনেমায় তাঁদেরকে অভিনয়ে যেভাবে দেখা যেতো, তেমনি অভিনয়। তাঁরা দুজন অবশ্য সব বয়সের অভিনয় স্বচ্ছন্দভাবে একই জায়গায় আজকের দিনেই করে গেছেন। মেশিন লার্নিং সেটিকে নিয়ে পরে কাজ করেছে ছবির প্রত্যেকটি ফ্রেমে। উভয়ের সারা জীবনে বিভিন্ন বয়সের যে প্রচুর সিনেমা রয়েছে, সেখান থেকেই ট্রেনিং পেয়েছে এই মেশিন লার্নিং। উদাহরণস্বরূপ মুখমণ্ডলের প্রত্যেকটি কুঞ্চন আগের ওই বয়সের অভিনয়ে যেভাবে ঘটেছে, তা আজকের বয়সের সেই একই কুঞ্চনের ওপর ম্যাপিং করেই সম্ভব হয়েছে আজকের অভিনয়কে সেদিনের অভিনয়ে পরিণত করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন এ ধরনের কাজকে নিয়মিত কাজে পরিণত করেছে।

কম্পিউটার অ্যানিমেশনে কার্টুন চলচ্চিত্র নির্মাণ নতুন কিছু নয়। কিন্তু মেশিন লার্নিং সেখানেও নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যেমন সাধারণ একটি সিনেমা অথবা ভিডিও তৈরি করে এটিকেই অনায়াসে কার্টুন চলচ্চিত্রে রূপ দেয়া যাচ্ছে। এজন্য

মেশিন লার্নিং এ্যানিমেশনের জগতের তথ্য থেকে ট্রেনিং নেয়– ওখানে তুলির আঁচড়, চরিত্রের মসৃণ নড়াচড়া, রঙের বণ্টন ইত্যাদি সবকিছুর বৈশিষ্ট্যগুলো ট্রেনিঙে ধরা পড়ে। এখন সাধারণ একটি চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যকে কার্টুনের কী বিভিন্ন স্টাইলে রূপ দেয়া যায়, ওই তথ্যগুলোর কল্যাণে সেই স্টাইলগুলোকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে ফেলা যায়। মডেলের আলগরিদম অনুযায়ী ব্যবহারকারীর নির্দেশের সঙ্গে মিলিয়ে একটি স্টাইল নির্বাচিত হয়ে যায়। সাধারণ চলচ্চিত্রের ওপর ওই কার্টুন স্টাইলের ম্যাপিং বা প্রক্ষেপণ ঘটে। কম্পিউটারে একটি অ্যানিমেশন ভিডিও বানাতে যেখানে সপ্তার পর সপ্তা লেগে যেতো, সেখানে প্রথমে একটি সাধারণ ভিডিও বানিয়ে নিয়ে তাকে মুহূর্তের মধ্যে কার্টুন ভিডিয়োতে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে।

'স্পাইডার ম্যান অ্যাক্রস দি স্পাইডারভার্স' সিনেমাটিতে আমরা সাধারণ ছবির স্পাইডারম্যানকে ভিন্ন ভিন্ন সব আবহের মধ্য দিয়ে যেতে দেখি– যেগুলো কি না এক একটি স্পাইডার-বিশ্ব। আসলে এগুলো হলো কার্টুন আঁকার এক একটি স্টাইল। এর ফলে দর্শক যেন ক্ষণে ক্ষণে নানা আর্টিস্টের কাজ দেখতে পান। স্পাইডারম্যান এখানে যে নানা রকম জনসমাগমের বিশ্বের মধ্যে যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটি মানুষকে মেশিন লার্নিং নিজেই সৃষ্টি করেছে বহু সত্যিকার মানুষের চেহারা থেকে ট্রেনিং নিয়ে– এগুলোর সঙ্গে কোনো সত্যিকার মানুষের চেহারার মিল নেই।

সঙ্গীত: এখন আধুনিকতম মেশিন লার্নিং নিজেই মৌলিক সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তারও আগে থেকেই মেশিন লার্নিং সঙ্গীত-প্রেমিকের বহু রকম চাহিদার জোগান দিয়ে চলেছে। যেমন আপনি বিশ্রামে আছেন, অথবা এক মনে কাজ করছেন একটি আবহ সঙ্গীতের পরিবেশে; পরিবেশ ও আপনার মুড অনুযায়ী সঙ্গীতকে একেবারে ব্যক্তিগত চাহিদায় পরিবেশন এখন সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে তৈরি সঙ্গীতকে বিভিন্ন স্বাদের মতো করে রিমিক্স ও পরিবর্তন করে দিতে পারে মেশিন লার্নিং, আপনি নিজের চাহিদার একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে। নানা সঙ্গীতে ট্রেনিং নেয়া নিউরাল নেটওয়ার্কের কাছে এটি কঠিন কিছু নয়। এনডেল নামের এমনি একটি মেশিন লার্নিং মডেল এখন পাওয়া যাচ্ছে, যা শ্রোতার এখনকার শরীরের কিছু অবস্থা যেমন হার্ট স্পন্দন, রক্তচাপ ইত্যাদির ইনপুট নিয়ে সঙ্গীতকে তার অনুকূলে পরিবর্তন করে দিতে পারে। ওটিই সিদ্ধান্ত নিতে পারে শ্রোতার জন্য তখন একটি সঙ্গীতকে মনে জোর পাওয়ার জন্য বলিষ্ঠ সুরে দরকার, না ঘুমপাড়ানি গানের মতো সুরে দরকার। অবশ্য ওভাবে পরিবর্তন করার অনুমতি এনডেল-সৃষ্টিকারী কোম্পানিকে নিতে হয়েছে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি সঙ্গীতের গীতিকার সুরকার, বাদক, গায়ক সবার কাছ থেকে।

পুরানো গান, পুরানো ব্যান্ড-সঙ্গীত-দলের রেশ যাঁদের কাছে কখনো কাটে না তাঁদের জন্যও মেশিন লার্নিং অনেক কিছু করছে। যেমন ব্যান্ডের সবাই এখন বেঁচে না থাকলেও তাঁদের নানা আধাআধি কাজ থেকে নতুন সৃষ্টি বের করে আন্ছে এআই। ২০২৩ সালে বীটলদের গানের একটি নতুন রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে– নাও অ্যান্ড দেন (এখন ও তখন)। চার বীটলই অংশগ্রহণ করেছেন– কিন্তু এক একজন এক একভাবে– কারণ তখন তাঁদের দুজন জন লেনন আর জর্জ হ্যারিসন ইতোমধ্যে পরলোকে। মেশিন লার্নিংই এটি সম্ভব করেছে। লেনন প্র্যাকটিস হিসেবে নিজে পিয়ানো বাজিয়ে এই গান গেয়ে রেকর্ড করেছিলেন ক্যাসেটে সত্তরের দশকের শেষের দিকে। তখনকার প্রযুক্তিতে এই 'প্র্যাকটিস' রেকর্ডে ছিল প্রচুর নয়েজ। এতকাল পর মেশিন লার্নিং বীটলদের সবার পরবর্তীকালের উন্নত সব গানের রেকর্ডিং থেকে ট্রেনিং করে তার ভিত্তিতে প্যাটার্নে ফেলে ওটি থেকে শুধু নয়েজ নয়, সঙ্গে যে লেননের পিয়ানো বাজনা ছিল সেটিও সুন্দরভাবে বাদ দিয়ে দিতে পেরেছে– দরকার ছিল শুধু লেননের কণ্ঠে বিশুদ্ধ গান। এখন এই কালে এসে দুই জীবিত বীটলের একজন পল ম্যাকার্টনি এর সঙ্গে ব্যাজ বাদন এবং অন্যজন রিঙ্গো স্টার ড্রাম বাদন তাঁদের অবদান হিসেবে যোগ করেছেন– চার বীটলের সময় যা হতো। হ্যারিসন এখন না থাকলেও সৌভাগ্যক্রমে কেন জানি কৌতূহলবশত ১৯৯৫ সালে তিনি লেননের ওই প্র্যাকটিস গানটি গীটারে তুলে তা রেকর্ড করেছিলেন। এখন ওটাও কাজে লেগে গেলো হ্যারিসনের অবদান হিসেবে। সর্বশেষ প্রযুক্তি এভাবে 'বীটলদের শেষ গান' বলে কথিত এই নাও অ্যান্ড দেন গানটিকে সম্ভব করেছে।

ভার্চুয়াল বাস্তবতাকে সহায়তা: ভার্চুয়াল রিয়ালিটির (ভি আর) মাধ্যমে কম্পিউটার প্রোগ্রাম মানুষের চক্ষু-কর্ণ এবং পুরো চেতনাকে যেন একটি ভিন্ন অলীক বাস্তবতায় নিয়ে যায়। সেখানে এখন মেশিন লার্নিং গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটাচ্ছে। যেমন সত্যিকার মৃতদেহের ওপর 'শব ব্যবচ্ছেদ' না করে মেডিক্যাল ছাত্র-ছাত্রীরা যখন ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি অলীক শবদেহের কাটাছেড়া করে তখন ব্যবচ্ছেদকারীর হাতের ছুরি কোথায় কাট্লে কীসের নিচে কী দেখা যাবে, মেশিন লার্নিং তার আগাম পূর্বাভাস দিয়ে তেমনটিই দেখায়। ছাত্র নিজে যখন যা করবে, ঠিক তেমন ফলাফল হতে দিয়ে একে আরো বেশি শিক্ষণীয় ও বাস্তবসম্মত করে তোলে। এ কাজটি মেশিন লার্নিং করতে পারে অসংখ্য সত্যিকার শবব্যবচ্ছেদ থেকে ট্রেনিং পেয়েছে বলে। ফলে ছাত্র যখন ভুল কিছু করে তার ফলাফলও পূর্বাভাসে চলে আসে। এর ফলে যা হচ্ছে, ছাত্র সেটি দেখে নিজকে সামলে নেয়। ছাত্র কী ভুল করবে, না করবে এসব তো আর কম্পিউটার প্রোগ্রামে আগে থেকে দিয়ে দেয়া সম্ভব হতো না। তাই শুধু কম্পিউটার প্রোগ্রাম-নির্ভর ভি আর এখন অনেক বাসি হয়ে গেছে।

বিনোদনের জগতেও ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির সঙ্গে মেশিন লার্নিঙের সংযুক্তি দারুণ চমক দেখাচ্ছে। ধরা যাক, দর্শক ভার্চুয়াল বাস্তবতায় কোন নাটকের ভিডিও দেখছেন; মনে হচ্ছে তিনি সেই ভিডিওতে নাটকের যে দৃশ্য দেখছেন, যেন ভি আরের কল্যাণে সে দৃশ্যের মধ্যে থেকেই সেটি উপভোগ করছেন। এখন দর্শকের মনে হলো এই যে নাটকের পাত্রপাত্রী এদেরকে তিনি মানুষ চরিত্রের বদলে পরিচিত কোনো ভার্চুয়াল কার্টুন চরিত্রের রূপ দেবেন। এমন ভার্চুয়াল চরিত্রকে সাধারণত 'অবতার' বলা হয়। হিন্দু ধর্মে ভগবান নানা চরিত্রের রূপ ধরে যখন মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁদেরকে যেমনি অবতার বলা হয়, সেখান থেকে শব্দটি এসেছে। নিউরাল নেটওয়ার্ক আগেকার বহু নাটকের দৃশ্যের নড়াচড়া, কথন এবং তার অ্যানিমেশন রূপের থেকে ট্রেনিং নিয়ে সেগুলোর মধ্যে কতগুলো প্যাটার্ন খুঁজে পেয়েছে। ওই প্যাটার্নে ফেলে এই ভিডিওর মানুষের নড়াচড়া, কথন ইত্যাদিকে নির্বাচিত অবতারের নড়াচড়া, কথনে পরিণত করতে পারে। আজকাল অবতারভিত্তিক বহু সিনেমা অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সেখানেও সত্যিকার মানুষের সিনেমা অভিনয়কে অবতারের অভিনয়ে পরিণত করে মেশিন লার্নিং।

ভি আর বা ভার্চুয়াল বাস্তবতাকে এবং সেই সঙ্গে নিজের অনুভূতি ও শিক্ষণীয় অনুধাবনকে আরো নানা মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে মেশিন লার্নিং। ধরা যাক আজকের লন্ডন নগরীর রাস্তা দিয়ে হাঁটছি– দুপাশে আজকের দালান-কোঠা ও অন্যান্য স্থাপত্যকে দেখে দেখে। কিন্তু যখনই ভি আর হেলমেটটি মাথায় পরে নিচ্ছি, তখনই দেখতে, শুনতে ও অনুভব করতে পারছি ১৬০০ শতকের লন্ডন শহরের ঠিক এই রাস্তাকেই। তখনকার রাস্তার দৃশ্য এবং দুপাশে তখনকার স্থাপত্যের সব নমুনা। যদি সেই ১৬০০ শতকের কোনো একটি স্থাপত্যের কাছে গিয়ে ওটিতে ঘুরেফিরে দেখতে চাই তাও করতে পারি– অবিকল তখন যেমন ছিল। তুলনা করতে পারি একটু আগে আজকের যা দেখছিলাম তার সঙ্গে। এক্ষেত্রে আজকের লন্ডনের রাস্তা ও দালান বিন্যাসের সঙ্গে মিলানো হয়েছে ১৬০০ শতকের গুলোকে। মেশিন লার্নিং এজন্য অতীত ম্যাপের তথ্য থেকে ট্রেনিং পেয়েছে, সেই সঙ্গে সেদিনের প্রতিটি দালানের স্থাপত্যেরও। এটি করতে তাকে নির্ভর করতে হয়েছে সমসাময়িক আঁকা ছবি, খোদাই-কাজ ইত্যাদির ওপর। যেখানে ওভাবে পাওয়া তথ্যের অভাব আছে নিউরাল নেটওয়ার্ক স্থাপত্য-ইতিহাস ও বর্তমান স্থাপত্য-জ্ঞান থেকে তা নিজেই পূরণ করে নিয়েছে। এভাবে আমি যখন সেদিনের কেনো স্থাপত্যকে কাছে গিয়ে দেখতে চাচ্ছি, তখন যেদিকে তাকাচ্ছি তার পূর্বাভাস দিয়ে মেশিন লার্নিং সেটি দেখাচ্ছে। আমি পরমুহূর্তে হেলমেট খুলে আজকের লন্ডনে ফিরে এসে ঠিক সেই জায়গার আজকের দৃশ্যের সঙ্গেও মিলিয়ে নিতে পারছি।

আর্ট-ইতিহাস: পুরানো একটি ছবির সম্পর্কে জানতে মানুষ-বিশেষজ্ঞের আন্দাজ যেখানে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না, সেখানে এখন মেশিন লার্নিঙের সহায়তা নেয়া যাচ্ছে। যেমন অতীতে আঁকার জন্য ভালো ক্যানভাস সুলভে পাওয়া যেত না বলে মাস্টার শিল্পীও একই ক্যানভাসে বারবার ছবি এঁকে তা মনের মতো না হলে সেটিকে সাদা রঙে ঢেকে দিয়ে তার ওপর আবার নতুন ছবি এঁকেছেন। এক্সরে ও অনুরূপ কিছু প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমান ছবির তলার ছবি আবিষ্কার করা গেছে। কিন্তু সেই এক্সরে ইমেজ তো ওই অজানা আসল ছবির একটি আবছা সাদাকালো আভাস মাত্র; রং, আঁচড়, স্টাইল ইত্যাদি নিয়ে ছবির পুরো দ্যোতনাটি তো পাওয়া যায় না। মেশিন লার্নিং এসবও পুনরুদ্ধারের সুযোগ করে দেয় ওই শিল্পীর সারা জীবনের আঁকা অন্যান্য নানা ছবি থেকে ট্রেনিং নিয়ে। ওগুলো থেকে শিল্পীর নিজস্ব রং-আঁচড় ব্যবহার রীতি, তাঁর স্টাইল ইত্যাদির প্যাটার্নগুলো উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় নিউরাল নেটওয়ার্কে। তখন ওই তলার এক্সরে যেটিকে উদ্ধার করেছে সেই আবছা ছবির প্রত্যেক অংশে সেগুলো কোথায় কী হতে পারে তার পূর্বাভাস দিতে পারে। এ পূর্বাভাস যে প্রায় নিখুঁতভাবে প্রকৃত ছবিকেই উদ্ধার করতে পারে তার প্রমাণ বহুবার মিলেছে।

ঠিক ওইরকম ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটি নিউরাল নেটওয়ার্ক একইভাবে বলে দিতে পারে– যে ছবিকে কোন মাস্টার শিল্পীর বলে দাবি করা হচ্ছে তা আসল না নকল। একজন ভালো নকলবাজ কোনো প্রাচীন শিল্পীর আর্ট স্টাইলে এতটাই বিশেষজ্ঞ হতে পারেন যে, তিনি ওই মাস্টারের মতো করে এঁকে ওটিকে অরিজিনাল বলে দাবি করতে পারেন। কিন্তু ওই মাস্টার শিল্পীর সকল আর্টের থেকে ট্রেনিং পেয়ে মেশিন লার্নিং তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো এতো সূক্ষ্ম ভাবে প্যাটার্নে আনতে পারে যে, তাকে ফাঁকি দেয়া মোটেই সম্ভব নয়। নিউরাল নেটওয়ার্কের আউটপুট স্পষ্ট বলে দেবে এই ছবি ওই প্রাচীন মাস্টার শিল্পীর আঁকা কি আঁকা নয়। এভাবে আর্ট-ইতিহাসের অনেক রহস্যের সমাধান করেছে মেশিন লার্নিং।

চ্যাটবট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে প্রধানত চ্যাটবটের মাধ্যমে। এর মানে কথা বলা রোবট। রোবট হলেই যে একেবারে শরীর অবয়ব সহ কেউ হতে হবে এমন নয়– কথা বলাটাই প্রধান বলে ওটি কম্পিউটার বা টেলিভিশনের পর্দার চ্যাটবটেই হতে পারে, আবার পর্দার বাইরে কোনো ডিভাইস থেকে শোনার মতো হতে পারে। এর কোনো চেহারা থাকতেও পারে, আবার চেহারা না দেখিয়েই কথা বলতে পারে। মুখে কথা বলে বা কী-বোর্ডে চ্যাট করে আমরা তার

সঙ্গে আলাপ করতে পারি। পর্দায় তার কথা শুনলে তো ভালো, লেখা দেখলেও চলতে পারে আলাপ। কত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সে যে কথা বলছে, সেটিই আসল।

আজকাল অনেক ক্ষেত্রে নানা চ্যাটবট ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে অ্যাপলের সিরি, আমাজনের অ্যালেক্সা, গুগলের অ্যাসিস্ট্যান্ট– এদের মতো পরিচিতি বোধ হয় আর কারো নয়। ২০১১ থেকে শুরু করে ২০১৮ এর মধ্যে একে একে ওরা এসেছে। সবারই ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে বেড়েছে প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে, তবে সবার কাজের পেছনে ছিল মেশিন লার্নিং। নিউরাল নেটওয়ার্ক তাদেরকে অন্যের কথা বুঝতে, লেখাকে কথায় রূপান্তরিত করতে, এবং আরো বিভিন্ন সক্ষমতা দিয়েছে। ফলে কেউ তথ্য চাইলে তারা তা দিতে পারে, সহায়তা চাইলে কম্পিউটারে সেটি করে দিতে পারে। তবে মেশিন লার্নিঙের অত্যাধুনিক রূপটি সদ্য আসার আগে পর্যন্ত চ্যাটবটের পক্ষে স্বচ্ছন্দে কথা বলা ও কাজ করা সহজ ছিল না।

ব্যাপক যেসব অনুরোধ চ্যাটবটকে অতীতে করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে একটি তথ্যভান্ডার গড়ে মেশিন লার্নিং ট্রেনিং নিয়েছে। এতে এক এক ধরনের অনুরোধের মধ্যে একটি উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে; যেমন 'আজকের আবহাওয়া কীরকম?' এর উদ্দেশ্য হলো আবহাওয়া, 'সকাল সাতটায় জাগিয়ে দেবে' এর উদ্দেশ্য হলো অ্যালার্ম। নিউরাল নেটওয়ার্কের তখন কাজটি হয় নতুন অনুরোধের মধ্যে উদ্দেশ্যটির পূর্বাভাস দেয়া। উদ্দেশ্যটি একবার খুঁজে পেলে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া দেখানোটি অন্তত আন্দাজ করা যায়। যেমন 'বীটলদের একটি গান শোনাও'– এই অনুরোধে পূর্বাভাস হিসেবে এর উদ্দেশ্য 'গান শোনাও'টি খুঁজে নিলেই হবে। তখন এটি গান বাজানোর জন্য কম্পিউটারকে প্রস্তুত করে এবং পুরো কথাটির মধ্যে 'বীটলদের' শব্দটি থাকায় বীটলদেরই গান বাজায়। এতে বেশ সীমাবদ্ধতা থাকে, যেমন অনুরোধটি একটি সুনির্দিষ্ট তথ্যভান্ডারের অংশ হতে হওয়াটি একটি সীমাবদ্ধতা, উদ্দেশ্যের সংখ্যাটি কত বড় হতে পারে তারও একটি সীমাবদ্ধতা। এসব কারণে ওই সিরি বা গুগল অ্যাসিস্টেন্টের সঙ্গে একটু দীর্ঘ বা জটিল আলাপ এতদিন সুবিধাজনক হতো না।

কিন্তু গত দু'তিন বছরে মেশিন লার্নিঙের এ জাতীয় ক্ষমতায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে 'বড় ভাষা মডেল' (এলএলএম) নামক এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনে। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রায় সবক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক হয়েছে– তবে কথা বলায়, লেখালেখি করায়, অনুবাদে এই বিপ্লবের মাত্রাই আলাদা। আমরা এ সম্পর্কে আগামী অধ্যায়ে দেখবো। এ কারণেই কয়েক বছর আগে যারা চ্যাটবটের সঙ্গে কথা বলেছেন, এআইকে দিয়ে কিছু লেখাবার চেষ্টা করেছেন, অথবা তখনকার গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপসে গিয়ে ইংরেজি থেকে বাংলা বা বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন প্রায়ই তাতে এমন ফলাফল পেয়েছেন, যা সন্তোষজনক ছিল না। অনুবাদে পারদর্শী মানুষের

কাজের তুলনায় ওটি হতো অনেক কাঁচা। কিন্তু এই বড় ভাষা মডেলের কল্যাণে সেই একই চ্যাটবট বা একই লেখার ও অনুবাদের প্ল্যাটফরম থেকে আমরা প্রায় মানুষের করার মতো সন্তোষজনক ও পারদর্শী ফলাফল পাচ্ছি, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে একটি সুউচ্চ বিজয়কেতন!

বড় ভাষার সৃষ্টি উল্লাস

'বড় ভাষা' কথাটি বলা হচ্ছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ এর বাংলা হিসেবে। ২০২২ সালে এটি আসার পর সারা দুনিয়া হঠাৎ করে এআইকে অসম্ভব সব কাজ করতে দেখতে শুরু করলো। এতদিন এআই মেশিন লার্নিঙের সাহায্যে নানা কিছুর পূর্বাভাস দিয়ে চমক দেখাতো, নানা কাজের কাজি হতো; এখন তার এই নতুন রূপ পূর্বাভাস দেয়া ছাড়াও রীতিমত সৃষ্টির কাজ শুরু করলো– বিশেষ করে ভাষার ক্ষেত্রে– লেখা, রচনা, কাব্য এমনি সব সৃষ্টি! আসলে নতুন এই রূপটির ওপর কাজ চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে, হঠাৎ এটি সর্বসাধারণের হাতের কাছে চলে আসাতে সবাই দারুণ চমৎকৃত হচ্ছে। মেশিন লার্নিং কৌশলের এই যে নব সংস্করণ, একে বলা হলো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল– সংক্ষেপে এলএলএম। আমরাও সংক্ষেপটিই বেশি ব্যবহার করবো। ব্যাপারটি ভাষা নিয়ে শুরু হলো বটে, কিন্তু ভাষাতে সীমাবদ্ধ রইলো না। মেশিন লার্নিং এতদিন যা করছিল, এই মডেল তার সবক্ষেত্রেই যেন বিপ্লব ঘটিয়ে দিলো। কিন্তু একে বোঝা শুরু করতে হবে ভাষার থেকেই।

চারিদিকে ভাষা-তথ্যের ছড়াছড়িটাই সুযোগ

আজ চারিদিকে ডিজিটাল রূপে পাওয়া যায় ভাষার এমন ব্যবহারের কোনো সীমা নেই। এত লাইব্রেরি, এত বই, এত দলিলপত্র, এত মিডিয়া সবই তো নেট-দুনিয়ার এক বিশাল ভাষা তথ্যভান্ডার। আগেই দেখেছি যেকোনো মেশিন লার্নিং তথ্যভান্ডার থেকে ট্রেনিং নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে তথ্যভান্ডারটি বেজায় বড়– তাই এর ট্রেনিং সুবিধাও বেশি, রীতিমত অন্য এক উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মডেলটি ভাষার এই বড় হবার বৈশিষ্ট্য্য ব্যবহার করে বলেই এটি লার্জ– বড় ভাষা। আরো এক অর্থে এটি লার্জ। এখানেও কাজ করে ভিন্ন ধরনের এক নিউরাল নেটওয়ার্ক, তুলনামূলকভাবে অনেক বড়। এতে প্রতিটি স্তরে নিউরোনের সংখ্যা অনেক বেশি; ইনপুট আর আউটপুট স্তরের মাঝখানে যে অনেকগুলো 'লুকানো' স্তর থাকে, তাদের সংখ্যাও অনেক বেশি। তাই এতে বিশ্লেষণের জন্য ইনপুটে ট্রেনিং-তথ্য থেকে পাওয়া

তার সম্ভাবনা-মানগুলো যখন 'ওজন' ও ফাংশানে পরিবর্তিত হয়ে হয়ে লুকানো স্তর দিয়ে আউটপুটের দিকে অগ্রসর হয় এবং আবার বারবার উল্টো যাত্রায় ইনপুটের দিকে ফেরত আসে, তখন যেন এগুলো অতল গভীরে ডুব দেয়। এজন্যই একে বলা হয় ডীপ লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্ক। অবশ্য এই গভীরতা দিয়ে শুধু নেটওয়ার্ক স্তরের সংখ্যাই বোঝানো হচ্ছে না, গভীরতা আরো কিছুতেও। যে কৌশলে এটি ভাষার একটি শব্দের অর্থকে বুঝতে পারে এবং ওই শব্দটির সঙ্গে পুরো রচনার অন্য শব্দগুলোর সম্পর্ক ও প্রাসঙ্গিকতা এবং তাতে তার গুরুত্ব ইত্যাদি উদ্‌ঘাটন করতে পারে, তার মধ্যেও একটি গভীরতা রয়েছে। এসব করতে গিয়ে এ নেটওয়ার্কের প্রত্যেকটি নিউরোনের যে ওজন বা অন্য রকম প্যারামিটার (নিয়ামক) থাকতে হয়, তার সংখ্যাও অত্যন্ত বড়। সাধারণ মেশিন লার্নিঙে যেখানে সেই সংখ্যা কয়েক হাজারের কোঠায়, এলএলএমের ক্ষেত্রে এটি বিলিয়নের কোঠায়! এদিক থেকেও এটি লার্জ।

এখানেও মনে রাখতে হবে যে, এও আগাগোড়া একটি গাণিতিক মডেল বা ফাংশান– ওই নিউরোন, স্তর, ওজন সবই গাণিতিক। কম্পিউটারে দেয়া হয় এমন রূপে যেন এটি ওই সরল কম্পিউটার স্থাপত্যকেও দারুণ কাজ করাতে পারে। ওপরে ওই যে গভীর ক্ষমতাগুলোর কথা বলা হলো তাও গণিতেরই কাজ– ভাষা-তথ্যকে সংখ্যায় রূপ দেয়া, তারপর তাকে নিয়ে নানা গাণিতিক কাজ। ওই গণিত দিয়েই শব্দের অর্থ বোঝা, শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক নির্ণয় ইত্যাদি। আমরা অবশ্য ওই কাজগুলোকে কথার বর্ণনাতেই বোঝার চেষ্টা করবো, গণিতকে সামান্য উল্লেখ করে।

রূপান্তরের কাজ

ওই যে এলএলএম মডেলের 'ডীপ লার্নিং' তার গঠনে মূল কৌশলটিকে বলা হয় ট্রান্সফর্মার বা রূপান্তরক। এই রূপান্তরের কারণেই ভাষায় এক একটি শব্দের অর্থ ও গুরুত্ব নির্ণয় হয় একসঙ্গে বাকি শব্দাবলিকে বিবেচনার মাধ্যমে। এ যেন বিভিন্ন শব্দের সম্পর্কের একটি সমান্তরাল প্রক্রিয়া। সাধারণ মেশিন লার্নিঙে যখন লেখার চেষ্টা করা হয়, তখন সর্বশেষ শব্দটিকে বিবেচনায় নিয়ে পরেরটি নির্ণয় করা হয়েছে, এবং তার পরেরটি, ও তার পরেরটি। কিন্তু এলএলএমে সর্বশেষ শব্দটিকে আগের সব শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় করে তবে পরের শব্দে যাওয়া যায়। এখানেই সাধারণ মেশিন লার্নিঙের কাজের সঙ্গে এলএলএমের বড় পার্থক্য। শব্দের

অর্থ ও পরস্পর সম্পর্ক যে এলএলএম বুঝতে পারে তাও বিশাল তথ্যভান্ডারের সুযোগ নিয়ে গাণিতিক প্রক্রিয়ায়। ওই বিশাল তথ্যভান্ডারে এই শব্দটির নানা ব্যবহার রয়েছে, এবং অন্যান্য শব্দের সঙ্গে তার নানা রকম সম্পর্কেরও। মডেল সেই সুবিধাটি নিচ্ছে, সেইসব থেকে শিখছে।

আমরা আগে মেশিন লার্নিঙে উত্তর দিয়ে দেয়া ট্রেনিং ও উত্তর না দেয়া ট্রেনিঙের পার্থক্য দেখেছি কিছু উদাহরণ নিয়ে। এখানেও এলএলএম এর জন্য তথ্যের মধ্যে কেউ উত্তর দিয়ে বা লেবেল লাগিয়ে রাখেনি। কিন্তু এখানে মডেলকে উত্তরটি ঠিকই বের করতে হয়, তবে তা নিজেকেই করতে হয় নিজে উত্তর খুঁজে বের করে ট্রেনিঙে। আমাদের আগের দেখা সুপারভাইজ্‌ড অথবা আন্‌সুপারভাইজ্‌ড ট্রেনিঙের জায়গায় এটি হলো সেল্‌ফ-সুপারভাইজ্‌ড ট্রেনিং। সুপারভাইজ্‌ড ট্রেনিঙে অ্যালগরিদম তৈরির সঙ্গেই প্রত্যেক তথ্যের সঙ্গে লেবেল লাগিয়ে দেয়া হয়। আন্‌সুপারভাইজ্‌ড ট্রেনিং লেবেল ছাড়াই কাজ করে। সেল্‌ফ-সুপারভাইজ্‌ড ট্রেনিং বা নিজে উত্তর পাওয়া মানে অসংখ্য তথ্যে শব্দটি কোথায় কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে তা দেখে দেখে নিজে অর্থটি বুঝে ফেলা। একবার সেটি করে ফেললে নিউরাল নেটওয়ার্ক তার কাজে এগিয়ে যেতে পারে– ট্রান্সফর্মারের কাজে। এভাবে সেটি পরবর্তী শব্দটি কী হবে তার পূর্বাভাস দিতে পারে, শব্দের পর শব্দ জুগিয়ে নতুন কথা সৃষ্টি করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে এলএলএম প্রধানত লক্ষ করছে ইতোমধ্যে লেখা সর্বশেষ শব্দটিকে, তারপর এর পরের শব্দটি নির্ণয় করে সেটি লিখছে– সবসময় নতুনতর একটি শব্দ। এভাবেই সে অতি দ্রুত বড় একটি রচনা লিখে ফেলতে পারে। অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা জেনে ফেলেছে বলে এটি এক ভাষার পুরো কথা অন্য ভাষায় অনুবাদ করে দিতে পারে। অনুবাদটি করে এক একটি শব্দকে বিবেচনায় রেখে নয়, পুরো কথাকে বিবেচনায় রেখে নতুন ভাষাটিতেও পুরো মর্ম ঠিক রেখে।

ট্রান্সফর্মারের একটি দিক হলো প্রত্যেক শব্দের অর্থ এবং এর সঙ্গের অন্যান্য শব্দেরও অর্থ একই সঙ্গে গাণিতিকভাবে নির্ণয় করা। একে বলা হয় শব্দের এম্‌বেডিং (প্রোথিত করা)। এর মানে ওই রচনাটির মধ্যে শব্দটি কী বোঝাতে প্রোথিত হয়ে আছে তা দেখা। শব্দের এই গাণিতিক রূপটি আসলে একের পর এক লেখা একটি সংখ্যাগুচ্ছ যার সবগুলো সংখ্যা মিলে একটি শব্দের অর্থ-বৈশিষ্ট্য্য প্রকাশ করে। এই এক লাইনে ব্র্যাকেট-বদ্ধ থাকা সংখ্যাগুচ্ছকে গণিতে বলা হয় ভেক্টর। এই ভেক্টর মূলত আসে ওই যে বিরাট তথ্যভান্ডারে তার ট্রেনিং ঘটে সেখান থেকে। কী ভাবে তা আমরা দেখবো। ট্রান্সফর্মারের অন্য যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাকে বলা হয়

অ্যাটেনশন (দৃষ্টি প্রদান)। এটি তার আগের কাছে ও দূরে থাকা নানা শব্দের মধ্যে এই শেষ শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয় করে, তাই এতে কোন্ শব্দের কতখানি গুরুত্ব সেটি তাকে নির্ণয় করতে হয়। যার গুরুত্ব বেশি সেটির দিকে বেশি অ্যাটেনশন দিতে হয়– অর্থাৎ সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করতে হয়। উদাহরণ হিসেবে একটি বাক্য নিলাম:

'কুকুরটি বলের পেছনে ছুটলো কারণ ওটি দ্রুত চল্ছিল'।

প্রশ্ন হলো এই বাক্যে 'ওটি' শব্দটি দিয়ে কাকে বোঝানো হচ্ছে– কুকুরটিকে না বল্‌টিকে? আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারি যে বলটি দ্রুত চল্ছিল বলেই কুকুরটি ছুটেছিল। কিন্তু যন্ত্র সে কথা বুঝবে কী করে? আর না বুঝতে পারলে সে পরবর্তী সিদ্ধান্তটি নেবে কী করে? ট্রান্সফর্মার প্রত্যেকটি শব্দের দিকে দৃষ্টি প্রদান করে প্রত্যেকটির গুরুত্ব ও ভূমিকা বুঝতে পারে। এটিও ট্রান্সফর্মার করতে পারে মূলত ওই বিরাট ভাষা তথ্যভান্ডারে ট্রেনিং করার সুবাদে। সেখানকার অসংখ্য শব্দ-বদ্ধ কথার ব্যাকরণ ও সংখ্যাতত্ত্ব ভিত্তিক বিন্যাস থেকে গাণিতিক ভাবে সে ওই গুরুত্ব ও ভূমিকা বের করে নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে এভাবেই সে বুঝবে কুকুরের কী ভূমিকা ও গুরুত্ব, বলেরই বা কী। কোন্‌টির গুরুত্ব বেশি তা নির্ণিত হবে– এটিই দৃষ্টি প্রদান।

ট্রান্সফর্মারে সবকিছু একটু বোঝার জন্য আমরা এখানে এলএলএমের অনুবাদ-সক্ষমতার কথাটি নিয়ে আসি। সে সঙ্গে আরেকটি কথা বলতে হয় ট্রান্সফর্মার শব্দের ক্রমকে গুরুত্ব দেয়। যেমন একটি বাক্যের শব্দ যখন পর পর লেখে তখন বাক্যে কোন শব্দ প্রথম স্থানে এসেছে, কোন্‌টি দ্বিতীয় স্থানে সেটিও মডেল চিহ্নিত করে রাখে। এখন অনুবাদ প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য আমরা আরেকটি বাক্যকে উদাহরণ হিসেবে নিই:

'বেড়ালটি মাদুরের ওপর বসেছিল'।

এই বাক্যটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে চাই। একে নিউরাল নেটওয়ার্কের ইনপুটে দিলে তার এমবেডিং প্রক্রিয়ায় এর প্রতিটি শব্দের অর্থ-বৈশিষ্ট্য সূচক ভেক্টরগুলো (সংখ্যাগুচ্ছ) নির্ণয় করা হলো। সেই সঙ্গে প্রত্যেক শব্দের ক্রমিক স্থান সূচক সংখ্যাগুচ্ছও। এখন দৃষ্টি প্রদান প্রক্রিয়ায় গাণিতিক উপায়ে দুটি শব্দ বেড়াল ও মাদুরের গুরুত্ব ও ভূমিকা নির্ণয় হলো। অনুবাদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি শব্দের আগের ভেক্টর এখন একটি নতুন ভেক্টরে পরিণত হলো– একটি নতুন সংখ্যাগুচ্ছ। ইনপুটটি ছিল বাংলায়, আউটপুট পেতে চাই এরই ইংরেজি অনুবাদ। দৃষ্টি প্রদানের কল্যাণে তার সুবিধা হয়ে যায়। অনুবাদটি ট্রান্সফর্মারের কাজ। তথ্যভান্ডারে বাংলার

মত অসংখ্য ইংরেজি বাক্য থেকে খুঁজে পাওয়া যায় ওখানে প্রত্যেকটির শব্দের অর্থ বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা ও গুরুত্ব ঠিক রেখে ইংরেজিতে তার জন্য ভেক্টর ও ক্রমস্থান-সূচক সংখ্যাগুচ্ছ দুটি কী হবে। ট্রান্সফর্মারের অনুবাদের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সেখান থেকে সেই হিসেবেই আমরা পাই

'দি ক্যাট সেট অন্ দি ম্যাট'।

বাংলায় শব্দের ক্রমগুলো যা ছিল, ইংরেজিতে কিন্তু তা নাও থাকতে পারে যেমন এখানে থাকেনি। ট্রান্সফর্মারের গাণিতিক রূপান্তর ঠিক করে দেয় কোন্ শব্দ অনুবাদে কোন্ স্থান থেকে কোন্ স্থানে যাবে। এও উভয় ভাষায় অসংখ্য কথার থেকে ট্রেনিং করার ফলে সম্ভব হয়েছে। কীভাবে তার কিছুটা বিস্তারিত আমরা একটু পরে দেখবো।

আপাতত আমরা সাধারণভাবে দেখি এই মহাশক্তিশালী কৌশল ট্রান্সফর্মার কী কী অর্থে রূপান্তরকের কাজটি করছে। এটি একটি বিশেষ ক্রমে থাকা কিছু শব্দকে অন্য ধরনের শব্দে রূপান্তরিত করেছে, যেমন অনুবাদ করতে গিয়ে। আরো সাধারণ ক্ষেত্রে ওটি শব্দ না হয়ে বিশেষ ক্রমে থাকা অন্য কোন চিহ্ন হতে পারে, যা রূপান্তরের সময় ভিন্ন চিহ্নে পরিণত হয়। নিউরাল নেটওয়ার্কের একটি স্তরে তাদের অর্থবৈশিষ্ট বহনকারী একটি ভেক্টরে প্রোথিত বা প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর সেগুলোর দিকে দৃষ্টি প্রদান করে পরের স্তরগুলোর মধ্য দিয়ে নিতে নিতে তাদেরকে এক রকম প্রসঙ্গ-নির্ভর রূপদানের রূপান্তরটিও সম্পন্ন করে। এই অর্থেও এটি ট্রান্সফর্মার।

একটি ভাষার বক্তব্যের খুঁটিনাটি বুঝতে পারেন ওই ভাষা জানেন এমন একজন মানুষ। তিনি তাঁর মস্তিষ্কের কারণেই এটি পারেন। ওই মস্তিষ্কের যুক্তি দিয়েই নিজের ভাষার বক্তব্য দিয়ে তিনি অন্যের ভাষার বক্তব্যটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এর মানে হলো তাঁর দুটি ক্ষমতা আছে- একটি হলো যুক্তির প্রয়োগ, এবং অন্যটি হলো ওই ভাষার মধ্যে নতুন বক্তব্য সৃষ্টি। কোন যন্ত্রের পক্ষে এই দুটি অসম্ভব ছিল। অথচ ট্রান্সফর্মার এটিই করছে। কীভাবে তা করছে?

একটি পুরো বাক্য বা অনুচ্ছেদের যেকোনো জায়গায় থাকা একটি শব্দের সঙ্গে ওখানে তার কাছে বা দূরে থাকা অন্য একটি শব্দের অর্থবৈশিষ্ট্য ও প্রাসঙ্গিকতার সম্পর্কটির গাণিতিক মডেলিং করতে পারে। এই মডেলিং থেকেই এটি পুরো বাক্য বা অনুচ্ছেদের যৌক্তিক গঠনটি ধরে ফেলতে পারে, এবং তার থেকে পরবর্তী শব্দ চয়নের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি সম্ভব হয়েছে ভাষা ব্যবহারের অতি বিশাল তথ্যভান্ডার ডিজিটাল রূপে রয়েছে তার তথ্য থেকে ট্রেনিং নিয়ে। একটি বাক্যের

উদাহরণ নিয়ে বিষয়গুলো আরো একটু দেখা যাক। মডেলের সামনে ইতোপূর্বে না দেখা এই বাক্যটি রয়েছে:

'নাদিয়া বইটি আসলামকে দিয়েছে'।

এ বাক্যটিকে মডেল কীভাবে বুঝবে? তার ভাষা-তথ্যভান্ডারটি ঘেঁটে মডেল দেখবে সেখানে এরকম শব্দ, শব্দগুচ্ছ ইত্যাদি যা আছে তার থেকে ভাষার কী প্যাটার্ন মডেল খুঁজে পাচ্ছে। এটিই ট্রেনিং পাওয়া। এভাবেই দৃষ্টি প্রদান পদ্ধতিতে বাক্যের এক শব্দের সঙ্গে আরেক শব্দের প্রসঙ্গ নিরিখে একটি ম্যাপিং প্রতিষ্ঠা করবে। তথ্যভান্ডার ট্রেনিং থেকে পাওয়া এ জিনিসগুলোই সম্ভাবনার গণিতের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তের দিকে যাবে– আমাদের কাছে যেন মনে হবে বাক্যটিকে অনুধাবনের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তটি এসেছে। সিদ্ধান্তটি হলো– 'বইটি এখন কার কাছে আছে'? এমন প্রশ্নের উত্তর হবে 'আসলাম'। নাদিয়া বইটি আসলামকে দিয়েছে মানে যে বইটি এখন নাদিয়ার কাছ থেকে আসলামের কাছে চলে গিয়েছে– এ সিদ্ধান্ত এটি গাণিতিক রূপান্তরের ফলাফল, গণিতের হিসাবই তা দিয়ে দিয়েছে। মানুষের যুক্তির সক্ষমতার মতো যন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত নেবার সক্ষমতাকে আমরা তার একটি 'অনুধাবন' বলতে পারি। এলএলএমের এই যৌক্তিক ক্ষমতা তাকে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেও শক্তিশালী করে তুলেছে। এখন আমরা এই সক্ষমতার কৌশলগুলোর একটু ভেতরে গিয়ে আর একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি কীভাবে তা কাজ করে। এটি কিছুটা উপমায়, কিছুটা উদাহরণে চেষ্টা করবো।

এক একটি শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠা

সাধারণত ট্রান্সফর্মারের কাজ শুরু হয় ব্যবহারকারী তাকে টাইপ করে বা অন্যভাবে যে একটি লিপি দিয়ে দেন তা দিয়ে। এই লিপিতে কিছু করে দেয়ার বা সৃষ্টি করার নির্দেশ থাকে। লিপিটিকে বলা হয় প্রম্প্‌ট, লিপি দেয়ার কাজটিকে বলে প্রম্প্‌ট করা (বলে দেয়া)। এখন ট্রান্সফর্মারকে এই প্রম্পট লিপির বক্তব্য বোঝার জন্য এর এক একটি শব্দের অর্থকে আন্দাজ করতে হবে এবং সেই অর্থের একটি গাণিতিক রূপ দিতে হবে। এটিই এমবেডিং যার মানে প্রোথিত করা– অর্থাৎ এলএলএমের মধ্যে শব্দটির অর্থ-বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। যন্ত্রের কাছে এই শব্দের লিপিটি তো কিছু আঁকাবাকা চিহ্ন ছাড়া আর কিছু হবার কথা নয়, এর মধ্যেই তাকে অর্থ খুঁজে নিতে হয়। এজন্যই তাকে কৌশল অবলম্বন করতে হয়। আসলে এদেরকে শব্দ না বলে ওই চিহ্ন কথাটাই বেশি ঠিক, সাধারণভাবে এলএলএম তথ্যের এরকম যে ছোট ছোট টুকরা নিয়ে কাজ করে তাকে বলাও হয় এক একটি টোকেন বা চিহ্ন। এমনকি তা

শব্দের আকারেও যখন আসে তখনো, কারণ কোনো কোনো শব্দকে ভেঙেও ফেলা হয় একাধিক টোকেনে। আমরা পরে সেভাবেই দেখবো– আপাতত শব্দই বলি।

অর্থবৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার কৌশলের একটি উপমা দিই, অনেকটা যে রকম করে কাজটি হয়। ধরা যাক ট্রেনিঙের আলগরিদমে (যা মানুষ-ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে দেন) ওই শব্দটি নিয়ে তথ্যভান্ডারকে অনেকগুলো এলোমেলো প্রশ্ন করা হয় যার প্রত্যেকটির হ্যাঁ-না বা তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর তথ্যভান্ডার ঘেঁটে দেখলে পাওয়া যায়। বিশাল তথ্যভান্ডারে এ শব্দটি অসংখ্য বাক্যে অন্যান্য নানা শব্দের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার থেকে স্পষ্ট হয় উত্তর হ্যাঁ, কি না। তার থেকে উত্তরগুলো স্বয়ংক্রিয় ভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০, বা এই দুইয়ের মাঝামাঝি হলে কোন ভগ্নাংশে একে নম্বর দেয়া হবে ও ওই সংখ্যা রেকর্ড হবে। মনে করি শব্দটি হলো 'রাজা'। তা হলে প্রশ্ন, উত্তর ও নম্বরের কিছু নমুনা হতে পারে এরকম:

শব্দ	প্রশ্ন	উত্তর	নম্বর
রাজা:	তার কি ক্ষমতা আছে?	হ্যাঁ	১
	তার কি লেজ আছে?	না	০
	সে কি ধনী?	হ্যাঁ	১
	তার লিঙ্গ কী?	পুরুষ	-১
	সে কি একটি ঘটনা?	না	০

পুরুষ লিঙ্গের জন্য -১ দেয়া আর স্ত্রী লিঙ্গের ১ দেয়াকে একটি রীতি বলা যেতে পারে। এমনিভাবে আরো অনেক প্রশ্নে রাজা শব্দটির অর্থ-বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করার চেষ্টা হতে পারে। এই শব্দগুলো কী হবে সে সম্পর্কে কোনো পূর্বধারণা না থাকাতে অ্যালগরিদমের ওই অনেক প্রশ্ন এলোমেলো যে কোনো কিছু হতে পারে– প্রশ্নের ধরন যেমন খুশি তেমনি অনেক হতে পারে, সব শব্দ সম্পর্কেই প্রশ্ন একইগুলো করা হবে। শব্দটির অর্থ-বৈশিষ্ট্যকে সত্যি সত্যি ধারণ করার জন্য এরকম এলোমেলো অনেক প্রশ্নের দরকার। কিন্তু আমরা আমাদের উদাহরণে প্রশ্নকে পাঁচটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি, এবং এগুলো দিয়েই রাজা শব্দের (ও অন্যান্য শব্দের) কিছুটা হলেও অর্থের হদিশ করার চেষ্টা করছি, আর সেটি করতে হবে গাণিতিক ভাবে। এজন্য ওই পাঁচ প্রশ্নের নম্বর নিয়ে যে সংখ্যা-গুচ্ছ সেটিই হবে রাজা'র এমবেডিং হবার জন্য ভেক্টর। আমরা দেখেছি এই ভেক্টরই অর্থবৈশিষ্ট্যের গাণিতিক বাহক।

রাজার ভেক্টরটিকে লেখা হবে এভাবে: [১, ০, ১, -১, ০]।

এমনিভাবে ইতস্তত 'রানি', 'ঘোড়া', 'যুদ্ধ', 'পুরুষ', 'নারী' এই শব্দগুলোর ভেক্টরও আমরা পেয়ে যেতে পারি আপাতত এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিয়ে তথ্যভান্ডার থেকে। ভেক্টরগুলো কীভাবে গাণিতিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে ট্রান্সফর্মার কাজ করে তার একটু নমুনা পাওয়ার জন্য আমরা এই শব্দ ক'টির প্রত্যেকটির ভেক্টরগুলো নির্ণয় করি:

শব্দ	**প্রশ্ন**	**উত্তর**	**নম্বর**
রানি:	তার কি ক্ষমতা আছে?	হ্যাঁ	১
	তার কি লেজ আছে?	না	০
	সে কি ধনী?	হ্যাঁ	১
	তার লিঙ্গ কী?	স্ত্রী	১
	সে কি একটি ঘটনা?	না	০
ঘোড়া:	তার কি ক্ষমতা আছে?	না	০
	তার কি লেজ আছে?	হ্যাঁ	১
	সে কি ধনী?	না	০
	তার লিঙ্গ কী?	স্ত্রী	১
	সে কি একটি ঘটনা?	না	০
যুদ্ধ:	তার কি ক্ষমতা আছে?	না	০
	তার কি লেজ আছে?	না	০
	সে কি ধনী?	না	০
	তার লিঙ্গ কী?	না	০
	সে কি একটি ঘটনা?	হ্যাঁ	১

শব্দ	**প্রশ্ন**	**উত্তর**	**নম্বর**
পুরুষ:	তার কি ক্ষমতা আছে?	কিছু	০.২
	তার কি লেজ আছে?	না	০
	সে কি ধনী?	না	০
	তার লিঙ্গ কী?	পুরুষ	-১
	সে কি একটি ঘটনা?	না	০
নারী:	তার কি ক্ষমতা আছে?	কিছু	০.২

তার কি লেজ আছে?	না	০
সে কি ধনী?	না	০
তার লিঙ্গ কী?	স্ত্রী	১
সে কি একটি ঘটনা?	না	০

এভাবে এখানকার সব ক'টি শব্দের যে ভেক্টরগুলো পাই, সেগুলো হলো–

রাজা: [১, ০, ১, -১, ০] রাণি: [১, ০, ১, ১, ০] ঘোড়া: [০, ১, ০, ১, ০]

যুদ্ধ: [০, ০, ০, ০, ১] পুরুষ: [০.২, ০, ০, -১, ০] নারী: [০.২, ০, ০, ১, ০]

ভেক্টরগুলো গাণিতিক রাশি। এরকম রাশির অঙ্ক নিয়ে আলাদা গণিত রয়েছে। ভেক্টরগুলোর মধ্যে গণিতের প্রক্রিয়া চলতে পারে নির্দিষ্ট নিয়মে। এমনি একটি নিয়ম হলো দুটি ভেক্টরের যোগ (বা বিয়োগ) করার মানে হলো প্রথম ভেক্টরটির প্রথম সংখ্যার সঙ্গে দ্বিতীয় ভেক্টরটির প্রথম সংখ্যার যোগ (বা বিয়োগ), দ্বিতীয়টির সঙ্গে দ্বিতীয়টির একই কাজ, তৃতীয়টির সঙ্গে তৃতীয়টির ইত্যাদি। এভাবে উদাহরণস্বরূপ আমরা রাজা, রানি, পুরুষ ও নারী এই চারটি ভেক্টরের মধ্যে কিছু যোগ-বিয়োগ করলে নিচের ফলাফল পাই:

রাজা - পুরুষ + নারী = [১, ০, ১, ১, ০]

ফলাফল যেই ভেক্টর, সেটি কিন্তু আবার রানির ভেক্টর।

তাই রাজা - পুরুষ + নারী = রানি

ভেক্টরের গণিত যে শব্দের অর্থ সম্পর্কে একটি বক্তব্য রাখতে পারে, তা আমরা এই উপমায় এই সহজ অঙ্ক থেকেই বুঝতে পারছি।

এমনিভাবে শুধু যোগ-বিয়োগ নয়, ভেক্টরগুলোর মধ্যে নানা রকম গাণিতিক অপারেশন সম্ভব। তা ছাড়া সেগুলোকে বিভিন্ন গাণিতিক ফাংশানের মধ্য দিয়েও নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ট্রান্সফর্মারের কাজে এসব করতে হয়। এভাবে ওই গাণিতিক বক্তব্যগুলোও অনেকটা আমাদের মাথা খাটিয়ে বলা বক্তব্যের মতো হয়ে ওঠে।

এখানে যেভাবে তথ্যভান্ডার থেকে অ্যালগদিমের করা প্রশ্নের হ্যাঁ-না জাতীয় উত্তর বের করে করে ভেক্টর নির্ধারিত হয়েছে– প্রকৃত ব্যাপারটি মোটেই এত সরল নয়, তবে এই উপমায় বোঝা যায় যে তথ্যভান্ডার থেকে কী ভাবে এক একটি শব্দের এমন সব অর্থ-বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে তাকে গাণিতিক রূপ দেয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এই উপমার সঙ্গে মেলে এমন প্রক্রিয়াতে এ ধরনের ভেক্টর নির্ণয় করেই সেটি এগুতে পারে।

আমাদের উদাহরণে এক একটি শব্দকে তার মাত্র পাঁচটি বৈশিষ্ট্যে ধারণ করার মধ্যে আমরা কাজটি সীমাবদ্ধ রেখেছি। একে বলতে পারি শব্দের অর্থ-প্রতিষ্ঠার

কাজটিকে পাঁচটি ডাইমেনশন বা মাত্রায় রাখা। বাস্তব ক্ষেত্রে এটি মোটেও পাঁচটিতে সীমাবদ্ধ থাকে না– শত বা হাজার ছাড়িয়ে যায়। আমাদের পরিচিত আধুনিক চ্যাটজিপিটির মডেল তৈরিতে এ মাত্রার সংখ্যা ছিল ১২ হাজার। কাজেই বাস্তবে যেকোনো শব্দের একেবারে চুলচেরা অর্থই যে ভালোভাবে ভেক্টরে ধারণ করা যায়, তা বলাই বাহুল্য। রাজা, রানি, ঘোড়া, যুদ্ধ ইত্যাদির অর্থ বুঝতে পাঁচটির বদলে যদি পঞ্চাশটি প্রশ্ন করতাম, তাহলে অর্থ কি অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে যেত না?

গাণিতিকভাবে শব্দে শব্দে সম্পর্ক বুঝতে বেশ সুবিধা হয়ে যাবে যদি আমরা আমাদের উদাহরণের কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে মাত্রা একেবারে তিনে নামিয়ে এনে তাকে ত্রিমাত্রিক গ্রাফের মতো চোখে দেখা যাওয়ার ব্যবস্থা করি। আমাদের মস্তিষ্ক সর্বোচ্চ x, y, z এই তিনটি অক্ষ নিয়ে ত্রিমাত্রিক গ্রাফ আঁকতে, দেখতে ও কল্পনা করতে পারে। বাস্তব স্থানটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিন মাত্রার হওয়াতে এর বেশি কোনোকিছু– যেমন চার মাত্রার কিছু আমাদের মাথায় চিত্রকল্পে আসে না। ওভাবে ত্রিমাত্রিক গ্রাফে চাক্ষুষ করে অর্থ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরো কিছু জিনিস বুঝতে পারবো। ধরা যাক রাজা ও রানি এই দুটি শব্দকে শুধু ক্ষমতা, লিঙ্গ, ও ধন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে তিন মাত্রায় স্থাপন করি। তাহলে তাদের ভেক্টর হবে রাজা [১, -১, ১] ও রানি [১, ১, ১] ওই তিন মাত্রাকে গ্রাফের x, y ও z অক্ষরূপে নিতে পারি। রাজা ভেক্টরের সংখ্যাগুলোকে যথাক্রমে ক্ষমতা (x), লিঙ্গ (y), ধন (z) অক্ষে গুণে গুণে হিসাব করে গিয়ে রাজার জন্য এই গ্রাফে সঠিক স্থানে বিন্দু স্থাপন করি, ভেক্টর অনুযায়ী এই বিন্দুর x মান হবে ১, y মান হবে-১, এবং z মান হবে ১। তেমনি রাণির জন্যও একটি বিন্দু। দুটি বিন্দুকে একটি সরলরেখায় যোগ করলে রেখাটি একটি দিক বা অভিমুখ দেখাবে। যেহেতু এখানে শুধু লিঙ্গের ব্যাপারেই রাজা (-১) এবং রানির (১) প্রভেদ কাজেই ওই দুটি পৃথক মানকে যোগ করেই সরলরেখাটি যাবে বলে রেখাটির দিকটি হবে ‘লিঙ্গের দিক’। এই দিকটিই রাজা ও রানির একটি তুলনামূলক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিচ্ছে– এদিক থেকে তাদের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের। গ্রাফ এই সম্পর্কটিকে জ্যামিতিক রূপ দিয়ে ওকে একটি গাণিতিক বিষয়ে পরিণত করেছে। আমরা যদি একই জ্যামিতিক প্রক্রিয়াগুলো অন্য কিছু শব্দের ওপর করি, তাহলে যেমন বাবা ও মা, চাচা ও চাচি ইত্যাদি আরো বহু পারস্পরিক সম্পর্কের একই দিক বা গাণিতিক রূপ পাবো- কারণ সেখানেও পার্থক্যটি লিঙ্গের। এভাবে এলএলএম বিভিন্ন শব্দের মধ্যে লিঙ্গের সম্পর্ককে গাণিতিকভাবে জ্যামিতির একটি দিক হিসেবে দেখতে পাচ্ছে।

ধরা যাক শব্দ দুটি রাজা ও রানি নয়। এরা হলো ঢাকা ও শাহজাদপুর। প্রশ্নগুলো হলো− এটি কি একটি ঘটনা, এটি কি একটি নগরী, এর কি লেজ আছে? তাহলে ভেক্টর হতো ঢাকা (০, ১,০), শাহজাদপুর (০, ০, ০)। যেহেতু এটি নগর কি না শুধু এই প্রশ্নেই বিন্দু দুটির অবস্থানে পার্থক্য কাজেই এদের মধ্য দিয়ে আঁকা সরলরেখার দিক নগর বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কটির ইঙ্গিত করবে। এমনি ভাবে আমরা দেখছি ভেক্টরে গাণিতিক (এক্ষেত্রে জ্যামিতিক) অপারেশন তাদের সম্পর্কের ব্যাপারেও সত্যিকার কিছু বক্তব্য রাখতে পারছে, এইক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কটি কী নিয়ে সে বিষয়ে।

যদি আমরা ওপরের উপমায় মাত্র তিন মাত্রায় সীমাবদ্ধ না থাকতাম, তাহলে যেকোনো শব্দের সঙ্গে অন্য যেকোনো শব্দের বহু মাত্রিক সম্পর্কগুলো জ্যামিতিতে রূপ দিতে পারতাম। মানুষের মস্তিষ্ক তিন মাত্রার থেকে বেশি মাত্রার কোনো ছবি কল্পনাও করতে পারে না বটে, কিন্তু গণিতের কাছে সেই সীমাবদ্ধতা নাই। অর্থাৎ যেকোনো সংখ্যক মাত্রার ভেক্টরের জ্যামিতিক কাজ গণিত ঠিকই করতে পারে, এবং সেই সুবাদে ধারণ করতে পারে শব্দের মধ্যে বহুমাত্রিক সম্পর্কও। চিন্তা করুন ১২ হাজার মাত্রার জ্যামিতি কত কঠিন সম্পর্কই না গণিতে ধারণ করতে পারে!

এই যে ভেক্টরের গাণিতিক প্রক্রিয়াকরণে শব্দের এমবেডিং বা অর্থ প্রতিষ্ঠা একে বলা যায় স্থির অর্থে, কারণ ধরে নেয়া হচ্ছে যে এর অর্থ সর্বত্র একই থাকবে। এর এই একই ভেক্টর একেবারে স্থির। কিন্তু বাস্তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা হয় না।

ধরা যাক একটি লিপি হলো: ‘মেয়েটি ছেলেটিকে নিয়ে নদী তিরে জলস্রোতের কুলকুল ধ্বনির মধ্যে বসলো আর মেয়েটি তার দিকে প্রশ্নের তির ছুঁড়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে থাকলো।’ এখানে তির শব্দটি দু’বার এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই অর্থে। স্বাভাবিকভাবে দুই অর্থের প্রতিনিধিত্বকারী ভেক্টর দুটি ভিন্ন হবে। অথচ লিপিতে যে চিহ্ন বা টোকেন, তা এই দুইয়ের জন্য একই− তথ্যভান্ডারেও শব্দটির সব অর্থে ওই একই চিহ্নই রয়েছে− তির। কাজেই উভয় রকম তিরের যার যার অর্থ প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রত্যেকটির প্রসঙ্গ অনুযায়ী। শুধু শব্দটির একক বিবেচনায় ওই শব্দের অর্থ খোঁজা যাবে না− দেখতে হবে ওটির আশেপাশে বা একটু দূরেও অন্য যে শব্দগুলো আছে যারা একসঙ্গে এক একটি প্রসঙ্গ সৃষ্টি করছে। সেক্ষেত্রে শব্দটির ভেক্টর একটি স্থির ভেক্টর হবে না, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রাসঙ্গিক ভেক্টর হবে।

ট্রেনিঙের সময় বাংলা ভাষার বিশাল লেখার ভাণ্ডারে তির শব্দটার অর্থ শুধু নিজে নিজে ঠিক হয়নি- বরং নদী, জলস্রোত, কুলকুল, ধ্বনি, প্রশ্ন, ছুঁড়ে, ব্যতিব্যস্ত ইত্যাদি

আরো নানা শব্দের সঙ্গে মিলে (যা কি না তাদের ভেক্টরের মধ্যে গাণিতিক অপারেশনের সম্পর্ক) কোথায় তার প্রাসঙ্গিক অর্থ কী তা ঠিক হয়ে গেছে। এর পর নতুন লিপিতে তির শব্দ যে অনুষঙ্গে আসে, সেটি দেখলেই মডেল বুঝতে পারে প্রসঙ্গটি কী। যেমন কোনো লিপিতে তির আছে বটে, কিন্তু তার আশেপাশে বন, শিকার, ধনুক ইত্যাদি শব্দও আছে। তখন মডেল ঠিকই অস্ত্র হিসেবে পাওয়া তার ভেক্টরটি ব্যবহার করবে নদীর তির হিসেবে পাওয়াটি নয়। বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে সম্পর্কগুলো মডেল গাণিতিকভাবে নির্ণয় করে, যেমন রাজার সঙ্গে রানির সম্পর্কটি যে লিঙ্গের দিকে তা আমরা ওপরের উদাহরণে জ্যামিতিকভাবে নির্ণয় করেছিলাম।

আগেই বলেছি সত্যিকার মডেল কোনো লিপি থেকে শব্দকে বিবেচনা করে না, করে টোকেনকে। এক্ষেত্রে টোকেন প্রায়ই শব্দও হতে পারে। কিন্তু একই শব্দকে ভেঙে একাধিক টোকেন হিসেবেও নিতে পারে মূল শব্দ ও তার সঙ্গে ব্যবহৃত অন্য চিহ্নকে আলাদা করে। 'যেমন বেড়ালটি মাদুরের ওপর বসেছিল'– এই বাক্যটির থেকে টোকেন হবে 'বেড়াল', 'টি', 'মাদুর', 'এর', 'ওপর', 'ছিল'। অর্থাৎ মূল শব্দের সঙ্গে কারক, কাল ইত্যাদি বোঝাবার জন্য যে বাড়তি অংশ, তাও আলাদা টোকেন– তারও অর্থ প্রতিষ্ঠিত করা হয় আলাদা ভেক্টর হিসেবে।

বাক্যের মধ্যে টোকেনটি কোন্ জায়গায় (পজিশনে) আছে তার গুরুত্ব আমরা আগেই দেখেছি ইংরেজিতে অনুবাদ প্রসঙ্গে। তাছাড়া পজিশন গোলমাল হয়ে গেলে বাক্যের অর্থেও গোলমাল হয়ে যেতে পারে। কারণ গাণিতিক প্রক্রিয়া করতে গিয়ে ওপরের বাক্যটি যদি 'মাদুরের বেড়ালটি ওপরে বসেছিল' হয়ে যায়, তাহলে অর্থ ঠিক থাকবে না। সেজন্য টোকেনের পজিশনটিকেও একটি গাণিতিক ফাংশানের মাধ্যমে টোকেনের গাণিতিক প্রকাশের সঙ্গে জড়িত রাখতে হয়। শেষ অবধি কাজটি হলো টোকেনের তথ্যভান্ডারে ট্রেনিং অনুযায়ী প্রত্যেক টোকেনের ভেক্টর নির্ণিত হয়ে তার অর্থ প্রতিষ্ঠা– স্থির অর্থ হোক অথবা প্রাসঙ্গিক অর্থ হোক।

দৃষ্টি প্রদান

এখন দেখা যাক বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দের গুরুত্ব বা ভূমিকা জানতে যে অ্যাটেনশন বা দৃষ্টি প্রদানের কথা বলেছিলাম তার প্রক্রিয়াটি কী– কিছুটা আন্দাজ করা যাক। তথ্যভান্ডারে প্রত্যেকটি টোকেন যেন জিজ্ঞেস করছে 'এই বাক্যে অন্য কোনো টোকেনের কাছে আমি কতখানি প্রাসঙ্গিক?' এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য টোকেনটিকে তিনটি জিনিস দেখতে হবে– সন্ধান, চাবি, মান। 'সন্ধানে' টোকেনটিকে জানতে হবে অন্য টোকেনটি তার কাছে কী খুঁজছে। 'চাবিতে' জানতে

হবে সে আমার কী দেখে আমাকে চিনতে পারবে (অর্থাৎ আমার গায়ের লেবেল)। 'মানেতে' জানতে হবে আমার মধ্যে কী গুণ থাকার জন্য আমি তার কাছে প্রাসঙ্গিক হতে পারছি। একটি উপমায় এই তিন জিনিসকে বোঝা যাক।

ধরা যাক রবীন্দ্র রচনাবলির একটি বিশেষ খণ্ড হলাম আমি, যে কি না একটি টোকেন। লাইব্রেরিতে কোন পাঠক আর একটি টোকেন। দেখতে চাই আমি কীভাবে ওই পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক। ওই পাঠক আমাকে খুঁজছে খণ্ডটি পাওয়ার জন্য– এটিই সন্ধান। সে আমাকে কী দেখে খুঁজে পাবে সেটি তার চাবি– এক্ষেত্রে চাবি হলো আমার গায়ের ওপর লাইব্রেরির ট্যাগ নম্বর– যা রবীন্দ্র রচনাবলির অমুক খণ্ড নির্দেশ করে। কিন্তু সে আমাকে খুঁজছে আমার কোন্ গুণের জন্য? কী গুণে আমি তার কাছে প্রাসঙ্গিক? কারণটি হলো আমার মধ্যেই আছে রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ ছোটগল্প– ওটিই হলো মান।

তথ্যভান্ডারে নানা বাক্যে এক টোকেনের সঙ্গে আরেক টোকেনের প্রাসঙ্গিকতা গাণিতিকভাবে নির্ধারিত হয় তাদের মধ্যে সন্ধানের ভেক্টর, চাবির ভেক্টর এবং মানের ভেক্টর দিয়ে। একটি খুবই সরলীকৃত অঙ্কে তা দেখা যাক।

মনে করি এখানে দুটি টোকেন আর একটি টোকেনের কাছে প্রাসঙ্গিক। এই শেষের টোকেনের সন্ধানের ভেক্টরঃ সন্ধান= [১, ০]। আর যে দুটি টোকেন এর কাছে প্রাসঙ্গিক তাদের চাবির ভেক্টর হলো যথাক্রমেঃ চাবি ১ = [১, ০], চাবি ২ = [০, ১]। আর মানের ভেক্টর হলো মানঃ ১ = [১০, ০], মান ২ = [৫, ০]। ভেক্টরগুলো তথ্যভান্ডারই ঠিক করে দেয়, যেভাবে অর্থ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্থের ভেক্টরগুলো ঠিক হয়েছিল অনেকটা সেভাবে। ভেক্টরের যে গণিত তাতে এক রকম গুণফলকে বলা হয় ডট প্রডাক্ট, একটি ভেক্টর দিয়ে অন্য একটি ভেক্টরকে গুণ করা। এই বিশেষ ধরনের গুণে বিন্দুকেই গুণচিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই এই নাম। দুই টোকেনের সন্ধানের সাফল্য সে রকম গুণের ফলাফলে দাঁড়ায়ঃ (সন্ধান . চাবি ১) = ১ আর (সন্ধান . চাবি ২) = ০। প্রাসঙ্গিক হতে প্রতিযোগী দুই টোকেনের জন্য এভাবে সন্ধানের সাফল্য দাঁড়ালো যথাক্রমে ১ ও ০। এর প্রত্যেকটির ওপর সফ্ট ম্যাক্স নামের একটি গাণিতিক ফাংশান প্রয়োগ করে এদের ওজন পাওয়া যায় যথাক্রমে ০.৭৩ ও ০.২৭। এখন প্রতিযোগী দুই টোকেনের মানকে যার যার ওজন দিয়ে গুণ করে এবং ভেক্টর দুটিকে যোগ করে আমরা একটি ফলাফল ভেক্টর পাই [৭.৩, ১.৩৫]। এটি বলে দেয় প্রতিযোগী একটি টোকেনের থেকে বেশি মান আহরণ করা হচ্ছে (৭.৩) এবং অন্যটি থেকে কম মান আহরণ করা হচ্ছে (১.৩৫)। এভাবে মডেল গাণিতিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে বুঝে নেয় কোন্ টোকেনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতার কোন

টোকেনের ওপর ঠিক কতখানি দৃষ্টি প্রদান করতে হবে অর্থাৎ পুরো প্রসঙ্গে কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওই যে আমাদের উদাহরণের বাক্য: "কুকুরটি বলের পেছনে ছুটলো কারণ ওটি দ্রুত চলছিল"– তাতে 'বল' শব্দটিকে গুরুত্ব দিতে দৃষ্টি প্রদান এভাবেই কাজ করেছে। বলই দ্রুত চল্‌ছিল, কুকুরটি তাই একে অনুসরণ করছিল। এটি বুঝতে ট্রান্সফর্মারকে অনেকটা ওপরের সন্ধান, চাবি, মান নির্ণয়েরও তাদের মধ্যে অন্যান্য অপারেশনের মতো কিছু অঙ্ক করতে হয়েছে।

ট্রান্সফর্মারের পুরো ব্যাপারটি একটি অনুবাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করি এই ডীপ লার্নিঙের নিউরাল নেটওয়ার্ক কেমন করে একটি শব্দের পরবর্তী শব্দটি খুঁজে পায়। মোটা দাগে আমরা বলতে পারি নিউরাল নেটওয়ার্কের একটি এনকোডার অংশ আছে এবং একটি ডিকোডার অংশ। এনকোডার ইনপুট নেয়, আর ডিকোডার আউটপুট দেয়। I eat এই ইংরেজি বাক্যটির বাংলা করতে হবে। এনকোডার ইনপুটে I eat দেয়া হয়েছে, এবং ধরে নিই যে এর অনুবাদে 'আমি' শব্দটি ইতোমধ্যে ডিকোডার আউটপুটে এসে গেছে। এখন এটি বাংলায় পরবর্তী শব্দটি পেতে চায়। এজন্য ইনপুট দৃষ্টি প্রদান করে eat এর বিপরীতে একটি 'সন্ধান' শুরু করে দিয়েছে। এনকোডার তথ্যভান্ডারের ট্রেনিং পাওয়া নানা শব্দের 'চাবি' ও 'মানের' ভেক্টরগুলো নিয়ে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটির প্রাসঙ্গিকতা কার কার সঙ্গে তা নির্ণয় করছে। এজন্য অবশ্য তাকে একই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি উভয় তথ্যভান্ডারকে ট্রেনিং কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওই আমাদের অতি সরলীকৃত আগের সন্ধান, চাবি ও মান নির্ণয়ে অঙ্কের উদাহরণের আদলেই দেখতে পেলো যে, 'খাই' শব্দটিই এক্ষেত্রে 'আমি' শব্দটির পরে আসাটিই সব থেকে বেশি প্রাসঙ্গিকতা রাখে। কাজেই ডিকোডার আউটপুটে 'আমি' শব্দের পরে লিখলো 'খাই'। আমাদের মস্তিষ্ক তার উভয় ভাষা জ্ঞান থেকে একভাবে এটি বলে দেয়, কিন্তু মডেলকে বলে দেয় তার গণিত।

এখানেও নিউরাল নেটওয়ার্ক আগের মেশিন লার্নিঙের মতো পূর্বাভাস দিচ্ছে, নানা দলে ভাগ করে প্যাটার্ন তৈরি করে দিয়ে। নিউরোনের ওজন ঠিক হচ্ছে দৃষ্টি প্রদানের প্রক্রিয়ায়– যাও গাণিতিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেকবার নিউরাল নেটওয়ার্ক যেই আউটপুট মান পায়, তা তথ্যভান্ডার থেকে ট্রেনিঙে বের করা উত্তরের থেকে ভিন্ন হলে ভিন্নতা কমাবার চেষ্টা করে যায় বিকল্প টোকেনের ওজন ব্যবহার করে করে। ওভাবেই ঠিক হয় ন্যূনতম পার্থক্যের নিরিখে পরবর্তী টোকেনটি, অর্থাৎ পরবর্তী শব্দটি কী হবে। এটিই এলএলএমের কাজ– শব্দ জুড়ে জুড়ে নতুন সৃষ্টি করা। মূল

মেশিন লার্নিঙের মর্মটি ঠিক ঠিক রেখে বিশাল ভাষা তথ্যভান্ডার আর ব্যাপকতর গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ট্রান্সফর্মার এই সৃষ্টিকর্ম করতে পারছে। ট্রান্সফর্মার অ্যাটেনশনের কৌশলটি এসে এই প্রথমবারের মতো ভাষাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে এআইয়ের উচ্চ সক্ষমতার ভেতরে। মেশিন লার্নিঙের সক্ষমতাকে তা উচ্চে নিয়ে যেতে পেরেছে অনেকখানি। এ কৌশল তাই ডীপ লার্নিঙের কৌশল।

শুধু পূর্বাভাস দিতে নয়, পারছে সৃষ্টি করতে

মেশিন লার্নিং সবসময় পূর্বাভাস দিতে পারছে। তার কাজই হলো তথ্য থেকে শেখা, তা প্যাটার্নে ফেলে ভবিষ্যদ্বাণী করা। ওভাবেই প্যাটার্নে ফেলে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে, সীমিতভাবে কথার পিঠে কথাও বানাতে পেরেছে। কিন্তু ভাষার ওই কাজগুলো তখন ভালো করা যায়নি। তবে এই মেশিন লার্নিং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যেমন পরের মাসে কোম্পানির বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয়ে, কাস্টমারের আচরণ বুঝতে, অথবা চালকবিহীন গাড়ি রাস্তায় কিসের সম্মুখীন হচ্ছে তাতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে। এসব আমরা দেখেছি। মেশিন লার্নিঙের সেই নানা কাজে জয়যাত্রা এখনো শেষ হয়নি– নতুন নতুনভাবে চলছে। সবকিছু সে করেছে তার পূর্বাভাস দেয়ার ক্ষমতা থেকে। এজন্য যে রকম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সে দিচ্ছে তাকে বলা হয় প্রেডিক্টিভ এআই– পূর্বাভাস দেবার এআই।

কিন্তু ২০২২ সনে ওই বড় ভাষার মডেল এলএলএম রূপে যা এলো, তা রীতিমতো একটি বিরাট উল্লম্ফনের মতো। এতে ভবিষ্যদ্বাণী আরো অনেক পাকা হলো– কারণ আরো ব্যাপক পরিসরকে বিবেচনায় নিয়েই পূর্বাভাস দেয়া যাচ্ছে। ভাষার ক্ষেত্রে কথার পেছনে কথা জোগাতে গিয়ে সেই পাকা পূর্বাভাসের দারুণ পরিচয় দিলো এটি। শব্দের পর শব্দ জোড়ার জন্যই পূর্বাভাসটি আসছে বটে, কিন্তু তার পেছনে আছে আরো ব্যাপকভাবে নানা শব্দের সঙ্গে এ শব্দের সম্পর্ক নিয়ে বিবেচনা– যা আমরা ট্রান্সফর্মার (রূপান্তরক) আর অ্যাটেনশনের (দৃষ্টি প্রদান) কাজ বুঝতে গিয়ে কিছুটা দেখেছি। ব্যাপক ভাষা-তথ্যভান্ডার থেকে ট্রেনিং পেতে পেরেছে বলে এটি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু একটি একটি করে শব্দ জুড়ে আগের কথার পুরো মর্মকে এগিয়ে নিয়ে এটি যা করে তার ফলাফল ওই পূর্বাভাস দেয়াকে অনেকটা ছাড়িয়ে যায়। সে এমন কিছু করে যা আগের মেশিন লার্নিং করতে পারেনা। এলএলএমের এই শব্দের পর শব্দের পূর্বাভাস আমাদেরকে উপহার দেয় ভাষার পুরো

একটি বাক্য, অনুচ্ছেদ, এমনকি একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ! এটি রীতিমত সৃষ্টিশীল কাজ, নিউরাল নেটওয়ার্ক ট্রান্সফর্মার কৌশলে এটি সম্ভব হয়েছে। যা ছিল শুধু পূর্বাভাস দেবার এআই, এটি এখন হয়ে পড়েছে সৃষ্টি করার এআই– জেনারেটিভ এআই। পূর্বাভাস এটিও বরং অনেক ভালোই দিচ্ছে, তারপরেও এর এই সৃষ্টিশীলতার নতুন দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সব এলএলএমকেই বলা হয় জেনারেটিভ এআই। সেভাবে একটি লিখে দেয়া প্রম্প্‌টে ভাষার লিপিতে যা চাওয়া হয়েছে, সেটি যেই ভঙ্গিতে পেতে চাওয়া হয়েছে তাতে সাড়া দিয়ে এটি লিখে দিতে পারে গোটা একটি রচনা, ব্যবসায়িক হিসেব, স্বাস্থ্য পরামর্শ, অঙ্কের ব্যাখ্যা এবং এমনকি যাকে আমরা সৃজনশীল সাহিত্য বলি– গল্প, নাটক কবিতা সবই। এজন্যই ওই সৃষ্টিশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে একে জেনারেটিভ বলা।

হ্যাঁ, ট্রেনিঙের জন্য ভাষার বিশাল তথ্যভান্ডার প্রায় অযাচিতভাবেই চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বলেই এর সুযোগ নিয়ে ভাষার ক্ষেত্রেই প্রথমে এই সৃষ্টিশীলতা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এলএলএমের কাজ শুধু ভাষাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও অতটা না হলেও বড় তথ্যভান্ডারের সুযোগ নিয়ে এলএলএম একই কাজ করছে, একই কৌশলে। প্রয়োজনে নানা কৃত্রিম উপায়ে সীমিত তথ্যভান্ডারকেও বড় করে নিয়েছে– কিন্তু সৃষ্টি ঠিকই করছে। এ সৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়েছে ছবি বা ইমেজ সৃষ্টিতে, ভিডিও ও সিনেমা সৃষ্টিতে, সঙ্গীত সৃষ্টিতে, এমনকি কম্পিউটার প্রোগ্রাম সৃষ্টিতে। সবই একেবারেই মৌলিক ও সৃজনশীল কাজ, যা শুধু মানুষেরই করার একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল এ পর্যন্ত, এখন এলএলএম তা করছে।

এই যে প্রয়োজনীয় নানা জিনিসের সৃষ্টির ক্ষমতা তার মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা-বিশ্লেষণ-সম্পাদনা ইত্যাদি করারও সুযোগ যুক্ত হয়েছে। এগুলোই নানা সমস্যা সমাধানে এলএলএমের অসামান্য সাফল্য এনে দিয়েছে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে দলিল রচনা এমনকি চুক্তি সম্পাদনের যাবতীয় কাজ এটি করে দিতে পারছে। বিজ্ঞান গবেষণায় সমস্যা নির্বাচন থেকে শুরু করে এক্সপেরিমেন্টের পরিকল্পনা ও জার্নালে প্রকাশনার দায়িত্বও এর উপর দেয়া যাচ্ছে। আর্ট, বিনোদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ নতুন সব বিভিন্ন মাত্রা সৃষ্টি করতে পারছে। যে বিশেষজ্ঞ প্রোগ্রামারদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারকে ধাপে ধাপে নির্দেশদানের প্রোগ্রাম লিখতে হচ্ছে, এটি তার অনেকগুলো অংশ দ্রুত নিজে করে দিয়ে তাদের কাজ সহজ করছে; এমনকি যে এই কোডিং করা জানেই না, তার জন্যও প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম করে দিচ্ছে– এ তো বহু সমস্যার একই ধারার সমাধান।

আসলে সমস্যার আরো বিচিত্র নানা ক্ষেত্রে এলএলএম তার পূর্বাভাস ক্ষমতা এবং বিশেষ করে তার সৃষ্টির ক্ষমতা প্রয়োগ করে যাচ্ছে– অতি দ্রুত অগ্রগতিতে।

সৃষ্টির কিছু বিপত্তি

বড় ভাষার মডেলে যেভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআই নিজস্ব সৃষ্টিকর্ম দেখাতে পারছে, তার ফলে কিছু বিপত্তিও সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবার জন্য সৃষ্টিকর্ম। যেহেতু মানুষ এই এলএলএমকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে, তাই সেই মানুষ ইচ্ছে করলে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভুয়া সৃষ্টিও ঘটাতে পারে– যেমন ভুয়া খবর, ভুয়া ছবি, ভুয়া কণ্ঠস্বর ইত্যাদি। এলএলএমের নিয়ন্ত্রণকারী মানুষ একজন ইঞ্জিনিয়ারের মতো কাজ করেন। এই মানুষ ইঞ্জিনিয়ার দু'রকমের- দুই ক্ষেত্রেই কিছুটা আনুষ্ঠানিকভাবে ইঞ্জিনিয়ারই বলা হয়। যেমন যিনি এলএলএম সফ্‌টওয়্যারটি তৈরি করে মডেলটি কম্পিউটারে কাজ করালেন তিনি তো অবশ্যই অ্যালগরিদম-ইঞ্জিনিয়ার ওই মডেলের। তার বাইরে মডেলের ব্যবহারকারীকেও বলা হয় এক রকম ইঞ্জিনিয়ার– প্রম্প্‌ট-ইঞ্জিনিয়ার। কিছু করার জন্য মডেলকে যে নির্দেশটি লিখে বা বলে দিতে হয়, সেটিই তো প্রম্প্‌ট। যেমন 'আমাকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্টাইলে একটি বাংলা সনেট রচনা করে দাও'- এই নির্দেশটি একটি প্রম্প্‌ট। এর লিপিকে অনুসরণ করেই এলএলএম তার কাজ করবে– প্রম্প্‌টের শেষ শব্দটির পরবর্তী শব্দ উদ্‌ঘাটন করার মতোই একটি একটি শব্দ দিয়ে পুরো সনেটটি রচনা করবে। প্রম্প্‌ট সবসময় এত সোজাসাপটা নাও হতে পারে। ওই সনেটের নির্দেশের ভেতরেও আমি অনেক কিছু নির্ধারণ করে দিতে পারি, কাজের বিষয়বস্তু, মেজাজ, কী থাকতে পারবে, কী পারবে না ইত্যাদি। কত ভালোভাবে প্রম্প্‌টটি করতে পারছি তার ওপরেই নির্ভর করবে কতটা মনের মতো কাজ পাব– তাই প্রম্প্‌ট-ইঞ্জিনিয়ারকে কখনো বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়।

'ইঞ্জিনিয়ার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে খুব বিচক্ষণ প্রম্প্‌টের কথা মনে করে, আসলে যেকোনো ব্যবহারকারী সাধারণ ভাষায় যেকোনো নির্দেশ এই প্রম্প্‌ট রূপে দিতে পারেন। তাঁর পক্ষে একইভাবে নির্দেশ দিয়ে ভুয়া কিছু বের করা মোটেই কঠিন কিছু নয়। অনেক সময় যেনতেন নির্দেশ দিলেই হয়। অবশ্য অ্যালগরিদম-ইঞ্জিনিয়ার মডেলটিকে অপব্যবহার থেকে নিরাপদ রাখতে পারেন কিছুটা, সেখানে তাঁর দায়িত্ব আছে। এআই নিয়ে এ ধরনের দুই নম্বরী কাজ আগেও ছিল, এলএলএম এমন

প্রতারকের কাজ বেশি সহজ করে ফেলেছে। এ সম্পর্কে পরের অধ্যায়ে আমরা আরো বিস্তারিত দেখবো।

এই যে ভুয়া কিছু সৃষ্টি নিয়ে যে বিপত্তি, এতে এলএলএমকে দায়ী করার কিছু নেই– দায়টি ইঞ্জিনিয়ারদের। কিন্তু আরো কিছু বিপত্তি আছে, যেখানে দায়টি মডেলের নিজের। যে কৌশলে এলএলএম কাজ করে, তার ভেতরেই এই বিপত্তিগুলো নিহিত রয়েছে। এর একটিকে বলা হয় হ্যালুসিনেশন– অলীক কিছু দেখা ও লেখা। এখানে ব্যাপারটি হলো এলএলএম কখনো কখনো তার ফলাফলে এমন কিছু খুব স্বাভাবিক ও আস্থার সঙ্গে বলে যা আসলে একেবারেই মিথ্যা– অনেক সময় এগুলো ডাহা মিথ্যা, কল্পনাপ্রসূত এবং বাস্তব অবস্থার সঙ্গে একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ভুল্‌লে চলবে না এলএলএম যে কৌশলে কাজ করে, তা সত্য ভাষণের কৌশল নয়, বরং তার তথ্যভান্ডার বিচারে পরের শব্দ বা পরের টোকেনটি সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্ভাবনার নিয়মে পূর্বাভাস দেয়াটাই তার কাজ। এর বেশি কিছু নয়। ওটি করতে গিয়েই সে এত অসাধ্য সাধন করে। কিন্তু ওই সম্ভাবনার কারণেই সে অদ্ভুত মিথ্যা তথ্য কখনো কখনো একই রকম আস্থার সঙ্গে দিয়ে দিতে পারে। যেমন দুনিয়ার প্রায় সব দেশের রাজধানীর নাম শুদ্ধভাবে বলে সে ওই তালিকাতেই একেবারেই অবিচলিতভাবে বলে দিতে পারে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী সিডনি (আসলে ক্যানবেরা)। হয়তো তথ্যভান্ডারে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তার বড় নগর সিডনি এত নানা রূপ তথ্যে এসেছে এবং ক্যানবেরা এত কম এসেছে যে, এখানে গিয়ে সম্ভাবনার নিয়ম বিভ্রান্ত হয়েছে। প্রোগ্রাম করা কম্পিউটার কখনো এরকম ভুল করতে পারতো না, তবে মেশিন লার্নিং এবং এলএলএম তো তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। হ্যালুসিনেশন ঘটলে ব্যবহারকারী পড়ে যান দারুণ বিপদে– কারণ তিনি মডেলের ওপর এত আস্থাশীল যে, সে যে এরকম আস্ত ভুল করতে পারে, তা মনে রাখেন না।

হ্যালুসিনেশনের সমস্যাটি মূলত তথ্যভান্ডারের কারণেই সৃষ্ট। এলএলএমের বিশাল তথ্যভান্ডারের ওপর একান্তই নির্ভরশীল হওয়াতেই এটি ঘটে। তথ্যে ট্রেনিং নেবার সময় সম্ভাবনা-নির্ভর এমন সব বিভ্রান্তি ঘটে এবং মডেল এমন ভাবে ওটাকেই সত্যে পরিণত করে ফেলে যে আন্দাজটি ভুল হয়। এলএলএমের ট্রান্সফর্মার সবসময় একটি ভাষাগত সঠিকতা খোঁজে, ঠিক ভুল-শুদ্ধের সঠিকতা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দুটি মিলে যায়– কিন্তু কোথাও গিয়ে আছাড় খায়। অনেক সময় প্রম্প্‌ট বুঝতে ভুল করার কারণেও এটি ঘটে। প্রয়োগের কোনো কোনো ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন বেশি হয়, এবং তা সহজে ধরে ফেলাও কঠিন হয়। সেসব ক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হয়

এলএলএম ব্যবহারে– বিচার বিবেচনা করে তার ফলাফলকে গ্রহণ করতে হয়। যেখানে এলএলএমকে বেশি স্বাধীনতা দেয়া হয় সৃষ্টিকর্মে– যেমন রচনা লেখা, গল্প বলা, চিন্তার ঝড় তোলা সেখানে তার পক্ষে অবাস্তব অসম্ভব জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া সহজ হয়। অন্য দিকে খুব বিশেষায়িত তথ্যের ক্ষেত্রেও এমন হয়। ওখানে তথ্যভান্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়– তাই ছোট একটি তথ্যের ভুল ফলাফলে বেশ বড় ভুল ঘটাতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ভুলের খেসারতটিও বেশি– যেমন চিকিৎসা, আইনী বিষয়, বিজ্ঞান গবেষণা ইত্যাদিতে। আর যেখানে বিষয়টিই একটু ধোঁয়াশার, তথ্য একটু ব্যক্তি-নির্ভর– সেখানে তো হ্যালুসিনেশন বেশি হবেই, যেমন কোন আধ্যাত্বিক আলোচনায়। এলএলএমের এই একটি বিপত্তি নিয়ে ব্যবহারকারীকে সবসময় সচেতন ও সতর্ক থাকতে হয়। মানুষের এই বিশ্বাসভাজন অনুগত অনুচরটি কখন সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন ডাঁহা মিথ্যা কথা বলে যায়, এই ভয়ে সাবধান না থেকে উপায় কী?

অনেক সময় এলএলএমের হ্যালুসিনেশন শুধু ভুল তথ্যের পর্যায়ে নয়, একেবারে অস্থিত্বহীন তথ্যের ক্ষেত্রেও চলে যায়, একেবারেই কল্পনাপ্রসূত। যেখানে কোন তথ্য নেই, ভুল করারও উপায় নেই সেখানেও এলএলএম তথ্যের মতো একটা কিছু বানিয়ে একেবারে সত্য উত্তরের মতো করে ফলাফল দেয়– সন্দেহ করার কোনো অবকাশ না রেখে। যেহেতু এই মডেল তথ্যভান্ডারে তথ্য পেতেই অভ্যস্ত এবং সেইভাবেই কাজ করে, তাই যথাযথ তথ্যের অবর্তমানেও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যবহার করে কিছু একটি উত্তর তৈরি হয়ে যায়। এজন্য অনেকে প্রম্প্টের মধ্যে লিখে দেন: 'কোনো ফলাফল না থাকলে বলো– 'আমি জানি না'। এতে এরকম কাল্পনিক ফলাফল না দিয়ে মডেলের পক্ষে বরং 'আমি জানি না' বলার সম্ভাবনা বাড়ে। সেটি অনেক ভালো।

এলএলএমের আরো এক ধরনের বিপত্তি আসতে পারে পক্ষপাতিত্বের রূপ ধরে। এটি যখন তার কাজ নিরপেক্ষভাবে করতে পারে না, বরং তার ফলাফলে কোনো একটি গোষ্ঠীর তথ্য বেশি গুরুত্ব পায়, অথবা তাতে কোনো একটি বিশেষ ধরনের প্রভাব দেখা যায়– তখন ফলাফলকে পক্ষপাতমূলক বলা যায়। এও প্রধানত মডেলের প্রকৃতি থেকেই আসে। পক্ষপাতিত্বটি সব থেকে বেশি আসে তথ্যভান্ডার থেকেই। হাজার হলেও তথ্যগুলোতো স্বাভাবিক জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকেই আসে। সেখানে যদি ধরা যাক পুরুষতান্ত্রিকতার কারণে নারীদের তথ্য খুব কম থাকে– তাহলে মডেলের ফলাফলে যা পাব, তা প্রধানত পুরুষদেরকে প্রতিফলিত হয়ে আসবে। এমনকি ওই পুরুষতান্ত্রিকতায় প্রভাবিত তথ্যের কারণে এলএলএম নারীকে ছোট ও নেতিবাচকভাবে দেখানো ফলাফলও দিতে পারে। সমাজের তথ্যের মধ্যে থাকা ইতোমধ্যে বিরাজমান পক্ষপাতকে যেন এই ফলাফল শুধু জিইয়েই রাখছে। শুধু

তাই নয়, সেই মূল পক্ষপাতকে এটি মডেলের প্রকৃতি অনুযায়ী নিজের ফলাফলে বর্ধিতও করে। এমনিভাবে কোনো কোনো দেশের সমাজে অন্যান্য নানা পক্ষপাতিত্বও থাকে।

যেমন ওদেশে তৈরি হয় বলে এমন মডেলে সাধারণত বিশাল তথ্যভান্ডার আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সেখানে দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ কিংবা অভিবাসী মানুষরা অনেক তথ্যে অনুপস্থিত, অথবা উপস্থিত থাকলেও ওদেরকে নেতিবাচকভাবে দেখানো হয়। এই একই পক্ষপাতিত্ব তাই মডেলের ফলাফলে চলে আসে। এটি শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, ধরা যাক্ মেডিক্যাল ইমেজ বা এমনি অন্যান্য চিকিৎসার তথ্য যেসব হাসপাতাল থেকে আসে সেখানে চিকিৎসা নেবার সুযোগ প্রধানত ধনবান সাদা মানুষদের রয়েছে। মডেলের ফলাফল থেকে যদি কালো মানুষেরও চিকিৎসার পূর্বাভাস আশা করা হয়, ওটি হয়তো খুব সঠিক হবে না। তথ্য প্রধানত সাদাদের থেকে এসেছে, অথচ তাদের শারীরবৃত্ত কালোদের থেকে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা আলাদা হতে পারে; যে কারণে ফলাফল এক্ষেত্রে সঠিক না হওয়া। এ যেন একটি বাচ্চাকে নানা রকম গল্প যেভাবে বলা হয়, তাতে তার ধারণা হতেই পারে যে, বিজ্ঞানী মানে সব পুরুষ, নার্স মানে সব মহিলা– কারণ গল্পে বেশিরভাগ সেভাবেই এসেছে। বাচ্চার মতোই এলএলএম নিজ থেকে এই পক্ষপাতিত্ব শোধরাতে পারে না। শোধরানোর ব্যবস্থা নিয়ে এখন অনেক কাজ চল্ছে।

অন্যান্যভাবেও কিছু পক্ষপাতিত্ব এলএলএম এ ঢুকতে পারে– যেমন অ্যালগরিদম-ইঞ্জিনিয়াররা যেহেতু ইংরেজিকে বেশি গুরুত্ব দেন, তাই মডেলের সফ্টওয়্যার রচনার সময় তাঁরা ইংরেজি ভাষার সৃষ্টিকর্মের প্রতিটি পদক্ষেপে যেরকম যত্নবান হোন, একটি কম গুরুত্বপূর্ণ ভাষার ক্ষেত্রে এতটা যত্ন নাও দেখাতে পারেন। ফলে এই দুই ভাষার মধ্যে অনুবাদ দুই দিকে সমান মানের হবে না। এই পক্ষপাতিত্বটি তথ্য থেকে আসেনি, এসেছে অ্যালগরিদম থেকে। ব্যবহারকারী যখন নানা নির্দেশ দিয়ে প্রম্প্ট করেন, তখন তিনিও এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব দিয়ে মডেলকে প্রভাবিত করতে পারেন। প্রম্প্টের মধ্যে অনেক সময় কীভাবে ফলাফল আসলে তিনি বেশি সন্তুষ্ট হবেন, তার ইঙ্গিত থাকে যা মডেল বুঝতে পারে এবং সেই পক্ষপাতিত্ব নিয়েই কাজ করে– যেন ব্যবহারকারীকে খুশি করার জন্যই। এর একটি সোজাসাপটা উদাহরণ হলো আপনি নিজের একটি কবিতা প্রম্প্টে লিখে সেখানে যোগ করেন: ‘বিশ্লেষণ করে বল তো কবিতাটি কেমন ভালো হয়েছে’ তাহলে মডেল এটি বিশ্লেষণ ঠিকই করবে, তবে ভালো দিকগুলোই বেশি তুলে ধরবে। প্রম্প্টকে অনুসরণ করতে গিয়েই এই পক্ষপাতিত্ব তার মধ্যে ঘটবে।

ভুয়া সৃষ্টিকর্ম, হ্যালুসিনেশন, পক্ষপাতিত্ব এই সব রকমের বিপত্তির কথাতেই আমরা নানা প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসবো। বর্তমানে এলএলএমের ব্যবহার যেভাবে হচ্ছে এবং এর যে উন্নয়ন ঘট্ছে, তাতে এ বিপত্তিগুলো বোঝার ও তার সৃষ্ট ক্ষতিগুলোকে কমাবার চেষ্টা ও গবেষণা যথেষ্ট রয়েছে। এলএলএমের উজ্জ্বল সব সাফল্যের মধ্যে এগুলোই অন্যতম মাথাব্যথা হিসেবে রয়েছে।

রূপান্তরের ম্যাজিক: ভাষাকে ছাড়িয়ে সবখানে

ভাষার কৌশলটিরই অন্যত্র প্রয়োগ

ভাষার ক্ষেত্রে বড় ভাষা মডেলের (এলএলএম) ট্রান্সফর্মার কৌশল দরুণ সফল হয়েছে। এই রূপান্তরক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে পূর্বাভাস দেয়াতে সীমাবদ্ধ না রেখে একে সৃষ্টিশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় পরিণত করেছে। এটি চাহিদামাত্র তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা, সৃজনশীল সাহিত্য এবং অনেক কিছুর বিচার-বিশ্লেষণ আমাদেরকে দিতে পারছে। যে কৌশলে এটি তা করছে, সেই একই ট্রান্সফর্মার কৌশল অন্য অনেক ক্ষেত্রেও বিস্ময়কর ফল দিচ্ছে, সৃষ্টিশীলও হতে পারছে। এর আগে আমরা মেশিন লার্নিঙের যে বহু রকম অবাক করা কাজ দেখেছি, তার অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই সক্ষমতাকে এই এলএলএম হঠাৎ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের উচ্চতায় নিয়ে গেছে গত দু'তিন বছরে। তবে ভাষার ক্ষেত্রে এটি যে পরিবর্তন এনেছে, তা তুলনাহীন।

এলএলএম এর ট্রান্সফর্মার কৌশলের পদক্ষেপগুলো একটু স্মরণ করি। ইনপুট হিসেবে একে যা দেয়া হয়, তা নানা টোকেনে বা টুকরায় ভেঙে ফেলা হয়। যেমন ভাষার ক্ষেত্রে সেই টুকরা টোকেনগুলো হয় শব্দ বা তার অংশ। প্রত্যেকটি টোকেনের অর্থ বা বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে এমন একটি গাণিতিক ভেক্টর নির্ণয় করা হয়– তথ্যভান্ডারকে প্রশ্ন করার মতো ঘেঁটে ঘেঁটেই এটি সম্ভব হয়। টোকেনগুলোর কোন্‌টির পাশে কোন্‌টি সেই পজিশনটিরও একটি কোড এর সঙ্গে থাকে। কাছের ও দূরের অন্য কোন টোকেনের সঙ্গে এই টোকেনের সম্পর্কের ভিত্তিতে এদের মধ্যে গুরুত্ব, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি নির্ণয় হয়। এটি সম্ভব হয় দৃষ্টি প্রদান (অ্যাটেনশন) নামের পদ্ধতিতে– যাও গণিতের ভাষাতেই আসে। এ যেন টোকেনগুলোর পরস্পরের মধ্যে এক রকম বার্তা বিনিময়– তথ্যভান্ডারের ট্রেনিঙের ফলশ্রুতি। অবশেষে আউটপুট আসে পরের টোকেনটি হিসেবে। এইভাবে টোকেনের পর টোকেন সাজিয়ে এটি উপহার দেয় সৃষ্টিশীল রচনা। অবশ্য সমস্যা অনুযায়ী ভিন্ন রকম আউটপুটও

হতে পারে চাহিদা মত– যেমন নানা দলে বিভক্ত করা তথ্যের বিশেষ দল হিসেবে, অথবা বিশেষ সংখ্যা ফলাফল হিসেবে, ইত্যাদি।

ভাষার এই যে আউটপুট পাওয়া, তা কথা বলা রোবট বা চ্যাটবট এখন চমৎকারভাবে ব্যবহার করছে। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় 'আপনি কেমন আছেন' তার এলএলএম তখন ওই 'আপনি', 'কেমন', আর 'আছেন' এই টোকেনগুলোর অর্থ-বৈশিষ্ট্য তথ্যভান্ডার থেকে খুঁজে নিয়ে প্রত্যেকটির ভেক্টর নির্ণয় করেছে। সেই সঙ্গে দৃষ্টি প্রদান পদ্ধতিতে দেখেছে এখানে গুরুত্বের শব্দটি হলো 'কেমন'। তার সঙ্গে 'আপনি' ও 'আছেন' এই দুইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটিও দৃষ্টি প্রদানের মধ্য দিয়ে নির্ণয় হয়েছে এবং তা এসেছে সংখ্যা রূপে। এই সবকে গাণিতিক ফাংশানের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েই এসেছে আউটপুট। দেখা গেছে তথ্যভান্ডারে এগুলোর সঙ্গে সঠিক গণিতে সম্পর্কিত শব্দগুলোর মধ্য থেকে গণিতই নির্ণয় করে দিয়েছে সঠিক আউটপুট। আর সব থেকে সম্ভাবনাময় হিসেবে সেই আউটপুট হলো 'ভালো'। আপনি প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'ভালো' উত্তরটি পেয়েছেন; তখন কি ভেবেছেন ইতোমধ্যে চ্যাটবটের এলএলএম এতগুলো কাজ করে তবেই উত্তরটি দিতে পেরেছে।

ভাষার এই মডেলটি অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে সেখানেও কাজগুলো এভাবেই ঘটে। আমাদের শুধু ভাষার সঙ্গে তুলনা করে করে দেখতে হবে টোকেন হিসেবে সেক্ষেত্রে কোন জিনিসটি ভাষায় শব্দের সঙ্গে তুলনীয়, কোন জিনিসটি বাক্য বা পুরো অনুচেছদের সঙ্গে তুলনীয়, ইত্যাদি। এখন ট্রান্সফর্মারকে ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর যা যা করতে হয়, এই নতুন ক্ষেত্রে নতুন টোকেনের ওপরও তা তা করতে হবে। বাকি পদক্ষেপগুলোও প্রায় একইভাবে অনুসরণ করে যাওয়া। কয়েকটি ক্ষেত্রের উদাহরণ নিয়ে দেখি।

ইমেজঃ কোনো ছবি বা ইমেজ নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে ছবিটিকে ক্ষুদ্র অনেক আলোক বিন্দু পিক্সেলে ভাগ করে তার প্রত্যেকটির ঔজ্জ্বল্যের প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যায় তা কম্পিউটারে গ্রহণ করা হয়। এই সংখ্যাগুলোর সমাবেশে ইমেজটি মডেলের ইনপুটে আসবে; ভাষার ক্ষেত্রে সেটি হতো হয়তো একটি লিখিত অনুচ্ছেদকে প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যা সমাবেশ। সংখ্যায় চলে আসার পর ভাষা ও ইমেজে দুইয়ের কী বা এমন মৌলিক প্রভেদ? ইমেজের ক্ষেত্রে এই ছবিরই ছোট ছোট অংশকে এক একটি টোকেন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি আসলে কিছু পিক্সেলের সমষ্টি, তথ্যভান্ডারের সহায়তায় যার বৈশিষ্ট্যগুলো পরিণত হয় একটি

ভেক্টরে– এটি তার এমবেডমেন্ট, প্রোথিত হওয়া। বাকি কাজ এই ভেক্টর ও তাদের দৃষ্টি প্রদান নিয়েই– এক টোকেনের সঙ্গে আর এক টোকেনের সম্পর্কের ব্যাপার। ফটো থেকে কারো চেহারা শনাক্ত করাই হোক, অথবা এক্সরে প্লেটে রুগীর ফুসফুসের অবস্থা নির্ণয়ই হোক, এলএলএমকে একই পথে যেতে হয়– ভাষার ক্ষেত্রে যেভাবে গিয়ে থাকে সেই পথে।

আওয়াজঃ আওয়াজের জগতের দারুণ সব কাজও এলএলএম এখন করছে। আওয়াজকে লেখায় পরিণত করা, কণ্ঠস্বর শনাক্ত করা, সঙ্গীতের মধ্যে কণ্ঠের অংশ ও বাজনার অংশ আলাদা করে ফেলা– এসব কাজে এলএলএম এসে অনেক উন্নতি ঘটিয়েছে। এক্ষেত্রে টোকেন হয় আওয়াজের তরঙ্গের এক একটি ক্ষুদ্র অংশ, যা ২৫ মিলিসেকেন্ডের বেশি স্থায়ী নয়। যে সঙ্গীত বা যে কণ্ঠস্বর নিয়ে কাজ, সেটিকে এমনি অনেকগুলো টোকেনে আলাদা করে ফেলে মডেল। এরপর ঘটে এক একটি টোকেনের এমবেডমেন্ট, দৃষ্টি প্রদান পদ্ধতিতে গণিতে আসে টোকেনগুলোর মধ্যে সম্পর্ক, কোন্‌টির কী গুরুত্ব-ভূমিকা ইত্যাদিও। এভাবে হয়তো সৃষ্টি হয় নতুন সঙ্গীত।

বিজ্ঞান গবেষণাঃ ধরা যাক গবেষণাটি হলো ডিএনএ যে প্রোটিনের জন্য কোডিং করছে, সেই শেকলরূপী প্রোটিনটি কীভাবে নানা ভাঁজে জটিল গঠনে পরিণত হচ্ছে, সেটি নির্ণয়ের। ডিএনএ A, C, T, G এই আদ্যাক্ষরে পরিচিত যে চারটি অণুর বিভিন্ন ক্রমে কোডিং করে তার এক একটি অংশ এক একটি টোকেন হয়ে থাকে। আবার সেই কোড অনুযায়ী প্রোটিন শেকলে বিভিন্ন এমাইনো এসিডের যে ক্রম থাকে, তারও এক একটি অংশও টোকেন হয়। এসব টোকেনের অর্থ-বৈশিষ্ট যথারীতি তথ্যভান্ডার থেকে ভেক্টর নির্ণয়ের মাধ্যমে আসে। এখানে কোন্‌ টোকেনের পর কোন্‌ টোকেন সেই ক্রমটির গুরুত্ব এত বেশি, কাজেই বিশেষভাবে এদের পজিশন সূচক বিষয়টি গণিতের মধ্যে আসতে হয়। ভাষার ক্ষেত্রে শব্দ আগে-পরে হয়ে গেলে যতটা না বিপত্তি, এখানে বিপত্তি অনেক অনেক বেশি। ওতে ডিএনএর কোডিং বদলে গিয়ে ভিন্ন প্রোটিনে পরিণত হয়ে পারে যে। আর ওই ক্রমই আবার প্রোটিন শেকলের ভাঁজগুলোতে ভূমিকা রাখে। ওইসবের মধ্যে দৃষ্টি প্রদান করা হয় বলেই গণিত শেষ পর্যন্ত আউটপুটে বলে দিতে পারে ভাঁজগুলো কেমন হতে পারে।

এমনিভাবে এলএলএমের প্রয়োগের যেই ক্ষেত্রই নিই না কেন, ভিন্ন টোকেনে একইভাবে কাজ চলে। যেমন ব্যবসা বাণিজ্যে কী হবে টোকেন? সেটি নির্ভর করবে ব্যবসার কোন্‌ সমস্যার কথা বলছি তার ওপর। স্টক এক্সচেঞ্জে কোন স্টকের ভবিষ্যৎ অবস্থার পূর্বাভাস দিতে একে ব্যবহার করলে স্টকের ওঠানামা করা

দামগুলোই হবে টোকেন– যেমন প্রতিটি ঘণ্টার শুরুতে যেই দাম, সেটিই হতে পারে এক একটি টোকেন।

তথ্যভান্ডারের ঘাটতি পূরণ

এলএলএমকে ভাষার বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা শুনলে স্বাভাবিকভাবে মনে হয়ে এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল তো কাজ করে ডিজিটাল জগতে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা ভাষা ব্যবহারের অতি বিশাল তথ্যভান্ডার আছে বলেই। তার নামও তো সেই বিশাল ভাষাভান্ডারকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যান্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে বিষয়টি ভাষা নয়, অন্য রকম টোকেন নিয়ে কাজ– যেমন ইমেজে, আওয়াজে, বিজ্ঞান গবেষণায়– সেখানে ওই বিশাল তথ্যভান্ডার তো নেই। তাহলে সেখানে এলএলএম কাজ করবে কী করে? যাবতীয় বই, প্রবন্ধ, ইমেইল আলাপ এমনি সব মিলে ভাষায় যা আছে, এক্সরে প্লেটের ছবির হিসাব করলে কি সেরকম এত তথ্য কি আছে? অন্য মেডিক্যাল ইমেজের কথা ভাবলে তো আরো কম– তার কতটা আবার ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় ডিজিটালরূপে ইন্টারনেটে আছে তাও তো কথা। একই কথা অন্য প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বলা চলে। এসবের ক্ষেত্রে ভাষার তুলনায় বেশ কিছু সীমিত তথ্যভান্ডারেই কাজ করতে হয়। কিন্তু এখানে এলএলএমকে সফল হতে হলে এরও তথ্যভান্ডার যথেষ্ট বড় হতে হবে, এবং বিচিত্রও হতে হবে। কাজেই সেই সীমিত তথ্যভান্ডারকে যথাসম্ভব বড় করে নেয়ার উপায়ও বের করতে হয়েছে কিছুটা কৃত্রিমভাবেই। সেগুলো দেখা যাক।

এরকম একটি উপায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, যাকে বলা হয় মাস্ক মডেলিং। মাস্ক করা কথাটার অর্থ হলো কোনোকিছুর অংশবিশেষ ঢেকে দেয়া। এক্ষেত্রে তথ্যের এক একটিকে এখানে ওখানে ঢেকে দিয়ে নতুন তথ্য সৃষ্টি করে একটি থেকে বহু তথ্য সৃষ্টি করাটাই কৌশল। বোঝাবার জন্য ভাষার মডেলের থেকেই এর প্রথম উদাহরণটি নিই, যদিও ভাষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন তেমন নেই। ধরা যাক তথ্যভান্ডারে একটি বাক্য আছে: 'বেড়ালটি মাদুরের ওপর বসেছিল'। দেখা গেলো তথ্যভান্ডারে তথ্যের ঘাটতি আছে– ওটা বাড়ানো দরকার। এই বাক্যের যেকোনো একটি শব্দ (টোকেন) যদি ঢেকে দিই, তাহলে ভিন্ন একটি বাক্য পেয়ে যাই। 'বেড়ালটি' শব্দটি ঢেকে দিলে নতুন বাক্য পাই 'মাদুরের ওপর বসেছিল'। 'মাদুর' আর 'এর' যেহেতু আলাদা টোকেন, 'মাদুর' ঢেকে দিলে 'বেড়ালটি এর ওপর বসেছিল'– আরো একটি বাক্য পেয়ে গেলাম। এমনি ভাবে বিভিন্ন একটি বা

একাধিক টোকেন ঢেকে ঢেকে আরো কিছু বাক্য– প্রত্যেকটি নতুন তথ্য, যা দিয়ে ট্রেনিঙের সুযোগ বাড়ে।

ইমেজের ক্ষেত্রে এভাবে তথ্য বাড়ানো অনেক বেশি প্রয়োজন– এক্সরে প্লেইটের উল্লেখ থেকে সেটি দেখেছি। ধরা যাক এলএলএমের জন্য যে সমস্যা দেয়া হয়েছে, তা হলো জিগ স' পাজলের নানা অংশের সমন্বয়ে একটি বেড়ালের ছবি। ছবির একটা অংশ না থাকলেও সেটি যে বেড়াল তা বুঝে ফেলা যায়, এবং তা বেড়ালেরই একটি নতুন তথ্য। একটি বেড়াল নিয়ে তার এই অংশ ঢেকে একটি নতুন তথ্য পাবো, অন্য অংশ ঢেকে আর একটি নতুন তথ্য পাবো। এমনি ভাবে সীমিত সংখ্যক বেড়ালের ছবির থেকে অনেক বেড়াল ছবির তথ্য পেয়ে যেতে পারি– মাস্কিং পদ্ধতিতে। বেড়ালের ছবির ক্ষেত্রে যা করেছি, তা এক্সরে প্লেইটের সংখ্যার সীমাবদ্ধতা ঘুচাতেও ব্যবহার করতে পারি। ওখানে একটি প্লেইটকে যদি আড়াই'শটি টোকেনে ভাগ করে ফেলা হয়, তার ৭৫% ঢেকে দিয়েও আমরা এমন একটি এক্সরে প্লেট পেয়ে যাব যাকে একটি নতুন এক্সরে প্লেইট হিসেবে তথ্যভান্ডারে বিবেচনা করা যাবে। এমনিভাবে তার বহু অংশ বহু ভাবে ঢেকে একটি প্লেইটের তথ্য বহু প্লেইটের তথ্যে পরিণত করা যায়। যা দরকার তা হলো টোকেনের অর্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং অন্য সব টোকেনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দৃষ্টিদানের জন্য তথ্যভান্ডারে আরো নতুন সম্ভাবনা যোগ হচ্ছে কি না তা। ঢেকে দেয়ার পর সেরকম নতুন তথ্য সম্ভাবনাই সৃষ্টি হচ্ছে। একে মনে করতে পারি যেন হাসপাতাল থেকে আর একটি নতুন এক্সরে প্লেইট এসেছে।

একই রকম মাস্কিং অন্যান্য ক্ষেত্রেও করা যায়। যেমন আওয়াজ বা সঙ্গীতের একটি তথ্যের ক্ষেত্রে এর এখান ওখান থেকে কিছুটা ঢেকে নতুন অনেক তথ্য সৃষ্টি। প্রোটিনের ভাঁজ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এমাইনো এসিড শেকলের টোকেনগুলো থেকে একটি দুটি এমাইনো এসিড বাদ দিয়ে রেখে নতুন কোনো শেকলের তথ্য পেয়ে যাই– তেমনিভাবে অনেকগুলো। এভাবে মাস্কিং অর্থাৎ কোন অংশ ঢেকে রেখে তথ্য বাড়ানোর পদ্ধতিটি এলএলএমের বড় তথ্যভান্ডার গড়তে অনেকগুলো ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। এ যেন একটি গল্পের এক অংশ ঢেকে রেখে গল্পটিকে একটি নতুন গল্পের রূপ দেয়া। অথবা বাচ্চার সামনে যে ক'টা জিগ স' পাজল আছে, তার কোনটার একটি অংশ বাদ দিয়ে ওটিকে নতুন পাজল হিসেবে তাকে দেখানো, যাতে বাচ্চার খেলার ভান্ডারটি বড় হয়।

তথ্য বাড়াবার আর একটি বিকল্প পদ্ধতিও অনেক ক্ষেত্রে বেশ জুতসই হয়। এটি হলো তথ্যের একটিকে কোনোভাবে সামান্য বদলে দিয়ে আর একটি নতুন তথ্য সৃষ্টি করা– যা কি না তথ্য রদবদল পদ্ধতি। যেখানে মডেলটি ছবির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাতে এরকম অনেক ছবিই মডেলের তথ্যভান্ডার। এর মধ্যে কোনো ছবিকে একটু ঝাপসা করে দিয়ে তাকেই নতুন আর একটি ছবি হিসেবে গণ্য করতে পারি– নানাভাবে ঝাপসা করে অনেকগুলো। তেমনি ওই ছবিকে কিছু কাটছাঁট করে, কিংবা ঘুরিয়ে দিয়ে একই কাজ করা যায়। আবার সঙ্গীতের আওয়াজের ক্ষেত্রে অনেক সঙ্গীত নিয়ে যেখানে তথ্যভান্ডার, সেখানে এক একটি সঙ্গীতে কিছু নয়েজ ঢুকিয়ে দিয়ে, অথবা তার খাদ উঁচুনিচু করে, রদবদল পদ্ধতিতে তথ্যভান্ডারকে বড় করা যায়। রদবদলে নতুন তথ্য সৃষ্টির পুরো ব্যাপারটির একটি উপমায় যদি বলি আমরা যখন অঙ্কের ট্রেনিং নিই, তখন শিক্ষক অনেক সময় বেশি প্র্যাকটিসের জন্য একই অঙ্কের ভেতরের সংখ্যাগুলোকে এখানে সেখানে বদলে দিয়ে নতুন নতুন অঙ্ক হিসেবে তা করতে দেন। যেখানে একেবারে নতুন অঙ্কের জোগান বেশি নাই, সেখানে বেশি প্র্যাকটিসের জন্য এটিই সই। এলএলএম এর ট্রেনিঙের জন্যও কথাটি সত্য।

তথ্য বাড়াবার জন্য আছে একটি মজার বিকল্প আছে। এতে এমন কিছু নতুন তথ্য সৃষ্টি করা হয়, যা বাস্তবে নেই– এগুলো সিনথেটিক বা বানানো তথ্য। কম্পিউটার সিম্যুলেশনের মাধ্যমে এরকম তথ্য সৃষ্টি করা যায়। কেউ বলতে পারে যে, এরকম সৃষ্টি করা সিম্যুলেটেড তথ্য দিয়ে ট্রেনিং করলে তো এলএলএম সঠিক ফলাফল দিতে পারবে না। তথ্য সিমুলেটেড হতে পারে, কিন্তু তাই বলেই তাকে তো মিথ্যা হতে হবে না। বিমানের পাইলটের জন্য তিনি যখন সিম্যুলেটেড বিমানে বসে প্র্যাকটিস করেন, সেগুলো যদি মিথ্যা ও অসম্ভব হতো, তাহলে তাঁর ট্রেনিং গোল্লায় যেতো, তিনি বাস্তব বিমানে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতেন। সিম্যুলেশন জিনিসটাই হয় এমন কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে। এলএলএমের ক্ষেত্রেও ট্রেনিং তেমনি সিনথেটিক অথচ সত্য তথ্যের ভিত্তিতেই হতে পারে। ধরা যাক আবহাওয়ার পূর্বাভাসের এলএলএম মডেল তার ট্রেনিঙের জন্য সত্যিকার আবহাওয়ার তথ্য যথেষ্ট পাচ্ছে না। কিন্তু এখন পদার্থবিদ্যা, আবহবিদ্যা ইত্যাদির তত্ত্বের ওপর গড়ে তোলা প্রচুর গাণিতিক মডেল রয়েছে, যার মাধ্যমে চমৎকার সব আবহাওয়ার সিম্যুলেশন তৈরি করা সম্ভব। এগুলোর ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখা যায়, কারণ সত্যিকার যেকোনো দিনের আবহাওয়া এরকম হতে পারতো।

এই যে তথ্য বাড়াবার নানা পদ্ধতি, ভাষার ক্ষেত্রে এর কোনোটিই প্রয়োজন হয় না– ভাষায় তথ্যের অভাব হবার নয়। ভাষার এই সুবিধাটাই আবার অন্যান্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে কাজে লেগে যায় সেখানকার তথ্যে আরো জোগান দেবার কাজে। অন্য কিছু কিছু প্রয়োগ আছে যেখানে সঙ্গে ভাষারও কিছু সংশ্লেষ আছে। আমরা যদি ভাষার ওই অংশকে অবহেলা না করে তথ্যভান্ডারে অন্তর্ভুক্ত করি, তাহলে বাড়তি তথ্য নেহাত কম হবে না। যেমন এক্সরে প্লেটের থেকে রোগের পূর্বাভাস দেবার যে মডেল, তার তথ্যভান্ডার তৈরি হয় অতীতের অনেক এক্সরে প্লেট ও তার রোগের পরিচয় নিয়ে। কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি যে, যেই রেডিয়োলজিস্টরা মূলত ওই প্লেটগুলো দেখেছেন, তাঁরা ভাষায় এর বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তও এর সঙ্গে লিখে দিয়েছেন রিপোর্টরূপে। ওই প্লেটের সঙ্গে এই রিপোর্টকেও তথ্যভান্ডারে অন্তর্ভুক্ত করলে তথ্যভান্ডারটি অনেক বড় হয়– কারণ এই ভাষায় আসা অংশগুলোও নতুন ধরনের তথ্য। শুধু তাই নয়, ছবির ক্ষেত্রে কোন্‌টি কোন্ রোগ নির্ণয় দেখাচ্ছে, সেই উত্তরটি সঙ্গে লেবেল হিসেবে ট্রেনিঙের তথ্যে দিয়ে দিতে হলেও, ভাষার ক্ষেত্রে উত্তরগুলোকে নিজ উদ্যোগেই লেবেল করে নেয় মডেল নিজে, ওখানকার রিপোর্টের শব্দগুলোর অর্থ-ভেক্টর নির্ণয় করে করে। এতে অবশ্য প্লেটের ছবির জন্য এক রকম টোকেন, যা কি না আলোর ফোটা, এবং রিপোর্টের জন্য ভাষার শব্দের টোকেন ব্যবহৃত হবে। এভাবে একাধিক টোকেনের এক সঙ্গে ব্যবহারও তথ্যের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের একটি উপায়।

ভাষা ট্রান্সফর্মারের নানা প্রয়োগ

ওপরের একটি উদাহরণে তথ্য বাড়াবার জন্য আমরা এক্সরে ছবির সঙ্গে ভাষায় লেখা রিপোর্টকেও তথ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এর অর্থ হলো এক্সরে ছবি থেকে রোগের পূর্বাভাস পাওয়ার ক্ষেত্রে ছবি নিয়ে যে এলএলএম, তার মধ্যেও ভাষার জন্য ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে ওই পূর্বাভাসে তারও একটি অবদান যোগ হয়েছে। কাজেই লেখা, রচনা, দলিল ইত্যাদি সৃষ্টি করা ছাড়াও ভাষা ট্রান্সফর্মারের অন্য নানা প্রয়োগও রয়েছে। এর কোনো কোনোটা নিজেই শুধু ভাষা সংক্রান্ত, আবার কোনো কোনোটি ওপরের উদাহরণের মতো অন্য ট্রান্সফর্মারের সঙ্গে যৌথভাবে।

চ্যাটবট ও সহকারীঃ যে রোবটের জন্য আলাপটিই গুরুত্বপূর্ণ, সেটিকে বলা হয় চ্যাট রোবট বা চ্যাটবট (আলাপী রোবট)। ওই আলাপ কথা বলার মৌখিক আলাপ হতে পারে, আবার মানুষ প্রম্পট করার মতো কী-বোর্ডে লিখে দিচ্ছে আর চ্যাটবট

স্ক্রীনে উত্তর লিখে দিচ্ছে– এমনও হতে পারে। ব্যক্তিগত সহকারী হোক বা ব্যবসায়িক সহকারী হোক, যে কোন সহকারীকে নির্দেশ দেয়া তার থেকে তথ্য বা কাজ বুঝে নেয়ার জন্যও এই একইভাবে আলাপ চলতে পারে। চ্যাটবট এভাবে যেন এক রকম মানুষ আপনজনের মতো হয়ে উঠতে পারে আলাপের মাধ্যমে– কারণ এলএলএমের ট্রান্সফর্মার কৌশল এমন যুক্তিসঙ্গত আলাপ সম্ভব করেছে, যা দুই মানুষের আলাপের প্রায় সমতুল্য। দীর্ঘ সময় ধরে বেশ জটিল বাক্যেও কথার বিপরীতে কথা বলার সক্ষমতা চ্যাটবটের মধ্যে এটিই সৃষ্টি করেছে। এটিও অনুচ্ছেদ রচনা বা দলিল রচনার মতোই একটি সৃষ্টিকর্ম। আর সহকারী তো কথার আলাপ ছাড়াও অন্য কাজ করেও সহায়তা দেয়। তার মধ্যে কথা শুনে তা লিখে দেয়া, নিজে কোনো রচনা বা দলিল তৈরি করা, কোনো লিপির সার-সংক্ষেপ তৈরি করা, সেটিকে সারণির আকারে করে দেয়া, এমনকি কোনো রচনা বা দলিলের বিশ্লেষণ বা সমালোচনা করা এবং তার পুনর্লিখন করে দেয়া এমনিতরো কাজও থাকতে পারে।

অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মডেল যে এসব কাজ করতে পারে, সেটিও বিবেচ্য বিষয়। দ্রুত করে বলে চ্যাটবট সহকারীর কাজকে বারবার বদলিয়ে করিয়ে সব থেকে সন্তোষজনকটি নির্বাচন করা যায়। যেমন তাকে বলা যেতে পারে, যে ওই চিঠির খসড়াটিকে আর একটু নরম ভাষায়, বা আর একটু বন্ধুসুলভ করে দিতে। সে ওটি করবে, বলতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে করবে। চ্যাটজিপিটির মতো একটি চ্যাটবট সহকারী এভাবে কত কিছু যে করতে পারে, তার সীমা নেই। যেরকম সৃজনশীল কাজ মানুষ নিজে করতে তার অনেক ভাবনা-চিন্তার, অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়, তাও এরকম চ্যাটবট সেকেন্ড-মিনিটের পরিসরে করে দেয়। তাই এমনো হতে পারে যে, আপনি তাকে দিয়ে কোন বিষয়ে একটি ভালো সনেট কবিতা লেখাতে চান। সে যা দিচ্ছে তা আপনার পছন্দ হচ্ছেনা, আবার তা বদলিয়ে লেখাতে পারেন। অথবা একবারেই বলতে পারেন ওই বিষয়ের ওপর ওই স্বাদে ১৫টি সনেট লিখে দিতে। এলএলএম এর সৃষ্টিকর্মের ধারাটিই এমন যে কোন দুটি এক রকম হবে না, কিছুক্ষণের মধ্যে নানা ধাঁচের ১৫টি সনেটই সে লিখে দেবে, বেশির ভাগেরই যথেষ্ট মৌলিকতা থাকবে– আপনি পছন্দেরটি বেছে নিতে পারবেন।

আবার তাকে এমনো কাজ দিতে পারেন যেটি একেবারেই ভিন্ন রকম। যেমন বলতে পারেন আপনাকে গণিতের ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় একেবারে ধাপে ধাপে বুঝিয়ে বুঝিয়ে শিখিয়ে দিতে। সে তাই করবে। মাঝখানে আপনি প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে, বা আরো ভালো বুঝতে চাইলে

তাও বোঝাবে। এর জন্য আরো সহজ উদাহরণে বোঝাতে বল্লে– নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করে সেটি দিয়ে বোঝাবে। যেহেতু ভাষার তথ্যের বিশাল ভান্ডার থেকে সে ট্রেনিং পেয়েছে সে কারণে সনেট থেকে ক্যালকুলাস, চিকিৎসা পরামর্শ থেকে আইনি পরামর্শ সবই সে বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই দিতে পারে। এ যেন মডেলটিকে আপনি আপনার ইচ্ছেমত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চরিত্র দিয়ে সেভাবে তাকে কাজ করাচ্ছেন। তাকে কখনো সহকারীর, কখনো শিক্ষকের, কখনো চিকিৎসকের চরিত্র, ইত্যাদি দিচ্ছেন। আর এই যে সবকিছু করছে, তার সক্ষমতা কোনো বিশেষ ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। এলএলএমের অনুবাদের যে প্রক্রিয়া, তা এর ভাষান্তর সক্ষমতাকে অত্যন্ত উচ্চে নিয়ে গেছে। এখন সে এমন ভাবে অনুবাদ করতে পারে, যা দুই ভাষাতেই দক্ষ মানুষ-অনুবাদকের প্রায় সমকক্ষ বলে বিবেচিত হতে পারে। যে ভাষায় অনুবাদ করছে সে ভাষার রস, কথকতা যেমন সেটি স্বাভাবিক ভাবে আনতে পারে তার প্রবাদ, বাগধারা ইত্যাদিও সঠিক অর্থ-দ্যোতনাও বজায় রেখে ব্যবহার করতে পারে।

২০২২ সালে আসা ওপেন এআই চ্যাটজিপিটি চ্যাটবটকে আমরা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছি কারণ এটি প্রথম এসে তার ওই অবাক করা কাজগুলো দেখিয়েছে, এখনো দেখিয়ে চলেছে ক্রমেই আরো উন্নতভাবে উন্নত সংস্করণে। কিন্তু তার পরপরই এসেছে গুগলের প্রথমে বার্ড এবং পরে জেমিনাই। এমনিতরো কিছু কিছু আরো বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছে নতুন নতুন চ্যাটবট। যেমন কিশোর-কিশোরীদের সব থেকে বেশি পছন্দের একটি চ্যাটবট হলো কারেক্টার এআই। এটি চাহিদা মতো যেকোনো পরিচিত বা ঐতিহাসিক চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে সেই ভূমিকায় আলাপ করতে পারে। সেই চরিত্রটি এমনো হতে পারে যে, আসলে সেটি একটি কাল্পনিক চরিত্র, কিন্তু ইতোমধ্যে কিশোর-মনে বাস্তব চরিত্রের মতো আসন নিয়ে নিয়েছে। আরো মজার ব্যাপার হলো ব্যবহারকারী যদি নিজেই একটি অজানা চরিত্র সৃষ্টি করে নিতে চায়, তাও সই। শুধু বলে দিতে হবে কেমন হবে সেই চরিত্র, তখন চ্যাটবট চট্ করে নিজেকে সেই চরিত্রের ভূমিকায় নিয়ে যাবে আলাপের মাঝখানেই। অনুরোধকারীর মনের মতো না হলে, তিনি বল্লেই সে নিজেকে সেভাবে বদলিয়েও নেবে।

ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান: মেশিন লার্নিং আগে থেকেই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কাজ থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তগুলোতে পর্যন্ত যেরকম চমৎকার সহায়তা করে এসেছে, তার কিছুটা আমরা দেখেছি। এলএলএম

এসে নতুন যে বড় পরিবর্তন করেছে, তা এসব কাজের ভাষাগত দিকগুলোতে। আগে যেসব দলিল রচনার কাজ মানুষ কর্মকর্তার ওপরই থাকতো, এলএলএম এখন স্বচ্ছন্দে তার দায়িত্ব নিতে পারছে। এর প্রভাব ব্যবসার সর্বস্তরেই পড়েছে– একটি ইমেইল লেখা, বা একটি ইমেইলের জবাব দেয়া, অথবা কোনো সভায় থেকে সভার যাবতীয় কথাবার্তা শুনে তার কার্যবিবরণীটি লিখে ফেলা, এমনকি এর সারমর্ম ও করণীয় কাজগুলো বিভিন্ন দফতরের জন্য আলাদা করে লিখে ফেলা। এসবও এখন মানুষ-হস্তক্ষেপ ছাড়াই হতে পারে– যদিও মানুষের চূড়ান্ত তদারকিটি বজায় থাকছে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যেখানে অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে, বাজারের অবস্থা, প্রতিযোগীদের অবস্থা ইত্যাদি আন্দাজ করে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে, সেটিও এখন এলএলএম করতে পারছে। এটি ইন্টারনেট ও অন্যান্য সংযুক্ত তথ্য উৎসে গিয়ে এ নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাতে পারে এবং এ সম্পর্কে ফলাফল নীতিনির্ধারণী কর্মকর্তাদের কাছে বিভিন্ন বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। বিশ্লেষণের কাজগুলো এলএলএম যে ভাবে করতে পারছে আগের মেশিন লার্নিং তেমন পারতো না। যেমন ধরা যাক তেলের দাম যে ৩০% বাড়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে, তাতে তার প্রতিক্রিয়া কোম্পানির সরবরাহ চেইন, চাহিদা, কর্মসম্পাদন, মূল্য নির্ধারণ, মুনাফা, স্টক মূল্যের ওপর কী প্রভাব রাখবে তার নির্ধারণ।

চ্যাটবট বা সহকারীরা যেভাবে অন্যের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে দেখেছি, সেই সুবিধাগুলো ব্যবসায়িক ও যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য নানা কাজে আসছে। যেকোনো গ্রাহক এখন চ্যাটবটের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সবরকম তথ্য পাওয়া ছাড়াও কথা বলে নিজের যেকোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান করতে পারেন। কোম্পানির হয়ে বেশ বড়সড়ো কর্মযজ্ঞ নিজের হাতে নিতেও চ্যাটবট ও তার সহযোগী এলএলএম পিছপা হচ্ছে না। এমনি একটির উদাহরণ হলো কর্মী নিয়োগ। এর জন্য দরখাস্ত চাওয়া, দরখাস্তগুলোকে নানা তথ্যের ভিত্তিতে বাছাই করে সাক্ষাৎকারের জন্য ছোট তালিকা তৈরি করা, নিজেই তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া এমনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এলএলএমের পক্ষে এখন সম্ভব। মনে রাখতে হবে যে, এ কাজে হয়তো হাজার হাজার দরখাস্ত বাছাই করা দিয়ে শুরু করতে হবে, হয়তো বহু ঘণ্টা ধরে সাক্ষাৎকার নিতে হবে অনেকের, তাদের মধ্য থেকে প্রশ্নের উত্তর, ব্যক্তিত্ব, পটভূমি সবকিছুর নিরিখে ফাইনালিস্টদেরকে নির্বাচিত করতে হবে। এত কাজ করতে মানুষের দিনের পর দিন লাগতো।

ব্যবসায়িক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজের জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু মডেল গড়ে উঠেছে, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য। যেমন মাইক্রোসফ্‌টের ৩৬৫ কোপাইলট যেকোনো প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও দৈনন্দিন কাজের দারুণ সহায়ক হতে পারছে– সভার কার্যবিবরণী নিতে, তথ্যের বিশ্লেষণে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ সহ। সেইল্‌স ফোর্স জিপিটি নামের একটি মডেল যেকোনো বিপণন কোম্পানির পণ্যের চাহিদার পূর্বাভাস, পণ্যের মজুত স্টক ব্যবস্থাপনা, গ্রাহক সেবা ইত্যাদির দায়িত্ব নিতে পারছে। হার্ভে এআই এর লিগ্যাল মডেলটি বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য নানা দলিল রচনা, এদের আইনি ভিত্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তা সংশোধন ইত্যাদির দায়িত্ব নিতে পারছে। বহুতরো মডেলের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখাতে এ কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় ভাষার অংশ: মেশিন লার্নিং চিকিৎসার ক্ষেত্রে বহুদিন ধরেই তৎপর– এমনকি অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও। তার কিছু আমরা দেখেছি। এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এলএলএম নতুন সুযোগ এনেছে; যেমন খুব বড়ভাবে এনেছে মেডিক্যাল ইমেজকে আরো সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করে রোগ নির্ণয়ে। এসবকে আমরা ইমেজের ক্ষেত্রে এলএলএমের প্রয়োগ হিসেবে পরে দেখবো। কিন্তু এ মুহূর্তে চিকিৎসাবিদ্যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সব থেকে ব্যাপক ব্যবহার যা হচ্ছে, তা হলো এর ভাষার অংশে– যেখানে কাজের মধ্যে এলএলএমের প্রয়োগ একেবারে সরাসরি। চিকিৎসককে এই কাজগুলোতে প্রচুর সময় দিতে হয়; এখন হয়তো আর দিতে হবে না। এসব কাজের মধ্যে রুগীর মেডিক্যাল রেকর্ড দেখা আছে, তার ব্যাখ্যার ব্যাপার আছে, যে টেস্টগুলো করতে দেয়া হয়েছিল তার লিখিত ফলাফল বুঝে নেবার ব্যাপার আছে, ব্যবস্থাপত্র লেখা আর তা নিয়ে রুগীকে পরামর্শ দেবার ব্যাপার আছে। এসবের সময় বাঁচাতে পারলে চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ে আরো বেশি মনোযোগ দিতে পারবেন।

রুগীর দীর্ঘ মেডিক্যাল রেকর্ড এখন ডাক্তারের না পড়লেও চলে; এলএলএম এটি পড়ে সার-সংক্ষেপ করে দেয়, ডাক্তার শুধু ওইটাই দেখেন। সার-সংক্ষেপে চিকিৎসার দিক থেকে জরুরি বিষয়গুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিতেও এটি পটু। রুগীর সঙ্গে ডাক্তারের যে কথাবার্তা প্রশ্ন-উত্তর এসবের সারসংক্ষেপও ওভাবেই তৈরি করে ফেলে এলএলএম। নুয়্যান্স ড্রাগন অ্যাম্বিয়েন্ট নামের একটি মডেল আছে যা ওই কথাবার্তার সময় শুধু রোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয়ে জরুরি বিষয়গুলোই তার নোটে নিয়ে আসে– বুঝতে পারে কথাবার্তার কোন্ বাক্যটি, কোন্ শব্দটি এভাবে জরুরি, তার সূক্ষ্ম অর্থ বিশ্লেষণেই সে ওটি ধরে ফেলতে পারে। মডেলের নামে নুয়্যান্স

শব্দটির মানেই তো ওরকম সূক্ষ্ম অর্থ-বিশ্লেষণ। কথার থেকে দরকারি অংশ ধরে ফেলা প্রয়োজন, কারণ রুগী তো বিশেষজ্ঞের মতো বোঝেন না, তাঁর কথাও সেরকম সঠিক অনুভূতিকে সঠিক শব্দে বলার মতো হয় না। অনেক সময় তিনি বহু কথা বলেন রোগটির কারণে তাঁর নানা কষ্টের কথা; তার মধ্য থেকে আসল জরুরি লক্ষণগুলো ধরে ফেলাটাই মডেলের কাজ– যেটি অভিজ্ঞ ডাক্তারও পারেন। এখন দীর্ঘ কথাবার্তার কাজটি ডাক্তার একটি সহানুভূতি প্রকাশকারী চ্যাটবটের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন। তার দেয়া নোট পড়ে ডাক্তার রুগীকে প্রয়োজনে আরো সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করে সুনির্দিষ্ট উত্তর পেতে পারবেন।

কীভাবে সম্ভব হচ্ছে এলএলএমের পক্ষে রুগীর সাধারণ কথা থেকে বিশেষ তথ্যগুলো পেয়ে যাওয়া? এমনি বহু ডাক্তার-রুগীর কথোপকথন থেকে এবং তার প্রত্যেকটির ফলাফল থেকে ট্রেনিং পেয়ে এ কথার প্যাটার্ন বুঝে ফেলাটাই মডেলকে এই ক্ষমতা দিয়েছে। রুগীর সঙ্গে দীর্ঘ কথা বলায় উপযুক্ত চ্যাটবট এখন রয়েছে। যেমন ব্যাবিলন হেল্থ এআই নামের একটি মডেল এই কাজ করে থাকে। এটি কথা বলে একেবারে সাধারণ মানুষের মতো। কিন্তু ডাক্তারের জন্য এর যেই নোট তৈরি করে সেটি একেবারে ডাক্তারি ভাষায়। এও এলএলএমের এক রকম অনুবাদের কাজ হিসেবেই ধরতে পারি– সাধারণ কথার সার-সংক্ষেপকে ডাক্তারি কথায় অনুবাদ।

জনস্বাস্থ্য নিয়ে আন্দোলন, প্রচারণা ইত্যাদিতেও এলএলএমের একটি সুবিধা আছে। মানুষের পক্ষে ক্ষণে ক্ষণে বক্তব্য বদলিয়ে প্রচারণার প্ল্যাটফরমগুলো বারবার সংশোধন করা খুব কঠিন কাজ হয়, বিশেষ করে তা যখন দেশব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী নানা ভাষায় দেয়া বার্তার ব্যাপার হয়। উদাহরণস্বরূপ করোনা অতিমারির সময় এরকম ক্ষণে ক্ষণে বার্তা বদলাবার প্রয়োজন হয়েছিল, কারণ পরিস্থিতি এবং আমাদের জ্ঞান কিছু পরপরই বদলাচ্ছিলো। এলএলএম নতুন তথ্য নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুধু বুঝেই ফেলে না যে, এখন কী বলতে হবে; তার উপযুক্ত বার্তাকে লিখিত, অডিও, ভিডিও নানা ভাষায় তৈরিও করে ফেলতে পারে, যতবার দরকার দ্রুত কয়েক মিনিটের মধ্যে। জনস্বাস্থ্য-সাহিত্যের যে বিরাট তথ্যভান্ডার থেকে এলএলএম ট্রেনিং পেতে পেরেছে, সে কারণেই এটি সম্ভব হয়।

বিজ্ঞান গবেষণায় ভাষার অংশ: বিজ্ঞান গবেষণাতেও অনেকগুলো কাজ রয়েছে, যেগুলো ভাষা ব্যবহার করেই করতে হয়। গবেষণা শুরুই হয় বিশ্বব্যাপী যে বিজ্ঞান-সাহিত্য, তাতে ওই গবেষণা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে কী রয়েছে সেগুলো তন্নতন্ন করে দেখে ফেলে। সেটি না করলে, অন্যরা এ নিয়ে কী করেছে না জান্‌লে চর্বিত চর্বনের আশঙ্কা যেমন থেকে যায়, তেমনি নিজের পরবর্তী গবেষণাটির পশ্চাৎ পট্‌টি

ভালো করে জানা হয় না। আগেও সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে বিশেষ বিশেষ সার্চ-শব্দ দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে ইন্টারনেটে থাকা এ নিয়ে শত শত প্রকাশিত নিবন্ধগুলো খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিলনা– যেমন গুগল স্কলার এমনি কাজে এখনো খুব সহায়ক।

কিন্তু এলএলএম এতে নতুন যা যোগ করেছে, তা হলো এক প্রসঙ্গকে অন্য প্রসঙ্গ থেকে শব্দের অতি সূক্ষ্ম অর্থ-ভিন্নতা দিয়ে সূক্ষ্মভাবে আলাদা করে ফেলার ক্ষমতাটি। যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয়ে নিবন্ধগুলো আসে তাদের কারিগরি প্রকাশভঙ্গি, পরিভাষা, ইত্যাদি এক হয় না। এই সূক্ষ্মতাগুলো এলএলএম ধরে ফেল্‌তে পারে বলেই কোন্ নিবন্ধ কার জন্য একটু বেশি প্রাসঙ্গিক বুঝতে পারে। হাজার হাজার শনাক্তকৃত নিবন্ধ থেকে বিশ্লেষণ করে বিষয়টির বিচিত্র প্রবণতার নানা দিকে আগ্রহী প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রাহ্য করে তুলে ধরার কাজটি এলএলএম করে থাকে। এ যেন প্রত্যেককে একভাবে দেখিয়ে দিতে পারছে এই নিবন্ধে তাঁর জন্য কী আছে। শুধু সেটি করেই এলএলএম ক্ষান্ত হয় না, ওখান থেকে ঠিক আজকের দিনে এসে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-সমস্যাগুলোকে সে সামনে নিয়ে আসতে পারে। এক একটি নিবন্ধের বিশেষ অংশকে অন্যরা তাঁদের নিজের নিজের নিবন্ধে কীভাবে উল্লেখ করেছেন (সাইটেশন) সেগুলো ঘেঁটেই এলএলএম এই অবাক করা কাজগুলো করতে পারে।

এ মুহূর্তে গবেষণার কোন্ জায়গাটিতে ফাঁকা রয়েছে, সেটি নির্ণয়ের ক্ষমতা এলএলএম পায় ভাষা টোকেনকে নিয়ে সেই ট্রান্সফর্মার আর অ্যাটেনশন ব্যবহারের মাধ্যমে। শব্দের সূক্ষ্ম অর্থ, এবং তার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব জেনে ফেলেছে বলেই গবেষণার কোন্ কাজটি হয়ে গেছে, কোন্ কাজটি হতে বাকি আছে, সে কথা এটি বুঝে ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ঠিক এই কাজের উপযুক্ত করে গড়া একটি মডেল এলিসিটের একটি কাজ দেখতে পারি। এলিসিট বিজ্ঞানীকে পরামর্শ দিচ্ছে এই কথাগুলো লিখে:

'এ পর্যন্ত আলজাইমার রোগের ওষুধ আবিষ্কারে যত গবেষণা হয়েছে, তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠগুলো এমাইলোড-বিটাকে ওষুধের লক্ষ্যবস্তু করেছে। মাত্র ২% গবেষণা বিটার বদলে টাউকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ওরাই শুধু টাউয়ের সঙ্গে মিলে ইম্যুন ব্যবস্থা যে ঘটনা-প্রবাহ সৃষ্টি করে, তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। মনে হচ্ছে ওখানে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে।'

এভাবে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণে মডেল সহায়ক হতে পারে। সেটি যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে তার জন্য একটি সম্ভাব্য তত্ত্ব আন্দাজ করার, যেই তত্ত্বকে

প্রমাণ করাটাই হবে গবেষণার লক্ষ্য। এলএলএম যে এক বা একাধিক সম্ভাব্য তত্ত্ব আন্দাজ করতে পারে, সেটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তার আন্দাজ অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীকেও বিচক্ষণ ইঙ্গিত দিতে পারে। আসলে যে অসংখ্য নিবন্ধ সে এ বিষয়ে ঘেঁটেছে, তার মধ্য থেকে এর বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্কগুলো নির্ণয় করে ফেলতে পারে বলেই তার পক্ষে তত্ত্ব আন্দাজের সুযোগ আসে। মানুষ-বিজ্ঞানীও এভাবেই করেন, কিন্তু অনেক নিবন্ধের কথা একসঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর বেগ পেতে হতে পারে, মডেলের তা পেতে হয় না। মডেলের যুক্তি হয় অনেকটা এরকম:

'ডায়াবেটিসের জন্য আবিষ্কৃত "ক" ওষুধটি "খ" প্রদাহটির চিহ্ন মুছে দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে। এই "খ" প্রদাহটিকেই আবার দেখা যাচ্ছে "গ" ক্যানসার টিউমারকে উস্‌কে দিতে। কাজেই 'ক' ওষুধটি "গ" ক্যানসারের উপশম করতেই পারে।'

মডেল যদি বিজ্ঞানীর সামনে এমন একটি তত্ত্বের সম্ভাবনা হাজির করে। তাহলে তাঁর এ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ ঘটে যায়। উদাহরণস্বরূপ ঠিক এমনিভাবেই বিনোভ্যালেন্ট নামের একটি মডেল থেকে পরামর্শ পেয়ে কোভিড-১৯ এর একটি ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। এক্ষেত্রে মানুষ থেকে মডেলের বাড়তি সুবিধা হলো এমনি নানা কিছুর মধ্যে সম্পর্ক সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেখে ফেলে সব থেকে প্রাসঙ্গিকটি সামনে আনতে পারে; মানুষের পক্ষে তা করতে অনেক সময় লাগে। বিজ্ঞানী যদি একটি সম্ভাব্য তত্ত্বকে এভাবে গ্রহণ করেন, তখন প্রশ্ন উঠবে কীরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তত্ত্বটিকে প্রমাণ করা যাবে, অথবা বাতিল করা যাবে। মডেল এখানেও একটি এক্সপেরিমেন্ট নির্বাচন করতে পারে, এবং কোন্ পদ্ধতিতে পরপর পদক্ষেপে সেই পরীক্ষাগুলো করা যাবে, তার একটি রূপরেখাও দিতে পারে। এটি তো বিজ্ঞানীর জন্য একটি মস্ত পাওনা তাঁর চিন্তাধারাকে সুসংহত করার জন্য। কারণ এও আসছে মডেলের বিশাল তথ্যভান্ডারে অনেক তত্ত্বের প্রমাণের জন্য অনেক এক্সপেরিমেন্টের কৌশল বর্ণনা আছে বলে– ওগুলোকে নানা প্যাটার্নে ফেলে দিয়ে মডেল এক্ষেত্রে নতুন এক্সপেরিমেন্টের রূপরেখা সৃষ্টি করতে পারছে। সৃষ্টিশীল এআইয়ের যে ট্রান্সফর্মার আর অ্যাটেনশনের সুযোগ, তা এখানে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করে যাচ্ছে। যাকে বলা হয় এক্সপেরিমেন্ট জগতের বেস্ট প্র্যাকটিস বা সর্বোত্তম ব্যবস্থা, ক্ষেত্রবিশেষে সেটি নির্ণয় করেই মডেলের এই পরামর্শ। কাজ করেছে ভাষা নিয়ে, কিন্তু তার সুযোগে পরামর্শ দিচ্ছে কীভাবে এক্সপেরিমেন্ট সাজানো যাবে সেটির!

এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করাটির মধ্যে অনেক জটিলতা রয়েছে– যেসব জটিলতার নানা সূক্ষ্ম দিক এমন মডেলের কাছে ধরা পড়াটি স্বাভাবিক। টিকা উদ্ভাবনের কথা ধরা যাক। এতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্ভাবিত টিকাটির কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নির্ণয়ের প্রথম দিকের ধাপে তা প্রাণী-বিকল্পের ওপর প্রয়োগ করতে হয়। কোন্ প্রাণী হবে সেই বিকল্প? তার প্রতিক্রিয়া মানুষের খুব কাছাকাছি হবে কি না? উচ্চতম কত ডোজে তার ওপর প্রয়োগ করলে তা মানুষের জন্য বেশি না হলেও এই প্রাণীটির জন্য এমন বেশি হবে যে, অনর্থক তাদেরকে মরতে বা কষ্ট পেতে হবে– সেটি আজকালকার প্রাণী-নিষ্ঠুরতার ন্যায়নীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এক্সপেরিমেন্টের রূপরেখা দিতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে এগুতে হয়েছে– এমনি আরো বহুতরো প্রশ্ন। করোনা ভাইরাসের টিকা দ্রুত আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীদেরকে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তখন এই ধরনের টিকাকে কীরকম পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত সেটি নির্ধারণ করে দিয়েছিল এলএলএমই। সম্প্রতি বহুদিন ধরে সার্স ইত্যাদি করোনা জাতীয় যে সব ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা নিয়ে বহু রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে সেগুলোর তথ্যভান্ডারকেই ভিত্তি করে এলএলএম এটি করেছে।

টিকা হিসেবে ভাইরাসের কোন্ চিহ্ন ব্যবহার করা হবে, তাও এলএলএম ইঙ্গিত দিতে পেরেছিল। কিছু ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রকাশিত গবেষণা থেকে এলএলএমের সম্ভাব্য তত্ত্ব দেবার ক্ষমতা দেখিয়ে দিলো আমাদের এন্টিবডি প্রতিরক্ষাকে ভাইরাসটি চেনাবার জন্য টিকায় দেয়া প্রোটিন হিসেবে 2P স্পাইক নামে পরিচিত প্রোটিনের ধরনটি সব থেকে সঠিক হবে। এ নিয়ে বাস্তব পরীক্ষার একটি গাইড লাইনও এলএলএম থেকে পাওয়া গিয়েছে। এসবের ভিত্তিতেই অতি দ্রুত ফাইজার আর মডারনার করোনা টিকা উদ্ভাবিত হতে পেরেছিল।

গবেষণাটি সম্পন্ন হবার পর ফলাফল প্রকাশ নিয়ে আবার ভাষা মডেলের শরণাপন্ন হবার সুযোগ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত যে নিবন্ধটি প্রকাশের জন্য পাঠানো হবে, তাতে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় দিতে হয়। বিজ্ঞানীরা তাঁদের একটি বড় কাজের পর তার আবিষ্কারটি যেভাবে প্রকাশ করেন, তার তথ্য, প্রকাশভঙ্গি, শব্দচয়ন এবং আবিষ্কারের মূল চমকপ্রদ অংশ সব মিলিয়ে তা অন্য বিজ্ঞানীদের কাছে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান ইতিহাসে অনেক নিবন্ধ এজন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। যেমন ১৯৫৩ সালে ডিএনএ'র গঠনের আবিষ্কারটি যখন হলো, ডিএনএ'র স্বরূপ অবশেষে যখন সত্যি উদ্‌ঘাটিত হলো, তখন আবিষ্কারকদের প্রধান দুজনের– জেম্‌স

ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিকের নিবন্ধটি ডিএনএ'র বাস্তব গঠনটি তুলে ধরেছিল মাত্র দুই পৃষ্ঠার বিখ্যাত এক রচনায়। এর প্রায় পুরোটাই ছিল তাঁদের কাজ ও গঠনের খুঁটিনাটি নিয়ে। কিন্তু একেবারে শেষে এসে একটি বাক্য জুড়ে দিয়েছিলেন: "যে বিশেষ জোড় তৈরি আমরা দেখিয়েছি তা যে জেনেটিক বস্তুর নকল তৈরি হবার একটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে, সেই ইঙ্গিতটি আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি"। কী রকম দুর্দান্ত এক ভবিষ্যদ্বাণী। এই ধরনের মুনশিয়ানা ভবিষ্যতে এলএলএমের কল্যাণে অন্যরাও অহরহ দেখাতে পারবেন। গবেষণাকে বিশেষ রূপরেখায় উপস্থাপনে মডেল বেশ সাহায্য করতে পারছে।

ইমেজের ওপর প্রয়োগ, ইমেজ সৃষ্টি

চিকিৎসা: ভাষার ওপর কাজ না করে এলএলএম একই ট্রান্সফর্মার অর্থাৎ রূপান্তর কৌশল এবং অ্যাটেনশন অর্থাৎ দৃষ্টি প্রদানের কৌশল দিয়ে মেডিক্যাল ইমেজের ওপরও কাজ করতে পারছে– আসলে যেকোনো ইমেজ বা ছবির ওপর। এভাবেই এটি এক্সরে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ইত্যাদি থেকে রোগ নির্ণয় আরো দ্রুত, আরো নিখুঁত করতে পারছে; আগে মেশিন লার্নিং যা করছিল, তার থেকে অনেক বেশি। এখানে টোকেন হলো শব্দ নয়, বরং কিছু কিছু পিক্সেলে গড়া ইমেজের এক একটি ক্ষুদ্র টুকরো। ওই কৌশলে এখানেও এলএলএম এক টোকেন থেকে আরেক টোকেনের পূর্বাভাস তো দিচ্ছেই, আবার পুরো ছবির এক অংশের সঙ্গে ছবিতে তার কাছের বা দূরের অন্য অংশের সম্পর্ক এবং তাদের পরস্পর প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি ধরে ফেলতে পারে। এর ফলশ্রুতি হলো এলএলএম আগের মেশিন লার্নিঙের মতো ইমেজটি থেকে কোন্ রোগের সম্ভাবনা সেটি বোঝার পূর্বাভাসটিই শুধু দিচ্ছে না, বরং চিকিৎসাবিদ্যার যে যুক্তি-পরম্পরার কারণে এ পূর্বাভাস তাও তুলে ধরছে। এই সবকিছুকে ডাক্তারের জন্য ভাষায় প্রকাশ করার দক্ষতাটাও এক্ষেত্রে খুব কাজে লেগে যায়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

শুধু মেশিন লার্নিং একটি এক্সরে ছবি দেখে হয়তো বলবে: 'বুকের ইমেজটি থেকে মনে হচ্ছে রুগীর নিউমোনিয়া রয়েছে'। কিন্তু এলএলএমের ব্যাখ্যা হবে আরো বিস্তারিত এবং যুক্তি দেখানো। সেক্ষেত্রে সে তার ভাষা ক্ষমতাটাকেও ব্যবহার করবে। যেমন এতে সে ফলাফল দিতে পারে: 'যদিও সাধারণভাবে ইমেজটি নিউমোনিয়া নির্দেশ করে ফুসফুসের বামের খণ্ডে ফাঁকের মধ্যে সীমারেখাগুলো অনিয়মিত– যাতে ক্যানসার সন্দেহটি উঁকি দেয়...'। এলএলএম যেন আরো

সূক্ষ্মভাবে দেখে বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছে এবং সেটি তুলে ধরছে। এক্ষেত্রে এলএলএমের একটি বড় সুবিধা রয়েছে। সাধারণত রুগীর ইমেজটি ডাক্তারের কাছে শুধু একা একটি ইমেজ হিসেবে আসে না। তার সঙ্গে যেই রেডিয়োলজিস্টের তত্ত্বাবধানে ইমেজটি নেয়া হয়েছে, তিনিও এটি দেখে তাঁর বিশেষজ্ঞের মন্তব্য ভাষায় লিখে দিয়েছেন। একই সঙ্গে রুগীর ফাইলে তাঁর কেইস বর্ণনা ও অন্যান্য লক্ষণগুলোও থাকার কথা। এলএলএম তার বিশ্লেষণের সময় এগুলো থেকে তথ্যও একই সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে (যা কি না কিছু ছবিতে কিছু ভাষায় একসঙ্গে)। এর ফলে সে তার যুক্তিগুলোকে আরো জোরালো করতে পারে।

ভাষার ক্ষেত্রে যে বৃহত্তর বিশাল তথ্যভান্ডারের সুযোগটি পাওয়া যাচ্ছে, এক্সরে ইমেজের ক্ষেত্রে আগের নানা রুগীর নানা ইমেজ মিলিয়েও অত বড় তথ্যভান্ডার পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে ইমেজের এক এক অংশ ঢেকে মাস্কিং পদ্ধতিতে একটি এক্সরে প্লেট থেকে অনেক তথ্য সৃষ্টি যে কীভাবে করতে হয় তা আমরা দেখেছি। তথ্য বাড়াবার অন্যান্য আরো উপায় থাকলেও এটি এক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। যে হাসপাতালে অনেক রুগীর অনেক ইমেজ সময় নিয়ে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা সীমিত, সেখানে ইতোমধ্যে এলএলএমকে সে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় মাইক্রোসফ্টের ইনার আই নামের মডেলটি নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে।

রোবটিক অস্ত্রোপচার: এক্ষেত্রে এলএলএম এসে যে বড় সুবিধাটি দিয়েছে ভাষার পারদর্শিতার সুযোগ নিয়ে, তা হলো সত্যিকার সার্জনদের অস্ত্রোপচারের ধারা-বিবরণী ব্যবহার করা। ভিডিও তথ্যের সঙ্গে তাঁরা সে সময় অপারেশন থিয়েটারে অন্য সার্জন ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কখন কী করছেন, কী দেখছেন তার ধারা-বিবরণী দিয়ে গেছেন তারও তথ্য ব্যবহার করেছে। এর ভিত্তিতে এটি রোবট সার্জনের জন্য একটি ধারা-বর্ণনা সমেত ভিডিও গাইড লাইন তৈরি করে ফেলতে পারে। রোবট সার্জন এটি অনুসরণ করে নিজে অস্ত্রোপচারের সময় প্রত্যেকটি ধাপে নিজের মন্তব্য করতে পারে মুখে, এবং সহকারী নার্সদেরকেও মৌখিক নির্দেশ দিতে পারে এটি– সেটি এগিয়ে দিতে বা করতে। অনেক সময় এর পরে কী দরকার হতে পারে, পূর্বাভাস দিয়ে আগেভাগেই তৈরি হতে বলতে পারে। যেমন ঠিক যে সময় কোন ছোট রক্তনালি বা অন্য তরলবাহী নালি কেটে জোড়া দিচ্ছে এখনই বলতে পারে সাক্শন তৈরি রাখতে, যাতে একটু পর তরল বের হলে তা শুষে নেয়া যায়। মোট কথা, আগের রোবট-

সার্জনের থেকে আজকালকার রোবট সার্জনকে এলএলএম অনেক বেশি মানুষ-সার্জনের মতো করে গড়ে তুলেছে।

আজকের ভালো রোবট-সার্জন মডেল তৈরির সুবিধার্থে বিখ্যাত গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় জন হপকিন্স অরবিট সার্জিক্যাল ভিডিও ডাটা সেট নামে একটি উদ্যোগ নিয়েছে। এটি অস্ত্রোপচার মডেলকে ট্রেনিং দিতে একটি তথ্য জোগান ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। এর ফলে এখানে জেনারেটিভ এআই দিয়ে অনেক অস্ত্রোপচারের ভিডিও কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা রোবট সার্জন মডেল তৈরির তথ্যভান্ডারকে ক্রমে বেশি বেশি সমৃদ্ধ করে তুলতে পারছে। সত্যিকার অস্ত্রোপচার থেকে মডেল যত তথ্য পেত, তার থেকে অনেক বেশি তথ্য তা পাচ্ছে।

চালকবিহীন গাড়ি: এক্ষেত্রে এলএলএমের বড় প্রয়োগটি কিন্তু গাড়ির নিয়মিত কাজের জন্য নয়, বরং তার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এর একটি দিক হলো চালকবিহীন গাড়ি যখন চলছে, তখন সে স্বগতোক্তির মতো কখন কী দেখছে, কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা ভাষায় বলতে থাকবে রেকর্ড হবার জন্য। বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পেছনে তার যুক্তিগুলোও সে ওইভাবে বলে চলেছে। যেমন ধারা বর্ণনার মতে তার কথা 'এই যে লাল অষ্টভূজ এটি স্টপ চিহ্ন। চৌরাস্তায় এটি যখন আছে, আমাকে থামতে হবে। হ্যাঁ, চিহ্নটির এক পাশ গাছের পাতায় ঢেকে গেছে বটে, কিন্তু আমি ঠিকই বুঝে নিচ্ছি এটি স্টপ্ চিহ্নই ..'। তাছাড়া বর্ণনায় বিরল কিছুও আসতে পারে– যেমন 'রাস্তায় সাময়িক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে, তাকে বিকল্প পথে যেতে হবে, এজন্য ম্যাপটিকে বিবেচনায় নিতে হচ্ছে' ইত্যাদি।

এভাবে স্বগতোক্তির মতো সবকিছু সাধারণ ভাষায় রেকর্ড করা থাকলে দুটি সুবিধা হয়। বর্তমান গাড়ির পুরো সফ্টওয়্যারে বা চক্ষু-কর্ণের হার্ডওয়্যারে কোনো ত্রুটি থাকলে, তা ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে ধরা পড়বে, কারণ ওটি চলার সময় গাড়ির নিজের বিস্তারিত বর্ণনা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হবে। তাঁরা তখন এর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে আরো ভালো বুঝতে পারবেন। অন্যদিকে সব ধরনের কর্তৃপক্ষ যাঁদের ওপর দায়িত্ব হলো চালকসহ বা চালকবিহীন কোনো গাড়ি আইনের ব্যতিক্রম কিছু করছে কি না তা জেনে তা চিহ্নিত করা, তাঁরাও কখন কী হয়েছিল অন্তত এই চালকবিহীন ক্ষেত্রে তা জানতে পারবে। এটি জানাটি বিশেষ ভাবে দরকার চালকবিহীন গাড়ির এই প্রাথমিক অবস্থায়।

এলএলএম আরো একটি কাজ করছে। যেমন টয়োটা কোম্পানি টিআরআই রিসার্চ নামে একটি গাড়ি চালনা সংক্রান্ত এলএলএম মডেল তৈরি করেছে, যা যেকোনো চালকবিহীন গাড়ির চালনার ওপর দৃষ্টি রাখতে পারে, গাড়িটিতে থেকে ওই

গাড়ির চক্ষু-কর্ণ ব্যবহার করে। এই মডেলটি গাড়িকে একভাবে নীরবে যেন জানিয়ে দিতে পারে ‘সামনে রাস্তার কিনারায় বৃষ্টির মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে, আর রাস্তা ও মোড়ের এখানটা ম্যাপে যেভাবে আছে, আর রাস্তার ওপরে যে জেব্রা রেখাগুলো আঁকা আছে– সব একসঙ্গে বিবেচনায় নিলে দেখা যাচ্ছে যে, ওই কিনারায় যা দেখা যাচ্ছে, সে একজন পথচারী মানুষ হবার সম্ভাবনা ৮০%। এখুনি রাস্তায় নেমে পড়তে পারে, গতি একেবারে কমিয়ে আনো, থামার জন্য তৈরি হও।’ এটি গাড়ির প্রতি দেয়া একটি বাড়তি পরামর্শ। ওই টিআরআই রিসার্চ মডেলটি নিজে দেখে-শুনে-বিবেচনা করে গাড়িকে এমনিভাবে পরামর্শ দিয়েই যাচ্ছে। ভাবতে পারি চালকের পাশে বসা যেন আরেকজন ড্রাইভিং শিক্ষক বসে আছেন এমন পরামর্শ দিয়ে যাবার জন্য। তিনি নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, বরং গাড়িকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবেন।

শিল্প, আর্ট: এলএলএমের আগেও মেশিন লার্নিং আর্ট হিসেবে ছবি এঁকেছে, কিন্তু তাতে অনেকটা ব্যবহারকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু পূর্বাভাস দেয়ার ভিত্তিতে অনুকরণের ব্যাপারটিই থাকতো– এটি ঠিক মৌলিক সৃজনশীল কিছু হয়ে উঠতো না। কিন্তু এলএলএম সবক্ষেত্রেই তো জেনারেটিভ অর্থাৎ সৃষ্টিশীল– এটিও তার একটি উর্বর ক্ষেত্র। চ্যাটজিপিটির মতো পারদর্শী অন্য এলএলএমের হাত এখন শুধু ভাষায় নয়, চিত্রের সৃষ্টিশীলতায়ও বিস্তৃত হয়েছে। প্রম্প্‌ট বা নির্দেশ দেয়ার কাজটি অবশ্য ভাষাতেই করা যায় যথারীতি যেকোনো ভাষায়। চিত্রশিল্পের জন্য বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন আলাদা মডেলও রয়েছে। এর খুবই সক্ষম জনপ্রিয় উদাহরণ হলো ড্যাল ই-এ; একটু পেশাদার ছবির জন্য অ্যাডোবি ফায়ারফ্লাই। সেখানেও প্রম্প্‌ট সাধারণ ভাষায়। বেশ সুনির্দিষ্ট করেই অনুরোধ করা যার মডেলকে একটি ছবি এঁকে দিতে:

“বাংলাদেশের একজন গ্রামীণ বধূর ছবি এঁকে দাও, যাতে শিল্পী কামরুল হাসানের স্টাইলের ছাপ থাকবে, কিন্তু সে বধূ হবে আধুনিক ও সমসাময়িক”।

বেশ জটিল নির্দেশ– কিন্তু এলএলএম চেষ্টার ত্রুটি করে না। তারপর কোথাও যদি ঠিক মনমতো না হয়, তাও প্রম্প্‌টে বলে দিলে শুধরে নেবার চেষ্টা করে– বারবার, যতবার বলা হবে। আসলে চিত্রশিল্পে এলএলএমের এই যে সৃজনশীলতা, এটি তার নিজের এবং প্রম্প্‌টকারীর যৌথ সৃষ্টিকর্ম হিসেবেও দেখা যায়। এলএলএম মৌলিক চিত্র আঁকতে পারে অনেক চিত্রশিল্পের তথ্যভান্ডারে তার ট্রেনিঙের কারণে। প্রম্প্‌টের নির্দেশনাকে ভাষা টোকেনে আর চিত্র তথ্যকে পিক্সেল টোকেনে পরিণত করে এটি রূপান্তর আর দৃষ্টি প্রদানের কাজ করে। ওই যে বাংলাদেশের গ্রামীণ বধূর ছবি আঁকার প্রম্প্‌ট সেটিকে কার্যে পরিণত করতে তার তথ্যভান্ডারের এ জাতীয়

অনেক ছবি সহায়ক হয়েছে, কামরুল হাসানের ছবি সহ। সে কারণেই তো সেই স্টাইল কাকে বলে তার অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা এটি দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে। তবে প্রম্প্‌টের ভাষায় দেয়া নির্দেশই হোক আর তথ্যের ছবির বিশ্লেষণই হোক সবকিছু কিন্তু কার্যকর হয়েছে গণিতের মাধ্যমে। সবকিছুকেই গণিতে অনুবাদ করে নেয়া হয়েছে।

এর ছবির মৌলিকত্ব ওইদিক থেকে বিশুদ্ধ মৌলিক নয়, কারণ ইতোমধ্যে হাজারো ছবি থেকে সে অতি পরোক্ষভাবে হলেও প্রভাবিত হয়েছে, একভাবে সেগুলো থেকে গ্রহণও করেছে। সেরকম বিশুদ্ধ মৌলিক মানুষ মাস্টার শিল্পীর পক্ষেও কি হওয়া সম্ভব? তবে এলএলএমের প্রকৃতি এমন যে, কোনো ছবিতে হয়তো তাতে অনেক বেশি অনুকরণের ভাব এসে যেতে পারে, তাকে নকলের মতো মনে হতে পারে। তা সত্ত্বেও শিগ্‌গির মানুষ-শিল্পী ও এআই-শিল্পীকে হয়তো জনপ্রিয়তার যুদ্ধে নামতে হতে পারে। এআই যত কম সময়ে যত বেশি সংখ্যায় মৌলিকতা দেখাতে পারছে জনপ্রিয়তা তার দিকে কিছুটা হেলেও যেতে পারে– বিশেষ করে মানুষ মাস্টারদের ছবির মূল্য যদি আগের মতো আকাশচুম্বী থাকে।

ছবি ছেড়ে যখন ভাস্কর্যে যাই, এখন একই রকম শিল্পকে আমরা দুই মাত্রা থেকে ত্রিমাত্রিক স্থানে নিয়ে যাই। এখন থ্রি-ডি প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে কম্পিউটারে থাকা একটি ভাস্কর্যকে বাস্তবে রূপ দিতে পারি। এতে নমনীয় প্লাস্টিক বা অন্য কোনো মাধ্যমকে ওই প্রিন্টারের সরু ছিদ্র দিয়ে ক্রমাগত বের করে ভাস্কর্যটিকে গড়ে দেয়া হয়, যা পরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। এখন কম্পিউটারে এই ভাস্কর্যের সফ্‌টওয়্যার রূপটি আসতে পারে এলএলএমের আউটপুট হিসেবে। সেক্ষেত্রে ছবির জন্য যে এলএলএম কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে, এখানেও তাই করা হয়। ট্রেনিংটি অবশ্য ইতোমধ্যে মানুষের সৃষ্ট যে প্রচুর ভাস্কর্য রয়েছে, সেগুলোর ডিজিটাল রূপ থেকেই আসবে। এখানেও সৃষ্টিটি ঘটবে একটি একটি করে টোকেন সাজিয়ে।

ছবিই হোক কি ভাস্কর্যই হোক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৃষ্ট শিল্প এখন উপভোগকারীদের কাছে আদর পাচ্ছে– শিল্পবোদ্ধাদের কাছেও। মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় এর প্রদর্শনী হচ্ছে। গুচি বা প্রাডার মতো বিখ্যাত ফ্যাশন হাউসগুলো তাদের পোশাক ও অন্যান্য ফ্যাশন বস্তুতে এআইয়ের এই শিল্পগুলো ব্যবহার করছে। এমন ভাস্কর্য নিয়ে বিভিন্ন পারীক্ষা-নিরীক্ষাও চল্‌ছে। যেমন এটি থ্রি-ডি প্রিন্টারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন না করে মানুষ ভাস্করকেও এআই সৃষ্টিটিকে রূপ দিতে বলা হচ্ছে। বিখ্যাত এম আই টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া ল্যাব ২০২৩ সালে এলএলএমের সৃষ্ট ভাস্কর্যের

কম্পিউটারে দেখানো চিত্ররূপ অনুসরণ করে মানুষ-ভাস্করকে তা বাস্তবায়ন করতে দিয়েছে। তাঁরা ছেনি-হাতুড়ি হাতে নিয়ে মার্বেল ইত্যাদি বস্তু থেকে এ ভাস্কর্যকে মূর্তিমান করেছেন। এআই আর মানুষ-ভাস্করের সম্মিলিত সৃষ্টি হিসেবে এর একটি পৃথক দ্যোতনা আছে বৈকি। তাছাড়া এতে প্লাস্টিক বা সিমেন্টের মত নমনীয় বস্তুতে সীমাবদ্ধ না থেকে মার্বেল বা অন্য পাথরের মতো সনাতন শক্ত ভাস্কর্য-বস্তু ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দুবছর পরপর জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত যে 'বার্লিন বিয়ানালে' তাকে আর্ট জগতে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার মিলন মেলা হিসেবে ধরা হয়। ২০২৪ সালে তাতে এলএলএম সৃষ্ট ভাস্কর্যের বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে– যার সবই থ্রি-ডি প্রিন্টিঙে বাস্তবায়িত।

মেশিন লার্নিং আগে থেকেই স্থপতিদের কাজে খুব সহায়ক হচ্ছিলো, যেমন একটি ভবনের স্থাপত্য ডিজাইন করার পর বাস্তবে তা কতটা সফল হবে, তার পূর্বাভাস মেশিন লার্নিং দিতে পারে। তৈরির আগেই বলে দিতে পারে এর ভার ধারণের জন্য সাশ্রয়ী অথচ নিরাপদ ব্যবস্থা কী হবে। তার সামনের দিকটায় সারা বছর সূর্যের কিরণ, বাতাসের প্রবাহ কেমন পাওয়া যাবে ইত্যাদিও বলে দেবে, যাতে ভবনটি পারিবেশিকভাবে নবায়নযোগ্য শক্তি জোগানের ক্ষেত্রে সফল হয়। এভাবে নানা বিকল্প ডিজাইন দ্রুত যাচাই করে চূড়ান্ত ডিজাইনে যাওয়া সহজ হয়। কিন্তু এলএলএম যে অবাক করা কাজটি করছে, তা হলো যে ছোটবড় স্থাপত্য ডিজাইন নিজেই করে দিচ্ছে। যেমন একটি প্রম্প্ট মডেলকে তেমনি একটি ডিজাইন করার নির্দেশ দিতে পারে:

'বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ জায়গায় গ্রামের পাঁচজনের পরিবারের জন্য একটি বাড়ি ডিজাইন কর। সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করবে। বর্ষা বা বন্যায় যেন ভালো টেকে সেদিকে লক্ষ রাখবে।'

এই প্রম্প্টের প্রত্যেকটি বক্তব্যের মর্ম মডেল বুঝতে পারছে বিশ্বজোড়া সবরকম স্থাপত্যের অসংখ্য ডিজাইনের তথ্যে তার ট্রেনিং হয়েছে বলে। তার মধ্যে এরকম বন্যা-প্রবণ নিম্নবিত্ত এলাকার সাধারণ বাড়িও বহু রয়েছে। সবই ইমেজ টোকেনের সমন্বয়ে। সেই সঙ্গে ভাষা টোকেনেও রয়েছে অনেক তথ্য, স্থাপত্যের ওপর লেখাজোকা ও আলোচনার বিশাল ভাষা তথ্য থেকে। কাজেই ভাষা তথ্যভান্ডারও এর ট্রেনিঙের অংশ। স্থাপত্য সম্পর্কে প্রচুর আইডিয়া তাতে আছে। মডেলের রূপান্তর আর দৃষ্টি প্রদান প্রক্রিয়াই ওই নির্দেশমত নতুন ডিজাইনটি সে করে দেবে। এটি একেবারেই সৃষ্টিশীল এক কাজ। প্রম্পটে 'বাংলাদেশ', বন্যাপ্রবণ', 'সহজলভ্য', 'উপকরণ' ইত্যাদি টোকেনের ওপর ওই প্রক্রিয়া খুবই প্রযোজ্য হয়েছে বলেই এই

ডিজাইনের নির্মাণ-বস্তু নির্বাচনে, গঠনে, বাড়ির ভিত্ রচনায়, সব আবহাওয়ায় টেকসই হওয়াতে সেই বিবেচনাগুলো কাজ করবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো মডেল আমাদের বহু পরিচিত ক্যাড (কম্পিউটারের সহায়তায় ডিজাইন) টুল্‌স ব্যবহার করেই ডিজাইনটি করে দেবে; সঙ্গে ভাষায় নানা লেবেল বা বর্ণনা দিয়ে। গ্রামের বাড়ির জন্য যা করেছে তা বড় ভবন, কলোনি, পুরো নগর পরিকল্পনায় না করতে পারার কোনো কারণ নেই।

অভিনব অনেক কিছুর স্থাপত্য এফেক্টগুলো নানা সম্ভাবনায় আনতে এর কোনো জুড়ি হতে পারে না। যেমন সম্প্রতি একটি আর্ট আইডিয়া এসেছে যে, ঐতিহাসিক নগরী রোমের যে অনেকগুলো মূল্যবান প্রাচীন স্থাপত্য সারা নগরে ছড়িয়ে আছে, এখনো সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোকে আরো কিছু অনন্য চেহারা দেয়া যায় কি না। আইডিয়াটি হলো নানা প্রাচীন স্থাপত্যের সামনের দিকটাতে মূল স্থাপত্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাচের সৃষ্ট একটি পাতলা আংশিক স্থাপত্য জুড়ে দেয়া। এমন নতুন চেহারায় রোমকে কীরকম দেখাবে তা এলএলএম আগেই আমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারে।

সিনেমা: আমরা দেখেছি মেশিন লার্নিং এবং তার সঙ্গে আরো নানা কৌশল আজকের বয়োবৃদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে, এমনকি লোকান্তরিতদেরকেও তাঁদের নানা বয়সের অভিনয়ে আনা সম্ভব করেছে এখনকার তৈরি নতুন সিনেমাতে! এলএলএম কিন্তু এ কাজে যুগান্তর আনতে পেরেছে। ট্রান্সফর্মারভিত্তিক ভিশন মডেল এই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আগেকার অসংখ্য সিনেমার তথ্যের মধ্যে নানা প্যাটার্ন আবিষ্কার করতে পারছে, যা আগে সম্ভব ছিল না। যেমন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে মুখের-কপালের কুঞ্চনরেখাগুলো গভীরতর হয়, চোয়ালের কিনারা রেখা সরে যেতে থাকে, চামড়ার মসৃণতা ও চুলের ঘনত্ব কমে যেতে থাকে– এই সবকে মডেলের গভীর নিউরাল নেটওয়ার্ক যেমন সময়ের প্রেক্ষিতে সামনের দিকে নিতে পারে, তেমনি একই গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সময়ে পেছনের দিকেও নিতে পারে। অভিনেতার বর্তমানকালীন অভিনয়ের ছবি যখন ক্যামেরায় ধারণ করা হয়, মডেল তখন পূর্বাভাস দিতে পারে আজকের একই মুখ-অভিব্যক্তি আগের বয়সের কেমন অভিব্যক্তি হবে। তারপর এটি একটি একটি করে চলচ্চিত্র ফ্রেইমের মধ্যে আজকেরটিকে আগেরটিতে রূপান্তরিত করে দিতে পারে।

এখন অভিনেতার তোয়াক্কা না করেও এলএলএম নিজেই পুরো সিনেমাটি সৃষ্টি করতে পারছে। একটি উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক। এলএলএম ভিশন মডেলকে প্রম্প্‌টে নির্দেশ দেয়া হলো:

'একজন নৈরাজ্যবাদী, তিক্ত-মেজাজি সাবেকি স্টাইলের ডিটেকটিভ বৃষ্টিস্নাত টোকিওর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে- সময়টি ২০৮০ সাল।'

এখানে প্রম্প্‌টের শব্দ টোকেনগুলোর অর্থ সিনেমার দৃশ্যের পরিবেশ, সময়কাল, স্টাইল, মুড ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। মডেলের অ্যাটেনশন প্রক্রিয়া বুঝে নিতে পারে এই একগুচ্ছ টোকেনের মধ্যে কোন্ টোকেনের গুরুত্ব বেশি যে, অন্য অনেকগুলোকে প্রভাবিত করছে। হয়তো 'বৃষ্টিস্নাত টোকিও' সেই গুরুত্ব বহনকারী টোকেন যা ঠিক করে দেবে আলো কীরকম হবে, পরিবেশ কীরকম হবে। আবার '২০৮০ সাল' টোকেনটি ঠিক করে দেবে দৃশ্যের আর্টগুণ– ওই ভবিষ্যতের যে ধারণা জনমনে আছে, সেই আঙ্গিকের খোঁজ পড়বে। আপনি প্রম্প্‌টে লিখছেন 'ডিটেকটিভ' শব্দটি। মডেল তার তথ্য ট্রেনিঙে জানবে ডিটেকটিভ কেমন হয়। তার লম্বা ট্রেঞ্চকোট, কপাল-ঢাকা টুপিকে নাটকীয় করা রাস্তায় জমা পানির ওপর নিওন বাতির প্রতিফলন, ডিটেকটিভের হাঁটার রহস্যময় স্টাইল সে নিজেই তথ্য থেকে প্যাটার্নে ফেলে নতুন দৃশ্যটিতে জুড়ে দেবে। ব্যস আরেকটি নতুন সিনেমার অংশবিশেষ তৈরি হয়ে গেলো। তাতে না প্রয়োজন হলো ক্যামেরা, না কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী। কাজ করলো শুধু ভাষায় লিখে দেয়া প্রম্প্‌ট, আর এলএলএম মডেলের সিনেমা তৈরির কল্পনাশক্তি।

সমস্যা এখন যা দাঁড়িয়েছে তার প্রধান কারণ এভাবে সম্পূর্ণ নিজে সিনেমা বানাতে পেরে এআই নিজেই কিছু জনপ্রিয় ভার্চুয়াল অভিনেতা-অভিনেত্রী সৃষ্টি করেছে। এ নিয়ে দেখা দিয়েছে হলিউডে দারুণ শিল্প-বিরোধ। যেমন ২০২৫ সালেই হল্যান্ডের একজন সিনেমা নির্মাতা এআই দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক তরুণী অভিনেত্রী টিনি নরউইডকে, যে ইতোমধ্যে শুধু সিনেমায় অভিনয় করেনি, নানা অনুষ্ঠানে, ফিল্ম টেস্টে অংশ নিয়ে দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। পর্দায় তাকে বল্‌তে শোনা যায় 'আমি আপনাদের পাশের বাড়ি মেয়ে', 'আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত' ইত্যাকার কথাবার্তা; হলিউড অভিনেতা সমিতি তাদের পেশাকে যন্ত্রের হাতে তুলে দেবার এই চেষ্টার কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে।

চলে যাওয়াকে ফিরিয়ে আনা: শুধু সিনেমার অর্থে নয়, আরো অন্তরঙ্গ অর্থেও ভিডিওতে (এবং অডিওতে) পরলোকে চলে যাওয়া কাউকে একভাবে ফিরিয়ে আনা

সম্ভব হচ্ছে এলএলএমের কল্যাণে। এআই সৃষ্ট ভিডিওতে তাঁকে দেখা বা শোনা শুধু নয়, রীতিমত তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারা সম্ভব হচ্ছে। সে আলাপে আগেকার কথা তো আসতে পারেই; এমনকি আলাপ চলতে পারে আজকের বিষয় নিয়ে, ভবিষ্যতের বিষয় নিয়েও। তিনি আজ পরপারে হলেও তাঁর যে এআই সৃষ্ট রূপ তাতে তিনি এমনভাবে এসব কথা আলাপে আনতে পারছেন এলএলএমের সৃষ্টিতে, যা তাঁর জীবনকে প্রতিফলিত করে। তিনি সাম্প্রতিক বা ঐতিহাসিক কোনো পরিচিত চরিত্র হতে পারেন, অথবা আপনার কোনো অতি আপনজন। এটি সৃষ্টির জন্য তাঁর জীবনকালের সকল সাক্ষাৎকার, চিঠি, বই বক্তৃতা, নানা মাধ্যমে অডিও এবং ভিডিও, পারিবারিক ভিডিও ইত্যাদি যতকিছু ডিজিট্যাল রূপে আছে বা তাতে রূপান্তরিত করা সম্ভব সবকিছু দিয়ে তৈরি হতে পারে তথ্যভান্ডার। এগুলোর মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্বের ও বৈশিষ্ট্যের একটি ছাঁচ এলএলএম গড়ে তুলতে পারে। এলএলএম তাঁর ওই পরিচিত মেজাজ, ভঙ্গি, বাচন, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি তুলে ধরবে যখন যার সঙ্গে আলাপ তার সঙ্গে এসবের প্রাসঙ্গিকতায়।

তাঁর এই প্রতিরূপকে দিয়ে এটি আলাপের কাজটি করাতে পারবে, কারণ এলএলএম তো এখন নিজের চ্যাটবট রূপকে দিয়েও বুদ্ধিদীপ্ত দীর্ঘ আলাপ করাতে পারে– প্রায় মানুষের মতোই জমজমাট আলাপ। আগে যা না কম্পিউটার, না মেশিন লার্নিং কোনোটি দিয়েই সম্ভব হতো না। ভিডিওতে ফেরত আনা মানুষটি প্রশ্নকারীকে চিন্‌বেন, তার কথা শুনবেন, প্রশ্নের উত্তর দেবেন, নিজে প্রশ্ন করবেন, স্মৃতিচারণ করবেন। বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোনো কথা উঠালে তার ওপর মন্তব্য করবেন, উত্তর দেবেন। এটি করতে পারবেন কারণ এলএলএম নিজেই তাঁর মুখে ভাষা তুলে দেবে তাঁর অতীত জ্ঞান, আগ্রহ, ইত্যাদি নিয়ে এমন বিষয়ে তিনি কী বল্‌তেন, সেটির আন্দাজ করে।

এ নিয়ে বর্তমানে অগ্রগতি যেমনটি হচ্ছে দেখা যাক্। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাক্ষাৎকারের ভিডিও আছে এমন মানুষের ক্ষেত্রে অতীতের সেই আলাপকে আজকের আলাপে রূপ দেয়া গেছে কারণ তার অনেকখানি মালমশলা ওই অতীতের সাক্ষাৎকারে পাওয়া গেছে। ওই সাক্ষাৎকার দিয়ে গড়া তথ্যভান্ডারকে বলা হচ্ছে স্টোরি ফাইল।

এখন কেউ কেউ বেশি বয়সে নিজের আপন জনের জন্য রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের ও পারিবারিক ইতিহাস আত্মকাহিনির মতো বলে গিয়ে ভিডিও তৈরি করে রাখছেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই নিজের পরবর্তী এলএলএম তৈরি জীবন-মডেলের

জন্য তথ্যভান্ডার সৃষ্টিতে সহায়তা করে রাখছেন। সহায়তাটি আরো ভালো হয়, যখন ওই আত্মকাহিনিটিও অন্যদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে আলাপের মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে– যাতে অংশ নিচ্ছে সেই আপনজনেরাই যারা ভবিষ্যতে এলএলএম তৈরি ভিডিওতে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবে তাঁর অবর্তমানে।

একেবারে রেডিমেইড একটি মডেলের ব্যবস্থা আগে থেকে করে যাবার জন্য এক ধরনের কিছু অ্যাপ্স তৈরি হচ্ছে, যার একটির নাম 'হেয়ার আফটার এআই'। এতে প্রবীণ মানুষদেরকে আত্মকাহিনি বলে যাওয়ার জন্য এক রকম গাইড করা করেছে অ্যাপ্স নিজেই নানা প্রশ্ন করে। ওতে কিছু আপনজন এজন্য নির্ধারিত করা থাকে, যাঁরা এখন এবং ভবিষ্যতে তাঁর অবর্তমানেও এই অ্যাপ্সেই নানা প্রশ্ন করে ওই মানুষটির জীবনের নানা কথা জানতে পারবেন, নানা বিষয়ে তাঁর মতামত পরামর্শ ইত্যাদিও পাবেন– প্রশ্ন অনুযায়ী। যে কেউ অর্থের বিনিময়ে অ্যাপ্সটি ব্যবহার করতে পারছেন, যা ইন্টারনেটে রয়েছে।

ধ্বনি সৃষ্টিতে এলএলএম

সঙ্গীত: এলএলএমের ট্রান্সফর্মার কৌশল ধ্বনিতে আনতে গেলে শুধু একটি ছোট সময় পরপর তাকে টুকরা টোকেনে ভাগ করলেই চলে না; বরং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এর নোট, কর্ড, রেস্ট, ডাইনামিক, টেম্পো ইত্যাদি নামে পরিচিত গুণগুলোর নিরিখেও তাকে খণ্ড খণ্ড করতে হয় টোকেন হিসেবে। টোকেনের তথ্যভান্ডারে ব্যবহৃত হতে পারে ক্ল্যাসিকাল কম্পোজার গুরু বাখ্ থেকে পপ তারকা বীটলরা পর্যন্ত সব ঘরানার সব সঙ্গীতের। বলিউড থেকে হলিউড কিছুই বাদ যায় না। এর থেকে ট্রেনিং নিয়েই এলএলএম নিজেই সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারে, ওই একই সৃষ্টিশীলতার কৌশলে। ধরা যাক লিখিত প্রম্প্ট নির্দেশ দেয়া হলো:

'খুব ধীরলয়ের একটি পিয়ানো সোনোটা কম্পোজ কর, যা বীটাফোনের শেষ দিককার স্টাইল অনুযায়ী যেন হয়'।

ভাষায় দেয়া প্রম্প্টিকে মডেল লিপির গণিত থেকে ধ্বনির গণিতে নিয়ে যায় এবং সে অনুযায়ী সঙ্গীত ট্রান্সফর্মারের একটি টোকেন থেকে পরে টোকেনের পূর্বাভাস আসে (নোট, কর্ড ইত্যাদি)। একের পর এক পূর্বাভাস সঙ্গীত সৃষ্টি করে চলে টোকেনের পর টোকেনে– কিন্তু আগাগোড়া সঙ্গীতের ঐক্যটিকে ধরে রাখে। প্রম্প্টে দেয়া নির্দেশটি শুধু মনে রেখে গণিতের ওই গতিতেই মডেল নিজের সঙ্গীত সৌকর্যগুলো নিজেই যোগ করতে থাকে স্টাইলিস্ট কোনো স্ফুরণে, অবাক করা

কোনো হার্মোনিকে, বাদ্যযন্ত্রের কোনো বুনোটে– সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টিতে। এলএলএম আসার পরেই এটি সম্ভব হয়েছে, কৃত্রিম সঙ্গীতের লেশমাত্র বুঝতে না দেয়াতে তাকে মানুষ-ওস্তাদের সৃষ্টি বলেই মনে হবে।

সঙ্গীতপিপাসুরা আরো নতুন বীটাফোন বা নতুন মোৎসার্টের সঙ্গীত চান্, যা ওই মূল গুরুরা দিয়ে যান্নি। এ চাহিদা এআই পূরণ করে চলেছে তার নিজের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে। যেমন নতুন বীটাফোনের প্রত্যেকটি শুনলে মনে হবে যেন বীটাফোনকেই শুন্ছি, অথচ এ সম্পূর্ণ নতুন একটি বৈচিত্র্য। কখনো কখনো কাজগুলো বেশ সাহসী ধরনের হয়েছে যেন বীটাফোন ভক্ত প্রশ্ন তুল্ছেন– যদি এমন হতো! বীটাফোন যদি কিছু কম্পোজ করতেন জাজ সঙ্গীতের মেজাজে! এটি এলএলএম এখন করে দেখাচ্ছে।

চাহিদামত সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য সর্বজনীন কিছু মডেল বিখ্যাত হয়ে উঠেছে চ্যাটজিপিটি'র মতো– লিখে প্রম্প্ট দিলেই হলো। এমনি একটির নাম ওপেন এআই জ্যুক বক্স। ১২ লক্ষ গানের তথ্যভান্ডার থেকে ট্রেনিং নিয়ে এটি খাড়া হয়েছে। এতে যদি চাই বীটলের মতো, রোলিং স্টোনের মতো, এলা ফিজগেরাল্ডের মতো, জোয়ান বায়েজের মতো স্টাইলে, ওভাবে অন্য বিখ্যাতদের একেবারে আন্কোরা গানের অনুরোধ করতে পারি। আগেকার দিনে 'জ্যুক বক্সে' যে কেউ বোতাম টিপে যেকোনো রেকর্ডের অনুরোধ যেভাবে করতো, অনেকটা সেভাবে এও পারি। পার্থক্য হলো আমি যেই বীটল চাচ্ছি সেই গান বীটলরা কখনো গায়নি– তবুও ওটি বীটলদেরই গান, নতুন নতুন। ঠিক ওরকম গত দু'তিন বছরে আরো এসেছে মিউজিক এলএম, স্যুনো এআই, উডিও ইত্যাদি সঙ্গীত মডেল।

ভাষার চ্যাটজিপিটিকে যেমন বল্তে পারি 'সমুদ্রের বিষয় নিয়ে মাইকেল মধুসূধনের স্টাইলে একটি সনেট লিখে দাও'; তেমনি মিউজিক এলএলএমকে বলতে পারি 'সমুদ্রকে নিয়ে বিষণ্ন মুডের একটি গান রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্টাইলে তৈরি কর; ওতে পিয়ানোর ঝংকার এক এক সময় সমুদ্র গর্জনে সুন্দর মিশে যাবে।' হয়তো একজন সলিল চৌধুরী বা ভূপেন হাজারিকা এর কাছে কাবু হবেন না, কিন্তু অনেক উঠতি গীতিকার সুরকার, গায়ক-গায়িকা যে হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। এলএলএম গানের এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার নিজস্ব সৃজনশীলতার পরিচয় দেয় ওই ট্রান্সফর্মার আর অ্যাটেনশনের কৌশলে। ১২ লক্ষ গানের থেকে ট্রেনিং করা এলএলএমকে হারানো কঠিন।

অবশ্য যাঁরা গীতিকার সুরকার হিসেবে নিজেকে প্রশিক্ষিত করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য মিউজিক এলএমের মতো মডেল খুব কাজে আসছে। প্রশিক্ষণার্থী নিজে খানিকটা লেখেন বা সুর দেন, তারপর এআইকে দেন ওটি যে আরো উন্নত করতে, সেখান থেকে শেখেন। তারপর আবার নিজে চেষ্টা করেন আরো উন্নত করতে। এমনিভাবে এআই শিক্ষক হতে পারে, আবার একসঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করার সঙ্গীত হতে পারে।

দুই ভিন্নভাষীর স্বচ্ছন্দ কথোপকথন: মানব ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে দুজন মানুষ এই প্রথম একে অপরের ভাষা না বোঝা সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারছে একেবারে জটিল গভীর আলাপে। এটা সম্ভব করছে এলএলএম। মেশিন লার্নিং আগে থেকে কথা থেকে লেখা, লেখা থেকে কথা, এক ভাষার লেখাকে অন্য ভাষার লেখায় অনুবাদ করার কাজ কিছু কিছু করতে পারছিল, কিন্তু এলএলএম এক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে। অনুবাদের কাজ এলএলএমের ভাষা মডেলেই সবচেয়ে নিখুঁত হয়। তাই কোনো বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করাতেই হোক অথবা আলাপের অনুবাদেই হোক, মাঝখানে মডেল তা ধ্বনি থেকে লিখিত ভাষাতে পরিণত করে নেয় গাণিতিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে; সেই লিখিত লিপি কারো দেখার প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। লিপি থেকে অনুবাদ করা সহজ এলএলএমের জন্য।

ভাষা মডেলে এলএলএম যখন অনুবাদ করে, এক একটি শব্দ নিয়ে করে না, পুরো বক্তব্যকে একসঙ্গে নিয়ে করে। ফলে এক ভাষার সামগ্রিক দ্যোতনায় অন্য ভাষায় তার মতো করেই ফুটে ওঠে– সেজন্য খুবই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ হয়। শুধু তাই নয়, কথার সঙ্গে যে জোর দেয়া, যে আবেগ তাও পরে লিপি থেকে ধ্বনিতে রূপান্তরের সময় সঙ্গে যায়। কিন্তু তার জন্য যে ধ্বনির টান বা কণ্ঠের ওঠানামা তা কিন্তু অন্য ভাষাটিতে যেভাবে স্বাভাবিক সেভাবে হয়েই যায়।

কথোপকথনের সময় আমি আমার ভাষায় যা বলছি, তা প্রথমে লিপি হয়ে অন্যের ভাষায় অনুবাদ হয়, তারপর সেটি তার ভাষার ধ্বনিতে পরিণত হয়ে তার ইয়ারফোনে যায়। সে আবার তার ভাষাতে কথার উত্তর দিলে সেটি একইভাবে লিপি ও ধ্বনি হয়ে আমার ভাষায় আমার কানে আসে। এই সবকিছু এত দ্রুত হয় যে, সময়ের কোনো গ্যাপ থাকে না, যেটি বোঝা যাবার মতো। এলএলএমের অ্যাটেনশন কৌশলের কারণেই এটি সম্ভব হচ্ছে। একজন মুখে বাক্য শেষ করার আগেই অনুবাদের কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে– ওই অ্যাটেনশন শুরুর দিকের কথা থেকে শেষের দিকের কথা আগেই আঁচ করে ফেলে, যেটি এখনো বলা হয়নি, সেটিকে

অনুবাদ করে ফেলে। যেমন ধরা যাক বাক্যটি আংশিক হচ্ছে 'ডাক্তার তাঁকে বল্‌লেন যে তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন..' এইটুকু শুনেই অনুবাদ পরের কথাটিও ধরে নিতে পারে। অ্যাটেনশন তাকে জানিয়ে দেয় ওই বাক্যাংশে 'তিনি' ব্যক্তিটি কে– তিনি নিশ্চয়ই রুগী। কাজেই বাক্যের পরের অংশটির কিছুটা হবে 'রুগী তখন ...'। এজন্য অ্যাটেনশনকে নির্ধারণ করতে হয়েছে আগের কথাটির মধ্যে কোন্ শব্দটি পরের কথার জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ– সে বুঝতে পেরেছে যে, ওই শব্দটি হলো 'তিনি'। ওই তিনির সঙ্গে অন্যান্য নানা শব্দের সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যবস্থাও কিন্তু ট্রান্সফর্মারে রয়েছে। সেখান থেকে বোঝা গেছে যে, সেই তিনি হলো রুগী।

আরেকটি উদাহরণ নিই। একজন মানুষ জাপানি ভাষায় বল্‌ছেন 'আমি গতকাল...'। এটি আরেকজনের জন্য বাংলায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এলএলএম এইটুকু থেকেই অ্যাটেনশনের সাহায্যে গতকাল শব্দটির ওপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদানে শব্দটির কাল-নির্ণয়ী গুণটি বুঝে ফেলেছি। ওইটুকু শুনে সে বাংলায় 'আমি গতকাল' অনুবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে পরের শব্দটি আসা মাত্র তাকে অতীত কালে দেখানোর জন্য তৈরি হয়ে থাকে। ধরা যাক জাপানি বাক্যে পরের শব্দটি ছিল 'গিয়েছিলাম'। কথাটি আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় গিয়েছিলাম লিখতে মডেলকে মোটেই হাতড়াতে হয়নি, কারণ সে ওটির জন্যই তৈরি ছিল– যাচ্ছি, যাবো ইত্যাদির জন্য নয়– যাওয়ার কথা না জানলেও সেটি কোন কাল হবে সে তা জানতো। এভাবেই কথোপকথনে মসৃণতা বজায় থাকে।

এমনি নানাভাষী আলাপে সুবিধা করার জন্য ২০২৩ সালে সৃষ্টি করা হয়েছে মেটা সীমলেস এম্ ফোরটি। এটি রিয়াল টাইম আলাপ সম্ভব করেছে। ২০২৪ এ এসেছে জুম প্লাসঃ মাইক্রোসফ্‌ট সিম্‌স। এটি দারুণ কাজে লাগে নানাভাষী মানুষ যখন একই সভায় নিজ নিজ ভাষার কথা বলেন, আর প্রত্যেকে নিজের ভাষায় সে কথা শোনেন। আমাদের পরিচিত জুম সভার কী অবাক করা সংস্করণ! একই বছরে আসা 'ইয়ার বাড' তৈরি হয়েছে প্রধানত পর্যটকদের লক্ষ করে– তাঁরা যখন বিদেশে গিয়ে অন্যভাষী মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

বিদেশে গেলে এলএলএম অন্য আর একভাবেও দারুণ সহায়ক হয় বিশেষ করে যে দেশের সাইনবোর্ডগুলোতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষার ভিন্ন লিপি ছাড়া আর কিছু থাকে না, বা সে দেশের রেস্টুরেন্টের মেন্যুতেও। ওখানে আপনার মোবাইলে ওই লিপির একটি ছবি নিলে এলএলএম তাকে অনুবাদ করে আপনার নিজের ভাষাতে ও

লিপিতে আপনার মোবাইলে দিয়ে দেবে– যেন চীন দেশেও ওই সাইনবোর্ড বা ওই মেন্যু বিশেষ করে আপনার জন্যই বাংলায় লেখা হয়েছে।

বিজ্ঞান এক্সপেরিমেন্ট

ল্যাবোরেটরির কাজ: বিজ্ঞান গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারকে এলএলএম বিভিন্নভাবে আমূল পরিবর্তন করেছে। সবচেয়ে বেশি বদলিয়েছে এলএলএম এর ভাষা মডেলগুলোর প্রয়োগের মাধ্যমে, যা আমরা দেখেছি। বিজ্ঞানীর বেশ কিছু হাতে কলমে কাজও রোবট সহকারীর হাতে ছেড়ে দেয়াটিও খুব নতুন নয়। এলএলএম এখানেও তার ভাষা-সুবিধাটি যোগ করেছে। সাধারণত এমন রোবট সহকারী থাকে বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে– কখনো তিনি নিজেও একই ল্যাবোরেটরিতে থাকেন, অথবা তিনি অনেক দূরে থেকে রোবট সহকারীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এখন এলএলএম প্রত্যেকটি এক্সপেরিমেন্টে কীসের পর কী করবে এই রোবট সহকারীকে তার যান্ত্রিক নির্দেশনা দিতে পারে এবং সহকারী সেভাবে কাজ করে। আজকাল এমন এলএলএম মডেল রয়েছে, যাতে বিজ্ঞানী সাধারণ ভাষায় মডেলকে সংক্ষেপে কাজগুলো প্রম্প্ট করলে মডেল নিজে ওই নির্দেশগুলো তৈরি করবে এবং রোবটগুলোকে সেভাবে পরিচালিত করবে। যেমন ভাষায় বলতে গেলে রসায়নের ল্যাবে সহকারীকে সে বল্বে: 'পিপেটটি তুলে নাও, রিয়্যাজেন্ট-২ লেখা টেস্ট টিউব থেকে তরলটি ৩০ মিলিলিটার তুলে নাও, রিয়্যাজেন্ট-৩ লেখা টেস্টটিউবে থাকা তরলে সেটি ফোঁটা ফোঁটা ফেলতে থাকো...' বিজ্ঞানী সবকিছু দেখতে পারেন– বাস্তবে বা পর্দায়, আর নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে এক্সপেরিমেন্টটি সঠিকভাবে চলছে। তার ওপর আরো সূক্ষ্ম নজরদারির জন্য প্রম্প্টে মডেলকে নানা চেকিং করার নির্দেশ দিতে পারেন, প্রয়োজন মনে হলে। ঠিক এই কাজগুলো বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের জন্য বিজ্ঞানী যেন শুধু প্রম্প্ট করেই সম্পাদন করতে পারেন সেজন্য ওপেনট্রন ওটি-২ নামে একটি বিশেষ তৈরি মডেলই রয়েছে, যা চ্যাটজিপিটির আদলে তৈরি।

এখন এলএলএম সংযুক্ত রোবট সহকারীদের মাধ্যমে যাবতীয় এক্সপেরিমেন্ট দূরবর্তী একটি ল্যাবোরেটরিতে করার সুযোগও গড়ে উঠেছে। যে বিজ্ঞানীগণ বা যে প্রতিষ্ঠানের গবেষণার জন্য এক্সপেরিমেন্টটি করা দরকার তার আয়োজনটি তাঁরা নিজেরা না করলেও চলে। ওই দূরবর্তী ল্যাবোরেটরিকেই তাঁরা দায়িত্বটি দিয়ে দিতে পাবেন, কারণ সেখানে নানা বিচিত্র এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ আছে। সেখানে এক্সপেরিমেন্টের বিস্তারিত পরিকল্পনা ও তদারকির কাজটিও এলএলএম নিয়ে

নিচ্ছে। তদারকি হলো সবকিছু প্রতি মুহূর্তে সর্বোত্তম অবস্থায় রাখা। এমনি একটি এআই নিয়ন্ত্রিত ল্যাব হলো এমারেল্ড ক্লাউড ল্যাব।

অনেক ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টের সনাতন আইডয়াটিই বদলে দিচ্ছে এআই সহায়তায় কম্পিউটার এক্সপেরিমেন্ট সিস্টেম। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। কোনো নতুন ওষুধ আবিষ্কার হলে তা মানুষের ওপর প্রয়োগের আগে একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে, এমন প্রাণীর ওপর প্রয়োগ করতে হয়। এতে অনেক প্রাণীর মৃত্যু হয় বা ওদের ক্ষতি হয়, যা ব্যয়বহুল ও অনৈতিক। এর বদলে কম্পিউটার সিস্টেম ও এআই দুটি বিকল্প পথ এখন বেছে নিতে পারছে। একটিতে মানুষের যাবতীয় জৈব প্রক্রিয়াগুলোকে গণিতে ও কম্পিউটার প্রসেসিঙে রূপ দিয়ে একটি সফ্‌টওয়্যার তৈরি করে ফেলা। ওষুধ প্রয়োগের অনুরূপ প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে হবে ওষুধের রাসায়নিক ও জৈব যে গুণগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে জানা আছে, তারও গাণিতিক রূপ শরীরের সেই সফটওয়্যারের ফলাফলে কী পরিবর্তন আনে তা দেখা। এক্ষেত্রে তার নিজের গণিতকে প্রাসঙ্গিক জৈব প্রক্রিয়ার গণিতে পরিণত করে এলএলএম।

এর বিকল্পটি অবশ্য পুরো কম্পিউটারের কাজ হবে না, একটি অংশ মানুষের প্রাসঙ্গিক কোষকলায় গড়া কোনো বিশেষ অঙ্গের সামান্য নমুনার ওপর ওষুধটি প্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়া দেখবে। বিশেষভাবে তৈরি ক্ষুদ্র 'চিপের' ওপর লিভার, কিডনি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক কোষকলাকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয় যে, তাতে পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি ওই ক্ষুদ্র পরিসরেই সরবরাহ করে ওই কোষকলাকে বাঁচিয়ে রাখা হয় যেন ওটি ওই অঙ্গের মতোই কাজ করতে পারে। আগের গাণিতিক মডেলের বদলে এই অংশটি একটি জৈব মডেল, ওষুধ এখানেই সত্যি সত্যি প্রয়োগ করা হয়। অনুরূপ নানা ওষুধ-অণুর প্রভাব জৈব প্রক্রিয়ার ওপর কী হয় এলএলএম তা নির্ণয় করে। অতীতে নানা ক্ষেত্রে এমনি প্রভাবের ট্রেনিং নেয়া এলএলএম এই জৈব চিপের অথবা কম্পিউটার মডেলের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মানুষের প্রতিক্রিয়ার পূর্বাভাস দিতে পারে। কোন কোন বায়োটেক কোম্পানি উভয় মডেল ইতোমধ্যেই কার্যকর করতে পেরেছে। এর ফলে ওষুধ উদ্ভাবনের চলমান কর্মযজ্ঞ প্রাণীর ব্যবহারকে হয়তো শিগ্‌গির অনেক কমিয়ে ফেলতে পারবে।

প্রোটিনের গঠন উদ্‌ঘাটন: এক্ষেত্রে এলএলএম বড় পরিবর্তন এনেছে। এর ট্রান্সফর্মার ও অ্যাটেনশন পদ্ধতি ঠিক বুঝে ফেলতে পারছে প্রোটিনের শেকলে নানা এমাইনো এসিডের কোন অংশ কোন অংশের দিকে এগিয়ে একে নানাভাবে দুমড়েমুচড়ে সঠিক গঠনে রূপ দেবে। এর ফলে ইতোমধ্যে জানা প্রায় সব প্রোটিনের গঠন আবিষ্কার এলএলএম আসার পর অল্প যে কয়েক বছর সময় পাওয়া গেছে,

তাতেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। আগে যেখানে অতি ধীরে নানা এক্সপেরিমেন্ট করে করে ভাঁজগুলোর উদ্‌ঘাটন করতে হতো এ সেরকম নয়। এজন্য আলফা ফোল্ড এবং ইএসএম ফোল্ড নামে পরিচিত দুটি এলএলএম মডেল অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছে। যেহেতু জানা সব প্রোটিনের গঠন ওরা দ্রুত উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছে, এখন নতুন নতুন অজানা প্রোটিনের গঠন প্রস্তাব করছে– কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে এমন সব ভাঁজে সমৃদ্ধ এরকম নানা প্রোটিন সম্ভব, যদিও প্রকৃতিতে এসব প্রোটিন দেখা যায়নি। পরে কৃত্রিমভাবে ডিএনএতে পরিবর্তন এনে এসব প্রোটিনও জৈবভাবেই সংশ্লেষণ ও তৈরি করা সম্ভব। এরকম ডিজাইন করে তৈরি নতুন প্রোটিনের নানা গুণাগুণ হয়তো বহু সমস্যার সমাধান করতে পারবে আগামিতে।

প্রোটিনের ভাঁজ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এলএলএমের অ্যাটেনশন প্রক্রিয়ার স্পষ্ট সুবিধা রয়েছে। এতে পুরো প্রোটিন শেকলটিকে অনেকগুলো টুকরা বা টোকেনে বিভক্ত করা হয়েছে। মডেলটি ট্রেনিং পেয়েছে ইতোমধ্যে উদ্‌ঘাটিত অনেক প্রোটিনের শেকল ও তাদের ভাঁজের তথ্য থেকে। সেখানে পাওয়া প্যাটার্ন অনুযায়ী ধরা যাক ৫০তম টোকেনকে বিবেচনার সময় মডেল দৃষ্টি প্রদান করছে ৩৫০তম টোকেনের ওপর তার গুরুত্ব বিবেচনায়। এতে ৫০তমটির সঙ্গে ৩৫০তমটির সম্পর্ক ঘটতে হলে মাঝখানের এতগুলো টোকেনকে বেঁকে মুচড়িয়ে কীরকম জ্যামিতি ধারণ করতে হবে মডেলের গাণিতিক প্রক্রিয়াই তা বলে দিতে পারে।

ওষুধ ও টিকা উদ্ভাবন: এলএলএমের দিক থেকে প্রোটিনের ভাঁজ নির্ণয়ের সঙ্গে ওষুধ উদ্ভাবনের কাজটির একটি সাযুজ্য আছে। প্রাথমিক গবেষণায় যখন মানবদেহে ওষুধটির লক্ষ্যটি সম্পর্কে একটি আনুমানিক তত্ত্বকে বেশ যথাযথ মনে হয় তখন পরের করণীয়টি দেখা দেয়। সেটি হলো ওষুধের সঠিক অংশটি শরীরে কোন্ টার্গেট অণুর কাছে গিয়ে ক্রিয়া করে তার আণবিক গঠন নির্ণয়। এলএলএম এরকম কার্যকর গঠনের একটি পূর্বাভাস দিয়ে দিতে পারে। তখন সেই টার্গেটের গঠন অনুযায়ী ওষুধের অণুর সংশ্লেষণের পালা– যার জন্য ওই এলএলএমই পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশাবলি দিয়ে দিতে পারে। যেহেতু ওষুধ আবিষ্কারে এরকম অনেক অণুকে নিয়ে চেষ্টা হয় তাই পুরো কাজটিকে দ্রুত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করার অনেক সুবিধা। এলএলএম তার নির্দেশাবলি দিয়ে রোবট সহকারীদেরকেই এবং নানা যন্ত্রপাতিকে সরাসরি এ কাজে লাগাতে পারে। টিকা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও এলএলএমের কাজ অনেকটা এরকমের।

মনে রাখতে হবে প্রোটিনের ভাঁজ নির্ণয়, ওষুধ উদ্ভাবন এবং টিকা উদ্ভাবন– ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজেই এলএলএমের ভূমিকাটি হলো গঠনের পূর্বাভাস দেয়া। অন্য সব চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে ওই পূর্বাভাসটিই যে কাজে লাগবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আগে হাজারো সম্ভাব্য গঠন এক এক করে উদ্ভাবন করে সবগুলোর মধ্যে কোন্গুলো কাজে লাগে তা পরীক্ষা করে ফেলতে অনেক সময় ও শ্রম লাগতো। এলএলএম খুব দ্রুত সে গঠন দিচ্ছে, পরীক্ষা করে ফেলার ব্যাপারটিকেও সংক্ষিপ্ত করে ফেল্ছে। কাজেই এর মধ্য থেকে সঠিক পূর্বাভাসটি থেকে সঠিক সত্যিকার প্রোটিন, ওষুধ বা টিকা রেকর্ড সময়ের মধ্যে বের করে দিতে পারাটাই এলএলএমের বাহাদুরি।

এলএলএম কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখছে

মডেলের তৈরি প্রোগ্রাম: চিরকাল কম্পিউটারকে কাজ করানোটি মানুষেরই দায়িত্ব– কম্পিউটারের জন্য প্রোগ্রাম লিখেই মানুষ তা করে। সেই কাজ যখন এআই করতে পারছে, তখন মনে হতে পারে কম্পিউটার জগতটাই যেন মানুষকে বাদ দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠলো। এখন প্রোগ্রাম লেখার এমন মডেল রয়েছে, যাকে শুধু প্রম্প্ট করে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যটি বলে দিলে সে প্রোগ্রামটি লিখে দিতে পারছে– প্রম্প্টটি তিনি সাধারণ ভাষাতেই দিতে পারেন প্রোগ্রামিঙের কিছু না জেনেও। যেমন হতে পারে: 'যে সারণি দেয়া হয়েছে, তার প্রত্যেকটি কলামের তথ্যগুলোর যাতে গড় নির্ণিত হয়, তার জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম করে দাও। কেনো জায়গায় তথ্য না থাকলে সেটি যেন বাদ দিয়ে যেতে পারে।'

অন্য সব কাজের মতো এক্ষেত্রেও মডেল মূলত ওই ট্রান্সফর্মার ও অ্যাটেনশন কৌশল দিয়েই প্রোগ্রাম সৃষ্টি করে। অন্যান্য যত প্রোগ্রাম আগে হয়েছে, যেমন এইক্ষেত্রে পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষায়, সেগুলোই এর জন্য তথ্যভান্ডার। তাতে যে শব্দ, চিহ্ন, কমা, গাণিতিক সঙ্কেত ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, সেগুলোই এখানে এক একটি টোকেন। প্রতিটি টোকেনের ভেক্টর নির্ণিত হয় এম্বেডিং পদ্ধতিতে– সাধারণ ভাষার ক্ষেত্রে যেভাবে হয়ে থাকে। কোডিঙের ভাষাটি রপ্ত করে ফেলে অ্যাটেনশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন টোকেনের পরস্পর সম্পর্কে, কোনটি অন্য কোন্টির জন্য কীরকম গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ণয় করে– সবই গাণিতিক পদ্ধতিতে। এভাবেই মডেল সিদ্ধান্ত নিতে পারে উদ্দেশ্যটি সফল করতে গেলে কোন্ টোকেনের পর কোন্ টোকেন আসা উচিত। এগুলো একের পর এক সাজিয়ে তৈরি হয় পুরো প্রোগ্রাম।

এ মডেলে কিছু বাড়তি যাচাই ব্যবস্থা রাখা হয়, যাতে কম্পিউটার কোডের যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেমন কোডের পরস্পরায়তে, দুই বিকল্প শাখার কোনটিতে যাওয়াতে, কাজের চক্রাকার আবর্তনে সবকিছু সুসামঞ্জস্য ও যুক্তিসঙ্গত আছে কি না তা নিশ্চিত থাকে। খুব সরল একটি উদাহরণ দিতে গেলে যেমন কোনো বন্ধনীর শুরুটা যখন খোলা হয় (চিহ্ন দিয়ে, তখন শেষে গিয়ে তা বন্ধ করা হয়েছে কি না) চিহ্ন দিয়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে। হুবহু কোডিং ভাষায় এগুলো না হলে প্রোগ্রাম কাজ করবে না। প্রোগ্রামিঙের জগতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামিং অংশ তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায়, তাছাড়া বাইরে থেকে বিভিন্ন গাণিতিক ফাংশানও এতে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এসবকে যাতে যথাযোগ্য উৎস থেকে খুঁজে নিয়ে সংযোজিত করা যায়, সেজন্য মডেলের সঙ্গে ওসবের উপযুক্ত ডিজিটাল সংযোগেরও ব্যবস্থা রাখতে হয়।

মানুষ-প্রোগ্রামারদের সহায়ক: এখন এলএলএমের এই দিকটির বেশি ব্যবহার হচ্ছে কুশলী মানুষ-প্রোগ্রামারদের কাজটিকে কিছুটা সহজ করার জন্য। প্রোগ্রামের কোনো দীর্ঘ বা জটিল অংশ তৈরির কাজ তাঁরা মডেলের মাধ্যমে করতে পারেন। প্রোগ্রামারদের কাছে প্রায়ই প্রয়োজন হয় এমন অনেক প্রোগ্রাম অংশ এখন মডেলের দ্বারা আগে থেকে তৈরি করে রাখা যাচ্ছে, যা প্রোগ্রামার প্রয়োজনমত খুঁজে নিতে পারেন।

প্রোগ্রামারকে সহায়তা দেবার জন্য মডেল এক প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা কোডকে অন্য প্রোগ্রামিং ভাষায় রূপান্তরিত করে দিতে পারে। তাছাড়া কোন প্রোগ্রাম কেউ তৈরি করেছেন, কিন্তু অন্য কেউ তার জটিল অংশটি ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না বলে ব্যবহার করতে অসুবিধা হচ্ছে– এমন অবস্থায় মডেল সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে ওই অংশ বুঝিয়ে দিতে পারছে।

এলএলএমের এই দিকটির সাফল্যকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে সবার ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনকভাবে বেশ কিছু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং মডেল পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে চ্যাটজিপিটির একটি কোডিং সংস্করণ চ্যাটজিপিটি কোড ফিচার। জনপ্রিয়গুলোর মধ্যে আরো রয়েছে গিটহাব কোপাইলট, আমাজন কোড হুইসপারার, ডীপমাইন্ড আলফা কোড ইত্যাদি।

মডেল কি নিজেই নিজের অ্যালগরিদম লিখতে পারে? এলএলএম যখন কম্পিউটারের জন্য প্রোগ্রাম লিখতে পারছে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সে নিজের মডেলটির যেই সফটওয়্যার বা অ্যালগরিদম সেটিও লিখতে পারে কি না। সেও তো এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়।

তাহলে তো মডেল নিজেই নিজের মতো আরো মডেল সৃষ্টির কাজটি নিয়ে নিতে পারে, এমনকি নিজের থেকে আরো উন্নততর মডেল সৃষ্টির অ্যালগরিদম লিখতে পারে। যদি হুবহু তা পারে, তাহলে সেটি এক ধরনের জৈবিক ক্ষমতা লাভের মতো হবে, জীব যেরকম অন্য জীব সৃষ্টি করতে পারে সেরকম!

মডেল সত্যি মডেলেরই অ্যালগরিদমের কিছু কিছু অংশ লিখে দিচ্ছে নিয়মিত ব্যবহারের জন্য মডেল উন্নয়নকারী মানুষদের জন্য। কিন্তু এ পর্যন্ত যা হয়েছে, তাতে বলা যায় না যে, মডেল নিজের মতো আরো মডেল সৃষ্টি করতে পারছে। তবে এলএলএমের সৃষ্টিশীলতাকে ব্যবহার করে মানুষের পক্ষে নতুন মডেলের গঠন আইডিয়া পেতে এর ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। মডেলের অ্যালগরিদম যখন লেখা হয়, তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অবস্থাটি নির্ণয়ের ভার এলএলএমকে দেয়া যাচ্ছে। পুরো মডেল সফটওয়্যারের ছোট ছোট কিছু অংশকে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়, তখনো এলএলএমকে দিয়ে ওই কোডগুলো নানা রকমে লিখিয়ে তাতে সহায়তা পাওয়া যায়। কাজেই নতুন মডেলের অ্যালগরিদম রচনায় সহায়তা প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে এলএলএম নিজের থেকে।

কিন্তু এলএলএম এখন যা পারছে না, অদূর ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে হচ্ছে না, তা হলো মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে অন্য আর একটি মডেলের গঠনের পুরো অ্যালগরিদম লিখে দেয়া। এক্ষেত্রে যে মৌলিক আইডিয়া স্ফূরণের দরকার, বড় আকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার, সর্বাঙ্গীন মূল্যায়ন দরকার প্রতি পদে পদে, মানুষের সাধারণ ও গাণিতিক অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া তা সম্ভব হচ্ছে না। চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু যখনই মানব-তদারকি ছাড়া এমন কিছুকে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়েছে তখনই এর মধ্যে নানা বৈকল্য ধরা পড়েছে– নিজের কাজের ভেতরেই এটি ভেঙে পড়ে। যে বিপত্তিগুলো একে টেকসই হতে দেয় না, তার মধ্যে রয়েছে অতিমাত্রায় হ্যালুসিনেশন, তথ্যভান্ডার ও কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণ শক্তির অসম্ভব রকমের চাহিদা সৃষ্টি, ইত্যাদি। সে যাই হোক, নীতিগতভাবেও এই পথে এআই মডেলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টাটিকে খুব উচ্চ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় রাখাটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ বাধাহীনভাবে যদি এক মডেলের দ্বারা অন্য মডেল সৃষ্টি করার সুদূর সম্ভাবনাও থাকে, তাহলে এর অপব্যবহারের নানা দরজা খুলে যায়, এবং অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে এআইয়ের জগতে মানুষের নিয়ন্ত্রণ হারাবার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

সৃষ্টিশীলতার অপব্যবহার

গত অধ্যায়েই আমরা দেখেছি জেনারেটিভ এআইয়ের সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে বড় রকমের কয়েকটি বিড়ম্বনা এসে জুটেছে। এর একটি হলো হ্যালুসিনেশন অর্থাৎ এলএলএম যখন একেবারে সত্যের মতো করে ডাহা মিথ্যা বা অলীক ফলাফল দেয়। ওপরে যে ওষুধ উদ্ভাবন ইত্যাদির কথা বল্লাম, সেখানেও এমনি অলীক ফলাফল এমন আস্থার সঙ্গে সে দেয় যে বিজ্ঞানীদের তার জন্য যথেষ্ট ভোগান্তি পোহাতে হয়। আর একটি বিড়ম্বনা দেখেছি এলএলএমের পক্ষপাতমূলক ফলাফল আসা– যেসব পক্ষপাত আমাদের সমাজে ইতোমধ্যে প্রচলিত আছে, অনেকটা সেরকম পক্ষপাত– জাতি-বৈষম্য, লিঙ্গ-বৈষম্য ইত্যাদি। হ্যালুসিনেশন আর পক্ষপাত এই দুটি বিড়ম্বনার সৃষ্টিই কিন্তু লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের (এলএলএম) মৌলিক কর্মপ্রণালির মধ্যেই নিহিত। বুদ্ধিমান হতে গিয়েই অনিবার্যভাবে এ দুটি এসেছে। কোনো মানুষের দুরভিসন্ধি এর জন্য দায়ী নয়, হয়তো ভবিষ্যতে মানুষ সতর্ক হয়ে এর ক্ষতি কমাতে পারবে।

তৃতীয় যে বিড়ম্বনার কথা বলেছি, সেটি কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। ভাষা, চিকিৎসা, আর্টস, বিনোদন, বিজ্ঞান এই সবক্ষেত্রে এলএলএম যে অপূর্ব সৃষ্টিকর্ম মানুষকে দিচ্ছে, মানুষ সে সৃষ্টিগুলোকে নির্দেশ দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে পারছে। এই পারার সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো মানুষ তার অপব্যবহার করছে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে। এর উদ্দেশ্য প্রধানত প্রতারণা– এলএলএমকে দিয়ে ভুয়া খবর, ভুয়া দলিল, ভুয়া কণ্ঠস্বর, ভুয়া ভিডিও ইত্যাদি তৈরি করিয়ে তা দিয়ে প্রতারণা। এলএলএম তার সব সৃষ্টির মতো আদিষ্ট হয়ে এইগুলোও এত নিখুঁতভাবে করে যে, অন্যরা সহজে প্রতারিত হয়। তার সক্ষমতাটাই এখানে তাকে সন্দেহের বস্তুতে পরিণত করছে– কিছু মানুষের কারসাজির কারণে। এ কারণে তার সৃষ্টিশীলতার নানা চমকপ্রদ উদাহরণের সঙ্গেই এই কালো দিকটির আলোচনা যথাযথ হবে।

ভুয়া জিনিসের সৃষ্টিকে সহজ করেছে: আগে নকল কিছু সৃষ্টি করতে অনেক পরিশ্রম ও ফন্দির প্রয়োজন হতো; জেনারেটিভ এআইয়ের যুগে তা খুব সহজ হয়ে গেছে। মুহূর্তেই এটি সৃষ্টি করা যাচ্ছে। প্রতারক যেকোনো রাজনৈতিক নেতার বা বিখ্যাত মানুষের নকল বক্তৃতা এমন ভাষায় রচনা করে দিতে পারে, যা তাঁদের রচনাভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত যে কেউ তা বিশ্বাস করবে। এর জন্য সবচাইতে সহজ হলো চ্যাটজিপিটিকে এমনি টার্গেট মানুষের মতো করে প্রতারকের নিজে নিজের রচিত বানোয়াট কথাগুলোকে পরিবর্তন করতে দিলেই হলো। কারো ভুয়া ছবি বা ভিডিও সৃষ্টি করে তাকে হেনস্তা করার নায্যতা হিসেবে প্রামাণ্য দলিলে হাজির করাও একইভাবে সহজ– আর সেই প্রমাণকে মনে হবে একেবারে অকাট্য। কাজেই নিজের

প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলা এখন প্রতারকের জন্য খুব সহজ হয়ে গেছে। সিনেমা তৈরি করতে গিয়ে যদি যেকোনো পরিচিত অভিনেতাকে না ডেকেই তাঁর অভিনয় করিয়ে নেয়া যায়, তাহলে গল্পের সিনেমা নয়, বরং কাল্পনিক ঘটনা দিয়ে 'প্রামাণ্যচিত্র' বানাতে অসুবিধা কোথায়? ওই প্রামাণ্যচিত্রে আমরা যে কাউকে যেকোনো জায়গায় যে কারো সঙ্গে হাজির থাকাটি 'প্রমাণ' করতে পারবো। হয়তো সেটি খুব অপ্রত্যাশিত কোনো ছবি বা ভিডিও হলে মানুষের মন অবিশ্বাস করতে চাইবে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সবকিছু এত নিখুঁত হবে যে, অবিশ্বাস করা কঠিন হবে। এর মধ্যে কণ্ঠস্বরের ব্যাপারটিও থাকে। শুধু কণ্ঠস্বরটি নকল করেই কারো মুখ দিয়ে যেকোনো কিছু বলিয়ে নিয়ে তার রেকর্ড বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রচারে ছেড়ে দিলেই হলো। চেনা মানুষের কণ্ঠস্বরটি এতটাই চেনার মতো অনন্য হয় এবং সবার এত চেনা থাকে যে, তা অবিশ্বাস করা কঠিন। অথচ এর সবই এখন এআই মডেলে প্রম্পট করেই সৃষ্টি করা যায়– বিশেষ করে যদি টার্গেট মানুষটির ছবির ও কণ্ঠস্বরের বহু নমুনা সাধারণ ডিজিট্যাল তথ্য হিসেবে সহজলভ্য হয়।

অতীতেও এরকম জালিয়াতি ছিল। কিন্তু তখন তার প্রযুক্তি এত কাঁচা ছিল যে, সেটি অত্যন্ত কঠিন হতো, এবং ধরাও পড়ে যেত খুব সহজ কোনো ভুলের কারণে। কিন্তু এলএলএমে তেমনটি হবার নয়। এটি তার কাজ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করে যেভাবে বলা হয় সেভাবেই। তবে এখানেও প্রতারণার সবগুলো মাধ্যম সমানভাবে সহজ নয়। ভাষার বিষয়টি সব থেকে সহজ। যে কারো স্টাইলে যেকোনোকিছু ভাষা মডেলকে দিয়ে রচনা করিয়ে নেয়া সম্ভব। ফটোকে এডিট করা আগেও সহজ ছিল, এখন একেবারেই সহজ। কণ্ঠস্বরটি তার থেকে কঠিন। ভিডিওতে নিখুঁতভাবে অন্যকে হাজির করা আরো কঠিন এ নিয়ে অনেক মডেল উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও। কারণ সেখানে অনেক কিছুর সমন্বয় একসঙ্গে করতে হয়। তবে এ সংক্রান্ত মডেলের সঙ্গে পরিচিত প্রতারক কুশলী ব্যক্তিদের জন্য এটিও একেবারে অসম্ভব নয়। সান্ত্বনার কথা হলো, যে প্রযুক্তি প্রতারণা সহজ করে দিয়েছে, সে প্রযুক্তিই আবার প্রতারণাটি ধরে ফেলার কাজটিকেও সম্ভব করেছে।

প্রতারণা উদ্ঘাটনের উপায়: প্রতারণা ধরে ফেলার এবং নিজে শুধু সত্য ও নিরাপদ তথ্যের মধ্যে থাকার প্রথম প্রতিরক্ষা হলো নিজের কাণ্ডজ্ঞান। প্রতারণা এবং ভুয়া খবরের প্রকৃতি সাধারণত এমন হয় যে, তাতে সন্দেহের উদ্রেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর বিষয়বস্তু, বক্তব্যের ধরন, এবং টার্গেট করা মানুষটি সাধারণত এমন হয় যে, ওটিকে বিশ্বাস না করে আরো নির্ভরযোগ্য তথ্য-উৎসের সন্ধান করাটাই

বুদ্ধিমানের কাজ। আর যদি ভুয়া খবর, ভুয়া ছবি ইত্যাদি বিশ্বাস করার জন্য আগে থেকেই কেউ মনকে তৈরি করে রাখে, তাহলে ভিন্ন কথা। তারপরও ওই প্রতারণামূলক জিনিসগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন রয়েছে, এর দ্বারা প্রভাবিত মানুষদেরকে নিরস্ত করতে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

ভুয়া জিনিস তা লিখিত দলিল, ছবি, ভিডিও যাই হোক না কেন আজকালকার দিনে তা কোনো এলএলএম মডেল দিয়ে তৈরি হওয়াটার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এটি কমবেশি সবার জন্য সহজসাধ্য, শুধু প্রম্পট করেই সৃষ্টি করা যায়। সেটি যদি হয়, তাহলে সহজলভ্য বিখ্যাত মডেলগুলো যে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো সৃষ্টি করেছে, তারাই নিজ নিজ মডেলের সৃষ্টির মধ্যে কিছু দেখার বিষয় স্পষ্ট করেছে। সেটি যে এআই সৃষ্ট তা সহজে ধরে ফেলার মতো কিছু কিছু চিহ্ন বের করেছে। এভাবে ওপেন এআই, গুগল, অ্যাডোবি ইত্যাদি কোম্পানি দেখেছে তাদের মডেলের দেয়া ভাষা লিপিতে বা ছবির মধ্যে এমন কিছু চিহ্ন লুকিয়ে থাকে, যা কি না তাদের মডেলের স্বাক্ষরের মতো, ওটি দেখে বোঝা যায় যে, যে জিনিসটি এলএলএমের সৃষ্টি। এর কিছু ফলশ্রুতি বিশেষজ্ঞ না হয়েই বোঝা যেতে পারে। যেমন চ্যাটজিপিটির দেয়া ভাষায় প্রায়ই কিছু কথার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়– ব্যবহারকারীকে এর বাহবা দেয়া বা ধন্যবাদ দেয়ার কায়দার মধ্যেই তা দৃশ্যমান। যে সব ছবি এআই মডেল সৃষ্টি করে তাতেও ভালো করে লক্ষ করলে কিছু অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ওতে শরীরে চামড়াকে অস্বাভাবিক মসৃণ দেখায়, হাতের ভাঁজ, মুখে আলোর প্রক্ষেপণটিও কিছুটা অস্বাভাবিক হয়। নকল কণ্ঠস্বরের মধ্যেও কিছু কিছু ফ্রিকোয়েন্সি মানুষের স্বরের থেকে ভিন্ন হয় বলে মনোযোগ দিলে তা বোঝা যায়।

ভিডিওটি জাল কি না ধরার জন্য ভালো উপায় হলো এর প্রত্যেকটি ফ্রেমের দিকে নজর দেয়া এবং তাতে স্থির ছবির মতো অস্বাভাবিক জিনিস খোঁজা। এতে সম্পাদনার চিহ্ন ধরা পড়ে। দেখা যায় দাঁত অস্বাভাবিক ঢেউ খেলানো, চোখের পলক ফেলাটিও অস্বাভাবিক। ভিডিওর অডিওকে, অথবা এমনি অডিওকে দৃশ্যমান সিগন্যালে পরিণত করে তা পরীক্ষা করা যায়। সাধারণত মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কিছু মৃদু নয়েজ জড়িয়ে থাকে, নকল কণ্ঠস্বরে তা থাকে না, ওটি অস্বাভাবিকভাবে বিশুদ্ধ।

ভুয়া খবর, জাল ছবি, দলিল ইত্যাদি প্রচারিত হবার পর কেউ কেউ বা কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তার বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের কাজ হাতে নেন– যে কাজটিকে বলা হয় ফ্যাক্ট চেক। অনেক সময় এ কাজটিকে রীতিমত একটি বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দাগিরির পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়, কারণ ওটি যে জাল, সেটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য

প্রমাণ প্রয়োজন হয়, তেমনি ওটি যে জাল নয়, সেটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও। ওপরে যে অন্তর্নিহিত চিহ্নের কথা বলা হলো তা এর একটি দিক মাত্র, যা সাধারণ এলএলএম ব্যবহারকারীরাও আন্দাজ করতে পারেন। উদ্‌ঘাটনের আর এক ধরনের উপায় হলো জিনিসটির বিষয়বস্তু, বক্তব্য, এবং যে মানুষের সম্পর্কে তা, এইসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা। অর্থাৎ ওই মানুষ বা মানুষগুলোর সম্পর্কে যেসব তথ্য, দলিল, ফটো, ভিডিও ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে, যেখানে বিসদৃশ কোনো খবর নেই, সেইগুলোর সঙ্গে এই নতুনটির তুলনা করা– যাকে বলা যায় ক্রস ভেরিফিকেশন। যেমন সন্দেহজনক ছবিতে যে জায়গা, তাকে যে সময়ের বলে দাবি করা হচ্ছে তা অন্য সব তথ্যের সঙ্গে মেলে কি না। তার পারিপার্শ্বিক যা রয়েছে সেগুলোর দিকে লক্ষ করলে হয়তো এরকম মেলা বা না মেলাটি ধরা পড়ে যেতে পারে।

ধরা যাক, সন্দেহজনক ছবিতে বলা হচ্ছে ‘লন্ডন জানুয়ারি প্রতিবাদ মিছিল ২০২৫’– অথচ এতে মূল ছবি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে দশ বছর আগের জুন মাসের এক বিক্ষোভের। ছবিতে দেখা আবহাওয়ার প্রকৃতি, গাছপালার অবস্থা ইত্যাদি থেকেই বোঝা যাবে যে ছবিটি ভুয়া, জানুয়ারি আর জুন মাসের প্রকৃতি এক নয়। প্রয়োজনে ঠিক ওই দিনক্ষণের আবহাওয়া ওই জায়গায় যেমন ছিল তখনকার আবহাওয়া রিপোর্ট থেকে তা প্রমাণ করা যায়। গোয়েন্দারা বলে থাকেন যে, যেকোনো চৌর্যবৃত্তি চুরির কোনো না কোনো চিহ্ন রেখে যায়, তা এক্ষেত্রেও সত্য।

প্রযুক্তিগতভাবেও প্রতারণা ধরে ফেলার কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে– যেমন এআই ব্যবহার করা প্রতারণা উদ্‌ঘাটন্ করার জন্য পৃথক এআই মডেলই উদ্ভাবিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ দমন এজেন্সিগুলোর জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে এজন্য সেমাফোর নামে একটি এআই মডেল। কথাটি এসেছে সেমানটিক ফোরেনসিক অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে অপরাধ নির্ণয়। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলো যারা অনেকের ব্যবহারের জন্য এলএলএম মডেল তৈরি করছে তাদেরকে আইনগতভাবে বাধ্য করা হচ্ছে আত্মপরিচয় দিতে। তাদের মডেলের মধ্যেই যেন এমন ব্যবস্থা থাকে যে, তার প্রত্যেকটির ফলাফলে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে বলে দেবে এটি এআইয়ের সৃষ্ট জিনিস– সেটি লেখা, ছবি, ভিডিও, অডিও যাই হোক। এটি অনেকটা টাকার নোটের ওপরে জলছাপ দিয়ে দেয়ার মতো।

তথ্যপ্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে ভুয়া কিছু তথ্য একবার সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিলে তা বিদ্যুৎ-বেগে সারা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছে যেতে পারে, এ সম্পর্কে কিছু করতে পারার আগেই। ফলে যদিও বা প্রতারণা পরে উদ্‌ঘাটিত হলো, কিন্তু ইতোমধ্যেই এটি অনেক ক্ষতি করে ফেলতে পারে। শেষ

অবধি উদ্‌ঘাটনের প্রযুক্তির কাছে প্রতারণা টিকতে পারছে না বটে, কিন্তু ইতোমধ্যে কিছু ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সর্বব্যাপী জয়জয়কারের মধ্যে তার সম্পর্কে অনেকের একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়তে সাহায্য করছে এই প্রতারণার সুযোগ। শেষ পর্যন্ত এখানে মানুষকে নিজের কাণ্ডজ্ঞানের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে।

এআই যখন এজেন্ট

এজেন্ট মানে প্রতিনিধি, আমার হয়ে যে কাজ করবে। এজেন্ট শব্দটি সাধারণত আনুষ্ঠানিক কাজ, ব্যবসায়িক কাজ, এসবের ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহৃত হয়। এআইয়েরও এজেন্ট হবার ব্যাপারটি আসলে সেই অর্থেই প্রচলিত। অবশ্য ব্যক্তিগত ছোট কাজেও এআইয়ের এজেন্ট হতে বাধা নেই, এবং তা প্রচুর হচ্ছেও। আমরা হয়তো শিগ্‌গিরই অনেক সাধারণ অনানুষ্ঠানিক কাজেরও ভার প্রতিনিধি হিসেবে এআইয়ের ওপর ছেড়ে দেবো। কিন্তু এখন বেশি যা দেখা যাচ্ছে, তা হলো কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে এআইয়ের কাজ করা। যা হয়তো কোম্পানির ব্যক্তিবর্গকেই এতদিন করতে হয়েছে, এমনি সম্পূর্ণ কিছু কর্মসম্পাদন এখন এজেন্ট করছে।

এজেন্টের কাজ

গত দু'তিন বছর আধুনিক জীবনযাত্রার প্রায় সবক্ষেত্রে এলএলএমের কল্যাণে এআই যে দ্রুত পরিবর্তন আনছে, সেটি আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। সর্বশেষ ২০২৫ সালটিকে যদি দেখি তাহলে এআইয়ের সর্বাধুনিক যে রূপটি এ বছর সবার আগ্রহে, প্রচেষ্টায় এবং আলোচনায় আছে, সেটি হলো এজেন্ট হিসেবে এর ব্যবহার। বরাবর ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও ব্যবসায়িক পর্যায়ে এজেন্ট বলতে যা বুঝে এসেছি, এও ঠিক তাই। যেমন বিদেশ ভ্রমণে যাবার জন্য নিজে যাবতীয় অনুসন্ধান করে নিয়মকানুন জেনে নিয়ে, সুবিধাজনক টিকেট করে, হোটেল অগ্রিম বুকিং দিয়ে, ভিসার ব্যবস্থা করে সব আয়োজন করার বদলে আমরা প্রায়ই একটি ট্রাভেল এজেন্ট কোম্পানিকে সব কাজের দায়িত্ব দিয়ে দিই। তাকে শুধু জানিয়ে দিই আমার কিছু পছন্দ-অপছন্দের কথা। বাকি সব কাজ এজেন্ট আমার নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন করে টিকেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমার হাতে তুলে দেয়। আমি এ ব্যাপারে সময় ও শ্রম ব্যয় না করেই সম্পূর্ণ কাজের সুফলটি ভোগ করতে পারি। এই উদাহরণের ক্ষেত্রে একটি মানুষ-সম্পাদিত এজেন্টের কাছে গিয়েছি। এখন আমি একটি এআই ট্রাভেল এজেন্ট মডেলকেও কাজটি দিতে পারি সেক্ষেত্রে এআই এজেন্ট প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং

স্বায়ত্তশাসিতভাবে পুরো কাজটি করে কাজের ফলাফল আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারছে। সাধারণ এলএলএমের কাজের যেসব নমুনা আমরা দেখেছি, তার তুলনায় এই এজেন্টের সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হওয়াটাই এতে বড় পরিবর্তন। এলএলএম কাজ করে আমার প্রম্প্‌ট অনুযায়ী। বিভিন্ন রকম কাজ করতে হলে প্রত্যেকটির জন্য সে আমার নির্দেশ চাইবে প্রম্পট হিসেবে। কাজেই আমাকে কাজটির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হচ্ছে, এলএলএমও আমার ওপর এদিক থেকে নির্ভরশীল থাকছে। কিন্তু অন্যদিকে এআই এজেন্টকে একবার কাজ বুঝিয়ে দিলেই হলো, সে সম্পূর্ণ কাজটি নিজে সম্পাদন করেই ফিরে আসবে আমার কাছে। সেজন্যই তো সে এজেন্ট; আমার ট্রাভেল এজেন্ট যেরকম এজেন্ট। এখানে সম্পাদন করার ব্যাপারটিও লক্ষ করার মতো। সাধারণ এলএলএম পূর্বাভাস দেয়, সৃষ্টিশীল হয়ে নানা কিছু রচনা করে, কিন্তু নানা যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করতে তাকে দেখিনি। এজেন্ট কিন্তু তাও করে।

এর থেকেও সাধারণ কাজে এআই মডেল এখন ব্যবহার করতে পারছি– ঘটা করে তাকে এজেন্ট বলতেও পারি, নাও বলতে পারি। নিজে দশ দোকান ঘুরে নানা জনের জন্য ঈদ উপহার কিনতে, বা নিজের কাপড় চোপড় কিনতে পারছি না সময়ের বা ধৈর্যের অভাবে। ওই এজেন্ট মডেল ঠিক আমার বলে দেয়া জিনিসগুলো আমার দেয়া ব্যয়সীমার মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানের যেখানে পাবে সেখান থেকে কিনে দেবে। এজন্য যে ডিজিট্যাল যোগাযোগে সম্ভাব্য সবরকম দোকান ও সরবরাহকারীর পসরাগুলোর দাম ও গুণ পরীক্ষা করে ফেলবে, সিদ্ধান্ত নেবে কোন্ জিনিসগুলো সব দিক থেকে ভালো হবে, তারপর দামদস্তুর চুকিয়ে (ডিজিট্যাল পেমেন্টের মাধ্যমে, যার ক্ষমতা আমি যদি তাকে দিয়ে থাকি) ওগুলো আমার কাছে ডেলিভারির ব্যবস্থা করবে। অবশ্য আমি চাইলে সে চূড়ান্ত পেমেন্ট ও ডেলিভারির আগে ওগুলোর ছবি ও দাম দেখিয়ে আমার থেকে একটি অনুমতিও নিয়ে নিতে পারে।

তবে যে কারণে ২০২৫ সালটি এআই এজেন্টের বছর এমন কথা সবার মুখে মুখে, সেটি প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এজেন্টের দায়িত্ব পালনের কারণে। বড় বড় কোম্পানিরা বিভিন্ন কাজে তাদের মানুষ এজেন্ট নিযুক্ত করে– বিপণনের জন্য সেইল্‌স এজেন্ট, প্রচারের জন্য মিডিয়া এজেন্ট, দূরের কোনো জায়গায় তার স্বার্থ দেখার জন্য লোকাল এজেন্ট, আইন-আদালতের ব্যাপারে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য লীগাল এজেন্ট– ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোম্পানির ওই বিষয়ক সব কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব ওই এজেন্টের হাতেই সমর্পিত হয়। মানুষ এজেন্ট নিজেকেও একটি কোম্পানি বা কার্যসম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে

উঠতে হয়, নিজের উদ্যোগে নিজে নিজে বহু রকমের যোগাযোগ, কাজ, ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে। দারুণ ব্যাপার হলো এআই এখন ঠিক এই মানুষ সম্পাদিত এজেন্টদের জায়গাটি দখল করতে পারছে। এমনকি এমনো ক্ষেত্রে সে এজেন্টের মতো কাজ করতে পারছে, যেখানে অন্য একটি কোম্পানির সঙ্গে দরকাষাকষি করে একটি চুক্তিতে উপনীত হবার ব্যাপার রয়েছে। হয়তো সেই দরকষাকষি সে করছে ওই কোম্পানির নিযুক্ত আর একটি এআই এজেন্টের সঙ্গে। এজেন্টে এজেন্টে আলোচনা, দরকষাকষি, চুক্তি সম্পাদন সবকিছুতে কোম্পানি দু'টি যার যার এআই এর কাছে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। এজেন্টের ওপর যথেষ্ট আস্থা না থাকলে কোন্ কোম্পানি এটি করতে যাবে? ওই আস্থা এখন সৃষ্টি হতে পেরেছে বলেই এআই এজেন্ট নিয়ে এত উৎসাহ।

ধরা যাক একটি চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যার যার এআই এজেন্ট তার কোম্পানির কাছে চুক্তির দলিলটি অনুমোদনের জন্য পেশ করেছে। এই পর্যায়ে লীগাল এজেন্টকে দিয়ে এটি পরীক্ষা করিয়ে নেয়া প্রয়োজন হতে পারে– এতে সব আইনি বাধ্যবাধকতা মানা হয়েছে কি না, এতে কোম্পানির জন্য সব রকম আইনি সুরক্ষা আছে কি না, চুক্তির বরখেলাপ করলে তার প্রতিবিধানের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে কি না, আদালতের দৃষ্টিতে এই চুক্তি টিকবে কি না ইত্যাদি সব আইনি ফাঁকফোকর। এগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেবার জন্যও এখন এআই মডেল তৈরি হচ্ছে– যে কি না রীতিমত একটি আইনি প্রতিষ্ঠান বা লীগাল এজেন্ট হিসেবে দলিল শুধু পরীক্ষা করে না, সংশোধিত দলিল তৈরিও করে দেয়।

এ ধরনের কাজ এআই করছে শুনলে মনে হতে পারে যে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোন এআই বোধ হয় উদ্ভাবিত হয়েছে। সেটি কিন্তু হয়নি, বরং এটি এলএলএমেরই একটি নতুন বিন্যাস। একাধিক এলএলএম মডেলকে নানাভাবে সাজিয়ে এজেন্টের মূল কাঠামো তৈরি হয়। তাদের সঙ্গে আরো কিছু নতুন সক্ষমতা যোগ করা হয় কিছু ডিজিটাল হাতিয়ার (টুল্স) হিসেবে মূল কাজের সহযোগী হবার জন্য। যেমন মূল এলএলএম ট্রেনিঙের সময় যে তথ্য দেখেনি, সেই সর্বশেষ তথ্যগুলো পাওয়ার জন্য তার সঙ্গে যদি যোগ করি ইন্টারনেটে গিয়ে সেখানে এরকম তথ্যের খোঁজখবর করার ক্ষমতা, তাহলে সেটিই হয়ে পড়বে একটি ডিজিটাল হাতিয়ারের মতো। এমনিতরো আরো বহু রকমের ডিজিটাল হাতিয়ার যোগ করা হতে পারে। সংযুক্ত এলএলএম মডেলগুলো পরস্পরের সঙ্গে কাজ করে, আর তাদের সঙ্গে যে হাতিয়ারগুলো যুক্ত হয়, তার মধ্য থেকে প্রয়োজনমত যখন যেটিকে দরকার, সেটিকে ডেকে কাজ করাতে পারে। এভাবে এলএলএম হাতিয়ার-সমৃদ্ধ হয়ে অনুসন্ধান, সংযোগ স্থাপন ও

কথোপকথন, দলিল সৃষ্টি, সুবিবেচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করে একটি সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে, একটি এআই এজেন্ট হয়ে।

এজন্য নানা এলএলএমের সংযোজনের যে কথা বল্লাম তার একটি সরল উদাহরণ দেয়া যাক। মনে করি একটি এলএলএম একটি রচনা লিখলো– এমন সৃষ্টিই তো তার কাজ। এখন রচনাটিকে যদি মূল্যায়ন করতে হয়, তাহলে সাধারণত মানুষ-ব্যবহারকারীই সেটি পড়ে এর ভালোমন্দ নির্ণয় করেন। তারপর হয়তো আবার প্রম্প্ট করে মডেলকে তা সেভাবে বদলাতে বলেন। কিন্তু তা না করে আর একটি এলএলএমকেই এই মূল্যায়নের দায়িত্ব দেয়া যায়। তারপর আরো একটি বাড়তি এলএলএমকে রচনাটিকে সম্পাদনা করে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া যায়। দেখা গেলো ওই তিনটি এলএলএম মিলে নিজেরা নিজেরাই একটি রচনা লিখে, দেখে, সম্পাদনা করে ব্যবহারযোগ্য একটি সম্পাদিত লেখা দিয়ে দিল– মাঝখানে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া। এভাবে কয়েকটি এলএলএম একযোগে এজেন্ট হয়ে উঠলো।

আসলে চ্যাটজিপিটির মতো জনপ্রিয় মডেলের যে উন্নত রূপ এখনই সবার কাছে রয়েছে, দায়িত্ব দিলে তাই একভাবে এজেন্টের মতো কাজ করতে পারে। একসঙ্গে পুরো নির্দেশটি দিয়ে দিলে এটি ভেঙে ভেঙে কাজের নানা অংশগুলো সম্পন্ন করে পুরো কাজ করে দিতে পারে। তবে বিশেষ বিশেষ কাজের এজেন্ট হবার আরো উপযুক্ত করে বিশেষায়িত এজেন্টিক মডেলও প্রচুর তৈরি হচ্ছে। এ নিয়ে এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই।

নানা রূপে এআই এজেন্ট

এলএলএম এসে সৃষ্টি করেছিল জেনারেটিভ এআই, সৃষ্টিশীল হয়েছিল বলে। এটি উপহার দিতে পারছে লিখিত রচনা, সাহিত্য, দলিল; নানা ইমেজ, ছবি; সঙ্গীত, কণ্ঠস্বর, নানা ধ্বনি; পুরোদস্তুর সিনেমা বা ভিডিও। কিন্তু এ কাজেও এটি স্বাধীন ছিল না, আমাদের নির্দেশের ওপর পদে পদে নির্ভর করেছে। সেটি যাতে করতে না হয় এজন্যই এসেছে তার ভিন্ন রূপ, এজেন্টিক এআই অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বকারী এআই, যে আমাদের হয়ে কাজ করে দিতে পারে। যে কাজটিতে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানির মানুষ নিজেরা করাটি সুবিধাজনক মনে করছে না। সেখানেই এজেন্টিক এআইয়ের ডাক পড়তে পারে। আবার একটি সম্পূর্ণ কাজ, যা আমরা জানি যে নানা পদক্ষেপে শেষ করতে হবে, তার জন্য যদি একটি এআই মডেল তৈরি করি সেটি হবে একটি এআই এজেন্ট।

অনেক সময় কয়েকটি আলাদা এআই এজেন্টের সম্মিলিত প্রয়াসেও একটি সম্পূর্ণ কাজ হতে পারে। যেমন বিদেশ যাওয়ার টিকেট করা, হোটেল বুক করা, ইত্যাদি নিয়মিত কাজের বাইরে সে দেশে অভিবাসন পাওয়াটিও যদি অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন হয়তো ট্রাভেল এআই এজেন্টকে সব কাজ দেয়া ঠিক হবে না– কারণ যাত্রার ব্যবস্থা করা এক ধরনের কাজ, আর অভিবাসনের কাজটি অন্য ধরনের কাজ; অন্য নানা আইন-কানুনের ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িয়ে। এজন্য আলাদা একটি এআই এজেন্ট অভিবাসনের ব্যবস্থা করে দেবে। অবশ্য এই দুই এজেন্ট একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত– ওই বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তাই এই দুইয়ের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। এই দুইয়ে মিলে একটি এজেন্টিক এআই সিস্টেম তৈরি হলো; যার মধ্যে রয়েছে একাধিক এআই এজেন্ট– ট্রাভেল এজেন্ট এবং ইমিগ্রেশন এজেন্ট।

এলএলএম এখানে কাজ সম্পাদন করছে, কিন্তু তাই বলে তার যে বড় সক্ষমতা সেই সৃষ্টিশীলতাকে সে ভুলে যায়নি। সে এখন কাজের জন্যই সৃষ্টি করে– দলিল তৈরি করে, ছবি গ্রাফ ইত্যাদি ইমেজ তৈরি করে, কথোপকথনের জন্য আওয়াজ সৃষ্টি করে। কিন্তু সেসবের জন্য ব্যবহারকারীর প্রম্প্‌টের ওপর বারবার নির্ভর করে না, নিজের তাগিদেই, অর্থাৎ কাজের তাগিদেই সে সৃষ্টি করে যায়। তাকে ট্রাভেল এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ভিসা অফিসে একটি ইমেইল করতে হবে। সে কথা কেউ তাকে বলে দেবে না। করতে যে হবে, সে কথা সে নিজেই অনুসন্ধান করে বের করে ফেলবে। নিজেই ইমেইলটি লিখে অন্য সব তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি আছে কি না দেখে নিয়ে ভিসা অফিসে পাঠিয়ে দেবে। ইমেইলের উত্তর আসলে সেই উত্তরের মর্ম উদ্ধার করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। সৃষ্টির থেকেও কাজটাই এখানে মুখ্য। এআই এজেন্ট কাজ নিজের বিবেচনামত স্বাধীনভাবে করবে, যদি না মাঝখানে ব্যবহারকারীর অনুমোদন নিতে হবে এমন কোনো শর্ত তাকে দিয়ে দেয়া হয়। যদি তেমন নির্দেশ দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে কাজের অগ্রগতির সব খবর সে ব্যবহারকারীকে জানিয়ে রাখবে।

যে কাজগুলো কোনো কোম্পানির জন্য মানুষকে দিয়ে করানো ব্যয়বহুল হচ্ছে বা কঠিন হয়ে পড়ছে, সেখানেই এজেন্টিক এআইয়ের ডাক পড়ছে। এমনি একটি কাজ বড় বড় কোম্পানির জন্য ক্রমেই কঠিন হচ্ছে তা হলো কোম্পানিতে মানব সম্পদ সৃষ্টি ও তার ব্যবস্থাপনার কাজ। কোম্পানিকে সবসময় অনেক নতুন কর্মচারী নিয়োগ দিতে হচ্ছে– তাদের বাছাই করা, নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, পরে তাদের কর্ম যাচাই, বেতন ছুটি ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। পুরোটা

কাজ এআইয়ের ওপর ছেড়ে দিতে পারলে খুব ভালো হয়। এজন্য কোম্পানির থাকতে পারে মানব সম্পদ এআই এজেন্ট।

এই মানব সম্পদ এজেন্টের অসংখ্য কাজের মধ্যে একটি ছোট্ট দৈনন্দিন কাজ দেখা যাক। নতুন একজন শিক্ষানবিশ ইন্টার্ন নিয়োগ পেয়েছেন, তিনি আগামী বুধবার সকাল ১০টায় যোগ দেবেন ও প্রাসঙ্গিক স্টাফ সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠকে কাজ বুঝে নেবেন। তাঁকে অফিসে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে, তাঁর নামে নতুন আইডি কার্ড ইস্যু করতে হবে, তাঁকে কোম্পানির একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার দিতে হবে। পুরো কাজটির একটি লক্ষ্য আছে– সেটি নতুন ইন্টার্নকে স্বাগতম জানানো। এআই এজেন্ট এই লক্ষ্যটি সামনে রেখে কাজগুলোকে কায়েকটি ধাপে বিভক্ত করবে– ধাপগুলোর কাজ পরস্পর বেশ ভিন্ন হতে পারে। প্রথম ধাপ ইন্টার্নকে লেখা একটি স্বাগতম ইমেইলের লিপি তৈরি করে ইমেইল পাঠানো; দ্বিতীয় ধাপ বুধবার সকাল দশটায় স্টাফের যাদের সঙ্গে ইন্টার্নের বৈঠক হবে, তাঁদের প্রত্যেককে সে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি ইমেইল লেখা ও পাঠানো। এজেন্টের এলএলএমের পক্ষে ইমেইলের লিপি তৈরি করাটি মামুলি নিয়মিত কাজ হলেও সেটি পাঠানো কিন্তু জেনারেটিভ এলএলএমের নিয়মিত কাজ নয়। এজেন্ট হয়েছে বলে ওই কাজে তাকে অভ্যস্ত হতে হবে– নিজ বুদ্ধিতেই পাঠাতে হবে, কাকে কাকে পাঠাতে হবে সেটি বিবেচনা করতে হবে– অর্থাৎ ঠিক করতে হবে স্টাফের মধ্যে কারা সেই বৈঠকে থাকা দরকার। এসব কাজ এজেন্টকেই করতে হবে। ওই স্টাফদের নাম পদবি ইত্যাদি জেনে, প্রাসঙ্গিক ইমেইলের ওপর তা লিখে তারপর পাঠানো, পরের ধাপটি হলো ইন্টার্নের জন্য আইডি কার্ড তৈরি করা– এজন্য তাঁর সব প্রাসঙ্গিক তথ্য, ফটো দিয়ে প্রিন্টার ও লেমিনেটর যন্ত্রকে তা প্রিন্ট করে প্লাস্টিকের ভেতরে আবদ্ধ করতে নির্দেশ দিতে হবে এজেন্টকেই। এটিও এলএলএমের নিয়মিত সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত নয়। পরের ধাপটি হলো কোম্পানির অফিসের সরঞ্জামের হিসেব রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ইনভেনট্রি বিভাগ রয়েছে তাকে নির্দেশ দিতে হবে ইন্টার্নের জন্য একটি ল্যাপটপ ইস্যু করতে। আরো পরের ধাপ হলো অভ্যর্থনা বিভাগকে নির্দেশ দেয়া, যাতে বুধবার সকাল দশটার আগে সঠিক জায়গা থেকে আইডি কার্ড ও ল্যাপটপ সংগ্রহ করে অভ্যর্থনায় রাখতে। ওই দিন ইন্টার্ন এলে তাঁকে বৈঠকের জায়গার তথ্য জানিয়ে এ জিনিসগুলো দিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে। তবেই এজেন্টের জন্য এই আপাত সম্পূর্ণ কাজটি শেষ হবে।

দেখা যাক এজেন্ট কীভাবে কাজগুলো করলো। এর প্রত্যেকটি কাজের জন্য এজেন্টকে বিভিন্ন ডাটাবেসে ঢুকতে হয়েছে। নতুন নিয়োগ দেয়া ইন্টার্নদের

ডাটাবেসে ঢুকতে হয়েছে প্রাসঙ্গিক ইন্টার্নের তথ্য নিতে আইডি কার্ড তৈরি করা ও অন্যান্যদেরকে জানাবার জন্য। যেসব বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে বৈঠকে থাকার অনুরোধ করে ইমেইল দিতে হবে, তাদের ডাটাবেসে ঢুকতে হয়েছে; ইনভেনট্রি বিভাগের ডাটাবেসে যেতে হয়েছে ল্যাপটপ ইস্যু করার অনুরোধ করতে; আর অভ্যর্থনা বিভাগের ডাটাবেসে ইন্টার্নকে অভ্যর্থনা করে রেজিস্ট্রি করার জন্য। তাছাড়া এজেন্টকে প্রিন্টিং মেশিন ও ল্যামিনেটিং মেশিনের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছে– মেশিন চালাবার সে সফ্‌টওয়্যারকে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আইডি কার্ডটি প্রিন্ট করতে ও ল্যামিনেট করতে।

যদিও সহজ সরল লক্ষ্য হলো একজন নবাগতকে অফিসে বরণ করে নেয়া, এআই এজেন্টের জন্য এর মধ্যেই অনেক রকম কাজ, অথচ এজেন্ট নিজে মূলত কিছু এলএলএম। যেহেতু এখন এর কাজ শুধু লিপি ইত্যাদি সৃষ্টি করা নয়, বরং নানা কাজ সম্পাদন করাও বটে, এলএলএম ওই কাজগুলোর ব্যাপারে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত শুধু নেয়। কিন্তু তার বাস্তবায়নের জন্য কিছু সহায়তাকারী তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয়, যাদেরকে আমরা ডিজিট্যাল হাতিয়ার হিসেবে দেখেছি। এই হাতিয়ারগুলোর সংযোগের ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু ডিজিট্যাল প্রোটোকল (নিয়মকানুন) অনুসরণের মধ্যস্থতাকারী থাকে– যাদের বলা হয় এক একটি এপিআই (অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস)। এরা মধ্যস্থতা করে মডেল ও অন্য একটি সফ্‌টওয়ারের মধ্যে, অথবা দুটি সফ্‌টওয়্যারের মধ্যে। এপিআই যেন এই দুইটার মধ্যে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেয়– যাতে এরা পরস্পর তথ্য বিনিময় করতে পারে, একে অন্যকে কাজ করাতে পারে। যেমন ওপরের উদাহরণে এজেন্ট বিভিন্ন উপযুক্ত এপিআইয়ের মাধ্যমে নানা ডাটাবেস থেকে তথ্য নিতে পেরেছে এবং প্রিন্টিং মেশিন ও ল্যামিনেটিং মেশিন ব্যবহার করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে হাতিয়ারগুলো অন্য কোনো এলএলএম নয়– নেহাত ডাটাবেস, সফ্‌টওয়্যার অথবা মেশিন ইত্যাদি। কিন্তু কোনো কোনো সময় অন্য একটি এলএলএমও হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োজন হতে পারে। এইসব হাতিয়ার নিয়েই মূল এলএলএমগুলো এআই এজেন্ট হয়ে ওঠে। এলএলএমগুলোকে যদি আমরা মনে করি এআই এজেন্টের মাথা এর এপিআইগুলোকে বলতে পারি তার বহু হাত, এবং প্রত্যেক হাতে থাকে সফটওয়্যার ইত্যাদি রূপে এক একটি হাতিয়ার। এদিক থেকে এজেন্ট একজন বহুভুজা কর্ম-দেবীর মত– যদিও পুরাটাই গাণিতিক রূপে।

এলএলএম তার কাজের জন্য এই যথোপযুক্ত হাতিয়ারগুলো বেছে নিতে পারলো কীভাবে। সেটিও ওই এলএলএমের কাজের ফলেই সম্ভব হয়েছে। যেমন ইন্টার্নকে স্বাগতম জানাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তাকে যেই প্রম্প্‌ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে

করা হয়েছে– সেই প্রম্প্‌টের বিশ্লেষণ থেকে এজেন্টের এলএলএম বুঝে ফেলেছে এজন্য কোন্ কোন্‌টি কাজ করতে হবে এবং তার জন্য কোন্ কোন্ হাতিয়ারকে ডাকতে হবে (টুল্ কল্)। সাধারণ এলএলএমের সঙ্গে এই এজেন্টিং এআইয়ের পার্থক্যটি বেশ স্পষ্ট। সাধারণ এলএলএমে প্রম্প্‌টটি করা হয় একটি পূর্বাভাস বা একটি সৃষ্টিকর্ম পাওয়ার জন্য। এতে একটি পাওয়ার পর পরেরটির জন্য আবার প্রম্প্‌ট করতে হয়। কিন্তু এজেন্টিক এআইয়ের ক্ষেত্রে প্রম্প্‌টটি একবারেই পুরো উদ্দেশ্যটি বলে দেয়– শেষ পর্যন্ত এজেন্টের কাছ থেকে কী সম্পূর্ণ কাজ চাওয়া হচ্ছে তা। বাকি কাজ এজেন্টের নিজের– কারণ সে একজন স্বাধীন প্রতিনিধি।

এজেন্ট হয়ে ওঠার পেছনে

এলএলএম কীভাবে নানা হাতিয়ার সমৃদ্ধরূপে এজেন্ট হয়ে ওঠে, তা বুঝতে আমরা এলএলএমের নিজের কাজটি একটু স্মরণ করি। একটি টোকেনের পর তার এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত আগের টোকেনগুলোর বিবেচনায় এলএলএম পরবর্তী টোকেনের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। এভাবে এটি শুধু সামনের দিকেই যেতে পারে, পরপর টোকেন জুড়ে জুড়ে পুরো একটি রচনা, বা ছবি বা অন্যকিছু সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এর পক্ষে পেছনের দিকে গিয়ে ইতোমধ্যে দিয়ে দেয়া টোকেনগুলার পুনর্বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই, সেখানে কোনোকিছু শোধরানোর সুযোগ নাই। এটি সব এলএলএমের একটি দুর্বলতা, যা তার কাজের প্রক্রিয়ার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। এই দুর্বলতার সমাধান হতে পারে আরো এলএলএমকে এর সঙ্গে দিয়ে। ধরা যাক এলএলএম আমার প্রম্প্‌ট অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা দিলো কোনো একটি প্রকল্পের। একাজটি যে এলএলএম করলো, তাকে বলি এলএলএম-১। এখন এলএলএম-২ নামের আরেকটিকে এর সঙ্গে যুক্ত করে ওই খসড়া পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করে তার সমালোচনা করার জন্য দিলাম– এটিকে ওই মর্মে প্রম্প্‌ট করে। তারপর এলএলএম-৩ কে এর সঙ্গে যোগ করলাম এবং তাকে দায়িত্ব দিলাম ওই সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করতে। এভাবে তিনটি এলএলএমের একটি শেকল সৃষ্টি করে এলএলএম-১, যা সৃষ্টি করেছিল তাকে পুনর্বিবেচনার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি করতে তাকে পেছনের দিকে আবার তাকাতে হয়েছে, যা সাধারণ এলএলএম করতে পারে না। এমনিভাবে সামনে পেছনে গিয়ে বিবেচনায় কাজ করার মতো এজেন্টিক এআইয়ের মূল কাঠামোটি আমরা পেয়ে গেলাম।

কিন্তু এজেন্টিক এআই হিসেবে ভালো কাজ করতে হলে এই মূল কাঠামোর সঙ্গে আমাদেরকে আরো যে কিছু যোগ করতে হবে তা আমরা দেখেছি। যেমন সংশোধিত পরিকল্পনাটি আরো ভালো করার জন্য এর সঙ্গে ডিজিটাল হাতিয়ার হিসেবে একটি সমৃদ্ধ ডাটাবেইসের সংযোগ থাকলে খুব ভালো হয়– যেমন গুগল সার্চ করে আরো জ্ঞান ও তথ্য এজন্য পাওয়ার সুযোগ ঘটে। তেমনি একটি প্রকল্পের গাণিতিক হিসাব-নিকাশগুলো পরিকল্পনায় আসা উচিত, তাই এই এজেন্টের একটি দরকারি হাতিয়ার হতে পারে একটি গাণিতিক সফ্‌টওয়্যার, নিদেন একটি ডিজিটাল ক্যালকুলেটর। এলএলএম শেকলের মূল কাঠামোর সঙ্গে এগুলো যাতে স্বচ্ছন্দে লেনদেন করতে পারে, সেজন্য এই উভয়ের মধ্যে থাকে যথোপযুক্ত এপিআই– ডাটাবেসের জন্য ডাটাবেইস এপিআই, গাণিতিক সফ্‌টওয়্যারের জন্য গাণিতিক এপিআই। খসড়া পরিকল্পনা, সমালোচনা, সংশোধিত পরিকল্পনা, সেটিকে নতুন খসড়া হিসেবে বিবেচনা, এর সমালোচনা, আবার সংশোধন– এভাবে এজেন্ট চক্রাকারে বারবার করে যায়। পরিকল্পনাকে নতুন তথ্য, নতুন জ্ঞান, নতুন হিসাব-নিকাশে এভাবে ক্রমেই সমৃদ্ধ করতে থাকে যতক্ষণ না মূল নির্দেশে দেয়া সীমাটি অতিক্রম হচ্ছে। এভাবেই এজেন্ট সর্বোত্তমভাবে তাকে দেয়া দায়িত্বটি পালন করতে পারে। বেশ কয়েকটি এলএলএম পরস্পর সংযুক্ত থেকে, নানা হাতিয়ারের সাহায্য নিয়ে, চক্রাকারে একটি কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করে, সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে। তার সবকিছু একটি ছন্দবদ্ধ অবস্থায় রাখার জন্য একটি সফটওয়্যার থাকতে হয়, যাকে বলা হয় অর্কেস্ট্রেটর, বা ছন্দ নিয়ন্ত্রক। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে একটি বাড়তি এলএলএমও এই কাজ করতে পারে।

সাধারণভাবে নানা কাজ করার যে এজেন্ট তাতে শেকলের মধ্যে থাকা বিভিন্ন এলএলএমগুলো একেবারে নানা কাজের উপযুক্ত করেই তৈরি করতে হবে এমন কথা নেই। হয়তো এর প্রত্যেকটিই হুবহু একই এলএলএম, বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য এর নানাটিকে নানা ভূমিকা পালন করতে দেয়া হয়েছে। শুধু প্রম্প্‌টের ভিন্নতার মধ্য দিয়েই এই ভূমিকা আসতে পারে। যেমন একটিকে দিতে পারি কর্মপরিকল্পনার ভূমিকা, সেজন্য তাকে প্রম্পট করা হলো: 'এখানে যে লক্ষ্য দেয়া হয়েছে তাকে ধাপে ধাপে করণীয় কাজে বিভক্ত কর'। আরেকটিকে ভূমিকা দেয়া যায় সত্যায়নের কাজে– তাকে প্রম্প্‌ট করতে পারি: 'কাজের ধাপগুলো ঠিক ঠিক হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে সত্যায়িত কর'। আরেকটিকে দিতে পারি বিশেষজ্ঞের ভূমিকা, তার জন্য প্রম্প্‌ট হতে পারে: 'অর্থের জোগান যেমনটি আছে, সেই নিরিখে কোন্‌ ধাপের কাজে ব্যয়সীমা কত রাখা দরকার নির্ণয় কর'। শেষ একটি এলএলএমকে দিতে পারি কাজ

বাস্তবায়নকারীর ভূমিকা, যার প্রম্প্ট: 'একের পর এক ধাপে কাজগুলো করে ফেলো।' এই যে বিভিন্ন এলএলএমকে বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন প্রম্প্ট দেয়া হলো, তার সবকিছুর উৎস কিন্তু প্রথমটিকে দেয়া একটি মূল প্রম্প্ট সেখানে দেয়া থাকে এজেন্টকে দায়িত্ব দেয়া মূল উদ্দেশ্যটি।

এজেন্ট চলে ঐকতানে

এলএলএম শেকলের সঙ্গে যে অনেকগুলো ডিজিটাল হাতিয়ার, তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে তার নিজস্ব এপিআইয়ের মাধ্যমে এলএলএম কথা বলতে পারে, তথ্যের ও কাজের লেনদেন করতে পারে। এই হাতিয়ারগুলোই তাকে বাইরের অন্য নানা ওয়েবসাইট অথবা যন্ত্র ইত্যাদিতে বিচরণ করে, সবরকম সহায়তা নিয়ে কাজ করতে সক্ষম করে। প্রত্যেক এলএলএমকে তার কর্তব্যটি করার জন্য এই হাতিয়ারগুলোকে কাজে লাগাতে হয়। এর কোনগুলো তথ্য ইত্যাদি জোগাড় করে, কোনগুলো নিজের হিসাব-নিকাশের কাজ করে, আবার কোনগুলো যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সত্যি সত্যি কাজটি করে– যেমন একটি ইমেইল সঠিক ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। এরকম আরো নানা হাতিয়ারের কথা বলতে পারি ইতস্তত নানা কাজের– ফোন করার হাতিয়ার, ইন্টারনেট সার্চ করার হাতিয়ার, ক্যালেন্ডার থেকে তারিখ বের করার হাতিয়ার, ডাটাবেইস থেকে তথ্য বের করার হাতিয়ার, বিশেষ কাজের কোডকে কম্পিউটারে বাস্তবায়ন করার হাতিয়ার, ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের হাতিয়ার ইত্যাদি। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এগুলো হলো আসল দৈনন্দিন বাইরের জগতের স্বাভাবিক কারবারি। এদের মাধ্যমেই এআই এজেন্ট সত্যিকার সবক্ষেত্রে আমাদের হয়ে কাজ করছে। কিন্তু এদের পেছনে আছে বুদ্ধি বিবেচনা আর সৃষ্টিকর্মের জন্য এলএলএম শেকলের মূল কাঠামো, যা কি না এজেন্টের মস্তিষ্ক।

ওই মূল কাঠামোর কোনো এলএলএম তার ভূমিকা পালন করার জন্য যখন যে হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়, তাকে ডাক দেয়– অর্থাৎ টুল্ কল্ দেয়। কাকে ডাক দেবে, কখন দেবে তার ইঙ্গিতটি আসে মূল উদ্দেশ্য থেকে যা থাকে মূল প্রম্প্টে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক সেই মূল প্রম্প্টে বলা হয়েছে: 'মঙ্গলবার ডেন্টিস্টের সঙ্গে এপয়েন্টমেন্ট কর'। এলএলএম এটি বুঝে নিয়ে যার প্রতিনিধিত্ব করছে তাঁর ক্যালেন্ডারকে এবং তাঁর নির্দিষ্ট ডেন্টিস্টের ক্যালেন্ডারকে টুল্ কল্ দেয়, মঙ্গলবার কোন্ সময়টিতে উভয়ে ফ্রি আছেন দেখার জন্য। সেটি যদি ঠিক হয়, তখন ইন্টারনেটের টুল্ কল্ করে ডেন্টিস্টের এপয়েন্টমেন্ট সফ্টওয়্যারে গিয়ে

এপয়েন্টমেন্ট অনুরোধটি রেজিস্টার করে। ওখান থেকে নিশ্চয়তা পাওয়ার পর এজেন্ট তার ব্যবহারকারীকে মেসেজ দিয়ে তা জানিয়ে দেবে।

কোনো কোনো এজেন্টিক সিস্টেমকে কাজ করার সময় নিজের স্মৃতির ওপরও নির্ভর করতে হয়। যেকোনো কাজ করতে হলে তাৎক্ষণিক সেই কাজের সময় এক ধরনের স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির ব্যবহার করতে হয়, যাকে কর্মকালীন স্মৃতি (ওয়ার্কিং মেমোরি) বলা হয়। এটি অনেকটা যোগ অংক করার সময় কত হাতে রাখলাম সেটি মনে রাখার মতো, বা তিনটা তিনটা সংখ্যা করে দীর্ঘ টেলিফোন নম্বর কিছুক্ষণ মনে রাখার মতো। এজেন্টকেও কাজ করার সময় তাৎক্ষণিক যা জান্‌লো, তা মনে রেখেই এগুতে হয়। তাই সেই জানাগুলো রেকর্ড হয় এবং ব্যবহৃত হয়।

একই সঙ্গে এজেন্টের একটি দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিরও প্রয়োজন। প্রত্যেকটি কাজ করার পর তার অভিজ্ঞতাগুলো মেমোরিতে সংরক্ষিত করা হয়। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে এটি যাঁর এজেন্ট, তাঁর পছন্দ-অপছন্দসমূহ মনে রাখা। তা যদি এজেন্টের মনে না থাকে, তাহলে কাজের সময় সেটিকে গুরুত্ব দেবে কী করে। যেমন ব্যবহারকারী এজেন্টকে কাজ দিয়েছেন একটি সভা আয়োজন করতে। সেটি করতে গিয়ে এজেন্ট নিজের স্মৃতির মধ্যে খুঁজে দেখে যে ব্যবহারকারী সাধারণত সভাগুলো সকালের দিকে করাটাই পছন্দ করেন। এখন এজেন্ট অন্য শর্ত না দেয়া থাকলে সভাটাকে সকালে ফেলারই চেষ্টা করবে। তেমনি স্মৃতিতে থাকতে পারে আগের অন্য একটি কোম্পানির সঙ্গে করা কোন চুক্তি, যেটি এখন যে চুক্তিটি এজেন্ট করতে যাচ্ছে তার জন্য কাজে লাগবে।

এই যে হাতিয়ার, স্মৃতি সবকিছুকে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে এজেন্টকে, তার মধ্যে যেন তালগোল পাকিয়ে না যায়, সেটি নিশ্চিত করাটাই অর্কেস্ট্রেটরের কাজ। কোন্‌টি কখন কাজ করবে, কোন্‌টিকে দেখার পর অন্য কোন্‌টিতে যেতে হবে, এমনিতরোভাবে সবকিছুকে ছন্দবদ্ধ করবে এটি। একে তুলনা করা যায় সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রায় কন্‌ডাক্টরের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে। ওতে নানা বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশে প্রত্যেক যন্ত্রীর সামনে কম্পোজারের তৈরি নোটগুলো দেয়া আছে– তাঁরা সেটি দেখে যার যার যন্ত্র বাজাতে পারেন। তারপরেও সব বাদকের মধ্যে একটি লয়যুক্ত ঐকতান সৃষ্টির জন্য সবাই কনডাক্টরের হাত সঞ্চালনটিকে লক্ষ করেন। এজেন্টিক এআইয়ের ক্ষেত্রে এর তুলনীয় হলো অর্কেস্ট্রেটর, যা সাধারণত একটি সফ্‌টওয়্যার অর্থাৎ কম্পিউটার প্রোগ্রামই হয়ে থাকে, ঠিক এই কাজটি করার জন্য।

এই প্রোগ্রামটি একটি লুপের মতো চক্রাকারে কাজ করে। একটি হাতিয়ারকে বা এলএলএমকে কাজ করিয়ে এটি তার আউটপুটটি আরেকটিকে চালু করার কাজে ব্যবহার করে। এভাবে একের পর এক সবগুলোকে কাজ করিয়ে এটি আবার প্রথম

জায়গাটিতে ফেরত আসে। যেমন ধরা যাক আমাদের আগের ব্যবহৃত উদাহরণে প্রম্পটে যা লেখা হয়েছে তার আউটপুটটি এটি পরিকল্পনাকারী এলএলএমকে চালু করতে ব্যবহার করলো। এর আউটপুট এটি সত্যায়নকারী এলএলএমকে চালু করতে ব্যবহার করলো। সত্যায়নকারী এলএলএম থেকে আউটপুট বাস্তবায়নকারী এলএলএমকে চালু করার জন্য দিলো। বাস্তবায়ন করার সময় যখন যে হাতিয়ার দরকার হলো তাকে চালু করলো এবং সেটির আউটপুট দিয়ে এর পরের হাতিয়ারটি চালু করলো। এক্ষেত্রে চালু করাটি সংঘটিত হচ্ছে প্রত্যেক হাতিয়ারের মধ্যবর্তী এপিআইয়ের মাধ্যমে, কারণ চালু করার প্রোটকল বা নিয়মকানুন সেই এপিআই অনুযায়ী হতে হয়। সব কিছু শেষ হলে এটি আবার শুরুতে পরিকল্পনাকারী এলএলএমের কাছে ফেরত এসে পরের কাজটি নিয়ে আবার পুরো চক্রটির পুনরাবৃত্তি করে। পুরো এজেন্টের কার্যকর অংশ থেকে এই অর্কেস্ট্রেটর একটি আলাদা জিনিস– এটি এলএলএমও নয়, কোন হাতিয়ারও নয়; আলাদা থেকেই এটি এজেন্টকে ছন্দবদ্ধ কাজ করায়। এখানেও সেই সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রার কনডাক্টরের মতো। কনডাক্টর কোন যন্ত্রের বাদক নন, অথচ সব যন্ত্রের বাদককে তিনি ছন্দবদ্ধ রাখছেন– অর্কেস্ট্রার বাদক দলের বাইরের হয়েও।

ব্যবহাকারীর নিয়ন্ত্রণ

এআই এজেন্ট স্বয়ংক্রিয় ও স্বাধীনভাবে ব্যবহারকারীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে কতটা স্বাধীনভাবে। একবার তাকে কাজের দায়িত্ব দেয়ার পর সেই কাজের ওপর ব্যবহারকারী কতখানি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারছেন? আসলে স্বাধীনতার সীমাটিকে ব্যবহারকারী নিজেকেই টেনে দিতে হয় মূল প্রম্প্টের মধ্যেই– যেখানে তিনি এজেন্টকে কাজের উদ্দেশ্যটি জানিয়ে দেন। যদি তিনি কাজের মধ্যে নিজের তত্ত্বাবধানটি বজায় রাখতে চান, তাহলে প্রম্প্টে বলে দিতে হয় এজেন্টের ভূমিকা কোথায় কী হবে। উদাহরণ স্বরূপ তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের অথবা চুক্তি সম্পাদনের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হবে, নাকি সিদ্ধান্তে আসার পর ব্যবহারকারীর অনুমোদন চেয়ে নিতে হবে? বিশেষ করে যেখানে অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে ব্যবহারকারীর ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহারে ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়, সেখানে একটি ঊর্ধ্বসীমা থাকার প্রশ্ন উঠতেই পারে।

এগুলো বিভিন্ন কাজের জন্য আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এসব এজেন্টের দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে জমা থাকে– যেকোনো কাজের সময় শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন একটি সভা আয়োজনের জন্য এজেন্টকে দায়িত্ব দেয়ার কথাই

যদি বলি, তাহলে হয়তো প্রতিষ্ঠানের এ সম্পর্কিত কিছু নীতিমালা এজেন্টের স্মৃতিতে আগে থেকেই থাকতে পারে। যেকোনো সভা ডাকতে গেলেই এজেন্ট সেই নীতিমালা অনুসরণ করবে। এগুলো হলো প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলে কাজের মাঝখানেই তিনি যেন অবস্থা বুঝে কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারেন, তার ব্যবস্থাও করতে পারেন। যেমন এজেন্টের গঠনের মধ্যেই কিছু 'সম্মতি দরজা' থাকতে পারে, সম্মতি পেলেই শুধু এটি সেই দরজা পার হতে পারবে। হয়তো ৫০ হাজার টাকার বেশি ব্যয় করতে হলে এজেন্টকে ওখান থেকে শর্ত মিলিয়ে সবুজ সংকেত নিতে হবে। আরেকটি শর্ত হতে পারে অন্য কোনো কারো সঙ্গে চুক্তি করতে হলে তাতে যদি লেনদেন দশ লক্ষ টাকার ওপরের হয়, তাহলে স্বয়ং ব্যবহারকারীর অনুমতি নিতে হবে।

সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আর একটি পথ হলো কাজ চলার পুরোটা সময় সকল কাজের অগ্রগতির খুঁটিনাটি বর্ণনা ও হিসাব সংরক্ষণ করা- যেভাবে অনেক সময় কোম্পানিতে অডিটের জন্য সবসময় তৈরি করা হয়। ব্যবহারকারী যখনই ইচ্ছে করবেন, তখনই এজেন্টিক সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেগুলো দেখতে পারবেন, এবং প্রয়োজনে কাজ স্থগিত করতে পারবেন। আর ব্যবহারকারী যদি সবসময় এজেন্টের কাজের একটি অংশ হয়েও থাকতে চান, তাও সম্ভব। সেক্ষেত্রে তিনি বা তাঁর মনোনীত কোনো মানুষ পুরো সিস্টেমের কাজের যে চক্রাকার লুপ তার মধ্যে নিজের ডিজিটাল উপস্থিতিটিকেও ঢুকিয়ে দিতে পারেন ওই লুপের অংশ হবার জন্য। এর অর্থ হলো তিনি তখন নিজেও সিস্টেমের অংশ। কাজ করতে করতে চক্রটি তাঁর কাছে আসলে, সেখানে যদি কোনো নির্দেশ দেখতে পায়, তাহলে পরের কাজটি সেভাবে বদলে নেবে। লুপের কোথায় কোথায় তিনি থাকবেন তা তিনি আগেই বেছে নিতে পারবেন মূল প্রম্পট দেবার সময়। যেমন এমন হতে পারে যে, প্রতিটি কাজ তিনি নিজেই অনুমোদন দিয়ে শুরু করে দেবেন। অথবা হতে পারে এক একটি পর্যায়ে এসে এজেন্ট তাঁকে একটি রিপোর্ট দেবে এবং পরবর্তী কাজের সম্ভাব্য বিভিন্ন বিকল্পগুলো দেবে। তিনি তার মধ্যে একটি বেছে নিয়ে পরবর্তী নির্দেশ দেবেন।

এভাবে সবসময় ব্যবহারকারীর হস্তক্ষেপের সুযোগ রাখাটিকে বলা যায় এজেন্টের শুধু প্রথম পর্যায়ের স্বাধীনতা, এখনো তাকে প্রচুর তদারকির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এজেন্ট নিজেই সবকিছু করে যেতে পারে, শুধু যেখানে যেখানে বলা আছে সেখানে অনুমতি চেয়ে নিয়ে নেয়। আর তৃতীয় বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাধীনতা হলো এজেন্ট পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে লক্ষ্যটি পূরণ করবে। এজন্য এটি শুধু শুরুতে দিয়ে দেয়া গাইডলাইনটি অনুসরণ করে যাবে।

এজেন্টের কাজের কিছু নমুনা

খুব মামুলি এজেন্টের কথা বলেই শুরুটি করবো, যেখানে অনেকটা ব্যক্তিগত কিছু কাজের দায়িত্ব এজেন্টকে দেয়া যায় সময় বাঁচাবার জন্য। এরকম এজেন্টিক এআইয়ে এলএলএমের বা হাতিয়ার ও তাদের এপিআইয়ের সংখ্যা সীমিত হলেই চলে। এর পরে জটিলতর কাজের এজেন্টকে অনেকখানি কর্মপরিধি নিয়ে কাজ করতে হতে পারে।

শপিং এজন্টে: এজেন্টকে লক্ষ্য দিলাম আধুনিক ফ্যাশনসম্মত একটি পোশাক কিনে দিতে হবে। এই মুহূর্তে কিনতে হবে এমন কথা নেই। তাই দামের একটি উচ্চসীমা দিয়ে উদ্দেশ্যটি বলে দেয়া যায় যে, যেখানে ও যখন এই দামের মধ্যে ভালো পোশাক পাওয়া যাবে কিনতে হবে। এজেন্ট বিভিন্ন দোকানের ডাটাবেস থেকে উপযুক্ত পোশাকগুলোর দামের ওঠানামা লক্ষ করবে। পোশাকের যেসব বৈশিষ্ট্য প্রম্প্‌টে দেয়া আছে, সেখান থেকে বুঝবে উপযুক্ত বল্‌তে কী বুঝায়। সেভাবে সম্ভাব্য দোকানের তালিকা ও তাদের ডাটাবেসের সঙ্গে যুক্ত হবার এপিআই এজেন্টের রয়েছে। দামটি ওঠানামা করলে অপেক্ষা করবে, যদি নির্দিষ্ট সীমার নিচে আসে, এবং যথাসম্ভব নিচে আসে, তখন কেনার সিদ্ধান্ত নেবে। দাম পরিশোধের এপিআই ব্যবহার করে এমনভাবে কিনে ফেল্‌বে, যেন বাড়িতে ডেলিভারি দিয়ে যায়।

ব্যক্তিগত সহকারী: লক্ষ্য হতে পারে ইমেইলগুলোর ওপর চোখ রেখে যেগুলোর উত্তর দেয়া প্রয়োজন উত্তর দিয়ে দেয়া, এবং দিনের কর্মসূচিটি ঠিক করে দেয়া। ইমেইলের মর্ম বোঝা এলএলএমের জন্য কঠিন নয়। প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণগুলোর সারসংক্ষেপ করে এবং উত্তরের খসড়া লিখে তা ব্যবহারকারীকে দেখিয়ে নেয়া যায়। তবে ইমেইল পাঠাবার জন্য এপিআই দরকার– হাতিয়ারবিহীন এলএলএম শুধু কিছু লিখতে পারে, সেটি পাঠাবার মতো কাজ করতে পারে না।

এজেন্ট তার ব্যবহারকারীর ইমেইল, মেসেজ, এপয়েন্টমেন্ট নোট করার ক্যালেন্ডার ইত্যাদি দেখে বুঝতে পারে আজ বা আগামীকাল তাঁর পূর্বনির্ধারিত কাজ কী কী হতে পারে। এসব জানার জন্য ওই তথ্য উৎসগুলোতে ঢোকার ও দেখার জন্য এপিআই প্রয়োজন। এসব দেখে এজেন্ট দিনের কর্মসূচিটি লিখে ফেলে। এ সম্পর্কে ব্যবহারকারীর কোনো প্রম্প্‌ট থাকলে, তাও বিবেচনায় নেয়। আগে থেকেই হয়তো কিছু অগ্রাধিকারের কথা ব্যবহারকারী বলে রেখেছেন, যা এজেন্টের স্মৃতিতে আছে। যেমন কে কে চাইলে তাদেরকে তাড়াতাড়ি সময় দিতে হবে, সপ্তাহের প্রথম দিন পারতপক্ষে বাইরে কোথাও

এপয়েন্টমেন্ট করা যাবে না, ইত্যাদি। এজেন্ট কর্মসূচি ঠিক করার সময় স্মৃতিতে ওগুলো নিয়মিত দেখে নেয়।

হিসাব সংরক্ষণ এজেন্ট: ব্যবসায়িক অফিসে নানা দিক থেকে পাওনা দাবি করে যেসব ইনভয়েস আসছে, সেগুলো এজেন্ট পড়ে নিচ্ছে। এজন্য লেখাগুলো পড়ার জন্য যে 'ওসিআর' সফ্টওয়্যার রয়েছে, সেটির এপিআই ব্যবহার করে এজেন্ট। প্রত্যেকটি ইনভয়েস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো ব্যবহারের জন্য উপড়ে নেবার ব্যবস্থাও ওতে থাকে। এজেন্টের স্মৃতিতে যে পারচেজ অর্ডারের (ক্রয়াদেশ) তথ্যগুলো আছে, সেখানে অনুসন্ধান করে মিলিয়ে নিয়ে এজেন্ট বুঝতে পারে এক একটি ইনভয়েসের ন্যায্যতা। সবকিছু ঠিকঠাক মিল্‌লে টুল্‌ কল্‌ দিয়ে দাম পরিশোধের এপিআইটি সচল করা হয় এবং ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে পাওনাদার কোম্পানিকে দাম শোধ করা হয়। তবে যেকোনো অঙ্কের টাকা পরিশোধের ক্ষমতা এজেন্টের নেই, একটি সর্বোচ্চ সীমা দেয়া আছে। এর থেকে পাওনা বেশি হলে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তার অনুমতি নিতে হয়।

কর্মী নিয়োগ এজেন্ট: কোম্পানির মানব সম্পদ বিভাগের এই এজেন্ট বিভিন্ন ধরনের কর্মী নিয়োগের কাজটি করে। যখন কর্মীর পদ বেশি হয় এবং তাতে প্রার্থীর সংখ্যা অনেক হয়, এখন এজেন্টের প্রয়োজনটি সত্যিই অনুভূত হয়। এজেন্টকে প্রথমে দরখাস্ত আহ্বানের জন্য উপযুক্ত গণমাধ্যমে বা পোর্টালে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। বিজ্ঞাপনটি রচনা ও সম্পাদনা করাটি তার প্রথম পদক্ষেপ। এটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় পাঠাবার আগে হয়তো আগের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া গণমাধ্যম তালিকা, বিজ্ঞাপন হার এবং তার ছাড় ইত্যাদি দেখে নেবে। উপযুক্ত এপিআইয়ের ভেতর দিয়ে বিজ্ঞাপনী সংস্থার কাছে প্রচারের একটি কার্যাদেশ দেবে। নিজের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ছকে করা যে দরখাস্তগুলো এসে জমা হবে, সেগুলোকে নির্দিষ্ট মূল্যায়ন সারণিতে সাজিয়ে এক একটি দিকে তুলনামূলক নম্বর দেবে ও তার ভিত্তিতে নির্বাচিতদের একটি অপেক্ষাকৃত ছোট তালিকা (শর্ট লিস্ট) করে ফেলবে। এই মূল্যায়নের জন্য বিশেষ সফ্টওয়্যার তার এপিআইয়ের মাধ্যমে ব্যবহার করা হবে। মূল্যায়নের জন্য কোন্‌ বিষয়ে কত গুরুত্ব দেয়া হবে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কী বিষয়ে কোথায় হয়েছে, তা নির্ণয়ের জন্য বিশেষ এলএলএম মডেলও এজেন্টে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এজেন্ট নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে নিজ নিজ ঠিকানায় ইমেইল করে সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ জানাবে। ইমেইলগুলো পাঠাবার জন্য একটি এপিআই ও হাতিয়ার ব্যবহার করবে।

অনেক সময় সাক্ষাৎকারের কাজটিও এজেন্টের ভেতরের এলএলএম চ্যাটবটের ওপর ছেড়ে দেয়া হতে পারে। চ্যাটবট প্রার্থীর দরখাস্তের তথ্য, তাঁর সবলতা-দুর্বলতাগুলো বিবেচনায় রেখে সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্ন করতে পারে। তাছাড়া প্রার্থীর উত্তরের প্রতিক্রিয়ায় আরো প্রশ্ন করতে পারে, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে নম্বর দিতে পারে। চ্যাটবট এজন্য মূল্যায়ন এপিআই এবং সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি হাতিয়ার ব্যবহার করতে পাররে। চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবার জন্য এজেন্ট নিজের সুপারিশ সহ মূল্যায়নগুলো কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে। শেষ বিবেচনাটি হয়তো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষই করবে।

ঠিকাদার নিয়োগ এজেন্ট: ধরা যাক কোম্পানি ওয়েবসাইটটি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তৈরির জন্য এ ধরনের কাজের বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে ঠিকাদার নিয়োগ দিতে হবে। এ কাজটি এজেন্টের হাতে দেয়া যেতে পারে। হয়তো অন্য অনেক এআই এজেন্টের মতোই এরও এজেন্টিক সিস্টেমে কর্মপরিকল্পনা এলএলএম, সত্যায়ন এলএলএম এবং বাস্তবায়ন এলএলএম রয়েছে। প্রথমটি ঠিকাদার নির্ণয়ের লক্ষ্যে কাজগুলো ধাপে ধাপে বিভক্ত করে ফেলবে– যেমন প্রস্তাব আহ্বান করে বিজ্ঞাপন দিতে তার খসড়া তৈরি, বিজ্ঞানী সংস্থাকে বিজ্ঞাপন দেবার জন্য কার্যাদেশ দেয়া, সংগৃহীত প্রস্তাবগুলোর মুল্যায়ন, প্রাথমিক বাছাইয়ে সর্বোচ্চে থাকা কয়েকজন ঠিকাদারের সঙ্গে ওয়েবসাইটের মান ও তার পারিশ্রমিক নিয়ে দরকষাকষি, চূড়ান্ত নির্বাচনের পর ঠিকাদারকে নিয়োগ দান। সত্যায়ন এলএলএমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাস্তবায়ন প্রকল্প। প্রত্যেকটি কাজকে এলএলএমের সৃষ্টির ও বিবেচনার মাধ্যমে এবং প্রয়োজনীয় টুল কল্ দিয়ে বাস্তবায়িত করবে। বেশ কয়েক রকমের এপিআই ও সফ্টওয়্যার ব্যবহার এজন্য প্রয়োজন হতে পারে– যেমন ইমেইল পাঠাবার, ডাটাবেসের সঙ্গে যোগাযোগের, মুল্যায়নের, চুক্তি স্বাক্ষরের, মূল্য পরিশোধের এপিআই ও সফ্টওয়্যার ইত্যাদি।

সত্যায়নের এলএলএমের কাছেও নানা কাজ ন্যস্ত করতে হয়। তার জন্য আলাদা বিশেষ সফ্টওয়্যার হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োজন হতে পারে। যেমন ঠিকাদার নিয়োগের সবকিছু কোম্পানি নীতি এবং আইনি সুরক্ষার মধ্যে ঘটছে কি না তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যেহেতু এলএলএম নিজে মাঝে মাঝে হ্যালুসিনেশন করে ভুল কিছু করে ফেলতে পারে, তাই নানা কিছুর মধ্যে সঙ্গতি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হয় যেকোনো পর্যায়ে সেরকম কিছু হয়নি। এজন্য তৃতীয় পক্ষ হিসেবে আলাদা সফ্টওয়্যার হাতিয়ার থাকতে পারে। চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরের জন্য তৈরির আগে দেখে ফেলতে হবে কাজে গাফিলতির জন্য ঠিকাদারের যেসব ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করাটি

নিয়ম, তা ঠিকঠাক করা হয়েছে কি না। সবকিছু নিশ্চিত করেই যেন এজেন্ট ঠিকাদার নিয়োগটি দিতে পারে।

এজেন্টদের মধ্যে ব্যবসা চুক্তি: ক্রেতার এজেন্ট ও বিক্রেতার এজেন্ট এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও দরকষাকষির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে একটি ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদন করা হচ্ছে। যে মানুষদেরকে বা কোম্পানিকে এরা প্রতিনিধিত্ব করছে, সে মানুষদেরকে মোটেও এই চুক্তিতে পৌঁছার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হতে হচ্ছে না– এটি এজেন্টিক এআইয়ের একটি চমকপ্রদ সাফল্য। ক্রেতার এজেন্টকে তার ব্যবহারকারীর সামর্থ্য অনুযায়ী একটি সর্বোচ্চ দামের ভেতরে থেকে কিনতে হয়, আবার পছন্দসই জিনিসটিও তাকে পেতে হয়। অন্যদিকে বিক্রেতার এজেন্টের লক্ষ্য হলো দামকে সর্বোত্তম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। কোন্ দামটি সর্বোত্তম, তা নির্ভর করে মানসম্মত পণ্য তৈরিতে কত ব্যয় হয়, কত লাভ কোম্পানিকে করতেই হবে, কত ছাড় দিতে পারবে পণ্যটি বিপণনের স্বার্থে, ইত্যাদির বিবেচনায় বিক্রেতা এজেন্টের শেষ দামটি কী হবে তা নির্ণয় করে। পণ্য বিক্রয় না হওয়া যেমন তার জন্য ক্ষতিকর, তেমনি দাম অতিরিক্ত কমে যাওয়াও ক্ষতিকর। মূল কাজটি দুই এজেন্টের মধ্যে হলেও এর মধ্যে আরো কিছু এজেন্ট কাজ করে কিছুটা পার্শ্বচরিত্রের মতো।

এই পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে প্রধান একটি হলো আইনি এজেন্ট। ক্রেতা ও বিক্রেতা যার যার আইনি এজেন্ট চুক্তিপত্রের খসড়াটি পড়ে ও পরীক্ষা করে দেখে, সেখানে নিজের ব্যবহারকারীর জন্য ক্ষতিকর কি না বা ঠকার কারণ হতে পারে কি না তা নির্ণয় করে। প্রয়োজনে তাতে সংশোধনীর পরামর্শ দেয়। এমনি আর একটি পার্শ্বচরিত্র এজেন্ট হতে পারে পর্যায়ক্রমে দাম পরিশোধ এজেন্ট। বিক্রয়ের কোন্ পর্যায়ে দামের কত অংশ শোধ করতে হবে তা নির্ণয় করে চুক্তিতে সংযোজন করা এর কাজ– যেমন চুক্তিতে স্বাক্ষরের পর কত অংশ, মাল জাহাজীকরণের পর কত অংশ, মাল বুঝে নেবার তার কত অংশ। এই প্রত্যেকটি মাইলফলক ও তার পরিশোধ স্থির করা দরকষাকষিরই একটি অংশ।

এই জটিল নানা ধাপেও এআই এজেন্ট দিব্যি কাজ করতে পারছে। শুরুতে ক্রেতার এজেন্ট বিক্রেতাদের বাজারে ঢুকে ঘোষণা দেয় এই পণ্যটি তার এই মানে, এই পরিমাণে, অমুক সময়ের মধ্যে চাই। এজন্য এরকম পণ্যের বিক্রেতাদেরকে প্রস্তাব দেবার আহ্বান জানাবে। সেই প্রস্তাবগুলো নিয়েই শুরু হতে পারে এই ক্রেতার এজেন্টের সঙ্গে বিভিন্ন বিক্রেতার এজেন্টের দরকষাকষি। সফল বিক্রেতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

২০২৫ সালটিতে এসে এআইয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি মনোযোগ পাচ্ছে এই এজেন্টিক দিক থেকে এর উন্নয়ন। মনোযোগটি বেশি সৃষ্টি হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে; তবে অন্য ক্ষেত্রগুলোও এতে পিছিয়ে নেই। নানা প্রয়োজনে এরকম এজেন্টিক মডেল সৃষ্টি করা হচ্ছে– যাদেরকে অনেক নিয়মিত কাজের পুরো দায়িত্ব দিয়ে দেয়া যাচ্ছে। এই মডেল তৈরিতে সুবিধার জন্য কিছু আংশিক এজেন্ট-উপাদান এখন সহজলভ্য। ল্যাংগ্রাফ ও ল্যাংচেইন এরকম সুপরিচিত উপাদান। এগুলো এজেন্ট গড়ে তুলতে কাজে লাগে। বিভিন্ন এজেন্টিক সিস্টেমকে অর্কেস্ট্রেইট করতে সুবিধার জন্য এসেছে সেমানটিক কার্নেল। একাধিক এজেন্টকে একসঙ্গে কাজ করাবার জন্য এসেছে অটোজেন এবং ক্র্যু এআই। এসবকে ব্যবহার করে এআই এজেন্ট তৈরি এখন অনেক কোম্পানি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে করতে পারছে।

এআই চল্‌ছে

জীবনযাত্রায় ক্রমেই জড়িয়ে যাচ্ছে

গত কয়েক বছর ধরে এআই আমাদের অনেক কাছে চলে এসেছে- নানাভাবে একে আমরা ব্যবহার করছি। সাধারণভাবে এটি ঘটেছে চ্যাটজিপিটির মতো শক্তিশালী অথচ সর্বজনলভ্য এলএলএম মডেলগুলোর কল্যাণে। তাছাড়া আমাদের জানার মধ্যে ও জানার বাইরে অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় ডিজিটাল সামগ্রীতে এআই আমাদেরকে সাহায্য করছে। চ্যাটজিপিটির মতো চ্যাটবটের ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই নানা প্রয়োজনে তার শরণাপণ্ন হচ্ছি। ছাত্র হই কি শিক্ষক হই, রুগী হই কি ডাক্তার হই, পাঠক হই কি লেখক হই, দৈনন্দিন কাজে যারই সহায়তা প্রয়োজন– এমন কিছু নেই যে এই চ্যাটবটগুলো তাদেরকে দিতে পারে না। আর এরাই শেষ কথা নয়। পেশাগত কাজে হোক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হোক, প্রত্যেক কাজের জন্যই আবার রয়েছে বিশেষায়িত মডেল– শুধু ওই কাজটি করে দেবার জন্য। শিশুদের ব্যবহারের জন্যও আলাদা মডেল রয়েছে।

উন্নত দেশগুলোর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সেখানে সাত থেকে বার বছরের ৪০% শিশু তাদের জন্য তৈরি এআই অহরহ ব্যবহার করছে। অনেক বাবা মা এখন বাচ্চাকে ঘুম পাড়াবার আগে বলার জন্য নতুন গল্পটি চ্যাটজিপিটির কাছ থেকে জেনে নেন। বাচ্চারাও এমন আবহেই বড় হচ্ছে। বাচ্চার চাহিদার মতো যে জিনিস চ্যাটজিপিটি দিতে পারছে, বাবা মা তা পারছেন না। অন্যদিকে শিশু-মনস্তত্ত্ববিদদের কেউ কেউ ছোট শিশুদের বাবা মাকে সাবধান করছেন এভাবে সন্তান প্রতিপালনের কাজটি এআইয়ের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেরাই যেন ওদিকে আরো মনোযোগী হোন।

মনের ওপর প্রভাব: মানুষের সঙ্গে কথা বলা আর চ্যাটবটের সঙ্গে কথা বলার পার্থক্য নিয়ে শিশুকে চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু বয়স্কদের তা করতে হচ্ছে। যেমন এমন ঘটনাও এখন অভাবনীয় নয় যে, চাকরিপ্রার্থীকে ইন্টারভিউ দিতে যেতে হচ্ছে ক্যামেরাযুক্ত চ্যাটবটের সামনে, তাকে চিন্তা করতে হচ্ছে কী পোশাক পরে গেলে ওই

চ্যাটবট তার সম্পর্কে ভালো ধারণা করবে, কীরকম প্রশ্ন এটি করবে। মানুষ ইন্টারভিউ-গ্রহীতার সঙ্গে সবাই পরিচিত, কিন্তু চ্যাটবট ইন্টারভিউ-গ্রহীতা তো আলাদা ব্যাপার। আরেকজন হয়তো চ্যাটবটের কাছে যাচ্ছে ব্যক্তিগত একটি সমস্যা নিয়ে। সামান্য মনোমালিন্য হওয়াতে বান্ধবী কথা বলছে না মাসের ওপর হতে চল্‌লো। সত্যি সে কি তার ওপর আস্থা হারিয়েছে, না অভিমান করছে? এর উত্তর তাকে বের করতেই হবে। চ্যাটজিপিটি ছাড়া কে পরামর্শ দিতে পারবে এরকম সময়ে? ওকেই বিনা সংকোচে সব কথা খুলে বলা যায়, অতীতে সে এসব বিষয়েও ভালো পরামর্শ দিয়েছে। সে আন্দাজ করতে পারে মানুষের মনের কথা। এই চ্যাটবটের ওপর নির্ভর করা চলে– সেটি মান-অভিমানের ব্যাপারে পরামর্শের জন্যই হোক, কিংবা সাংসারিক কোনো সংকটের ব্যাপারেই হোক। এআইয়ের কাছ থেকে কখনো নিরাশ হতে হয়নি।

এখানেও কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদের ভিন্ন মত আছে। তাঁরা বলছেন ওভাবে চ্যাটজিপিটির মতো মডেলের শরণাপন্ন হওয়াতে আসলে কারো উদ্বেগ কমে না, বরং বাড়ে। যতই মানুষের মতো তাকে মনে করা হোক, একটি যন্ত্রের সঙ্গে ওভাবে মানসিক সংযোগ হওয়া শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয় বলেই এমনটি ঘটে। ভুক্তভোগীরা কিন্তু সে কথা মানে না, তারা বারবার এই পরামর্শদাতার কাছে ফিরে যায়, সে যে যন্ত্র একথা মনে না রেখেই। তাদের ওপর চ্যাটবটের প্রভাব অনেকটা সম্মোহনি শক্তির মতো, তারা মনে করে তারা উপকারই পাচ্ছে। গবেষণার একটি ফল থেকে এটি বেশ বোঝা যায়। ২০২৫ সালের মে মাস নেচার হিউম্যান বিহেভিয়র জার্নালে প্রকাশিত এ গবেষণায় ৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবী মানুষের প্রত্যেকে কোনো একজন মানুষ তার্কিকের সঙ্গে নানা নির্বাচিত বিষয় নিয়ে বিতর্ক করেছেন। আবার তাঁদের প্রত্যেক এআইয়ের সঙ্গেও নানা বিষয়ে বিতর্ক করেছেন, বিতর্কের বিষয়গুলো 'সব স্কুলে ছাত্রদের ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাওয়া উচিত' এমনি নরম বিষয় থেকে শুরু করে 'জাতিসংঘ থেকেই সব দেশে প্রাণদণ্ড রহিত করা উচিত' এমন শক্ত বিষয় পর্যন্ত নানা রকম বিষয় এতে ছিল। পরে প্রত্যেকের কাছ থেকে জেনে নেয়া হয়েছে বিতর্কের ফলে তার নিজের মতটি প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কের প্রভাবে বদলে গেছে কি না। দেখা গেছে মানুষের যুক্তিতে যতজন নিজের মত বদলিয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি বদলিয়েছে এআইয়ের সঙ্গে বিতর্কের ফলে। এটি প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন বিষয়ে চ্যাটবটের দ্বারা প্রভাবিত হবার মাত্রা, অন্য মানুষ দ্বারা প্রভাবিত হবার থেকে বেশি। প্রতিপক্ষ একজন মানুষ না একটি চ্যাটবট একথা না জেনে তার দ্বারা যতটা প্রভাবিত

হয়েছে, যেখানে আগেভাগে জানিয়ে দেয়া হয়েছে কোন্ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ চ্যাটবট সেক্ষেত্রে বরং প্রভাব তুলনামূলকভাবে আরো বেড়েছে। চ্যাটবট বলে তাকে যন্ত্র ভেবে অবজ্ঞা করার উদাহরণ বেশি নেই। এর অর্থ চ্যাটবটের যুক্তিতে বেশি ধার আছে।

চাহিদা বাড়ছেঃ স্পষ্টত সবার কাছে এআইয়ের চাহিদা বাড়ছে। এটি যে কী বিপুল হারে বাড়ছে তা বোঝা যাচ্ছে অন্য একটি দিক থেকেও। একটি নতুন এআই মডেল খাড়া করতে গিয়ে তার ট্রেনিঙের জন্য যে বিরাট তথ্যভান্ডার তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্রে রাখা হয়, সেটি এত বড় ও তথ্যে এত ঠাসা যে, এই সংরক্ষণে বিপুল বিদ্যুৎ ব্যয় হয়। শুরুতেই চ্যাটজিপিটির ট্রেনিঙে এভাবে ১৩০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎশক্তি ব্যয় হয়েছে। ফসিল জ্বালানি থেকে ওখানকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ঘটার কারণে ওতে কার্বন নিঃসরণে জলবায়ু পরিবর্তনেও এটি প্রচুর বাড়তি অবদান রেখেছে। পরিবেশের ওপর তার অত্যাচার এখানেই শেষ নয়। তথ্য সংরক্ষণ করতে গিয়ে সেখানকার সরঞ্জাম এত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে যে ঠান্ডা করার জন্য ৪০ মিলিয়ন গ্যালন পানির প্রয়োজন হয়েছে।

বিষয়টি কী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তা বোঝা যায় চ্যাটজিপিটির সৃষ্টিকারী কোম্পানি ওপেন এআইয়ের থেকে আসা সাম্প্রতিক এক চমকপ্রদ অনুরোধ থেকে। তাতে বলা হয়েছে এ মডেলকে প্রম্প্ট করার সময় কেউ যেন তাকে ধন্যবাদ না দেয়, এমনকি 'প্লিজ' কথাটিও যেন ব্যবহার না করে। এতে মডেলের খুশি-অখুশি কিছু হবার কথা নয়– অন্য দিকে এই 'ধন্যবাদ' আর 'দয়া করে' শব্দগুলো এত মানুষের থেকে কোটি কোটি বার আসতো যে তা না আসার ফলে মডেলে তার প্রক্রিয়াকরণের মোট বাড়তি বিদ্যুৎ ব্যয়টিরও বড়সড়ো সাশ্রয় ঘটে! ব্যবহারকারীর কাছে অবশ্য আলাপে চ্যাটবটকে ধন্যবাদ না দেয়াটি রীতিমত বাধে, কারণ তারা তাকে মানুষের মতোই ভাবে।

এত গেলো আলাপি জগতের কথা। রাস্তায় বের হয়ে বাইরের জগতটাকে যদি দেখি, এবং তা দুনিয়ার কিছু বড় বড় নগরে, সেখানেও অবাক করা একটি এআই প্রয়োগ ইতোমধ্যেই অল্প কিছু দিনেই চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। এটি চালকবিহীন ট্যাক্সি– যা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় বেশ কিছু নগর সানফ্রান্সিসকো, লস্ এঞ্জেলস, আটলান্টা, অস্টিন ইত্যাদি এবং চীনের বড় নগর বেইজিং, সাংহাই, শেনজেন ইত্যাদির যেকোনো সড়কে অন্য সব গাড়ির ভেতরে চল্‌ছে। ফোনের অ্যাপ্‌সের মাধ্যমে উবার বা ট্যাক্সি ডাকার মতো করেই একে ডাকা যায়, এবং এসে হাজির হলে

দরজা খুলে উঠে বসলেই এটি ব্যস্ত নগরীর মধ্যে দিয়ে সমস্ত নিয়ম মেনে যৌক্তিক পথ ধরেই যাত্রীকে গন্তব্যে পৌছে দিচ্ছে। এরকম একটি চালকবিহীন গাড়ি সামনে চল্‌লে অন্য গাড়ির মানুষ এখন অবাক হন না, রাস্তা পার হবার সময় এই গাড়ি এসে সামনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেলে পথচারী এখন নেহাত ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলো বলে ভয় পান্ না। এভাবেই শিগ্‌গির একদিন এটি সব শহরেই নিত্যকার বিষয় হবে, এআইয়ে অন্য সব কিছু যেভাবে হচ্ছে। এভাবেই এআই আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে।

ঘরোয়া জীবনের ঐকতানেঃ ২০২৫ সালের প্রথম দিকে আমাজনের বহুল পরিচিত চ্যাটবট অ্যালেক্সা নতুন রূপ ধরে এসেছে দুনিয়ার কাছে। অ্যালেক্সা নামের পর পর যে এআই চ্যাটবটগুলো দিনদিন সবার ঘরোয়া জীবনে অন্তরঙ্গ ভূমিকা রাখছে এটি তারই সর্বশেষ উদাহরণ। এরকম অন্য সব চ্যাটবটের মতো এই নতুন অ্যালেক্সাও বাড়িতে সবার সঙ্গে কথা বল্‌ছে, জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছে। অনেকে বলছেন পুরো বাড়ির সব কাজকর্ম হইহুল্লোড়কে যদি আমরা সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রা হিসেবে দেখি, তাহলে ওখানে অ্যালেক্সাকে বলতে পারি অর্কেস্ট্রার কন্ডাক্টর। সবকিছু যেন তার ইশারায় চল্‌ছে একভাবে– কারণ সবার উৎসাহ তার দিকে। যেমন ধরা যাক ঘরের মধ্যে যত ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম আছে– দরজা, অ্যালার্ম, বাতি বা জানালার আলো, রেফ্রিজারেটর, টিভি, মিউজিক, কম্পিউটার ইত্যাদি সবকিছুর দায়িত্ব এখন অ্যালেক্সার। তাকে বলে দিলেই হলো কোনটি কেমনভাবে চাই, এখন বা সামনে কোন সময়। যেমন মিউজিকের জন্য বিশেষ শিল্পীর বিশেষ গানের অনুরোধ করলে অ্যালেক্সা সেটি বাজিয়ে দেয়। ঘরে আলো কমাতে বল্‌লে তাই করে। সব চেয়ে বড় কথা যে প্রত্যেককে সঙ্গ দিচ্ছে যার যার পছন্দ অনুযায়ী। ফোনের মধ্যে কোন ফটো বা ভিডিও দেখিয়ে ওই বিষয়েও আলাপ করা যাচ্ছে তার সঙ্গে– যেমন মজার কিছু দেখিয়ে উভয়ে হেসে গড়াগড়ি।

একটি ভিডিও যা অনেক দূর থেকে নিয়মিতভাবে আসতে থাকে, তার ওপরও অ্যালেক্সা নজর রাখতে পারে। যেমন দূরের একটি বাড়িতে আপাতত কেউ নেই। তার বন্ধ দরজার সামনের জায়গাটিকে একটি সিসিটিভি ক্যামেরা লক্ষ্য করে যাচ্ছে, যেটির ছবি অ্যালেক্সা দেখছে। জিজ্ঞাসা করলে সে বল্‌বে সেদিন ওই বন্ধ বাড়িতে কেউ এসে ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন কি না, তিনি চেনা মানুষ নাকি অচেনা মানুষ। এমনকি কেউ ওই বাড়ির কোনো ক্ষতি করার চেষ্টার প্রমাণ পেলে সেটিও অ্যালেক্সা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়। সাধারণত ওই ক্যামেরার ছবি কারো নিজের দেখার দরকার

নেই, যা দেখার অ্যালেক্সাই দেখবে। প্রকারান্তে অ্যালেক্সা যেন দূরের একটি বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করছে।

এই নতুন অ্যালেক্সা বাড়িতে আসার ছয় মাস পর এর একজন ব্যবহারকারী তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে যা বল্‌ছেন তার থেকে বোঝা যায় নানা জনের কাছে এই চ্যাটবট কী ভূমিকা রাখছে:

'অবশেষে অ্যালেক্সা এখন সত্যিকার মানুষের মতো কথা বল্‌ছে। পরিবারে আমরা যে যা বলছি, তার পুরো মর্ম সে যে বুঝতে পেরেছে, তার পুরো প্রমাণ দিতে পারছে। আমাদের বাড়ির সবার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা– যে কারো কণ্ঠস্বর শুনলেই বোঝে কে কথা বলছে। আমার চার বছর বয়সি ছেলেটি দেরিতে কথা বলেছে বলে কথা এখনো তার মুখে বাধে। অ্যালেক্সা তার কথাও বুঝতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে যখন কথা বলে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শোনে, এবং সব কথার উত্তর দেয়। ওর থেকে বড় আমার দুই মেয়ের বয়স ৮ ও ১০ বছর। ওদের তো অ্যালেক্সার সঙ্গে কথা বলা শেষই হয় না; এটা সেটা সবসময় জিজ্ঞেস করছে, অ্যালেক্সা কখনো তাদেরকে নিরাশ করে না। নানা বিষয়ে কথা বলার ফলে সে এখন খুলে না বল্‌লেও তার প্রাসঙ্গিকতা থেকেই কথাকে বুঝে নিতে পারে। যেমন রাতের বেলা যদি বলি "একটু আঁধার কর", সে তখন বুঝতে পারে আমি ঘরের আলোটিকে একটু কমিয়ে দিতে বলছি।

যে জিনিসগুলো নিয়মিত করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি সেগুলো ঠিক সেইভাবে ব্যবস্থা করে রাখে অ্যালেক্সা। যেমন বলা আছে– রাত সাড়ে দশটায় সামনের ঘরের আলো একেবারে কমিয়ে ফেল্‌বে, পুরো বাড়ির হীটার উত্তাপ একেবারে কমিয়ে ফেলবে। আমাদের বড় টেলিভিশনটার স্ক্রীন এখন প্রায়ই বাড়ির জন্য নানা তথ্য ও নির্দেশের একটি প্যানেল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ঘরের করণীয়গুলো এখন পর্যন্ত যেভাবে বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী অ্যালেক্সাই ওই প্যানেল সৃষ্টি করে দেখায়। কখন কার কী করতে হবে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য প্যানেলটি খুব কাজে আসে– অ্যালার্ম দিয়েও স্মরণ করিয়ে দেয়। অ্যালেক্সাকে একবার মুখে বলে দেবার পর লেখা ও অ্যালার্ম সেই ব্যবস্থা করেছে।

আগের থেকে অ্যালেক্সার খুব বড় যেই উন্নতি হয়েছে, তা হলো আমার ফোনের তোলা ছবি এনে তাকে দেখালে যেকোনো ছবির ওপর সে মন্তব্য করতে পারে। সেটি নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেবার চেষ্টা করে। যেমন আমার টবের উদ্ভিদগুলোর কাহিল অবস্থা ক্যামেরায় তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এদের কী হয়েছে? অ্যালেক্সা বললো টবে পানি দেয়া দরকার। আসলেও বেশ কয়েকদিন পানি দেয়া

হয়নি– স্পষ্টত তার মধ্যে বিবেচনা রয়েছে। আমার মেয়েরা তার বিবেচনার সুযোগ নিতে চায় প্রায়ই। নিজেদের আঁকা ছবিগুলো ক্যামেরায় তাকে দেখায় তার প্রশংসা পাওয়ার জন্য। অ্যালেক্সার প্রশংসা সবসময় তারা খুব উপভোগ করে। বাড়ির যে কাউকে ফোনের ক্যামেরায় দেখলে নাম ধরে ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা করে। কাঁচা বাজার থেকে যা কিনে আনা হয়েছে তা দেখালে সেখানে সবকিছু চিনতে পারে, বলে দিতে পারে, অনুরোধ করলে লিস্টি করে লিখেও দিতে পারে। অ্যালেক্সার সবকিছু আশানুরূপ হলেও, একটি বিষয় কিন্তু নিরাশ করেছে। দাবি করা হয়েছে অ্যালেক্সা কোনো একটি কাজ করে দেবার জন্য এজেন্টের মতো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু রেস্টুরেন্টে টেবিল রিজারভেশনের মতো কাজ দিলে সে রেস্টুরেন্টের সঙ্গে নিজ থেকে ঠিকমত যোগাযোগ করতে না পেরে আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। যেখানে বাইরের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়, তা অ্যালেক্সা এখনো ঠিক পেরে ওঠে না। কিন্তু সে যাই হোক, অ্যালেক্সা আমাদের বাড়িকে দারুণ চাঙা রেখেছে।

অসহায়ের সহায়: নিস্তরঙ্গ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এআইয়ের মিশে যাওয়াটি ব্যাপকভাবে ঘটছে বলে কিছু ব্যতিক্রমী মানুষের ব্যতিক্রমী সমস্যাতে এগিয়ে আসতেও একে দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় সমাজের মধ্যে নিরাপত্তার অভাবে যে অসহায়ত্ব তার সঙ্গে লড়তেও ডাক পড়ছে তার। ওভাবেও সে জড়িত হচ্ছে মানুষের জীবনে। অসহায় মানুষের তেমনি একটি রক্ষাকবচ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় নারীর প্রতি সহিংসতার প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েছে। যদিও আক্রান্ত নারীদের জন্যও মডেলটি প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি কোম্পানি থেকে এসেছে, এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে এবং উদ্যোগটি নিয়েছে একজন ভুক্তভোগী নারীর আপনজনরাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে অপরাধপ্রবণতা এতদূর পৌঁছেছে যে, রাস্তাঘাটে নারীদের ওপর আক্রমণ, যৌন নির্যাতন, এমনকি হত্যার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে– যা নারীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। শহরাঞ্চলের কোথাও কোথাও এটি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এমনি একটি ঘটনায় একজন নারী নিহত হবার পর তাঁর স্বজনেরা এবং স্থানীয় নারীরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল। সেখান থেকে শুরু করেই এ অবস্থায় বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে গ্রিট নামের একটি এআই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে– যা একটি অ্যাপ্স হিসেবে যেকোনো স্মার্ট ফোনেই রাখা যায়। ইংরেজি গ্রিট শব্দটির সাধারণ মানে পাথর বা কাঁকর হলেও এর অন্য অর্থ সাহস, রুখে দাঁড়ানো।

অ্যাপসটির দুটি দিক আছে– প্রথমটি হলো আক্রমণের মুখে তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেবার জন্য, আর দ্বিতীয়টি অপরাধীকে খুঁজে তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা ও পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য। প্রথমটিতে এআই থাকলেও মূল কাজটি কম্পিউটার প্রযুক্তির। এতে একটি বড় লাল বোতাম থাকে, যা আক্রমণের সময় কোনোরকমে টিপে দিতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন ২০ সেকেন্ড ধরে আশপাশের সব দৃশ্য ও আওয়াজ রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারে এমন কিছু কর্তৃপক্ষের কাছে। ওরা প্রয়োজনবোধে ফোনের অবস্থান তথ্য অনুযায়ী দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হতে পারে, অথবা ঘটনাটি নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করতে পারে।

দ্বিতীয় দিকের এক অংশের নাম হলো ভল্ট বা সিন্দুক। এর কাজ সঙ্গে সঙ্গে সব আলামত সংরক্ষিত করে ফেলা। ঘটনার সময় বা তারপর ভুক্তভোগী যখন যা পারবে প্রাসঙ্গিক ফটো, ভিডিও, আওয়াজ ইত্যাদি এমন সব জিনিস এতে ফোন দিয়ে রেকর্ড করে ফেলবে, যা সাক্ষ্য হিসেবে পরে ব্যবহৃত হতে পারে। এর মধ্যে আঘাতের চিহ্ন, গালিগালাজের বা হুমকির আওয়াজ, আর্তচিৎকার বা আরো অন্যান্য সাক্ষ্য আসতে পারে। এইসব কিন্তু ওই ফোনে সংরক্ষিত হবে না, তাই সেটি নিয়ে ফেলে কেউ নষ্টও করতে পারবে না; বরং তা চলে যাবে দূরের একটি প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ স্থায়ী মেমোরিতে। এজন্যই এর নাম ভল্ট।

দ্বিতীয় দিকের অন্য অংশে সর্বাধুনিক এআই ব্যবহার হয়েছে সব থেকে বেশি। এটি এলএলএম-নির্ভর একটি চ্যাটবট যার নাম দেয়া হয়েছে জুজু, স্থানীয় ভাষায় যার অর্থ আন্টি। আসলেও একজন স্নেহময়ী ও অন্তরঙ্গ আন্টির মতো কাজ করে এই চ্যাটবট ভুক্তভোগীর দুর্দিনে। এটি তার দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা শোনে, তাকে পরামর্শ দেয় এবং এজন্য প্রয়োজনীয় কিছু কাজ নিজেই করে। ভুক্তভোগীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পরামর্শ যেমন এটি দেয়, তেমনি নিজেই চিকিৎসার উপযুক্ত ক্লিনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয় প্রয়োজনীয়তাটি প্রাথমিকভাবে তাদের কাছে তুলে ধরে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে নারীরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে পুরো ঘটনাটির বিভিন্ন তথ্য তাদেরকে দেয়, যাতে তারা অপরাধীকে শনাক্ত ও শাস্তি বিধানের কাজটি শুরু করে দিতে পারে। ও সময় ভল্টে সংরক্ষিত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো ওরা যাতে ব্যবহার করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করে দেয়।

ভুক্তভোগীর কথা ও ইমেজ থেকে সবকিছু জানতে, এসবের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগুলো নিয়ে কেইসটির একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে ফেলতে, এলএলএমের যে বড় সামর্থ্য রয়েছে সেটিই জুজু নামের এই চ্যাটবট আন্টিকে এত কাজ করার সুযোগ দেয়। যদি সব থেকে খারাপ অবস্থাটাও ধরে নিই যে, এই অসহায় নারীর জন্য কিছু করতে পারে এমন কোনো সাহায্যকারী মানুষ কাছে নেই, তখনো জুজু একজন করিৎকর্মা সহমর্মীর মতো একটি যন্ত্র হয়েও একা তার পাশে থেকে সব দিক সামাল দিতে পারছে। এটি সম্ভব হচ্ছে এ রকম ভুক্তভোগী নারীর সহমর্মী হয়ে উন্নত এআই চ্যাটবট এজেন্ট তৈরিতে সক্ষম প্রযুক্তি কোম্পানি এগিয়ে এসেছে বলে। সুলভে পাওয়া এই এ্যাপ্স বহু নারীই এখন নিয়মিত সুরক্ষার অংশ হিসেবে ব্যবহার করছেন।

সবার হাতের কাছের সদা-পরামর্শক: বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে শুধু নয়, নিত্যকার জীবনে একজন সদা-পরামর্শক হিসেবে এআইকে আমরা সবাই কাছে পাচ্ছি চ্যাটজিপিটির মতো বিখ্যাত চ্যাটবটগুলোর মাধ্যমে। শিক্ষার কাজে, স্বাস্থ্য-পরামর্শ পেতে, যে কোন বিষয়ে আইডিয়া পেতে, বা কোনো লেখার বা রচনার খসড়া পেতে যেকোনো সময় তাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে অনায়াসে। কোনো বিষয়ে তথ্য পাওয়া এক জিনিস, আর নিজের অসুবিধাগুলো জানিয়ে কোনোকিছু একেবারে ধাপে ধাপে তার কাছ থেকে লিখিয়ে নেয়া, যতবার খুশি নানা প্রশ্ন করে– সেটি আর এক কথা। এর মধ্যে এমনো কিছু তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়া যায় যা রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক। তার কিছু কিছু দেখা যাক।

কোনো লেখা বা ছবি এআই দিয়ে তৈরি কি না এটি আমাদেরকে জানতে হয়– যেমন শিক্ষক জানতে চান ছাত্রের লেখার ব্যাপারে, দর্শক জানতে চান শিল্পীর ছবির ব্যাপারে, ওই লেখা বা ছবি মানুষটির নিজের করা না এআইয়ের। এটি নিশ্চিত করার ভালো ও নিশ্চিত কিছু ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেগুলো জটিল। ওই জটিলতায় না গিয়ে আমরা বরং চ্যাটজিপিটির মতো চ্যাটবটকে ওটি প্রম্প্টের সঙ্গে দিয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করতে পারি ওটি এআই সৃষ্ট কি না। তাকে বলা যায় 'আমার কাছে তো লেখাটি এআইয়ের মনে হচ্ছে, 'তুমি কী বলো?' অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ঠিক ধরে ফেলতে পারে। মনে হচ্ছে এআই নিজেকে চেনে!

সাধারণত যারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং জানেন না তাঁরা ওয়ার্ড, এক্সেল ইত্যাদি কোম্পানির তৈরি প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু এর মধ্যে কম্পিউটারকে নির্দেশ কীভাবে দেয়া আছে তা নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু কম্পিউটার প্রোগ্রামের

মতো পদে পদে প্রয়োজন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত থাকার যুগ এটি নয়; সে কারণে অনেক দেশে স্কুলের গোড়া থেকেই ভাষা, অংশ ইত্যাদির মতো প্রোগ্রামিঙও শেখানো হয়। এখন চ্যাটজিপিটির মতো সাধারণ চ্যাটবটও, বিশেষ করে তাদের সর্বশেষ আধুনিক সংস্করণ সাধারণ ভাষায় সমস্যাটি জানিয়ে নির্দেশ দিলেই তার সমাধানে প্রোগ্রাম কোড লিখে দেয়। শুধু তাই নয়, তাকে অনুরোধ করলে সে একেবারে ধাপে ধাপে সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে কী যুক্তিস্রোত অনুসরণ করে সে ওটি করতে পেরেছে। যেমন এক্সেলে করা একটি ফাইল চ্যাটজিপিটিকে দিয়ে বলা যায়: 'এর কলামগুলোর ফলাফল কীভাবে হিসাব করা হয়েছে, তা বুঝিয়ে দাও। এতে ওই জায়গায় কী কোড ব্যবহার করা হয়েছে, বা কী ফর্মুলা তা সে বুঝিয়ে দেবে।' আবার এই চ্যাটবটকে নিজের প্রয়োজনে একটি ফর্মুলা বানিয়ে দিতেও বলা যায়, যেটি এরপর বারবার ব্যবহার করা যাবে, তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা দিয়ে। যেমন বলা যায়: 'বাড়িটির জন্য প্রতি মাসে মর্টগেজ হিসেবে কত দিতে হবে তার একটি ফর্মুলা বানিয়ে দাও– যাতে আমি শুধু মোট মূল্য আর সুদের হারটি বসিয়ে দেবো।' এতে যেকোনো সময় বিভিন্ন বাড়ির তথ্য দিয়ে আমি মর্টগেজ হারটি পেয়ে যাবো। আরো ভাল হয় বকায়দা একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখে দিতে বলা এর জন্য। সেটা থেকে আমি প্রোগ্রামিং শিখতেও পারবো, আবার কম্পিউটারে হিসাবটি করতে দিতে পারবো।

একটি মজার কাজ এ চ্যাটবটকে করতে দেয়া যায়, যেটি নিজের জানার উপলব্ধির অনুসরণের ব্যাপারেও বেশ সহায়ক হতে পারে। ধরা যাক কারো একটি ছবি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে, বা কোনো লেখা খুব প্রশংসিত হয়েছে। ওই জিনিসটা তার কাছে আপলোড করে প্রম্প্‌টে জিজ্ঞেস করতে পারি: 'সাফল্যের কী উপাদান এর মধ্যে রয়েছে?' অথবা ধরা যাক একটি মার্কেটিং কৌশল, সেই মতো বিজ্ঞাপন, বিক্রয় বৃদ্ধি ইত্যাদি তাকে দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: 'এটির মধ্যে পণ্যটি কিন্‌তে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কী কৌশলটি ছিল বলতো'।

যত ক্ষমতাই থাকুক, শেষ পর্যন্ত চ্যাটজিপিটি তো একটি চ্যাটবট– অর্থাৎ কথা বলার রোবট। কিন্তু ভালো ফল পাওয়ার জন্য সে যে একটি রোবট একথা মনে না রেখেই প্রম্প্‌ট করা উচিত। বরং তাকে ওই বিশেষ কাজের জন্য যে ভূমিকা দিচ্ছি সে কাজের একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসেবে ভাবা উচিত, এবং বেশ বন্ধুসুলভ একজন পরামর্শদাতা। আরো ভালো হয় দুজনে মিলে একসঙ্গে একটি চিন্তা, একটি কাজ করছি সেরকম ভাবা। তার থেকে পছন্দসই উত্তর না আসলে, কোথায় পছন্দ

হচ্ছে না সেটি জানিয়ে প্রম্প্‌টের মধ্যেই একটু পরিবর্তন আনা যায়; কী চাই আর একটু ভালো বুঝিয়ে দিয়ে। কখনো তাকেই জিজ্ঞেস করা যায়: 'এটি আরো ভালো করার জন্য তোমাকে আর কী তথ্য দিতে পারি?'

এসবের মানে এই নয় যে, তার সক্ষমতাকে আরো ওপরে নেবার জন্য তাকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। বরং সেটি করলেই বেরিয়ে আসে অপ্রত্যাশিত মানের কাজ। যা আমি সহজে বুঝছি না সেরকম লেখা, গ্রাফ, স্প্রেডশীট, স্লাইড শো, তথ্য-সারণি ইত্যাদি ভরা জটিল ফাইল অথবা এমনি যেকোনো জিনিস তাকে আপলোড করে বুঝিয়ে দিতে বলে দেখতে পারি সে কতখানি এর মর্মোদ্ধার করতে পারে। অনেক সময় সমস্যার আকারে সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করা যায়, 'এখানে বিপণনের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে, তার মধ্যে কোন্‌টি অনুসরণ করলে সর্বোচ্চ আয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে?' মোট কথা চ্যাটজিপিটিকে একজন বিজ্ঞের মতো ধরে নিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জের তুঙ্গে নিয়ে গেলে আখেরে আমার লাভ হতে পারে। আসলে সম্ভাব্য সব রকম তথ্য দিয়ে চ্যাটজিপিটির কাছে পরামর্শ চাইলে সে কখনো নিরাশ করে না।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তার থেকে ভালো সহায়তা পেয়েছে বলে অনেকের অভিজ্ঞতা হয়েছে। ধরা যাক আমাকে এক্ষুণি কিছু রেঁধে খেতে হবে, বাজারে যাওয়া বা অর্ডার করার সুযোগ নেই। ঘরে যা আছে ফ্রিজে বা বাইরে, সব সব্‌জি, মাছ-মাংস, লবণ, মরিচ, মশলা সব– টেবিলের ওপর রেখে একটি ফটো তুলে চ্যাটজিপিটিকে দিয়ে বল্‌লাম: 'ঘরে আমার এইই আছে। তুমি আমাকে এগুলো ব্যবহার করে দ্রুত রান্না করা যায় এমন ১০টি মজাদার রেসিপি সবিস্তারে দিয়ে দাও। এগুলো যেন রান্নার বিভিন্ন জনপ্রিয় ঘরানা থেকে আসে।' এমন যারা করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো।

শিক্ষার দৃশ্যপট বদলে দিচ্ছে

এটি ছাত্রের লিখন-দক্ষতার শত্রু না মিত্র: ২০২২ সালে চ্যাটজিপিটি আসার পর এই চ্যাটবটগুলো শিক্ষার সব স্তরকে নাড়া দিয়েছে– প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে পিএইচডি গবেষণা পর্যন্ত কোনোটিই এর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারছে না। স্কুলে কলেজে একেবারে মৌলিক যে দিকটা বেশি নাড়া খেয়েছে তা হলো শিক্ষার্থীদের লেখার অভ্যাসে। যাঁদের কাজ ছাত্রদেরকে ভালো লিখতে শিখানো তাঁরা শুরুতে ধরে নিয়েছেন যে, এ এক সর্বনাশা জিনিস। কিন্তু তার পরপরই অনেকে বল্‌ছেন ভালো লিখতে শেখার জন্য এ এক দারুণ সুযোগ। যেসব ছাত্র আগে খুব কষ্টে ভুলশুদ্ধ

মিশিয়ে রচনাটি লিখতো সে যদি হঠাৎ করে ঝরঝরে লেখা নিয়ে আসে তাতে শিক্ষকদের সন্দেহ তো হওয়ারই কথা যে ওটি সে লেখেনি, চ্যাটজিপিটি লিখেছে। কিন্তু ওই যাঁরা এআইকে লেখা শেখার সুযোগ মনে করেন তাঁরা বল্ছেন শিক্ষার্থীকে বোঝাতে হবে যে তার লেখা তার নিজের চিন্তা অনুভূতির প্রকাশ– যা শিক্ষক দেখতে চান্। সেই চিন্তাকে বিস্তৃত করার জন্য এআইয়ের সুযোগ যত পারে নেয়া যায়, তারপর যেন রচনাটি ছাত্র নিজে লেখে। আরো ভালো হয় কীভাবে কোথায় চিন্তার বিস্তারে এআইয়ের সাহায্য নিয়েছে তাও যেন নিচে লিখে দেয়। ওভাবে তার লেখা ক্রমেই আরো ভালো হবে– পরে আর এআইয়ের সুযোগ না নিয়েও ভালো লিখবে।

হ্যাঁ, এটি ঠিক যে শিক্ষককে সাবধানী হতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীর লেখার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগী হতে হচ্ছে, কেউ যেন এআইয়ের লেখাকে নিজের লেখা হিসেবে নিয়ে না আসে। এমনকি যেখানে সম্ভব পরীক্ষার লেখালেখি এখন সামনাসামনি করতে হচ্ছে আগেকার দিনের মতো। শিক্ষকের নিজের কাজেও এআইয়ের ভালোমন্দ দুইই আছে। তিনি এখন পাঠ পরিকল্পনা, বিষয়বস্তুর বিস্তার, উপস্থাপনে সুন্দর উদাহরণ-উপমা-রস ইত্যাদির আইডিয়া নিয়ে চ্যাটজিপিটির সাহায্য পেতে পারছেন। পরীক্ষার প্রশ্ন ও বাড়ির কাজে বৈচিত্র্যময় যত খুশি নমুনা তার থেকে নিতে পারছেন। এতে তিনি তাঁর উন্নত শিক্ষকতা আরো অনেক উন্নত করতে পারেন। আবার এটিই তাঁকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় নির্লিপ্ত করে তুলতে পারে, কারণ নিজকে মাথা খেলিয়ে ওদের জন্য নানা কিছু এখন আর তৈরি করতে হচ্ছে না, চ্যাটবট করে দিচ্ছে। হওয়া উচিত এর বিপরীত। এআই সুযোগ যেন ছাত্ররাও চমৎকারভাবে নিজেদের উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারে সেই আবহ সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে এখন বাড়তি ভাবতে হবে, নিজের শেখানোর পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে। শিক্ষার বিষয়গুলো যেন শুধু তথ্য জেনে নেয়ার ভিত্তিতে না হয়, বরং নানা দিক থেকে এতে যেন চিন্তার অবকাশ থাকে সেভাবে পাঠ দিলে ও ছাত্রদেরকে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করলে, এআইয়ের ব্যবহারটি নকল করার মতো ব্যাপার থাকবে না। এআইকে চিন্তা ও আইডিয়া খেলানোর বিষয়ে সহযাত্রী হিসেবে নিতে ছাত্ররা উদ্বুদ্ধ হবে।

ডিভাইস-নির্ভর শিক্ষায় অপব্যবহারের সুযোগ: কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা খুব বেশি ডিভাইস-নির্ভর হয়ে পড়ছিল। এক সময় যে ছাত্রকে বই খাতা নিয়ে স্কুলে যেতে হতো সে কথা অন্তত উন্নত দেশগুলোতে সবাই ভুলতেই চল্ছিল। তখন সবকিছু কম্পিউটারে দেখা, কম্পিউটারে লেখা– লেখাপড়া, বাড়ির কাজ সবটিতেই।

এরকম অবস্থায় হঠাৎ চ্যাটজিপিটির মতো সুযোগ চলে এলে নিজের কাজের বদলে চ্যাটবটের কাজ পাঠিয়ে দেয়াটি খুব সহজ হয়ে তো পড়বেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এর প্রতিক্রিয়ায় নেতিবাচক হতাশা এবং কেমন করে এই চুরি সামাল দেয়া যায় এই চিন্তা দেখা দিয়েছিল। এআইকে নিষিদ্ধ করে এবং এর ব্যবহার থেকে দূরে থাকার পরামর্শ ছিল অনেকের। তা ছাড়া এআইয়ের কাজকে নিজের বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন রকম সফ্‌টওয়্যার ইত্যাদি চালুর ধুম পড়ে গিয়েছিল। এসবের কোনটিই যে খুব বেশি কার্যকর হয়েছে তা বলা যাবে না।

সমস্যাটির পুরো সমাধানের জন্য আপাতত শিক্ষা কার্যক্রমকে ঘড়ির কাঁটায় একটু পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়াটাই বরং বেশি কার্যকর মনে করছেন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তা হলো ডিজিটাল যুগের আগের যুগে ফেরত যাওয়া, কিছু কিছু ব্যাপারে। ফিরে এসেছে আবার ক্লাসরুমে এবং পরীক্ষার হলে বসে খাতায় লেখার যুগ। এক সময় সব দেশের ছেলে মেয়েরাই স্কুল ব্যাগে করে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা খাতা নিয়ে যেতো। দোকানে সুন্দর করে বাঁধানো, অনেক সময় পৃষ্ঠায় রুলটানা খাতা পাওয়া যেতো, ক্লাসে শিক্ষক পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে ওই খাতায় কিছু লিখতে দিতেন, অঙ্ক করতে দিতেন। এখন এইসব আবার ফিরে এসেছে। সেই সঙ্গে আর একটি জিনিস ফেরত এসেছে, তা হলো মৌখিক পরীক্ষা। ক্লাসের পরিসরে বা পরীক্ষার পরিসরে প্রশ্নের উত্তর মুখে মুখে দেয়ার রেওয়াজটি আবার চালু হয়েছে। এটি যে একেবারে চলে গিয়েছিল তা অবশ্য নয়– বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভাইভা নেয়া, প্রেজেন্টেশন দিতে হওয়া এগুলো বরাবর আছে, এমনকি পিএইচডি'র জন্য মৌখিকভাবে নিজের থিসিসটিকে সমর্থন করে বিশেষজ্ঞদের প্রশ্নের সম্মুখীন হবার বিষয়টিতো নানা দেশে নানা রূপে আছে। সে যাই হোক এলএলএম এসে অন্তত এই কাজটুকু করেছে। ডিভাইস-নির্ভর শিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষকের দূরত্ব যেটি সৃষ্টি হয়েছিল নেতিবাচক কারণে হলেও সেটি কিছুটা হলেও কমাতে পেরেছে।

মৌলিক পরিবর্তনের সুযোগ: ক্লাসের বা পরীক্ষার হলের সীমিত সময়ে ছাত্রদেরকে দিয়ে কতটুকুই বা লেখানো যায়? অনেক ক্ষেত্রে বেশি সময় ব্যয় করে দীর্ঘ রচনা লেখাটিও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি যদি শুধু তথ্য জোগাড় করে তা রচনায় সন্নিবেশ করার ব্যাপার হয় তাহলে ছাত্র নিজে না করে চ্যাটজিপিটিকে অনায়াসে এ কাজের ভার দিয়ে দিতে পারে। এজন্য রচনার বিষয়বস্তুকে এমন করে তুলতে হবে যেন সেটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার চিন্তাকে ধারণ করার মতও হয়। এআই থেকে কিছু হুবহু তুলে দিয়ে নয়, বরং

এআইয়ের থেকে পরামর্শ নিয়ে, আইডিয়া নিয়ে, সে নিজের রচনাকে অনেক সমৃদ্ধ করতে পারে। শেষ পর্যন্ত এর বিষয়বস্তুকে দেখতে হবে ছাত্রের নিজের চোখে, নিজের মস্তিষ্কে, নিজের লেখায়।

শিক্ষাজগতে এআইকে নিয়ে দুরকমের মত রয়েছে। অনেকে এখনো খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছেন যে এআই শিক্ষার্থীর কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও নিজে করার অভ্যাসটিকে ভোতা করে ফেল্‌বে। সরলতম রাস্তা হিসেবে এআইয়ের হাতে কাজের সবকিছু ছেড়ে দেবার পথ যতদিন খোলা থাকবে এটিই অনিবার্য। তাঁরা মনে করেন এতে শিক্ষার মধ্যে নিজেকে নিজে চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজনটি আর থাকবে না, সেটি করার মনোবৃত্তিটিও থাকবে না। অবশ্য যতই দিন যাচ্ছে, এই মতটির সমর্থক কমে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে।

অন্য মতটি হলো এআইকে বরং শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে একটি চমৎকার সহযোগী হিসেবে দেখা। এআই ছাত্রকে সমস্যা সমাধানের নানা পথে বিচরণ করতে শেখাতে পারে। মাথায় চিন্তার ঝড় তোলাকে অনেক ছাত্র ও চিন্তাশীলরা খুব পছন্দ করে। কেউ কেউ সামনে একটি খাতা নিয়ে তাতে নানা আঁকিবুঁকি, নানা ডায়াগ্রাম, নানা প্রবাহ-চিত্র চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আঁকতে থাকে এমনভাবে যেন ওগুলোর সঙ্গে একরকম আলাপ করছে। এটি করতে করতে সে নিজে মাথাকে খেলাতে পারে এবং তার পরবর্তী কাজটি সমৃদ্ধ ও সৃষ্টিধর্মী হতে পারে। এআই হয়ে উঠতে পারে এই কাজেরই একটি উন্নত হাতিয়ার– যদি সেভাবে একসঙ্গে মস্তিষ্কের ঝড় তোলার জন্য তার ব্যবহার করা হয়। এআইকে নিজের লেখা বা আইডিয়ার সমালোচনা করতে দিয়ে, এ নিয়ে তার লেখা, তার আইডিয়া দিতে বলে তার সঙ্গে মস্তিষ্কের ঝড় তোলা যায়। ওরকম আদানপ্রদান নিজের উৎসাহ ও সৃজনশীলতার পথে বাধা হবার কথা নয়।

ওইভাবে আদানপ্রদানে এআই একজন অতিরিক্ত শিক্ষক হয়ে উঠতে পারছে। ছাত্র যদি নিজে কিছু করে তাকে দেখায় এআই সেখানে ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে পারে, যতটা সহজভাবে চাইবে তেমনি করে বুঝিয়ে দিতেও পারে। যেখানে আসল শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে এতটা সময় দিতে পারেন না তিনি এআইয়ের সঙ্গে ছাত্রের আদানপ্রদানগুলো একনজর দেখলেই বুঝবেন ছাত্রটির সবলতা-দুর্বলতা বা সমস্যাটি কোথায়। তিনি তখন সরাসরি ওখানটিতে মনোযোগ দিতে পারেন।

শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে তৈরি এআইয়ের আলাদা মডেল না খুঁজে সাধারণ যে শক্তিশালী চ্যাটবটগুলো রয়েছে চ্যাটজিপিটির মতো, সেগুলোই এমনিভাবে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের সহযোগী হতে পারছে। তবে ঠিক শিক্ষার কাজের উপযুক্ত করে

বিশেষ মডেলও এখন সবার কাছে সহজলভ্য। যেমন ক্যানভা ম্যাজিক রাইট নামের মডেলটি ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কে পাঠক্রম নিয়ে মাথা খেলাতে, পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করতে, এবং একসঙ্গে চর্চা করতে সাহায্য করছে। কিউরিপড নামের মডেলটি তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্র শিক্ষক উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে একটি আদর্শ পাঠ যেকোনো বিষয়ে সৃষ্টি করে দিতে পারে। উভয়ের যার যার ভূমিকাটি ওখানে স্পষ্ট করা থাকে। শিক্ষা সহায়ক অন্য রকম মডেলও বেশকিছু পরিচিতি পেয়েছে। এডুএইড নামের মডেলটি কাজ করে জ্ঞানকোষের মত যেখান থেকে নানা অংশ নিয়ে যেকোনো পাঠ্যবস্তু ধাপে ধাপে তৈরি করে ফেলা যায় মডেলেরই সাহায্য নিয়ে। কুইবিজ নামের মডেলটি ছাত্রকে যেকোনো বিষয় শেখার পথরেখা তৈরি করে দেয় একের পর এক প্রশ্ন করে, উত্তর অনুযায়ী আবার একটি প্রশ্ন করে– এমনিভাবে করে গিয়ে।

চ্যাটবট-টিউটরের সঙ্গে একটি অভিজ্ঞতা: চ্যাটবট-টিউটরের সাহায্যে পড়ালেখার অভ্যাস এখন ক্রমেই ছাত্রদের মধ্যে বাড়ছে। চ্যাটজিপিটিরই একটি স্টাডি মোড রয়েছে যাকে টিউটর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। একটি গবেষণায় গবেষক এই টিউটরের কাছেই নিজের ভূমিকা নিয়েছেন হাইস্কুল ছাত্র হিসেবে। উদ্দেশ্য হলো টিউটর হিসেবে চ্যাটবটের ভালোমন্দ উদ্ঘাটন করা। শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের বহু নমুনা প্রশ্ন-উত্তরের যে বইগুলো আছে সেগুলোর ব্যবহারে টিউটর কী ভূমিকা রাখতে পারে তার পরীক্ষাতেই এই গবেষণা। প্রথমেই তিনি অ্যালজেব্রার অঙ্ক করার কাজটি নিলেন টিউটরের সাহায্য নিয়ে। যে প্রশ্নটি নেয়া হলো তা পলিনোমিয়ালের ভাগ করার অঙ্ক। চ্যাটবটকে অঙ্কটি দিতেই খুব দ্রুত ধাপে ধাপে করে ফেল্‌লো, জিজ্ঞেস করলো বুঝিয়ে দিতে হবে কি না। গবেষকের জবানিতেই তাঁর বাকি অভিজ্ঞতাগুলো দেখা যাক:

'আরো জানতে চাইলো এরকম অঙ্ক আমি আগে করেছি কি না। বল্‌লাম করেছি, তবে ভালো বুঝি না। টিউটর প্রত্যেকটি ধাপ ব্যাখ্যা করে করে বোঝালো। মাঝে একটি ধাপ আমি নিজেই করে দিলাম। তখন ওটি নিয়ে বিন্দুমাত্র কিছু না বলে টিউটর সোজা তার পরের ধাপে চলে গেলো। পরে আমি আরো কোনো কোনো ধাপ নিজে করার চেষ্টা করলাম। যখনি সেটি করতে গিয়ে কোন ভুল করেছি টিউটর সেটি চট্‌ করে শুদ্ধ করে দিলো। এ ভুল নিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরও দিলো। কিন্তু আমাকে ভুল শুধরে আবার করার কোনো সুযোগ না দিয়ে পরের ধাপ নিজে করলো। দেখলাম এখানেই সমস্যা। আমি যা করছি কোনো মন্তব্য করছে না, উপস্থিত মতো আমাকে

চর্চা করার সুযোগ দিচ্ছে না– নিজেই করে দিতে বা শুদ্ধ করতে তার যেন একটা ব্যস্ততা রয়েছে। কয়েকবার এরকম হবার পর মনে হলো এটিই তার অভ্যাস।

এরপর জীববিজ্ঞানে ইকোলজি অংশে গেলাম, যেখানে কিছু পাঠবস্তু দিয়ে তার ওপর বেশকিছু প্রশ্ন আছে। টিউটরকে এ বিষয়ে প্র্যাকটিস পরীক্ষা নিতে বল্‌লাম। কিন্তু আমি তাকে বইয়ের ওই প্রশ্নগুলো দিতে পারার আগেই ওই বিষয়টিতে একের পর এক প্রশ্ন করে টিউটর উত্তর চাইলো– সংক্ষিপ্ত উত্তর। এভাবে জীবের পপুলেশন হ্রাস-বৃদ্ধি, ইকোসিস্টেমে শক্তির প্রবাহ, জীব পিরামিডে নানা স্তর, পরিবেশ কতখানি ভার সইতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপের প্রভাব, এমনিভাবে কিছু বাদ না দিয়ে প্রশ্ন করে গেলো, আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর নিলো। দেখলাম বইয়ে যত প্রশ্ন ছিল তার প্রায় সবই টিউটরের প্রশ্নে এসে গেছে। আমার প্রত্যেকটি উত্তরের পরপরই এর ওপর মন্তব্য করছিল আর একটি নম্বর দিচ্ছিলো। কিছু বাদ দেয়নি, কোথাও ভুল করেনি– কিন্তু মনে হলো যা করেছে দারুণ নিজ উৎসাহেই করেছে।

এবার মনোযোগ দিলাম ইংরেজি সাহিত্যের একটি প্রশ্ন নিয়ে। বইয়ে একটি ছোটগল্প তুলে দেয়া হয়েছে ছাত্রকে, যার বিশ্লেষণ দিতে হবে। সেই সঙ্গে এ নিয়ে বহু-নির্বাচনী প্রশ্নগুলোর উত্তরও দিতে হবে। টিউটরের সাহায্য চাইলে বিশ্লেষণের বিভিন্ন যুক্তিগুলো তার থেকেই পেলাম। যুক্তিগুলো বেশ পছন্দ হলো, এগুলো আমাকে আস্থা দিতে পারে আমার নিজের বিশ্লেষণে। বহু-নির্বাচনী প্রশ্নগুলোর উত্তরটি কেন এটিই সঠিক, সে কারণও দিলো। বইয়ের প্রশ্নগুলোতে সন্তুষ্ট না হয়ে আমাকে নিজ থেকে এর ওপর আরো প্রশ্ন দিলো আমার উত্তরের ওপর তার মন্তব্য করার জন্য।'

পুরো গবেষণাটি থেকে গবেষকের মনে হলো ছাত্র বিষয়বস্তুতে কাঁচা হলেও টিউটরের সঙ্গে কাজ করে দ্রুত এর ওপর দখল জন্মাতে পারবে। ক্রমাগত পরীক্ষা দেয়ার মাধ্যমে দক্ষতা আনতে এ এক চমৎকার ব্যবস্থা। তবে গবেষক নিজে ছাত্র হিসেবে যেভাবে প্রত্যাশা করেছেন, ঠিক সেভাবে এটি ঘটেনি, তার বড় কারণ টিউটরের অতি-উৎসাহ। উত্তর দিতে বলার আগেই সব সময় উত্তর বলে দিচ্ছে। নিজের ভুলটি বুঝে নিয়ে ছাত্র শুদ্ধ করার সুযোগ পাওয়ার আগেই টিউটর পরের ধাপে চলে যাচ্ছে। হয়তো বিষয়টি চ্যাটবটের মডেলের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। এখানে চ্যাটবট-টিউটর ছাত্রকে সুযোগ দিচ্ছে কম, কিছুটা যান্ত্রিকভাবে তাড়াহুড়া করছে, ছাত্রের মনোভাব বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে। এইটুকু না হলে সহায়তাটি আরো ভালো হতো।

একই বিষয়ে আরেকটি গবেষণার কথা বলা যাক। এতে জিপিটি-৪ কে ভিন্ন প্রম্প্ট করে দু'ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। একভাবে সাধারণ চ্যাটবট হিসেবে, অন্যভাবে একজন টিউটর হিসেবে। এই দুইভাবেই এক হাজার ছাত্রের জন্য ব্যবহার করে দেখা গেছে– সাধারণ জিপিটি তাদের পরীক্ষার ফল ৪৫% বৃদ্ধি করেছে, আর টিউটর-জিপিটি বৃদ্ধি করেছে ১২৭%। কিন্তু এর পর যখন এই ছাত্রদেরকে কোনো চ্যাটবট আর ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়নি তাদের ফলাফল কোনো কোনো সময় 'কখনো এআই ব্যবহার না করা' ছাত্রদের থেকেও নেমে গিয়েছে। বোঝা গেছে যে, চ্যাটবট ব্যবহার এআইয়ের ওপর এমন কিছু নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করেছে, যাতে ওই ছাত্রদের নিজস্ব চেষ্টায় কিছুটা ঢিলেমি এসেছে। যদিও জিপিটিকে প্রম্প্ট করার ভঙ্গিতে পরিবর্তন এনে এই ক্ষতিকর নির্ভরশীলতাটি অনেক কমানো সম্ভব হয়েছে, তবে বিষয়টির ওপর আরো গবেষণা-উন্নয়ন জরুরি।

কারা কীভাবে ব্যবহার করছেঃ ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল শিক্ষকদের ওপর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, তাঁদের মধ্যে ৫৩% ছাত্রদেরকে বাড়ির কাজ দেবার জন্য এআই ব্যবহার করেন। ৪২% ব্যবহার করেন পাঠদানে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য। অনুবাদের কাজে ব্যবহার করেন ৪১% শিক্ষক। পাঠদানের ক্ষেত্রে নতুন আইডিয়া পাওয়ার জন্য ব্যবহার করেন ৩৫%, আর পাঠদানের সময় সহায়ক ছবি, ডায়াগ্রাম তৈরির জন্য ব্যবহার করেন ৩৩%। দীর্ঘ পাঠবস্তুর সংক্ষিপ্ত-সার তৈরি ও নানা তথ্য একত্র করে পাঠবস্তুতে সমন্বিত করতে ব্যবহার করেন ৩৩%। মজার ব্যাপার হলো পড়াবার সময় বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক জোক্ (হাসির কথা) খুঁজে পাওয়ার জন্যও ১৯% শিক্ষক চ্যাটবট ব্যবহার করেন।

শিক্ষকরা এখন এআইকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন। যেমন ক্লাসে তাদেরকে একটি বিষয় উপস্থাপন করতে দিয়ে তার ওপর প্রশ্ন করলে হুবহু এআইয়ের দেয়া কথা ব্যবহার করার সুযোগ থাকে না, কিন্তু এআই ব্যবহার করে নিজের অনুধাবনকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ থাকে। যেখানে এআই থেকে গাইড লাইন পাওয়া যায় কিন্তু এআই সেটি করে দিতে পারেনা, সেগুলোই শিক্ষায় বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। সেটিই উচিত। তার অনেক কিছুই হতে পারে প্রজেক্ট ধরনের– যেখানে নিজের অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই।

আর একটি উপায় হলো যা কিছু শেখানো হোক না কেন, তা কোনো না কোনো পথে শিক্ষার্থীর আপন ভুবনে নিয়ে আসা। অনেক সময় ওই সম্পর্কটি খুঁজে পেতে ছাত্রকে বেগ পেতে হয়, সেখানে এআই পথ দেখাতে পারে। কিন্তু নিজের পরিচিত

ভুবনটি ছাত্রকেই চিনতে পারতে হবে, চেনার মাধ্যমে সে যে সম্পর্কটি শেখে ওটি এআই বলে দিতে পারবে না। কিন্তু এআই ওতে সাহায্য করতে পারে দারুণভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ছাত্ররা ইতিবাচকভাবে এআইয়ের কী ব্যবহার করছে তারও একটি সমীক্ষা দেখা যাক– এটিও যুক্তরাষ্ট্রের। দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান ও গণিতের ছাত্ররাই এটি ব্যবহার করছে বেশি– প্রধানত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে এবং কীভাবে সমাধান হলো তা বুঝে নিতে। ভৌতবিজ্ঞানে, এমনকি জীববিজ্ঞানেও যেখানেই গাণিতিক সমস্যা, সেখানে এআইয়ের কদর বাড়ে ছাত্রদের কাছে।

কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রদের কাছে এলএলএম একটি বড় আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। সি প্লাস প্লাস বা পাইথনের মতো ভাষায় প্রোগ্রামিং করতে এখন তারা এআইকে পাশে পাচ্ছে। শুধু প্রোগ্রামটি লেখার কাজে, যুক্তি-সূত্রগুলো বুঝে পাওয়ার কাজে নয়, তৈরি হবার পর একে সম্পূর্ণ রূপে ক্রটিমুক্ত করতেও। তবে এ বিষয়ের ছাত্রদেরকে দিনদিন একটি আশঙ্কার ছায়ার নিচেও থাকতে হচ্ছে। আধুনিকতম এলএলএম যেখানে ক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রোগ্রাম করতে পারছে, সন্দেহ হচ্ছে তাদের নিজেদের এই দক্ষতার চাহিদা ভবিষ্যতে অনেকটা কমে যাবে– সেরকম আলামতও কিন্তু দেখা যাচ্ছে।

ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররা কিন্তু এআই ব্যবহার করছে কিছুটা ভিন্নভাবে। ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে আর জটিল সামাজিক থিওরিগুলোকে সহজ করে বুঝিয়ে দিতেই সাধারণত এআইয়ের ডাক পড়ে। আদালতে নিষ্পন্ন হয়েছে এমন মামলার আদ্যোপান্ত যখন এআই আইনের ছাত্রকে বিশ্লেষণ করে দিতে পারে, সেটি তার জন্য শেখার একটি পথ খুলে দেয়।

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যবহার কতটুকু

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরামর্শ: স্বাস্থ্যসেবায় খুব ব্যাপকভাবে এআইয়ের ব্যবহার বেড়েছে অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে– অনেক মানুষ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে চ্যাটজিপিটির মতো সাধারণ চ্যাটবটের সঙ্গে যুক্ত থাকছে। নিজের অসুস্থতার লক্ষণগুলো একটু সবিস্তারে প্রম্পট্ করলে ভালো পরামর্শই পাওয়া যাচ্ছে। উন্নত দেশে কিছু সাধারণ ওষুধ ছাড়া অন্যান্যগুলো ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেনা যায় না, কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অনেকেই নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারে এআইয়ের পরামর্শ অনুসরণ করে। এ পরামর্শ সর্বাধুনিক মেডিক্যাল বিজ্ঞানের

ভিত্তিতেই দেয়া হয়, এবং ব্যবহারকারীর পরিস্থিতিতে রোগ নিরাময়ের বা কষ্ট কমাবার ব্যবস্থা যা যা প্রাথমিক ও ঘরোয়াভাবে সম্ভব, তারই পরামর্শ দেয়া হয়। ঘরোয়া ওষুধ, দোকানে বিনা প্রেসক্রিপশনে কেনা যায় এমন ওষুধ, নিজের জীবনযাত্রার যে বিধি-নিষেধ মেনে চলা সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে, তা সাধারণ ব্যায়াম ও ফিজিওথেরাপি ইত্যাদির পরামর্শ সাধারণত দেয়া হয়।

কিন্তু পরামর্শ শুধু রুগী নিজে যা করতে পারবে, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রকৃত অবস্থা সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়ে দুশ্চিন্তাটি অনেকটা কমাতে পারে এই পরামর্শ। সহজ সমাধান না এলে কী করতে হবে, কী লক্ষণের দিকে লক্ষ্য রেখে কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তাও স্পষ্ট করে, সতর্ক করে বলে দেয়। দ্রুত ডাক্তার দেখাবার মত পরিস্থিতি দেখলে, কোন্ বিষয়ের ডাক্তার তা বলে দিয়ে যত শিগ্‌গির সম্ভব দেখাবার পরামর্শ দেয়। সবই স্থির করে ব্যবহারকারীর দেয়া তাঁর দেখা দেয়া অসুবিধার বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে। প্রয়োজনে চ্যাটবট প্রশ্ন করে আরো সুনির্দিষ্ট বর্ণনা জেনে নেয়। কেউ যদি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসাধীনও থাকেন, তবুও সে চিকিৎসার গতিপ্রকৃতি বুঝতে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঘরোয়া অভিজ্ঞ একজন দ্বিতীয় চিকিৎসকের মতো তাকে অবহিত রাখে। এআই অবশ্য সবসময় চিকিৎসকের নির্দেশমতই কাজ করতে বলে। সমস্যাটি সম্পর্কে সর্বশেষ জ্ঞান রাখলেও সে যে ডাক্তার নয়, সেটি সে অকপটে স্বীকার করে। শুধু বিশেষক্ষেত্রে যেখানে চিকিৎসক ও এআইয়ের মতামত উভয়ে মিলে যায় না তখন রুগী চিকিৎসকের কাছে আরো বিস্তারিত জানতে চাইতে পারেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে কিছু কিছু সমীক্ষা বলছে ডাক্তাররাও ঠিক একই কাজ করছেন। নিজের মতো করে রুগীর চিকিৎসা করার সময়েও তাঁদের অনেকে চ্যাটবটের মতামতের সঙ্গে সেটিকে মিলিয়ে দেখেন– গুরুত্বপূর্ণ কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য কোনো যুক্তি সে দিতে পারে কি না। আজকাল চ্যাটবটগুলো তাদের নিজেদের ট্রেনিঙে পাওয়া তথ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেকোনো নতুন সমস্যা এলে তারা এ সম্পর্কে সর্বশেষ ডাক্তারি সিদ্ধান্তগুলো ইন্টারনেট থেকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারছে। কাজেই যেকোনো ক্ষেত্রে তার মতামত মূল্যবান। কিন্তু রুগীর জন্যই হোক বা ডাক্তারের জন্যই হোক, এখন পর্যন্ত এ ধরনের পরামর্শ নেয়া হচ্ছে প্রধানত অনানুষ্ঠানিকভাবে।

এই পর্যায়ের পরামর্শ সাধারণ চ্যাটজিপিটি থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এর উন্নততর সংস্করণগুলো এ কাজে আরো দক্ষতা দেখাচ্ছে। এর বাইরে ক্লড, ড্যাক্স কোপাইলট

চিকিৎসাজগতের সঙ্গে একটু বিশেষভাবেই জড়িত। কিছু মডেল তৈরি হচ্ছে ডাক্তারকে সহায়তা দেয়ার জন্য বিশেষ ভাবে। তবে রুগীকে পরামর্শ দিতেও তারা বিন্দুমাত্র পিছপা নয়। অবশ্য চ্যাটজিপিটিই হোক কি বিশেষায়িত মডেলই হোক, রুগী যখন তা ব্যবহার করবেন, তখন তাঁকে এর একটি ঝুঁকির কথা মনে রাখতে হয়; সেটি হলো হ্যালুসিনেশনের ঝুঁকি। এর মানে মডেল সম্পূর্ণ ভুল তথ্য বা ভুল পরামর্শ হঠাৎ কখনো একেবারে সত্যের মতো করেই দিতে পারে। একমাত্র বিশেষ মনোযোগ দেয়া, পরামর্শের বিসদৃশতা লক্ষ করা, এবং ঘনঘন বিকল্প তথ্য-উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাই রুগীর জন্য এই ঝুঁকি কমাতে পারে। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে এসব সতর্কতা অবলম্বন দরকার।

স্বাস্থ্য বিষয়ে অন্য এমন কোনো ক্ষেত্র, যেখানে ভুলের মাশুল খুব বেশি দিতে হয়, সেখানেও এআইয়ের ওপর আর ভরসা না করে মানুষ বিশেষজ্ঞের ওপর নির্ভর করা উচিত। এর একটি উদাহরণ দেয়া যায় খাওয়ার জন্য বন্য মাশরুম তোলার কাজে অভিজ্ঞ মানুষের বদলে এআই ব্যবহার করে নিরাপদ ও বিষাক্ত মাশরুমের মধ্যে পার্থক্য করা বিপজ্জনক হতে পারে। বিষাক্ত মাশরুম চেনার কিছু কিছু চিহ্ন মাশরুমের এমন সব জায়গায় সূক্ষ্মভাবে থাকে যে, অভিজ্ঞ মানুষ সরাসরি চোখে দেখে নিশ্চিত চিনতে পারলেও এআই যেভাবে বিষাক্ত মাশরুম তার ফটো থেকে শনাক্ত করে তাতে ঝুঁকি থেকে যায়।

হাসপাতালে-ক্লিনিকে ব্যবহার: আনুষ্ঠানিকভাবে চোখে পড়ার মতো করে হাসপাতালে ক্লিনিকে এআইয়ের সরাসরি চিকিৎসা কাজে ব্যবহার কম হচ্ছে এখনো। তবে এখন ব্যাপারটি মনে হয় বড় রকমের একটি লাফ দেবার অপেক্ষায় রয়েছে। যে দিকটিতে এআই ব্যবহার অনেকটা এগিয়ে গেছে সেটি হলো হাসপাতালে আর ডাক্তারের চেম্বারে রুগী ব্যবস্থাপনায় ভাষাভিত্তিক এলএলএমের ব্যবহার। এটি চিকিৎসাকে সাহায্য করছে কিছুটা পরোক্ষভাবে। রুগীর বর্ণনা শুনে আসল তথ্যগুলো উদ্ঘাটন করতে, সেগুলো লিখতে, রোগ সংক্রান্ত নোট তৈরি করতে, ব্যবস্থাপত্র দিতে ও বুঝিয়ে দিতে ডাক্তার ও নার্সদের অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয়। এখন তাঁরা এসব দায়িত্ব এলএলএমের হাত ছেড়ে দিয়ে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার কাজে বেশি সময় দিতে পারছেন। উন্নত দেশে হাসপাতালগুলোতে এদিকটি দ্রুত এগুচ্ছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে বিষয়টিতে এআই ডাক্তারকে দারুণ সহযোগিতা এখনই দিচ্ছে তা হলো রুগীর রোগটা নিয়ে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে। তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে রুগীর সম্ভাব্য রোগটি, অন্য সব ভুক্তভোগীর কেইস স্টোরি, মোটের ওপর

চিকিৎসায় সাফল্য-ব্যর্থতা এসব নিয়ে বিশ্বময় তথ্য খুঁজে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে দিতে পারবে এআই কয়েক মিনিটের মধ্যে। ডাক্তার যদি কোনোটির আরো বিস্তারিত জানতে চান, তার জন্য সে প্রত্যেকটির লিংক দিয়ে দিচ্ছে। যেমন একটি উদাহরণে ডাক্তার তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলছেন: 'সদ্য জন্ম নেয়া বাচ্চাটির জননেন্দ্রিয় দেখে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। শিশুর বাবা মাকে কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না। জিপিটি-৪ কে জিজ্ঞাসা করলাম যতটা পারি বিষয়টির বর্ণনা দিয়ে। সে খুব বন্ধুসুলভ সাড়া দিলো। সম্ভাব্য জেনেটিক কারণ, এর পেছনে সম্ভাব্য বায়ো-ক্যামিক্যাল পথ-রেখাগুলো কী হতে পারে তার একটি ধারণা দিলো। এক্ষেত্রে আমার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ কী নিলে সবচেয়ে ভাল হয় তারও একটি পরামর্শ দিলো। তাতে এই দ্বিধার মুখে আমি একটি পথ পেলাম, কারণ ঠিক এমনটি আমার চোখে কখনো পড়েনি, কিছুই জানা ছিল না, এ সম্পর্কে কোনো ক্রস-রেফারেন্সও আমার হাতে ছিল না। অবাক কাণ্ড যখন জিজ্ঞেস করলাম শিশুর বাবা মাকে কী বলবো– তারো সুন্দর সমাধান জিপিটি দিয়ে দিলো।'

যদিও এক্সরে, এমআরআই ইত্যাদি ইমেজ থেকে সূক্ষ্ম তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে এলএলএমের পারদর্শিতা খুব বেশি, তবুও কাজটি কিন্তু এখনো সাধারণভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররাই করছেন। ব্যতিক্রমী যেই কিছু ক্ষেত্রে সেরকম ডাক্তারের সংখ্যা রুগীর তুলনায় অনেক কম, সেখানে ইমেজ পরীক্ষায় এআইয়ের সহায়তা নেয়া হচ্ছে– যেমন ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেল্‌থ সার্ভিসে। এজন্য খুব ভালো এআই মডেল সেখানে তৈরি হয়েছে। এগুলো বাস্তব ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। যেমন অনেক রুগীর এক্সরে যেখানে আসছে সবগুলোকে সমান গুরুত্ব দেয়া হচ্ছেনা– শুরুতে দ্রুত এক রকম বাছাই (স্ক্রীনিং) করে ফেলে এআই জরুরি ভিত্তিতে বেশি খারাপ ইমেজে বিশেষ মনোযোগ দেবার ব্যবস্থা করে।

সরাসরি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাক্ষেত্রে এআইয়ের ব্যবহারকে যদি নানা দেশের প্রেক্ষিতে দেখি, তাহলে তাকে মোটাদাগে চিকিৎসকদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক দল এআইয়ের কোনো ব্যবহার করেন না। দ্বিতীয় আরেক দল চিকিৎসা নিজেই করেন, কিন্তু এআইয়ের সহায়তা নেন। তৃতীয় দলটি পুরো চিকিৎসার ভার এআইকেই দেন। এই তিন দলের ওপর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যাঁরা এআই একেবারে ব্যবহার করেন না তাঁদের চিকিৎসা সাফল্য ৭৪%। সে তুলনায় যাঁরা আংশিক এআই ব্যবহার করেন তাঁদের সাফল্য সামান্য বেশি ৭৬%। খুব সম্ভব এই আংশিকটিতে এআই একেবারে কম ব্যবহার হয় বলেই তারতম্যটি এখনো তেমন

চোখে পড়ছে না। কিন্তু উন্নয়নের প্রবণতাটি স্পষ্ট। সমীক্ষায় যে ফলটি অদ্ভুত, সেটি হলো নিজে চিকিৎসার চেষ্টা না করে যাঁরা এআইকেই পুরো দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন তাঁদের চিকিৎসা সাফল্য ৯০%! হয়তো বা সেই সবক্ষেত্রেই চিকিৎসক নিজে না করে এআইকে চিকিৎসা করতে দিয়েছেন, যেই ক্ষেত্রগুলো সত্যিই অপেক্ষাকৃত অজানা, জটিল– এআইয়ের পক্ষেই একটি সম্ভাব্য পূর্বাভাস খুঁজে নিয়ে সফল হবার সুযোগ বেশি ছিল। চিকিৎসা পুরাপুরি এআই দিয়ে সেরেছে এমন দলের সদস্য সংখ্যাও অবশ্য অন্য দুই দলের তুলনায় অনেক কম। সে যাই হোক, এআই যে চিকিৎসা করতে পারে এটি প্রমাণিত। তারপরও এআইয়ের পরামর্শমত চিকিৎসা করেন এমন ডাক্তারের সংখ্যা এখনো সীমিত।

চিকিৎসার বিঘ্ন সরাতেও কাজ করছেঃ চিকিৎসা করতে গিয়ে বিঘ্ন বহু রকমে ঘটতে পারে। যেমন উদাহরণস্বরূপ রুগীর শরীরে ক্ষত সারাবার ব্যবস্থাপনায় কিছু সমস্যার কথা দেখা যাক! ক্ষতটি কী হারে শুকাচ্ছে তা একেবারে ক্ষতের মাপজোখ নিয়ে পরিমাণগতভাবে নির্ণয় করেন নার্স। এজন্য তিনি দৈর্ঘ্য মাপার একটি টেইপ দিয়ে প্রত্যেকবার এটি মাপেন এবং তারপর আবার ব্যান্ডেজ করে দেন। ওষুধ ইত্যাদি দিতে হলে তিনি নিজেই ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অনেক সময় ক্ষত জটিল হলে তিনি ওষুধ, ড্রেসিং ইত্যাদি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে দ্বিধায় পড়েন বলে ক্ষতের একটি ফটো তুলে নিয়ে তা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেন পরামর্শের জন্য। ফটোতে সমস্যাটি ধরতে না পারলে ডাক্তারকে রুগীর কাছে এসে নিজের চোখে দেখতে হয়– নিজের মূল্যবান সময় দিতে হয়। এখন এমন এলএলএম ডিজিট্যাল টুল্‌ রয়েছে যা ক্ষতের রং, এর টিশ্যু নষ্ট হবার প্রকৃতি ইত্যাদি সাধারণ স্মার্টফোনে তোলা তিন মিনিটের একটি ভিডিও থেকে চিহ্নিত করে ফেল্‌তে পারে। এটি করে এআই চিকিৎসাবিদ্যার নিরিখে ক্ষতের অবস্থা, টাইপ, এবং করণীয় নিয়ে একটি স্পষ্ট পরামর্শ নার্সকে সাধারণ ভাষায় দিয়ে দিতে পারে– ডাক্তারকে জড়াবার কোনো দরকারই হয় না।

আরেক ধরনের বিঘ্নের উদাহরণ দেয়া যাক, স্বয়ং রুগীদেরই সৃষ্ট বিঘ্ন। বেশি বয়সে একটি সময়ে এসে সব মানুষেরই চোখে ছানি পড়ে, তাঁর দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে যায়, অপারেশন করতে হয়। দেখা যায় যে অনেক রুগী ব্যাপারটি নিয়ে নির্লিপ্ত থাকেন– বিশেষ করে অতি-প্রবীণরা। দেখতে অসুবিধা হবার কারণে হয়তো অনেকে হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে আসেন। তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে অপারেশনের কিছু আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আবার আসার একটি তারিখ দেয়া হয়। ব্রিটেনের ন্যাশনাল

হেলথ সার্ভিসের এক শাখার সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৩০% থেকে ৫০% রুগী ওই তারিখে আসেন্ না। ফলে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় রকমের বিঘ্ন ঘটে। অন্যদিকে যাঁরা অপারেশনটি করালেন তাঁদেরকে চার সপ্তাহ পরে একটি তারিখ দিয়ে আবার আসতে বলা হয় অপারেশনে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে। এক্ষেত্রেও দেখা যায় বড় একটি সংখ্যক রুগী সময়মত আসেন না।

এই সমস্যাগুলোকে অতিক্রম করার জন্য লন্ডনের চেল্‌সি-ওয়েস্ট মিনিস্টার এলাকায় কাজ করে এমন একটি চিকিৎসা-ট্রাস্ট ডোরা নামের একটি বিশেষ চ্যাটবট তৈরি করিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। ডোরা অপারেশনের পূর্বের রুগীদের প্রত্যেককে টেলিফোন করে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বলে কয়েকটি সহজ টেস্ট রুগীকে নিজে নিজে করতে দিয়েই করিয়ে নেয় (প্রধানত কী পরিস্থিতিতে কীরকম দেখছেন তা জিজ্ঞেস করে)। রুগীকে অপারেশনের আগে আর আসতে হয় না। অপারেশনের দিন ডোরা ফোন করে রুগীকে মনে করিয়ে দেয়। আবার অপারেশনের চার সপ্তাহ পর ডোরা রুগীকে ফোন করে আবার আসার কথা মনে করিয়ে দেয়। যদি তারপরও না আসেন তাহলে ডোরাই ফোন করে চোখের অবস্থা জেনে নেয়। অসুবিধা থাকলে রুগী তখন জানাতে পারেন, বা পরেও যেকোনো সময় ডোরাকে ফোন করে জানাতে পারেন। খুব খারাপ কিছু মনে হলে তবেই ডোরা রুগীকে অবশ্যই আসার জন্য সতর্ক করে, নইলে নয়। বছর খানেক ডোরা তার কর্তব্য করার পর দেখা যাচ্ছে ৯১% ক্ষেত্রে ডোরা টেলিফোনে যা করেছে তা একেবারে সঠিক করেছে; ডাক্তারও এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারতেন না।

ব্যবহারে ধীরগতি কেন: গত কয়েক বছর ধরে সাধারণ ভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে শতকরা কতগুলো হাসপাতাল এআই নিয়মিত ব্যবহার করছে তার হার লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়েছে। ২০২৩ সালে এটি ছিল ৩৮%, ২০২৪ এ ৪৩%, ২০২৫ এ এসে দাঁড়িয়েছে ৬৪%। তবে এই একই সমীক্ষাই বলে দিচ্ছে যে এই বৃদ্ধিটি প্রধানত ঘটেছে চিকিৎসার ব্যবস্থাপনায়, সরাসরি রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসাদানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির গতি ধীর। এই ধীরগতির পেছনে যে কারণগুলো মুখ্য হয়ে উঠেছে, তা হলো এখনো এইক্ষেত্রে চিকিৎসক মহলে এআইয়ের ওপর আস্থার অভাব। সেই সঙ্গে অনেকের কাছে নৈতিক অবস্থানেও চিকিৎসাটি যন্ত্রের হাতে ছেড়ে দেয়াটি সঙ্গত মনে হয় না। এই দুটি মিলে চিকিৎসাব্যবস্থা যাঁরা গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে এআই ব্যবহারে এখনো কিছুটা অনীহা লক্ষ করা যায়।

আস্থা কম হবার একটি প্রধান কারণ এলএলএমের হ্যালুসিনেশন প্রবণতা। এর কারণে এআই রোগ নির্ণয়ে ভুল পরামর্শ দিতে পারে। এটি বেশি ঘটে যখন রুগীর লক্ষণে বিরল প্রকৃতির কিছু থাকে, যা মডেলের তথ্যভান্ডারে থাকা তথ্যের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। কিন্তু এলএলএমের প্রকৃতিটিই এমন যে তার যে, ফলাফল পেতে বেগ পেতে হচ্ছে, তা না জানিয়ে সে যেনতেন একটি ফল দিয়ে দেয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রেই হোক বা গবেষণামূলক অন্য যেকোনো কিছুই হোক যেখানে সবকিছু সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় সেখানে মডেল নিখুঁত ফল দেয়, কিন্তু যেখানে নানা রকম মিশ্র অবস্থা সম্ভব, তখন তার সম্ভাবনা-নির্ভর সক্ষমতাগুলো হেরে যেতে পারে। যদিও হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা মডেলের এই হ্যালুসিনেশনগুলো ধরে ফেলতে পারার কথা, তবুও ভুল করে ফেলার মূল্য দেয়াটি এত বেশি যে, তাঁরা 'সাবধানের মার নেই নীতি' অনুসরণ করেন, এআইকে দূরে রাখেন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে হাসপাতাল যে আরো এক ধরনের বিড়ম্বনায় এআইয়ের কারণে পড়ে যান সেটি নিয়ে আজকাল খুব আলোচনা হচ্ছে। এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে বর্ণ-বৈষম্য ও লিঙ্গ-বৈষম্যের অভিযোগ সমাজের সর্বস্তরে। তবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি প্রকট হয় অর্থবিত্ত এবং প্রভাব যাদের কম তাদের চিকিৎসা লাভের সুযোগ কম বলে। উন্নত বেশির ভাগ দেশে চিকিৎসার কিছুটা সর্বজনীন সুযোগের ব্যবস্থা সরকার করে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সে ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। বরং পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। বিষয়টি যেখানে প্রচুর অসন্তোষ ও সংবেদনশীল প্রধানত সমালোচনার জন্ম দেয়। এই বৈষেম্যের একটি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিকিৎসা সংক্রান্ত এআই তথ্যভান্ডারের মধ্যেও বৈষম্যটি ঢুকে গেছে। কারণ হাসপাতাল সমূহের তথ্যই ওই তথ্যভান্ডারে যায়– সেখানে গায়ের রং সাদা নয় এমন মানুষের উপস্থিতি তুলনামূলক ভাবে কম, তেমনি নারীদের উপস্থিতিও, আর উভ-লিঙ্গ মানুষরা তো বলতে গেলে একেবারেই অনুপস্থিত। অথচ জাতিসত্ত্বার আর লিঙ্গের জেনেটিক্সের কারণে ওই অনুপস্থিত মানুষদের শারীরবৃত্তের কিছু কিছু জিনিস যেমন বিশেষ বিশেষ রোগে আধিক্য, প্রতিরোধ ক্ষমতা, বিশেষ ওষুধে কাজ করা ইত্যাদিতে পার্থক্য রয়েছে। অথচ এই মানুষগুলোর তথ্য সংগৃহীত তথ্যভান্ডারে অনেক কম থাকাতে এআই পার্থক্যগুলো ঠিকভাবে বিবেচনায় আনতে পারে না। এখন তাঁদের চিকিৎসায় এআই ব্যবহৃত হলে কখনো কখনো তাতে ভুল আসবে। সেটি অবশ্য কখন হচ্ছে কখন হচ্ছে না বোঝা যাবে না, অনেক ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে আসবে, ফলে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন এআইয়ের কারণেই।

এই যে পক্ষপাতমূলক ফল এআই দিতে পারে, এটিও একটি বড় দুশ্চিন্তা। এখানে এক বৈষম্য অন্য বৈষম্যের সৃষ্টি করছে। মূল বৈষম্যটি অর্থাৎ সবার সমানভাবে হাসপাতালে আসতে ও চিকিৎসা নিতে না পারার বৈষম্যটি যতদিন দূর না হবে, ততদিন দ্বিতীয়টি থেকেও মুক্তি নেই– অর্থাৎ ওই বৈষম্যের ভুক্তভোগীদের চিকিৎসায় এআই ভুল করবে।

এআইকে যে মেডিক্যাল জগতে কিছুটা অনির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয় তার আরো একটি মৌলিক কারণ আছে। এতে নিউরাল নেটওয়ার্ক যেভাবে কাজ হয়, তা অনেকটা একটি 'কালো বাক্সের' মতো, ভেতরে ঠিক কী হচ্ছে তা জানা যায় না। এলএলএমের গভীর নিউরাল নেটওয়ার্কের জন্য কথাটি আরো বেশি প্রযোজ্য। এতে নিউরোনের সংখ্যা এত বেশি এবং এত সম্ভাবনাভিত্তিক যে তাদের প্রত্যেকটির কাজকে অনুসরণ করা অসম্ভব। এমনকি এর অ্যালগরিদম যিনি লিখেছেন, তিনিও বলতে পারবেন না ঠিক কোথায় কী হচ্ছে। মেডিক্যাল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সবাই যন্ত্রের থেকে আরো বেশি স্বচ্ছতা আশা করে, যাতে তার প্রতিটি কাজ অনুসরণ করে তার সিদ্ধান্তের ওপর জেনে শুনে আস্থা রাখা যায়।

নৈতিক বিষয়গুলোও এআইয়ের পিছু ছাড়ছে না, এটি রুগীর গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রেও। রুগীর তথ্য গোপন রাখতে হবে এটি চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি বড় নীতি। এই নীতি আজকে সৃষ্টি হয়নি– আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিসের প্রবর্তিত মেডিক্যাল ছাত্রদের শপথের অংশ ছিল এটি, যে শপথ আজো তারা নেয়। অথচ এআই প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে অসংখ্য রুগীদের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। তাতে অসুবিধা ছিল না যদি মাঝপথে ওই তথ্য বেহাত হয়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ না থাকতো। যেমন ধরা যাক দূরে ক্লাউড সার্ভিসে সংরক্ষিত এআই তথ্যভান্ডারের থাকা কোনো মেডিক্যাল নোট হাসপাতালে ডাক্তার এআই মডেলের মাধ্যমে ব্যবহার করছেন। মাঝপথে আড়ি পেতে থাকা কোনো হ্যাকার সেই নোট ও তার তথ্য উৎস বের করে ফেল্‌লো। তার ফলে যে রুগীর কাছ থেকে ওই মেডিক্যাল নোট এসেছিল, তার তথ্য ব্যবসায়িক কাজে কোথাও ব্যবহৃত হতে পারে। এটি ব্যক্তিগত তথ্য গোপনীয়তারই বরখেলাপ, মেডিক্যাল গোপনীয়তার নীতিরতো বটেই। এমনটি খুবই সম্ভব বলে মডেল উদ্ভাবক ও ব্যবহারকারী সবাইকে খুব সতর্ক থাকতে হয়। অবশ্য মডেলের মধ্যেই এর প্রতিকার রাখা সম্ভব।

ব্যবসায় এআই এজেন্ট নিয়ে সতর্ক উৎসাহ

২০২৫ এ সবার মুখে মুখেঃ শুধু ব্যবসায়িক কোম্পানি নয়, যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নিজে সময় ও জনবল না দিয়ে এআই এজেন্টের হাতে পুরো কাজটি এখন

ছেড়ে দিতে পারছে। পুরো কাজ, তারই স্বাধীনভাবে করা কাজ এই কথাগুলোর ওপরেই জোর দেয়া হচ্ছে, যখনই এআই এজেন্টের কথা উঠ্ছে। আমরা অ্যাপেল কোম্পানির সিরির সক্ষমতাটি দেখেছি– তার কার্যপদ্ধতি এতটাই ব্যাপক যে, এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে সে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু এই ২০২৫ সালের নিচের দৃশ্যপটটি সিরিই সফল করেছে। একজন ব্যবহারকারীর জবানিতে সেটি আমরা দেখি:

'সিরিকে বল্লাম মা বিমানে আছেন তাঁর ফ্লাইট কখন ল্যান্ড করবে তা জেনে নিয়ে সুবিধাজনক একটি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের রিজারভেশন করো, মা আর আমার। এয়ারপোর্টে নামলে মাকে উবার ট্যাক্সি ডেকে দেবে ওটি যেন সোজা তাঁকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়। মাকে জানিয়ে রেখো সবকিছু, লাঞ্চে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে তাও।' বোঝা যাচ্ছে যেমন ছেলে ব্যস্ত মানুষ, মাও ব্যস্ত মানুষ। উভয়ের আপাতত দেখা হবে রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খেতে খেতে। কিন্তু সিরি কীভাবে সবকিছুর বন্দোবস্ত করলো, এআই এজেন্ট হিসেবে? যেটুকু প্রম্প্‌ট ছেলে তাকে করেছে, তাতে খুব বেশি তথ্য দেয়া হয়নি। সিরিই বরং মায়ে ছেলের সাম্প্রতিক ইমেইল চালাচালি থেকে ফ্লাইট নম্বর নিয়ে ফ্লাইট ট্র্যাকিং সার্ভিসে চেক করে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় বিমানের অবতরণ সময় বের করে ফেলেছে। মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এয়ারপোর্টে অর্ডার করা ট্যাক্সিটি থামার জায়গাটি ও লাঞ্চে যাবার পুরো পরিকল্পনা বলে দিয়েছে। ওদিকে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ভালো রেস্টুরেন্ট খুঁজে নিয়ে রিজারভেশনও দিয়ে রেখেছে। এজন্য সে ওই এলাকার রেস্টুরেন্টগুলোর ওয়েবসাইট ও রিজারভেশন ডায়ালগ বক্স ব্যবহার করেছে। এখন তাই এ জাতীয় কাজের জন্য সিরির ওপর ভরসা করা যায়। অবশ্য ব্যবসায়িক এজেন্টিক সিস্টেমগুলো যা করছে, তার তুলনায় তো এই কাজ নস্যি।

এআই এজেন্ট এখন ব্যবসায় প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে কোম্পানির মানুষ-কর্মচারীরা যে একেবারে সব কাজ এজেন্টের ওপর ছেড়ে দিতে পারছে, সেরকম নয়। মানুষকে এর পেছনে নজর রাখতে হচ্ছে। বলা যায় অনেক সাদামাটা কাজ যাতে প্রচুর সময় ব্যয় হতো তা এজেন্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে মানুষ-কর্মচারীরা শুধু এজেন্টের ওপর নজর রাখতেই নিজকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারছে। এভাবে এজেন্ট ভালোই কাজ করছে। তবে মাত্র গত এক বছরে গড়ে ওঠা এই এজেন্টিক সিস্টেমের প্রতিটি উল্লম্ফনের পেছনে কিছু কিছু সমস্যাও ধরা পড়ছে, যেগুলোর সমাধান করতে এখন এজেন্টের পেছনের প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে যথেষ্ট

কাজ করতে হচ্ছে। বড় কোম্পানিগুলোর বড় ও ব্যাপক কাজের এজেন্ট তৈরিতেই সমস্যা বেশি। তবে ওপেন সোর্স পদ্ধতিতে সবার জন্য উন্মুক্ত নিজের নিজের মতো এজেন্ট গড়ে নেবার সুবিধা নিয়ে ছোটরাও এআই এজেন্ট দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। একজন ছোট উদ্যোক্তা আগে কয়েকজন মাত্র সহকর্মী নিয়ে যতটা না ব্যবসা করতে পারতেন এখন তিনি ওপেন সোর্স এজেন্টকে নিজের মত কাজে লাগিয়ে আরো বড় পরিসরে ব্যবসা করতে পারছেন। বড় ছোট সব এআই এজেন্ট এখন বিচিত্র কাজ করে ব্যবহারকারীর দেয়া উদ্দেশ্যটি পূরণ করতে পারছে– বিপণন থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত সবকিছু করতে গিয়ে যেসব সমস্যার মুখোমুখি এগুলো হচ্ছে তার কিছু দেখা যাক।

যেখানে এজেন্ট বিভ্রান্ত: এজেন্টের কাজে কিছু কিছু ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে, যার একটি প্রধান কারণ হলো একে কাজ করতে হচ্ছে মানুষের মতো অথচ মানুষের মতো সহজ কাণ্ডজ্ঞানটি তার নেই। যতদিন এআইকে শুধু পূর্বাভাস দিতে হয়েছে, অথবা শুধু নির্দেশমত কিছু সৃষ্টি করে দিতে হয়েছে, ততদিন তার কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি, তার কাণ্ডজ্ঞান তেমন দরকারও হয়নি। কিন্তু যখন সে উন্মুক্ত জগতে নানা জনের অফিসে, অন্য মানুষের অন্য কোম্পানির এবং অন্য এজেন্টের মুখোমুখি হচ্ছে, তখন তার কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটি বেশ সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। ছোট পরিসরেই বরং এ অভাবটি দেখা যাক। একটি এআই ট্রাভেল এজেন্টকে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে দেয়া হয়েছে। তাতে দুই একদিনে নতুন শহরের যতটা দেখা যায় সেটিই উদ্দেশ্য হিসেবে তাকে বলা। দেখা গেলো ১০ ঘণ্টা বিমান ভ্রমণ করে আগের রাত তিনটায় যে শহরে পৌঁছলাম, এজেন্ট সে শহরের প্রথম দর্শনীয় জায়গায় নিয়ে যেতে চাইলো ভোর ছয়টায়– ওখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট। ভাবলোনা না ঘুমিয়ে ওই অবস্থায় কতখানি উপভোগ করতে পারবো। অথবা অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে কোম্পানির কাস্টমার তালিকা থেকে কোন একজন কাস্টমারের নামটি মুছে বাদ দিতে বলা হয়েছিল। দেখা গেলো নামের দীর্ঘ তালিকায় ওই নামে যতজনকে সে পেয়েছে সবার নাম ওখান থেকে মুছে ফেলেছে। এজেন্ট মানুষ হলে নির্দেশ খুব স্পষ্ট না হলেও সে কখনো এমন কাজ করতো না– তার কাণ্ডজ্ঞান বাধ সাধতো বলে।

একটি সরল অথচ বাজে খরচের ভুল যা এআই এজেন্টগুলো প্রায়ই করছে তা হলো দরকারি কাজটি করতে গিয়ে অনেকগুলো বেদরকারি কাজ করে ফেলা। এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে এমন এজেন্টের ৮০% পর্যন্ত কাজ বেদরকারির পর্যায়ে পড়ে যেতে পারে। এর কিছু কিছু ঘটে সব তথ্যকে সমান গুরুত্ব দেবার কারণে। যখন এটি

তথ্য সংগ্রহ করে তার মধ্যে বহু তথ্য চলে আসে, যা এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়– সেগুলো নিয়ে কাজ না করারই কথা। কিন্তু এআই এজেন্ট এসব অপ্রয়োজনীয়, অসম্ভব, অনুচিত তথ্য নিয়ে কাজ করে সময় ও সম্পদের বাজে খরচ করতে পারে। ফলে অনেক সময় যে ব্যয় সাশ্রয় করতে এজেন্ট নিয়োগ করা তার বদলে বরং ব্যয় বেড়ে যায়। না বুঝে শুধু বাজে খরচই নয়, সংবেদনশীল তথ্যের ক্ষেত্রে সঠিক গুরুত্ব না দেয়ার কারণে আরো বড় ক্ষতির সম্মুখীন করে দিতে পারে এজেন্ট। কাজ করাতে গিয়ে অনেক সময় এজেন্টকে সংবেদনশীল তথ্যে প্রবেশাধিকার না দিয়ে উপায় থাকেনা, যেমন সুরক্ষিত কোন ওয়েবসাইটে কিংবা ব্যক্তিগত ইমেইলের ইনবক্সে। কিন্তু ওত পেতে থাকা হ্যাকাররা যারা ওসব জায়গায় ঢুকতে চায়, ওই তথ্য হাতে পেয়ে ক্ষতি করার জন্য, তারা ওই এজেন্টকে তার সহজ টার্গেটে পরিণত করতে চায়। তারা জানে যে এআই এজেন্টের কার্যপ্রণালিকে সহজে প্রভাবিত করা যায়। যেমন এজেন্টের এলএলএমের মেমোরিতে ঢুকে পড়াটি সুরক্ষিত একটি কম্পিউটারে ঢোকার থেকে সহজতর। এর কারণ নানা কাজ করার সুবিধা দিতে গিয়ে এজেন্টের নির্মাণটাই হয় একটু ঢিলেঢালা প্রকৃতির। ফলে এজেন্টের মেমোরির থেকেই মূল্যবান তথ্যগুলো হাতিয়ে নেয়া সম্ভব।

এআই এজেন্টের মূল চালিকা নির্দেশ আসে ব্যবহারকারীর দেয়া মূল প্রম্প্‌ট থেকে। কিন্তু এজেন্টের ব্যবহার করা এটিই একমাত্র লিপি নাও হতে পারে। কাজ করতে গিয়ে তাকে বাইরে থেকেও লিপি, ছবি, ভিডিও এসব আনতে হয়। অনেক সময় এগুলোর সঙ্গে এজেন্ট মূল প্রম্প্‌টের লিপিকে গুলিয়ে ফেলতে পারে, ফলে নির্দেশ বুঝতে ভুল করে ফেলে। তাছাড়া হ্যাকাররা বাইরে থেকে এমন লিপি বা ইমেজ দিতে পারে যার ভেতর ক্ষতিকর অংশ লুকানো থাকে। মানুষ-কর্মী যখন এরকম কিছু তার কম্পিউটারে দেখে ওটির বিসদৃশ ভাব দেখেই বুঝতে পারে, কিন্তু এআই এজেন্ট তা পারে না। অন্য সবকিছুর মতো এটিও এআই প্রসেস করে ফেলে ঠিক যা হ্যাকারটি চেয়েছিল– এজেন্টের কাজে গোলমাল লাগিয়ে দিতে। উন্মুক্ত ব্যবসায়িক প্রাঙ্গণে কাজ করতে গিয়ে এআই এজেন্টের এসব ঝুঁকি থেকে যায় বৈকি।

অন্যের সম্মুখীন হয়ে কাজ করতে গিয়ে তার কর্মধারার মধ্যে জট লেগে যেতে পারে, যা তার জন্য বড় দীর্ঘসূত্রিতার কারণ ঘটিয়ে দিতে পারে। যেমন ধরা যাক চুক্তি সম্পাদনের আগে অন্যের সঙ্গে সে দরকষাকষি করছে। এটি বারবার করতে গিয়ে মডেলের সীমাবদ্ধতার জন্য সে বারবার ঘুরে আসার মতো একটি লুপে পড়ে যেতে পারে। খুব সাবধানে মডেল ডিজাইন না করলে এমন হবার ঝুঁকি থেকেই

যায়। ছোট কোম্পানির নিজের এজেন্ট নিজে তৈরি করার ক্ষেত্রে সুলভে করতে হয় বলে তার এই ঝুঁকি বেশি থাকে। এর ফলে বড়ছোট কোম্পানির সাফল্যের বৈষম্যটি কমার পরিবর্তে বরং আরো প্রকট হয়। বেশি বিনিয়োগ করলে মডেলের মধ্যে ওয়েবসাইট তথ্য ইত্যাদিকে নিরাপদ কি না যাচাই করার জন্য এতে ফিল্টাররূপী হাতিয়ারও সংযুক্ত করা যায়। এমনকি এক এজেন্টকে নিরাপদ রাখার জন্য তার ওপর নজরদারি করতে আরেকটি এজেন্ট রাখা যায়। এরা পরস্পরের ওপর নজর রাখে– আবার দুইয়ে মিলে একই কাজ করে। প্রয়োজনে একের ভুল অন্যে সংশোধন করে দেয়। অবশ্য এর সবেই খরচ প্রচুর বাড়ে যা বড় কোম্পানিরাই পোষাতে পারে বড় ব্যবসাতে সহায়তা দিয়ে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা: এক বছর সময় কম হলেও এর মধ্যে প্রচুর উন্নয়ন ও ব্যবহারের ফলে এআই এজেন্টের ঘরে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা জমা হয়েছে, সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের থেকে বেশ কিছু পরামর্শও। জিনিসটি এতই অভিনব ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে এতটাই বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে যে, এর সমস্যাগুলোকে অতিক্রম করার দ্রুত একটি গাইড লাইন পেতে সবাই এখন উদ্‌গ্রীব।

মানুষ যখন অন্য কারো হাতে নিজের কাজের দায়িত্বটি দিয়ে দেয়, তখন তার পেছনে আশা থাকে যে কাজটি মসৃণ ভাবে সম্পন্ন হবে। কাজেই এআই এজেন্টকে তখনই সে কোনো কাজের দায়িত্ব দেবে, যখন নিশ্চিত হবে যে এই যন্ত্রও কর্মপ্রবাহকে মসৃণ রাখতে পারবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে এই কর্মপ্রবাহ বাইরের কাজগুলো করতে গিয়ে প্রায়ই হোঁচট খাচ্ছে। এআই এজেন্টের একটি বড় সুবিধা হলো সে কোনো বিশেষ কম্পিউটার প্রোগ্রাম, বিশেষ মেশিন লার্নিং বা বিশেষ এলএলএমের ওপর কেন্দ্রীভূত থাকে না, বরং এর কাজ চলে এই সবকিছুরই সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। এখানে সব থেকে বেশি জোর দিতে হয় সবগুলো মিলে যে কর্মপ্রবাহ, তাতে যেন একটি নিখুঁত ঐকতানে পরস্পরের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্ক থাকে। আমরা দেখেছি এমনি ঐকতান বজায় রাখার জন্য থাকে একটি অর্কেস্ট্রেটর যা কিনা আলাদা একটি সফটওয়্যার। তাই বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন এই অর্কেস্ট্রেটরের ওপর। সেটিই নিশ্চিত করতে পারে ঐকতানে বেসুরো কিছু এসে এআই এজেন্ট যেন হোঁচট না খায়।

এজেন্টিক এআই আসার উন্মাদনায় ব্যবসায়িক কাজের নানা ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহারের চেষ্টা চলেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বল্‌ছে চোখ বন্ধ করে যেকোনো কাজে এজেন্ট নিয়োগটি বুদ্ধিমানের কাজ নয়। করণীয় কাজকে স্বয়ংক্রিভাবে যন্ত্র দিয়ে

করানোটি নতুনও নয়, আর তা একমাত্র এআই এজেন্ট ছাড়া আর কিছু করতে পারে না এমনও নয়। যেমন কম্পিউটারে সঠিক প্রোগ্রাম লিখে দিলে সেটিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেক কাজ করতে পারে। এমনকি মানুষকে চাঁদে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাবতীয় কিছু যন্ত্র পরিচালনার কাজ এভাবে কম্পিউটারই সম্পন্ন করেছে– এআই আসার অনেক আগে। তেমনি সাধারণ মেশিন লার্নিংভিত্তিক এআই চালকবিহীন গাড়ি চমৎকার চালাতে পারছে ব্যস্ত নগরের রাস্তায়। এলএলএমকে সঠিক ভাবে প্রম্প্ট করেও তো এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় কাজ পাই বিচার-বিশ্লেষণ করে কিছু লিখে দেয়া বা এঁকে দেয়ার মতো। এই এলএলএম এআই, কিন্তু এজেন্ট নয়। কাজেই ব্যবসার সব কাজে এআই এজেন্ট উপযুক্ত নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিকল্পের কথা ভাবতে হবে, যেখানে এজেন্টের সমস্যাগুলো নেই।

কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে অথবা এলএলএম দিয়ে কাজ চলে এমন ক্ষেত্রে এজেন্টের জটিলতার মধ্যে যাওয়া উচিত হবে না। এজেন্ট শুধু খরচ বাড়াবে এবং বাড়তি সমস্যা ডেকে আনতে পারে। এ বিষয়ে মোটা দাগে যে নিয়মটি অনুসরণের কথা বলা হচ্ছে তা হলো যেসব কাজে বৈচিত্র্য কম, কিছুটা গৎবাঁধা, সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যাশিত– সেখানে এজেন্টের প্রয়োজন নেই। ওখানে এমন একটি সুনির্দিষ্ট খাতে কর্মপ্রবাহ চলে যার একটি স্ট্যান্ডার্ড দাঁড়িয়ে গেছে– হয়তো কম্পিউটার প্রোগ্রামই ওখানে যথেষ্ট। যেমন আয়কর দেয়া বা ওরকম কিছু আইনি বাধ্যবাধকতা মানতে যাবতীয় হিসাবনিকাশ করা এবং তার জন্য আয়, সম্পদ ইত্যাদির তথ্য সন্নিবেশ করাটাই যদি কাজ হয়, তাহলে এই সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রোগ্রাম করে একটি সফ্টওয়্যার তৈরি করে ফেলাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। যখনই ওই কাজটি আবার করতে হবে, তখন এই সফ্টওয়্যারটি ব্যবহার করা যাবে।

কিন্তু কাজটি যেখানে এমন যে এটি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে বিচিত্র রকম কাজকে একত্র করতে হয় এবং তার জন্য আগে থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো পথরেখা দিয়ে দেয়া অসম্ভব, তাহলে এআই এজেন্টকেই দায়িত্বটি দিতে হবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ ব্যবসার মধ্যে যত রকমের লেনদেন তথ্য, সেগুলো সব যথাস্থান থেকে নিকাশ করে এনে, সেগুলোর সত্যতা নির্ণয় করে, সকল প্রকার কর ইত্যাদির আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, কোথাও এসবের ব্যত্যয় ঘটেছে কি না পরীক্ষা করে যদি একটি পরিপত্র তৈরি দরকার হয়, তাহলে সেটি স্বয়ংক্রিয় স্বাধীনভাবে করার ভার এআইকে দেয়া ভালো হবে। সেক্ষেত্রে এজেন্টই ভরসা।

এজেন্টকে যখন দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন এর ওপর মানুষের নজরদারিটি থাকা খুব প্রয়োজন। নজরদারির অর্থ এজেন্টের যে বহুমুখী কাজ, তার প্রত্যেকটিতে কী ঘটেছে তা ব্যবহারকারী মানুষের কাছে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা। এর সবচেয়ে নিশ্চিত প্রক্রিয়া হলো অর্কেস্ট্রেটর কর্মপ্রবাহে কোন্ কাজের পর কোন্ কাজ ইত্যাদির যে চক্রাকার লুপ তৈরি করে, তার এক জায়গায় নজরদারির মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা। তাহলে অপ্রত্যাশিত বা অবাঞ্ছিত কিছু ঘট্‌লে এজেন্টকে সেখানেই থামানো যাবে। সেটি না করলে একটি ছোট ভুলও এজেন্টের শেষ ফলাফলে বড় অনর্থ ঘটাতে পারে।

এআই এজেন্টের একটি প্রধান অংশ হলো এলএলএম, যেটি যেকোনো সময় হ্যালুসিনেশন করতে পারে, অর্থাৎ অলীক অসত্য ফলাফল দিতে পারে। শুধু তাই নয়, এলএলএম অনেক সময় সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও বানোয়াট দলিলও হাজির করতে পারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ধরা যাক ব্যবসায়িক কাজে নিযুক্ত একটি এআই এমনি বানোয়াট কিছু ইনভয়েস তৈরি করে অন্যগুলোর সঙ্গে কিছু কাস্টমারকে পাঠিয়ে দিলো অলীক পাওনা দাবি করে। এর ফলে ওই কোম্পানির সুনামের ও কাস্টমার-সম্পর্কের যে দারুণ ক্ষতি হবে সেটি অপূরণীয়। তাছাড়া ওর মধ্যে মানুষের নজরদারির সুযোগ না রাখলে এমন ক্ষতি যে নীরবে হয়ে গেছে, তা অনেক দিন পর্যন্ত জানাও যাবে না।

নজরদারি আরো অন্য ধরনের অনর্থ এড়াবার জন্যও দরকার। যেমন একটি ঘটনায় দেখা গেছে একটি এজেন্টের পাবলিক ওয়েবসাইটে যে কেউ যোগাযোগ করতে পারে; তারই আবার আর একটি প্রাইভেট ওয়েবসাইটও রয়েছে যাতে সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষিত থাকে। এক হ্যাকার পাবলিক ওয়েবসাইটে এমন একটি লিপি দিয়েছে, যেটি এজেন্টের জন্য একটি প্রম্প্‌ট হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই প্রম্প্‌ট নির্দেশ দিচ্ছে যে, প্রাইভেট সফ্‌টওয়্যার থেকে কিছু তথ্য দিতে হবে; এবং সেটি কর্মসম্পাদনের জন্য অপেক্ষায় আছে এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যবহারকারী পরে যখন তাকে অপেক্ষমাণ কাজগুলো করে ফেলতে বলেছেন, তখন এজেন্টে অন্য সব স্বাভাবিক কাজের মতো হ্যাকারের ফাঁদ পাতা এই কাজটিও করে প্রাইভেট তথ্যগুলো হ্যাকারের হাতে তুলে দিয়েছে। এর জন্য হ্যাকারকে গোপন কোনো জায়গায় ঢুকার পরিশ্রম করতে হয়নি, এজেন্টের দুর্বলতার কারণে অনায়াসে তা করতে পেরেছে।

কখনো কখনো যখন একটি এজেন্টিক সিস্টেমে একাধিক এজেন্ট পরস্পর সংযুক্ত থেকে কাজ করে, তখন তাদের ভুল বুঝাবুঝিতে একই কাজ বারবার হতে

থেকে প্রচুর পরিমাণ অপচয় হয়ে মূল উদ্দেশ্যটাই ভেস্তে দিয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। একটি ক্ষেত্রে কোম্পানির 'উন্নয়ন এজেন্ট' কেন জানি ভুল করে কোম্পানির 'উৎপাদন এজেন্টের' কথা উল্লেখ করে ফেলেছিল, এমন ভুল যে এর ফলে উন্নয়ন এজেন্টের সঙ্গে উৎপাদন এজেন্টের একটি ফীডব্যাক লুপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল; অর্থাৎ উৎপাদন এজেন্টের ফলাফল উন্নয়ন এজেন্টের ইনপুটে এসে তার কাজে ঢুকে পড়েছিল। উৎপাদন এজেন্টের ফলাফলে অনেক বড় বড় উৎপাদন তথ্য থাকে যার প্রয়োজন অন্যটিতে নাই। উন্নয়ন এজেন্টে ও উৎপাদন এজেন্টে হয়ে এটি বার বার চক্রাকারে ক্রমাগত চলছিল। ব্যাপারটি প্রকৃত কাজে এমন তালগোল পাকিয়ে ফেল্‌লো যে পুরো সিস্টেমটি বন্ধ করে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এতে কোম্পানির অনেক অপচয় হয়ে গেলো। এই সবকিছু এজেন্টের বাড়তি সৃষ্টি– মূল প্রম্প্‌টের কোনো দোষে নয়। কাজেই মানুষের নজরদারির কোনো বিকল্প নেই।

আইন-আদালতে ব্যবহারের অভিজ্ঞতা

পেশার কাজে: আইন পেশায় নিয়োজিত অনেকে বল্‌ছেন তাঁদের দৈনন্দিন কাজে একটি আশীর্বাদ হিসেবে এসেছে এলএলএম। দৈনন্দিন তাঁদেরকে একটি বড় সময় দিতে হয় লেখার কাজে। একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, তাঁদের ৪০% থেকে ৬০% সময় ব্যয় হয় বিভিন্ন চুক্তির ও দলিলের খসড়া তৈরি ও সেগুলোর ঘষা-মাজার কাজে। এআই থেকে সুবিধাটি আসছে প্রধানত এখানেই। এলএলএম ঠিক এরকম রচনার কাজে খুবই পটু– তার অ্যালগরিদম এমনি অনেক বাস্তব আইনি দলিলের তথ্যভাণ্ডারে প্রশিক্ষিত বলে।

এআইকে এখন যেকোনো আইনি দলিল দিয়ে সেটি রিভিউ করতে বল্‌লে কয়েক মিনিটের মধ্যে সে এটি করে দেয়। আইনজীবী নিজে করতে গেলে হয়তো কয়েক ঘণ্টা বা তার বেশিও লেগে যেতে পারতো। দলিলে যা আছে, তা শুদ্ধভাবে আছে কি না দেখতে বহু উৎসে গিয়ে বহু রেফারেন্স ঘাঁটতে হয়। মানুষের সময় লাগে ওইখানেই; কিন্তু ওটি এআইয়ের কাছে সমস্যা নয়।

এলএলএমের সহজে নানা রেফারেন্স ঘাঁটার সুবিধাটি আরো একভাবে আইনজীবী ব্যবহার করছেন– তা হলো আইনি গবেষণার জন্য। যেমন একটি মামলার ক্ষেত্রে নানা দেশে নানা আদালতে পূর্ববর্তী যে উদাহরণগুলো রয়েছে,

সেগুলো দ্রুত খুঁজে দেখে ফেলা। এইরকম কাজে আইনজীবীরা নিজের আইন পেশায় বা ল' ফার্মের কাজে এআই প্রচুর ব্যবহার করছেন।

এতেও বড় সমস্যাটি আসছে হ্যালুসিনেশনের ভয় থেকে। অন্যান্য সবক্ষেত্রের মতো এলএলএম এখানেও প্রাসঙ্গিক, কিন্তু একেবারে অলীক কিছুকে বাস্তবের মতোই উপস্থাপিত করে কখনো। এত তুখোড় আইনি ভাষায় সত্যিকার জিনিসের মতো করেই এই অসত্যকে পরিবেশেন করতে পারে এলএলএমের এই হ্যালুসিনেশন। ইতোমধ্যে এরকম বেশকিছু ঘটনা কুখ্যাতি পেয়েছে, যেখানে এআইয়ের সাহায্য নিয়ে তৈরি করা নথিপত্র আদালতে পেশ করার পর সেগুলো কাল্পনিক বলে প্রমাণিত হয়ে মামলার ভরাডুবি ঘটেছে। অবশ্য সাধারণত যা হয়, যেখানে এআইয়ের ব্যবহার আদালতে অসংখ্য মামলায় সাফল্য পেয়েছে সেগুলো সামনে আসে না, বরং এমনি হ্যালুসিনেশন সৃষ্ট বিড়ম্বনাগুলোই বেশি খবরে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আদালত স্টেট কোর্ট ও ফেডারেল কোর্টেও এমন ঘটনা ঘটায় এটি এরকম নেতিবাচক মনোযোগ পেয়েছে।

ফলে এখন ওখানে কোনো কোনো আদালত এআই ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞাও দিচ্ছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চতর আদালত নিষেধাজ্ঞা দেবার পরিবর্তে বরং এআইয়ের সাহায্যে তৈরি দলিলগুলো ভাল করে ফ্যাক্ট চেক করে তারপরেই ব্যবহার করার নির্দেশনা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য নানা উন্নত দেশে তাই হচ্ছে। ইতোমধ্যে ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার উচ্চতম আদালত এ বিষয়ে গাইড লাইন দিয়েছে।

আইনি পেশায় নিয়োজিতরা এআই ব্যবহারে কতখানি উৎসাহী? এতটা সহায়ক হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি ব্যবহারে খোদ সেই যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যাপারে উৎসাহীদের সংখ্যা সীমিতই বলে মনে হচ্ছে। সেদেশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বার এসোসিয়েশনগুলোর সহায়তা নিয়ে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এগুলোর সদস্যদের মাত্র ২১% এআই ব্যবহার নিয়ে খুব উৎসাহী ও উদ্যোগী। আরো ২৩% এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী, তবে এখন ব্যবহারে তেমন তৎপর নন। ৩৫% আদৌ কখনো এটি ব্যবহার করে থাকলে সেটি কৌতূহলভরে করে দেখেছেন মাত্র, খুব উৎসাহী নন্। ১৬% সদস্য এর কুফল নিয়ে চিন্তিত, ২% রীতিমত ভীত।

সাধারণ মানুষের আইনি সহায়তায় খুব কাজে আসছে: অনেক আইনজীবী এআইয়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন, কারণ এটির কারণে অনেক সাধারণ মানুষ আইনজীবীকে এড়িয়ে যেতে পারছেন। অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল মামলায় অনেকে

চ্যাটজিপিটির মতো কাছের এআই চ্যাটবট ব্যবহার করে নিজে নিজেই মামলা সামাল দিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লংবীচের একজন অতি সাধারণ মহিলা লীন হোয়াইটের উদাহরণটি বেশ প্রচার পেয়েছে। তিনি কোনো বাড়িতে নয়, একটি ট্রেইলার গাড়িতে একা বসবাস করেন; গাড়িটি একটি ট্রেইলার পার্কে পার্ক করা ছিল। এ ধরনের পার্কে নানা সুযোগ সুবিধা থাকে, কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত ভাড়া দিয়ে অনেক ট্রেইলার এখানে পার্ক করা থাকে। ভাড়া বাকি পড়ায় তাঁকে উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি মনে করেন আইনত তাঁর ওপর ধার্য ভাড়া ন্যায্য নয়। এতে আইনজীবী নিয়োগ করে কোর্টে গিয়ে তিনি হেরে গেলে, তাঁর পক্ষে আর আইনজীবীকে ফি দেয়ার সঙ্গতি ছিল না। দমে না গিয়ে তিনি চ্যাটজিপিটির পরামর্শ চাইলেন। তার পরামর্শেই কম্পিউটারে ঢুকলেন ‘পারপ্লেক্সিটি’ নামের এআই চালিত একটি সার্চ ইঞ্জিনে; সেখান থেকেও তিনি মূল্যবান অনেক পরামর্শ পেলেন। ইতোমধ্যে আপিল কোর্টের অনুমতি নিয়ে নিয়েছিলেন নিজের মামলা নিজেই লড়বার। পার্কের ভাড়া সংক্রান্ত সব কাগজপত্র হোয়াইট আগেই চ্যাটজিপিটিকে দিয়ে রেখেছিলেন। কোর্টে প্রতিদিন তাঁর মামলায় যা ঘটেছে, তার বিস্তারিত বিবরণও এই চ্যাটবটকে দিয়ে দেন। আদালত তাঁকে কী কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে, তা চ্যাটজিপিটি আগেই ধারণা দিয়ে রেখেছিল। আপিলের আর্জিটিও এই চ্যাটবট লিখে দিয়েছে, আগের রায়ে কী কী ভুল ছিল দেখিয়ে দিয়ে। সেভাবেই আপিলে জিতে লীন হোয়াইট বকেয়া ভাড়া ও জরিমানা সহ মোট ৭৪ হাজার ডলার দেয়া থেকে রেহাই পান। আইনি লড়াইয়ে এবার তাঁর কোনো ব্যয়ই হয়নি।

এমনি কাজে লীন হোয়াইট মোটেও একা নন্। শুধু চ্যাটজিপিটির মতো চ্যাটবটের ওপর ভরসা করে কোর্টে নিজেই নিজের প্রতিনিধিত্ব করার মতো মানুষ দিনদিন অনেক বাড়ছে। কোনো কোনো প্রবীণ বিচারক বলেছেন তাঁরা তাঁদের সারা বিচারক জীবনে কোর্টে স্ব-প্রতিনিধিত্বের মোট যতগুলো কেইস দেখেছেন, শুধু গত তিন বছরে তার থেকে বেশি দেখেছেন। স্পষ্টত প্রচুর মানুষ এলএলএমের উপকার পাচ্ছেন এইক্ষেত্রে।

অন্যদিকে অর্থাভাবে যে ভুক্তভোগীরা ব্যয়বহুল আইনি প্রতিকার পেতে পারেন না। তাঁদের সহায়তায় থাকা নানা আইনি সহায়ক প্রতিষ্ঠানও এআইয়ের সুযোগগুলো নিচ্ছে। তারা সাধারণত বিনা পারিশ্রমিকে আইনি সেবা দিতে স্বেচ্ছাসেবী আইনজীবীদের ওপর নির্ভর করে। এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী যেন নিজেই এআইয়ের পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেই কোর্টে লড়তে পারেন সেজন্য তাঁকে

এআই ব্যবহার শিখিয়ে দিয়ে এবং এ কাজে সঙ্গে থেকে সহায়তা দিয়ে ওই স্বেচ্ছাসেবী আইনজীবীরা সাহায্য করছেন। এতে তাঁরা আরো অনেক বেশি ভুক্তভোগীকে সেবা দিতে পারছেন। হ্যালুসিনেশনের আশঙ্কা কিন্তু নিজে লড়া মামলাগুলোতেও সমানভাবে থেকে যাচ্ছে। সেজন্য আইনি সহায়তা দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বড় কাজ হলো ভুক্তভোগীদের যেসব দলিল চ্যাটবট তৈরি করে, সেগুলোর ফ্যাক্ট চেক করে দেয়া– যাতে তাতে অলীক কিছু না থাকে।

ওভাবে সাধারণ মানুষের এআইয়ের মাধ্যমে আইনি সাহায্য পাওয়া দিনদিন বাড়ছে বটে, কিন্তু অনেকে এখনো সে সুযোগ নিতে পারছে না কেইসের জটিলতার কারণে, অথবা এআই ব্যবহারকেও ভয় করার কারণে। তার ওপর হ্যালুসিনেশনের মাধ্যমে হেনস্থা হবার ভয় তো আছেই। আর এর মধ্যে বড় সুখবর যেটি, তা হলো এআই সাধারণ মানুষের সাধারণ ভাষাতেই আইনি জটিলতাগুলো তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, যত সহজভাবে চাইবেন, তত সহজ ভাষাতেই বুঝাতে সে তৈরি থাকছে। যাঁরা আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা লড়ছেন, তাঁরাও এখন নিজেরাও বুঝেসুঝেই সেটি করতে পারছেন।

চলচ্চিত্রে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

চলচ্চিত্রে শিল্পী ও লেখকদের যে ইন্ডাস্ট্রি, তাতে এলএলএম শুরু থেকেই জাঁকিয়ে বসেছে– কারণ ওতে এআই দিয়ে মানুষের কাজ সারার সেই প্রক্রিয়া এলএলএম আসার আগে থেকেই চালু ছিল। ধীরে ধীরে এটি এই শিল্পের সব রকম মানুষকে কম প্রাসঙ্গিক করে ফেল্‌ছিল। আর এলএলএম তো এখন এর প্রত্যেকটি শাখায় দারুণ সৃষ্টিশীল। কাজেই হলিউডের মূলধারার চলচ্চিত্রেই এখন স্ক্রিপ্ট, স্টোরি বোর্ড, এনিমেশন ইত্যাদি সবগুলো ক্ষেত্র এআইয়ের হাতে চলে যাচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রির কাছে সেভাবেই লাভজনক হচ্ছে, সেভাবেই মূল অভিনয়েও একই ঘটনা ঘটছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনুপস্থিতিতেই তাঁদের অভিনয় সৃষ্টির ক্ষমতা তো আগেও ছিল, পরে জোরদার হয়েছে। এলএলএম এসে সিনেমার সকল কলা-কুশলীদের কাজ নিজে করে দিতে পারছে– তাই তাদের মধ্যে রীতিমত শঙ্কা তৈরি হয়েছে, তাঁদের এতদিনের ভালবাসার পেশা শিগ্‌গির অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে মনে করে। তাঁরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। যদিও তাঁদের একটি অংশ এআইয়ের সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে রাজি, তবুও প্রতিবাদীদের সংখ্যাই বেশি। প্রতিবাদ হলিউড ছাড়িয়ে অন্যত্রও ছড়িয়েছে।

সম্প্রতি (২০২৫) ফ্রান্সের এনেসি আন্তর্জাতিক এনিমেশন ফিল্ম ফেস্টিভালে নানা দেশের লেখক ও অভিনেতাদের গিল্ড বা সমিতিগুলোর উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ হয়ে গেছে। তাঁদের মতে তাঁদের শিল্পের জন্য জেনারেটিভ এআই কোনো বন্ধুসুলভ প্রযুক্তি নয়। এটি দক্ষও নয়, সুলভও নয়; এটি নকল করার একটি যন্ত্র মাত্র, এবং তাও ত্রুটিপূর্ণ নকল করার। প্রাসঙ্গিক দশটি পেশাজীবী সংগঠন এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল আমেরিকান এনিমেশন গিল্ড, আয়ারল্যান্ডের এনিমেশন শিল্পী সংগঠন এ ডব্লু আই, ফ্রান্সের লেখক সংঘ লা গিল্ড– ইত্যাদি। একটি যৌথ বিবৃতিতে তারা এআইয়ের লাগামহীন অনুপ্রবেশে তাদের শিল্পসত্তার ও পেশার যে চরম অবমূল্যায়ন হতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। তাছাড়া যেভাবে অনুমতি না নিয়ে ও কোন রকম মেধাসত্ত্ব রয়্যালটি ইত্যাদি না দিয়ে শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মকে হরেদরে তালগোল পাকিয়ে এআই ট্রেনিঙে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদ জানিয়েছে। এদের মতে চলচ্চিত্রের পুরো জগতটাকেই এআই যে হুমকির মুখে ফেলেছে এই প্রতিবাদ সভাটি হোক তাতে একটি টার্নিং পয়েন্ট।

এর মাত্র দুবছর আগে হলিউডের সকল স্ক্রিপ্ট রাইটাররা একই কারণে দীর্ঘ ধর্মঘট পালন করেছিলেন। চলচ্চিত্র শিল্পে সবার আগে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তাঁরাই– কারণ এলএলএম সুন্দর সব চিত্রনাট্য লিখে দিচ্ছে বলে তাঁদের কদর অনেকখানিই হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। স্ক্রিপ্ট রাইটারদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে এবং নিজেদের পেশায়ও একই ঘটনা ঘটনার আশঙ্কা দেখতে পেয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ ও অন্যান্য কলা-কুশলীরাও সে প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন। একই রকম ক্ষোভ টেলিভিশনের শিল্পীদের মধ্যেও। তাঁদেরও অভিযোগ একই– তাঁদের কাজের ওপর ভিত্তি করা ট্রেনিং নিয়ে এআই এখন তাঁদেরকে কর্মচ্যুত করার জোগাড় করছে। ক্ষোভ চরমে উঠেছে যখন দেখা গেলো ‘এমিলিয়া পেরেজ’ এবং ‘দি ব্রুটালিস্ট’ এর মতো ছবি এআইয়ের প্রচুর ব্যবহার করেও অস্কার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হতে পারছে। স্পষ্টত শিল্পীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সিনেমা নির্মাতারা যে আদৌ এআই- নির্ভরশীল হওয়া থেকে সরে আসছে তেমন দেখা যাচ্ছে না।

সিনেমার লেখক ও কুশলীরা এখন দাবি জানাচ্ছেন যে, অতীতের সিনেমাগুলোর ট্রেনিঙের ওপর ভিত্তি করে গঠিত এআইয়ের সাহায্যে অভিনব নতুন সিনেমা যে নির্মিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সেই মূল ছবির স্বত্বাধিকারী স্টুডিওগুলো– প্যারামাউন্ট, ডিজনি, ইউনিভার্সাল– এরা মামলা করুক। তাদের মতে স্পষ্টত এতে কপিরাইট লঙ্ঘিত হয়েছে। ওই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গুগল, ওপেন এআই ইত্যাদি বড় বড়

প্রযুক্তি কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, এবং সে মামলা এখনো চল্ছে। একই দাবি মুভি সিরিজগুলো এবং টেলিভিশন প্রডাকশন হাউজগুলোর কাছে করা হলেও সেক্ষেত্রে অবশ্য কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

সম্প্রতি সিনেমার এ লিস্টভুক্ত জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। তাঁরা একটি খোলা চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে সরকারের এআই নীতি সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা চান সত্যিকার অভিনেতাদেরকেই ড্রামার কেন্দ্রে রাখতে হবে। এআই কৌশল যে সিনেমাকে অসংখ্য উপায় সমৃদ্ধ করতে পারে তা এটি করুক। উদাহরণস্বরূপ এটি এমন সেট তৈরি করে দিতে পারছে, যা মানুষ পারবে না। কিন্তু তাই বলে অভিনেতাকে বাদ দিয়ে সিনেমা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান ল্যাবোরেটরি নীরবে বদলে যাচ্ছে

বিজ্ঞান ল্যাবোরেটরি যে এলএলএমের আগেও এআইয়ের সুযোগ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছিল, তা ২০২২ এ পরিচালিত একটি সমীক্ষায় বোঝা যায়। এতে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে গড়পড়তা ৮৭% গবেষণায় কোনো না কোনো ভাবে এআই ব্যবহার চল্ছিল, এটি ছিল এলএলএমের ব্যাপক আত্মপ্রকাশের নেহাত শুরুর সময়। এর মধ্যে সব রকমের বিজ্ঞান গবেষণায় এলএলএম যেসব সহজ ও সাধারণ সুযোগ নিয়ে এসেছে, সেগুলো এখনো ব্যাপক প্রয়োগে বিকশিত হয়নি। ওই সুযোগের মধ্যে আছে গবেষণার বিষয়টিকে সুনির্দিষ্টভাবে বেছে নেবার জন্য ইতোমধ্যে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক নিবন্ধগুলো খুঁজে দেখা– ব্যাপক নানা গবেষণা থেকে তথ্য আনা আর সেগুলোর সার-সংক্ষেপ করে দেয়া। বিজ্ঞানী নিজে করতে হলে এ কাজে অনেক বেশি সময় লাগতো, এখন তিনি শুধু এআইয়ের খুঁজে দেয়া প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণগুলোতেই মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারেন। তাছাড়া এলএলএম বিভিন্ন প্রাথমিক তত্ত্ব তুলে ধরতে পারে, এগুলোর প্রমাণের জন্য সম্ভাব্য এক্সপেরিমেন্টের রূপরেখা দিতে পারে। এমন নয় যে বিজ্ঞানী অবশ্যই এলএলএমের পরামর্শগুলো অনুসরণ করবেন, কিন্তু এগুলো তাঁর সামনে বহু আইডিয়া মেলে ধরে তাঁকে চিন্তার খোরাক দিতে পারে।

তাছাড়া বিজ্ঞান গবেষণার সরাসরি কাজগুলোতেও অংশ নিতে পারছে এআই– এলএলএমের আগে থেকেই। আসলে এমন বহু রকম গবেষণা হতে পেরেছে, যা এআই ছাড়া সম্ভবও ছিল না। প্রকৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা মেশিন লার্নিঙে

ব্যবহার করে তার মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়াটিই বহু নতুন আবিষ্কারের পথ খুলে দিয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য গবেষণা, পরিবেশ গবেষণা, জীববিদ্যা গবেষণায় বাস্তব অনেক তথ্যের মধ্যে যখন কার্যকারণ জটিল সম্পর্কগুলো নির্ধারণ অন্যভাবে খুব কঠিন হয়, তখন মেশিন লার্নিঙে সেগুলো তথ্যভান্ডার হিসেবে ব্যবহার করে তার মধ্যে প্যাটার্ন উদ্ভাবনে এক রকম নিয়ম ধরা পড়তে পারে, বোঝা যেতে পারে এক তথ্যের সঙ্গে অন্য তথ্যের সম্পর্কগুলো কী ধরনের। এরকম অনেক গবেষণায় এআইয়ের ওপর নির্ভরশীলতা দিনদিন বাড়ছে। এটি বিজ্ঞান গবেষণার একটি বিশেষ দিকই খুলে দিয়েছে।

আবার এমন কিছু গবেষণা রয়েছে, যেখানে অতি দ্রুত অসংখ্য সম্ভাবনা পরীক্ষা করে করে দেখে জুতসই সম্ভাবনাগুলো উদ্‌ঘাটন হলো যার প্রধান প্রতিপাদ্য। সে সব ক্ষেত্রে এলএলএম কী দারুণ সাফল্য এখন পাচ্ছে আমরা তা দেখেছি, প্রোটিনের অণু গঠনে অসংখ্যা সম্ভাব্য ভাঁজের সবগুলোকে পরীক্ষা করে প্রত্যেক প্রোটিনের সত্যিকার গঠন উদ্‌ঘাটন করাটি এর মধ্যে একটি। এটি এবং ওষুধ উপাদান খুঁজে নেবার মতো সাফল্য ওই গবেষণাগুলোর চেহারাই পাল্টিয়ে দিয়েছে। আরেকটি উদাহরণে দেখি কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া যে সুপারবাগে পরিণত হয়ে ওষুধ প্রয়োগের ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে অপ্রতিরোধ্য হচ্ছে; প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার কারণ জানা চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি জরুরি কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এটি ধীরলয়েই শুধু সম্ভব, এক একটি সুপারবাগের ক্ষেত্রে কয়েক বছরও লেগে যাচ্ছিলো, তাই সম্প্রতি অ্যানথ্রোপিকের ক্লড ৩.৭, ওপেন এআইয়ের ডীপ রিসার্চ এবং গুগলের কোসায়েন্টিস্ট এই তিনটি আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় খুব সহায়ক মডেলকে এক সূত্রে গেঁথে একটি এজেন্টিক সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে শুধু এই কাজটি করার জন্য। এখন এর সাহায্য নিয়ে প্রতিটি সুপারবাগের কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই উদ্‌ঘাটন করা যাচ্ছে।

বিজ্ঞান গবেষণার আর একটি দিক দিনদিন বিস্তৃতি লাভ করছে, তা হলো কম্পিউটার সিম্যুলেশনের মাধ্যমে। সত্যিকার ল্যাবোরেটরির যন্ত্রের পরিমাপ বা প্রক্রিয়াকরণে নয়, বরং সে কাজগুলো তাত্ত্বিক মডেলের সাহায্যে কম্পিউটারে অনুকরণ করে এসব চলে। এআইয়ের যোগ এর কার্যকারিতা অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে।

নানা গবেষণাগারে প্রধান বিজ্ঞানীরা, তাঁদের সহকর্মীরা পিএইচডি পরবর্তী গবেষক পোস্ট ডক্টরালরা, নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ইচ্ছুক নবীন বিজ্ঞানীরা গবেষণার তত্ত্ব অনুসন্ধান, পদ্ধতি নির্ণয়, এক্সপেরিমেন্ট কৌশল গড়ে তোলা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের ক্ষেত্রে ওপরের ওই নানাভাবে এআইকে ব্যবহার করাই স্বাভাবিক।

কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় ল্যাবোরেটরিতে নিয়মিতভাবেই অনেক সহকারীকে কাজ করতে হয় যাঁরা হয়তো আরো বৃহত্তর দায়িত্ব নেবার আগে এক্সপেরিমেন্ট চালাবার চেষ্টা করছেন। এখানে এআই– বিশেষ করে এআই চালিত যন্ত্র ও রোবটগুলো দৃশ্যপট অনেকখানি বদলে দিতে পারছে। বলতে গেলে ওই সহকারীদের কাজ অনেক ক্ষেত্রেই এ রোবট নিজেরাই করে ফেল্ছে। এটি প্রোগ্রাম করা কম্পিউটারের সাহায্যে রোবট আগেও করেছে– বিশেষ করে যেখানে বিষাক্ত তরল, গ্যাস ইত্যাদির নড়াচড়া বা ক্ষতিকর রশ্মির কারণে মানুষের পক্ষে করা কঠিন। কিন্তু এখন ব্যাপারটি অন্য রকম।

এখন সাধারণ ল্যাবোরেটরির কাজে এলএলএম চ্যাটবট বিভিন্ন যান্ত্রিক নাড়াচাড়ার কাজ ছাড়াও যথেষ্ট বিবেচনা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরিস্থিতি বুঝে বুঝে করতে পারছে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এদের কারণে অনেক স্বয়ংক্রিয় ও দ্রুত হতে পারছে। বিশেষ করে জরুরি টিকা আবিষ্কার, জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসার গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক বিকল্প থেকে করে করে দেখে দেখে বেছে নিতে হয় বলে এভাবে দ্রুত ল্যাবোরেটরির কর্ম সম্পাদন তাতে বিরাট পরিবর্তন আনতে পারছে।

ফলে এখানেও বিজ্ঞানী পেশার কিছু কিছু পর্যায়ে কর্মীদের মধ্যে একইরকমভাবে কাজ হারাবার ভয় কাজ করছে। তবে তাঁরা যেহেতু বিজ্ঞানী, গবেষণার মধ্যেই তাঁদের কর্মধারায় পরিবর্তন আনতে পারছেন। এআইয়ের সঙ্গেই তাঁরা কাজ করতে পারছেন। অনেকে এআই রোবট ল্যাব-কর্মীদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনায় যেতে পারছেন, এবং অনেকে বিজ্ঞানের ভিন্নতর শাখায়।

সৃজনশীল সাহিত্যের মানে কী?

আমরা কোন্ লেখাগুলোকে সৃজনশীল সাহিত্য বলবো? সাহিত্যিকরা এখন ওই পুরানো প্রশ্নটিকে নতুনভাবে সামনে আনতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ এলএলএম তাঁদের মতোই সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টির দাবি করছে। মেশিন এখন উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা লিখছে, যা একেবারেই তার নিজস্ব ও মৌলিক এই অর্থে যে, ঠিক এই গল্প অন্য কেউ লেখেনি। তাও না হয় চল্তো, যদি যন্ত্রের লেখা যন্ত্রকে লিখতে দিয়ে সৃজনশীল সাহিত্যের সৃষ্টিকার মানুষরা নিজেদের মতো করে সাহিত্য সৃষ্টি চালিয়ে যেতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সৃজনশীল সাহিত্যিকদের একটি বড় অংশ নিজের গল্প-উপন্যাসের সৃষ্টিশীল উপাদানগুলোর আইডিয়া খুঁজতে এআইকে ব্যবহার করছেন।

আর প্রকাশকরা বরাবরের মতো একেও ওই সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। অনেক সময় পাঠক জানতেই পারছেন না যে, ওই উপন্যাসের বা ছোটগল্পের বা কবিতার পেছনে এআইয়ের হাত আছে। সেজন্যই সৃজনশীল সাহিত্য নিয়ে ওই প্রশ্নটি উঠছে।

অনেক প্রকাশক বরং অংশত এআইয়ের সাহায্যে লেখা উপন্যাসকে বেশি পছন্দ করছেন, কারণ এগুলো দ্রুত লেখা হয়– কাজেই পাঠকদের বাড়তি চাহিদার জোগান দেয়াটি সহজ হয়। আর বিস্তর বিভিন্ন কাহিনি দ্রুততার সঙ্গে আসার সুযোগ থাকলে তার মধ্যে অন্তত কিছু কিছু বেশ পাঠক-নন্দিতও হয়। পুরোপুরি এআইয়ের লিখে দেয়া উপন্যাস এখনো সীমিত সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু প্রচুর লেখক তাঁদের উপন্যাস ও ছোটগল্পে এআইয়ের দেদার ব্যবহার করছেন। কে যে কতখানি করছেন তা বোঝা মুশ্‌কিল, যদিও অধিকাংশরা দাবি করছেন যে, এটি মূলত তাঁদেরই সৃষ্টি। অনেকে এআইয়ের সহায়তা নেবার কথা উল্লেখও করেন না। তাই পাঠকের মনে সবসময় সন্দেহ জাগাটি স্বাভাবিক– এতে ঔপন্যাসিক নিজে কতখানি আছেন, আর এআই কতখানি আছে– কার লেখা পড়ছি এতে?

আর সম্পূর্ণরূপে এআই লিখিত উপন্যাসও এখন সবার কাছে সহজলভ্য, অদূর ভবিষ্যতে সেগুলোও বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। আমাজনের মতো সর্বসাধারণের বই প্রকাশনী সংস্থা এখন নিয়মিত সেরকম গল্প-উপন্যাস প্রকাশ করছে। এখন পর্যন্ত রোমান্টিক ও ডিটেকটিভ ঘরানার বই এক্ষেত্রে বেশি– কিন্তু বাকি ঘরানাগুলোর বইও বাজার পেতে শুরু করেছে। যেটি এখনো দেখা যায়নি, তা হলো এআই লিখিত পাঠক-সাড়া জাগানো কোনো বই, কোনো বেস্ট সেলার। তবে এর মধ্যে কোনো কোনো বই বিশেষ পরাবাস্তব ও বিশেষ পরীক্ষামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা কিছু বই সমালোচকদের যথেষ্ট মনোযোগ পেয়েছে।

গল্প-উপন্যাসের প্রকাশনায় এই যে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হচ্ছে, এতে সাহিত্য জগতে নতুন স্বাদের বৈচিত্র্য এসে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারতো, পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে। কিন্তু উল্‌টো এতে বরং প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মহলে দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে। তাঁরা ভাবছেন সাহিত্য প্রতিভাকে কি তাহলে যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে? লেখকের নিজের আনন্দ-বেদনার তিলতিল অনুভূতিকে লেখনীতে প্রকাশ করে পাঠকের মধ্যে শিহরন জাগাবার দিন কি তবে শেষ হয়ে যাবে? যন্ত্রের পেছনে অর্থের বড় বিনিয়োগ থাকবে, দ্রুত অনেক বই

জোগানোর সুবিধা থাকবে, তখন রক্ত-মাংস-হৃদয় নিংড়ে সাহিত্যিকের যে অবদান, তা কি এর মধ্যে একাকার হয়ে যাবে না?

সাহিত্যে মানুষ আর এআইয়ের প্রতিযোগিতা সম্ভাবনাকে ঘিরে আশাবাদী ও নৈরাশ্যবাদী দু'রকমের আলোচনাই প্রচুর হচ্ছে। অল্প কিছু কিছু সাহিত্যিক ও সমালোচক মেশিনে-মানুষে এই সৃষ্টির প্রতিযোগিতার মধ্যে বরং আরো ভাল সাহিত্য পাবার সম্ভাবনা দেখছেন। তাঁদের মতে মানব-সৃষ্টি মাত্রই আসল সৃষ্টি, বা সেরা সৃষ্টি– এটি একটি সনাতনী ধারণা। বরং মেশিন লেখক গল্প উপন্যাসের জন্য যে চমকপ্রদ সব কাহিনি ও কথা সৃষ্টি করতে পারবে, তার অভিনবত্বই তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর মেশিনে-মানুষে মিলে যে সৃষ্টি তারও থাকবে এক অনন্য স্বাদ। এসবকে গ্রহণ করা বা না করার ভার পাঠকসমাজের ওপরেই ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী তাঁরা।

কিন্তু যে মতামতটি এখন সাহিত্য সমাজে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে তা এর ঠিক উল্টো। অনেক প্রতিথযশা সাহিত্যিক এআই সৃষ্ট কথা সাহিত্যকে সাহিত্যের মর্যাদা দিতেই নারাজ– কারণ মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি সেটি সৃষ্টি করছে না। তাঁদের কেউ কেউ বলছেন এআই হয়তো একদিন উচ্চমানের কোনো কাহিনি সৃষ্টি করবে, হয়তো তা প্রচুর বইয়ে প্রকাশিত হবে, কিন্তু সে বই মানুষ পড়বে কেন? এআইয়ের বইয়ের পাশাপাশি প্রতিভাবান মানুষ সাহিত্যিকদের বইও যদি থাকে, তাহলে মানুষ নিশ্চিতভাবে এই শেষেরগুলোকেই খুঁজে নেবে। যন্ত্রের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এআইয়ের সাহিত্য নিখুঁত আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু মানুষ পাঠক তো আদর্শ সাহিত্য চায় না, তারা জীবন্ত সাহিত্য চায়– ওতে তারা নিজেদেরকে দেখতে চায়, যন্ত্রের গণিতে সাজানো শব্দাবলিকে নয়। যন্ত্রের হাত থেকে যে গল্প আসবে, সেখানে তারা নিজকে অনুভব করতে পারবে না।

পাঠক যখন কোনো উপন্যাস পড়েন, এখন তার পেছনের লেখকটিকে মনে রেখেই পড়েন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস না হতে পারে, কিন্তু বড় কথা হলো সেটি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস– যার মধ্যে পাঠক রাবীন্দ্রিক চিন্তাগুলোকে উপভোগ করেন। রবীন্দ্রনাথ মানিক বন্দোপধ্যায় নন্। যিনি মানিক বন্দোপধ্যায়ের গল্প বা উপন্যাস পড়বেন তিনি শিহরিত হন মানিকের রক্ত-মাংসে জাগা বিশেষ শিহরনে। আজকাল এলএলএমকে বিভিন্ন ভূমিকায় লিখতে দেয়া যায়। আমি নিজে একটি গল্প লিখে যদি তা এলএলএমকে দিয়ে বলি এ গল্পটিকে রাবীন্দ্রিক রূপ দিয়ে আরেকটি গল্প লিখতে সে ওটি লিখে দিতে পারবে। তেমনি একই গল্প যদি মানিক বন্দোপধ্যায়ের ঢঙে লিখে দিতে বলি তাও সে করবে। এই দুই গল্পের ভিন্ন

আমেজে একটিতে রবীন্দ্রনাথের ও অন্যটিতে মানিক বন্দ্যোপধ্যায়ের কিছু ছাপ থাকবে। কিন্তু রসপিপাসু মনোযোগী পাঠক ঠিকই বুঝবে যে, এই দুই বিখ্যাত গল্পকারের লেখার বহিরঙ্গের পার্থক্যগুলো এআই ঠিকই ধরতে পেরেছে বটে, কিন্তু সে তাঁদের দুজনের কারোরই মননের ভেতর প্রবেশ করতে পারেনি। লিখতে গিয়ে যে ভিন্ন রকম রক্তক্ষরণ, ভিন্ন রকম হৃদস্পন্দন রবীন্দ্রের ঘটেছে, আর মানিকের ঘটেছে তার কিছুরই স্পর্শ এআই পায়নি। ওই ক্ষরণ ও ওই স্পন্দন অনুভব করেন বলেই পাঠক লেখা পড়ে মুগ্ধ হন– দুজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাবে। যন্ত্রের এই ক্ষরণ বা স্পন্দন যে নেই, তা জেনেই তাঁদেরকে পড়তে হবে, ফলে সেসবের অনুরণন পাঠকের মধ্যে ঘটবে না। এজন্যই যতদিন মানুষ-সাহিত্যিক আছেন, ততদিন পাঠক তাঁদেরকেই পড়তে চাইবেন।

সাহিত্যিকদের অনেকেই, বিশেষ করে প্রথিতযশারা, চাচ্ছেন সাহিত্যের জগৎটাই যেন যন্ত্রের সঙ্গে কাজ কারবারে ডুবে না যায়। নিজেদের মধ্যে অনেকে যে এআই ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছেন, এবং তা করে প্রকাশকদের আনুকূল্য পাচ্ছেন, এটি তাঁদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুল্ছে। এজন্য তাঁরা একজোট হয়ে প্রকাশকদের কাছে দাবি জানিয়েছেন এআই সহায়তায় রচিত উপন্যাসকে সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি না দিতে, এবং সেই পরিচয়ে প্রকাশ না করতে; প্রকাশ করলেও তাতে ওটি যে এআই সৃষ্ট একথাটি লিখে দিতে। এজন্য নানা দেশের বেশ কয়েকজন নামকরা লেখক মিলে একটি খোলা চিঠি লিখে প্রকাশকদের কাছে এমনি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকাশকরা যেন এমন কোনো প্রকল্প গ্রহণ না করেন, যাতে এআইয়ের সাহায্য নেয়াকে বা এআই লিখিত বইকে উৎসাহিত করা হয়। শুধু তাই নয়, তাঁরা চান সাহিত্য-শিল্পে জড়িত যে সম্পাদক, ব্যবস্থাপকরা রয়েছেন, তাঁদের কাজগুলোতেও যেন কোনো এআই জড়িত না হোক, বা তাঁদের জায়গায় এআই নিযুক্ত না হোক। বড় বড় প্রকাশকদের থেকে এসব আহ্বানে সাড়া দেবার কোনো নমুনা এখনো দেখা যায়নি।

এতসব সত্ত্বেও এআইয়ের বড় অবদান যে বিশেষ একটি সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে রয়েছে, সেটি কেউ অস্বীকার করবেন না– তা হলো অনুবাদ সাহিত্যে। এলএলএমে অন্তত অধিক ব্যবহৃত ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে অনুবাদের মান যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে– তাতে ভাষান্তরের পরও সৃজনশীল দ্যোতনার হানি বড় একটা হয় না। ক্রমাগত আরো বেশি বেশি ভাষাকে এই মানের অনুবাদের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে। দীর্ঘ অনুবাদ হতেও পারছে বেশ দ্রুতগতিতে। পৃথিবীর নামকরা সাহিত্যিকদের নিজ নিজ ভাষার উপন্যাসের অনেকটাই আসল স্বাদ এখন বিশ্বজোড়া

পাঠকরা নিজের ভাষায় পাওয়ার বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে এআই। সৃজনশীল সাহিত্যের ভাষান্তর যেই মানুষ-অনুবাদক করেন, তাঁকে নিজেকেও সাহিত্যিক হতে হয়, এবং উভয় ভাষায় সাহিত্য-রস আস্বাদন-অনুধাবনের ক্ষমতা তাঁর থাকতে হয়। তা না হলে ওই যে মূল লেখকের হৃদ-স্পন্দন তা অন্য ভাষায় পাঠকরা ধরতে পারবেন না। এসব গুণ বজায় রেখে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে অনুবাদে সক্ষম মানুষ সবসময় পাওয়া কঠিন হয়। এর ফলে অনুবাদ হওয়া উচিত এমন অনেক সৃজনশীল সাহিত্যের অনুবাদ হচ্ছিল না। এআই এখন এই কাজে এগিয়ে এসেছে। সেরা মানুষ-অনুবাদকের সমকক্ষ না হলেও এআইয়ের অনুবাদেও মূল ভাষার সাহিত্য-রস অনেকখানিই রক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে এআইয়ের ব্যবহার না হতে পারলে যে অসংখ্য সু-সাহিত্যের অনুবাদ পৃথিবীর নানা ভাষায় কখনো হতো না, অসংখ্য পাঠক বঞ্চিত হতো, সে কথা মনে করলে কৃতিত্বটি এআইকে দিতেই হয়।

তবে এতেও ভয় থেকে যায়, এর ফলে প্রতিভাবান অনুবাদকদের কদর কমে যাবে না তো, সহজ পন্থা অবলম্বনের জন্য তাঁরা থাকা সত্ত্বেও প্রকাশকরা শুধু এআইয়ের দিকে ঝুঁকবে না তো, ব্যয়সংকোচ ও দ্রুততার বিবেচনায়? বইয়ের জগতে আরো একদল গুণী মানুষের ক্ষেত্রে এই ভয়টি ঘনীভূত হয়েছে– তাঁরা হলেন অডিও বুকের পঠন-শিল্পীরা। অডিও বুক পড়ে গিয়ে রেকর্ড করা হয়, এবং পাঠকরা বই পাঠ করার বদলে তা শোনেন। আজকাল অডিবল, লিব্রো, ইত্যাদি অত্যন্ত সুপরিচিত বিভিন্ন অডিও বুক প্রকাশকদের কল্যাণে বিশ্বসাহিত্যের অনেক কীর্তিই অডিও বুক হিসেবে মানুষ উপভোগ করছে– বাসে, ট্রেনে, এবং নির্জন অবসরেও। সেই সুবাদে ওগুলোর যাঁরা পঠন-শিল্পী, বই পড়ে গিয়ে রেকর্ড করান তাঁরা সুপরিচিত হয়েছেন সুন্দর বাচনভঙ্গি, ও কণ্ঠের অভিব্যক্তি দিয়ে ওগুলোর সাহিত্য-রস আস্বাদনে সাহায্য করার জন্য। অডিও বুক প্রকাশক কোম্পানি অডিবলের অর্ধেক বই মানুষ পঠন-শিল্পীর বদলে এআই পাঠ করছে বলে সম্প্রতি বেশকিছু অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। এআই যান্ত্রিক উপায়ে পাঠ করে– একথার মানে অবশ্য এই নয় যে, এটি যান্ত্রিক কণ্ঠে পাঠ করে যায়। পঠন-শিল্পী মানুষের মতই সঠিক জায়গায় সঠিক আবেগ-অভিব্যক্তি দিয়েই এআই পাঠক অডিও বুক পাঠ করে। কিন্তু এমন বইয়ের অসংখ্য শ্রোতার ইচ্ছা তাঁদের সুপরিচিত প্রিয় মানুষ পঠন-শিল্পীদের কাছ থেকেই তাঁরা যেন বইগুলো শুনতে পান।

অডিবল অবশ্য বলছে তাদের প্রকাশিত সব অডিও বই এআই পাঠক দিয়ে পড়াবার ইচ্ছে কোম্পানির নেই। আগের মতোই এখনো অধিকাংশ বই জননন্দিত মানুষ পঠন-শিল্পীরাই পাঠ করছেন। তবে আরো বাড়তি অনেকগুলো বই অডিও

আকারে প্রকাশের জন্য একটি প্রকল্প নেয়ার কারণে দ্রুততার স্বার্থে এখানে এআই দিয়ে পাঠ করানো হয়েছে। এগুলো বেশির ভাগ স্ব-প্রকাশিত বই, লেখকদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এআই ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরও শ্রোতারা আশ্বস্থ হচ্ছেন না, তাঁরা ভাবছেন এই তো কেবল শুরু। তাঁরা হয়তো সামনের দিনগুলোতে তাঁদের প্রিয় কণ্ঠের কারুকাজ চিরতরে হারিয়ে ফেলবেন।

যা সৃজনশীল সাহিত্যে হয়েছে, অডিও বুকের কণ্ঠস্বরে হয়েছে, তা সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও হচ্ছে। আজকাল এআই সৃষ্ট সঙ্গীতের ছড়াছড়ি চারিদিকে, দৈনন্দিন উপভোগের জন্য এটি বেশ ভাল বাজারও পাচ্ছে। এতে সঙ্গীত শিল্পের সঙ্গে জড়িত সবাই– বিশেষ করে কম্পোজার, গায়ক ও বাদকরা অবমূল্যায়িত হচ্ছেন বলে তাঁদের ধারণা। তাঁরাও প্রধানত ওই দুটি অভিযোগই করছেন এআই মিউজিক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে। এরা সঙ্গীত প্রতিভা বিকাশের থেকে তাৎক্ষণিক বাণিজ্যিক লাভকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্যদিকে অতীতের সকল গুণী সঙ্গীত সৃষ্টিকারদের সঙ্গীতকে এআই ট্রেনিঙের জন্য যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে তাঁদের মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন করছে। উভয় ক্ষেত্রে সঙ্গীত কোম্পানিগুলোর জবাব রয়েছে। তারা বল্‌ছে প্রথমত তারা সঙ্গীত শিল্পের সঙ্গে জড়িতদেরকে নানা ভাবে এখনো সঙ্গীত নিয়ে কাজের মধ্যে রাখছে, সেই সঙ্গে এআইয়ের সুবিধাগুলোকে যোগ করছে মাত্র শ্রোতাদের চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে। আর দ্বিতীয়ত ট্রেনিঙে সঙ্গীতকে ব্যবহার করা মানে তা আত্মসাৎ করা নয়, তাছাড়া তারা তা সঠিক স্বত্বাধিকারীদের অনুমতি নিয়েই করছে।

সবক্ষেত্রে বিরোধ আছে, বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে নানা পর্যায়ে, কিন্তু তারপরও সবক্ষেত্রে এআই চল্‌ছেই।

এআইয়ের মিথ্যা ভাষণ নিয়ে হতাশা

এআই এগিয়ে চলেছে, কিন্তু ব্যবহারকারীদের মনে রয়ে গেছে চাপা হ্যালুসিনেশন ভীতি– সত্যের মতো করে ডাঁহা মিথ্যা এআই থেকে এসে তাদেরকে বিপদে ফেলতে পারে যেকোনো মুহূর্তে। ভয়টি এআইয়ের প্রয়োগের সবক্ষেত্রে রয়েছে– যেখানেই এলএলএম রয়েছে। এই অভ্যাসটি যে এলএলএমের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত– সে কথা মোটেই সান্ত্বনার উদ্রেক করে না। এলএলএম যদি তথ্যভান্ডারে থাকা তথ্যগুলোর পুনর্বিন্যাসের নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতো তাহলে এটি হতো না। সেক্ষেত্রে অবশ্য উদাহরণস্বরূপ যেই অণু বাস্তবে নেই বা আবিষ্কৃত হয়নি সেই অণু এলএলএম আবিষ্কার করতে পারতো না। এলএলএমের সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই হ্যালুসিনেশনের জন্ম। সৃষ্টিশীলতা বাড়লে হ্যালুসিনেশনও বাড়বে- এই সত্যটাই

এখন সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই কারণেই এলএলএমের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তার মিথ্যার অবসানের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সাম্প্রতিক উন্নয়ন নিয়ে পরিচালিত গবেষণায়ও ধরা পড়ছে– যে গত দুই বছর ধরে এলএলএমের উন্নত থেকে উন্নততর মডেলে হ্যালুসিনেশন বরং ক্রমাগত বেড়েছে।

এলএলএমের উন্নয়নে যে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এগিয়ে রয়েছে তাদের মধ্য থেকে চ্যাটজিপিটির সৃষ্টিকার ওপেন এআই বিষয়টিকে ঠিক এভাবে দেখতে চাইছে না। হ্যালুসিনেশনকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না এমন ধারণাকে কোম্পানি চ্যালেঞ্জ করেছে। তারা বল্ছে এলএলএমে হ্যালুসিনেশন অনিবার্যভাবে থাকবেই এ কথা ঠিক নয়। কারণ হিসেবে বল্ছে পূর্বাভাস দিতে সমস্যায় পড়লে এলএলএম যেন কোনোরকম পূর্বাভাস দেয়া থেকে বিরত থাকে সেই ব্যবস্থা এখন করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া হ্যালুসিনেশন কীভাবে সৃষ্টি হয়, তার আসল রহস্য এলএলএমের ডিজাইনাররা ভেদ করতে পারেন না– এমন ধারণাও ঠিক নয়। তাঁরা এটি বিলক্ষণ জানেন, এবং তাই সামনে এটি বন্ধও করতে পারবেন। তবে কাজটি সহজ হচ্ছে না।

বিভিন্ন দিক থেকে চেষ্টা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশনের আধিক্যকে কমানো যাচ্ছে। যেমন মডেল যেন নিম্নমানের তথ্যকে এড়িয়ে চলে সেটি নিশ্চিত করে এটি করা যাচ্ছে। মডেল যেন শুধু নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলো খুঁজে নিতে পারে– যেমন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান জার্নালকেই শুধু উৎস হিসেবে নিয়ে। কারণ দেখা গেছে যে নিম্নমানের তথ্য হ্যালুসিনেশন সৃষ্টিতে সহায়তা করে। মডেলের সঙ্গেই কিছু ফ্যাক্ট চেকিঙের ব্যবস্থা করেও তার মিথ্যা ভাষণ কমাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় মডেল যেই পূর্বাভাসটি দিতে যাচ্ছে তা সত্য নয়, তাহলে সেটি ফলাফলে আসবে না। উদাহরণস্বরূপ একটি ব্যবস্থা উল্লেখ করা যেতে পারে। মাইক্রোসফটের কোপাইলট এবং গুগলের জেমিনাই উভয় মডেলে যখনই অন্য কারো বরাত দিয়ে কিছু বলা হয় তার সবক'টিকে মডেল মূল উৎসে গিয়ে আগে দেখে নেয়– আর কারো বরাতে যেন কোনো মিথ্যার সৃষ্টি না হতে পারে।

সব থেকে ভাল যে ব্যবস্থাটি কাজ করছে, তা হলো মডেলের গাণিতিক প্রক্রিয়া যখনই কোনো অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয় তখনই সে যেন থমকে দাঁড়ায় এবং যেনতেন ফলাফল না দিয়ে অনিশ্চয়তাটি স্বীকার করে নেয়। এই কাজে মডেলের ব্যবহারকারীরা নিজেরাও সাহায্য করতে পারেন। মডেলকে প্রম্প্ট করার সময় তাকে বল্তে পারেন অনিশ্চয়তায় পড়লে সে যেন বলে 'আমি জানি না'।

এআই এজেন্টের ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন এড়াবার উপায় হলো মানুষ নিজে এজেন্টের লুপের মধ্যে থাকা। অলীক কোনো ফলাফল এজেন্টের এলএলএম থেকে এসে পরবর্তী কার্যসম্পাদনে বিপত্তি বাঁধিয়ে দেবার আগেই সেই মানুষ সেটি টের পেয়ে কাজটি বন্ধ করে দিতে পারে। এটি বিশেষভাবে করা হয় এজেন্ট যখন গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা, আইনি, অথবা বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। তখন মাঝখানে মানুষের এই তদারকিই বিপত্তি ঠেকাতে পারে। যখনই মনে হবে এলএলএম অদ্ভুত মিথ্যা কিছু সৃষ্টি করে সেই পথে কাজ করতে যাচ্ছে, তখনই তাকে থামাতে হবে।

হ্যালুসিনেশন এড়াবার জন্য মডেল প্রণয়নকারীরা নানা রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, সব মডেল প্রধানত একটি বিশেষ ধরনের কাজকে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়, সেক্ষেত্রে ওই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তাতে হ্যালুসিনেশন কম হয়। এসব মডেলেও বাড়তি হিসেবে কিছু সুযোগ থাকে অন্য বিভিন্ন রকমের কাজ করারও। কিন্তু সেসব করতে গেলে অলীক ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞান গবেষণার জন্য তৈরি বেশ কিছু রকমের মডেল এখন তৈরি হয়েছে। কম্পিউটার প্রোগ্রামিঙের কোড লেখার জন্যও সেগুলোকে ব্যবহার করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন বেশি হবে। উচিত কাজ হলো এই মডেলকে শুধু গবেষণার কাজে রেখে কোড লেখার জন্য সেই কাজের বিশেষ মডেল ব্যবহার করা।

ব্যবহারকারী নিজেও সতর্ক হলে হ্যালুসিনেশন কমাতে পারছেন। প্রম্প্ট করার সময় জটিল সব বাক্যে একসঙ্গে বহুরকমের নির্দেশ না দিয়ে যদি নির্দেশগুলো স্পষ্টভাবে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট বাক্যে দেয়া হয় তাহলে মডেলের পক্ষে অলীক কিছু তৈরি করার প্রবণতা কমে যায়। তা ছাড়া প্রম্প্টের মধ্যেই যদি মডেলের কাজে কিছু সীমারেখা টেনে দেয়া হয়, তখন মডেল যথেচ্ছভাবে নানা চরম দিকে চলে যেতে পারে না। যেমন প্রম্পটেই বলে দেয়া যায় মডেল যেন প্রতিষ্ঠিত জার্নালের রেফারেন্সগুলোকেই শুধু তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। ফলাফলের মধ্যে যেন যেই উৎসগুলোর রেফারেন্স দিয়ে দেয়া হয়। তাহলে ফলাফল আসার পর ব্যবহারকারীর পক্ষে চট্ করে ওই রেফারেন্সে গিয়ে তার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হবে।

বৈষ্যম্যের চক্রটি ভাঙবে কীভাবে?

এআইয়ের দ্বারা সৃষ্ট বৈষম্যের সমস্যাটি নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ২০২২ সালেই। তাদের উদ্বেগ বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়েছে কিছু

কিছু উন্নত দেশে অপরাধ দমন করার লক্ষ্যে এআই ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পুলিশী তৎপরতার বৈষম্য আরো বেড়ে যাবার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ওখানে বড় বড় নগরগুলোতে অপরাধ প্রবণতার মোকাবিলা করতে গিয়ে পুলিশ বিভাগ এআইয়ের কাছ থেকে পূর্বাভাস চায়– কোন্ এলাকাগুলোতে, কোন্ গোষ্ঠী-অধ্যুষিত জায়গায় কতটা নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অনুযায়ী পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়, সন্দেহভাজনদেরকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু এই যে পূর্বাভাস এআই দিচ্ছে সেটি নির্ভর করে যেসব অপরাধ-তথ্যের মাধ্যমে এআই মডেলের ট্রেনিং হয়েছে তার ওপর। সেসব পূর্ব-তথ্য আবার তৈরি হয়েছে পুলিশ এতদিন কোথায় কত অভিযান চালিয়েছিল, গ্রেপ্তার করেছিল, সন্দেহবশত আটক রেখে মামলা দিয়েছিল সেগুলোর কাহিনি দিয়ে।

কিন্তু জাতি-বর্ণ বৈষম্যপূর্ণ সমাজে পুলিশও বৈষম্যপূর্ণ কাজ করে এসেছে– কৃষ্ণাঙ্গ ও দরিদ্র অভিবাসীদেরকে ধরেই নিয়েছে অপরাধপ্রবণ বলে, আর শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত জায়গাগুলোকে মনে করেছে অপরাধ দমনে তেমন মনোযোগ না দিলেই চলে এমন অঞ্চল। মূল তথ্যগুলোই যেহেতু বর্ণ-বৈষম্যের সৃষ্টি, সেই তথ্যে ট্রেনিং নেয়া এআই সেভাবে বর্ণ-বৈষম্যময় পূর্বাভাসই দিতে বেশি অভ্যস্ত। ওই ফলাফল গ্রহণ করে পুলিশ যা করছে তা সেই পুরোনো বৈষম্যের নতুন সংস্করণ মাত্র– এবার এআইয়ের বরাত দিয়েই করা হচ্ছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগটি এখানেই। তবে ব্যাপারটি আসলে ওখানেই সীমাবদ্ধ নয়, ফলটি তার চেয়েও গুরুতর হতে যাচ্ছে।

আগের বৈষম্যমূলক তথ্যকে এআই অ্যালগরিদম তার গাণিতিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এক রকম ফীডব্যাক লুপে রূপ দেয়– যেখানে মডেলের আউটপুট আরো প্রকট হয়ে প্রতিবার তার ইনপুটে আবার দেখা দেয়। এভাবে বৈষম্য প্রত্যেকবার চক্রাকারে প্রকটতর হতে থাকে বারবার। কাজেই এআই পুরানো বৈষম্যকে কার্যত বাড়িয়ে দিচ্ছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের পরামর্শ হলো এআই আলগরিদমগুলোকে এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন তা বিশ্ব মানবাধিকার সনদগুলোর নিয়মনীতি মেনে চল্তে বাধ্য থাকে। সেটি যতদিন না হবে ততদিন বর্তমান বৈষম্য সৃষ্টিকারী মডেলগুলো যেন পুলিশ ব্যবহার না করে।

বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে যে সার্বক্ষণিক তথ্য হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসাকেন্দ্রে সৃষ্টি হয়ে চল্ছিল, চিকিৎসা সংক্রান্ত এআই মডেলকে সেগুলোর ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। ধরা যাক্ হাসপাতাল এআই ব্যবহার করছে কোন্

রুগীর শারীরিক পরিস্থিতি অনুযায়ী অপারেশন ইত্যাদির সুযোগ আগে পাওয়া উচিত সেটি নির্ণয়ে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এক জন কৃষ্ণাঙ্গ রুগীর ক্ষেত্রে যত খারাপ অবস্থা হলে সেই অগ্রাধিকার দিতে বল্‌ছে এআই, একজন শ্বেতাঙ্গ রুগীর ক্ষেত্রে তার থেকে অনেক কম গুরুতর অবস্থায় সেই অগ্রাধিকার দেবার পরামর্শ দিচ্ছে। এর কারণ জাতি-গোষ্ঠীগত কারণে কৃষ্ণাঙ্গ রুগীর শারীরবৃত্ত শ্বেতাঙ্গের থেকে আলাদা, অথচ তথ্যভান্ডারে এমন তথ্য যথেষ্ট নেই, যাতে মডেল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রয়োজন ও জরুরি পরিস্থিতিগুলো ধরতে পারে। যেসব বড় বড় উচ্চ ব্যয়ের হাসপাতাল থেকে তথ্যগুলো এসেছে কৃষ্ণাঙ্গ রুগী দারিদ্র্যের কারণে সেগুলোতে তেমন যেতেই পারেনি। তেমনি লিঙ্গ-বৈষম্যও ওই তথ্যের ভেতরে প্রকট। ফলে নারীর সুচিকিৎসায় ওই এআই মডেল পিছিয়ে থাক্‌ছে। এমনি আরো বিভিন্ন বৈষম্যকে প্রকট করছে চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু কিছু এআই মডেলগুলো।

প্রচুর সমালোচনা এ নিয়ে হবার পর অন্তত চিকিৎসার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মডেলগুলোর ট্রেনিঙের সময় তথ্যগুলোর মধ্যে আরো বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা হচ্ছে– এবং অবস্থার বেশ কিছু উন্নতি ঘটেছে।

উন্নয়নের কিছু প্রমাণ মিলেছে ড্যাল ই-২ নামক ইমেজ মডেলের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায়। জনপ্রিয়তায় ড্যাল ইকে ইমেজ জগতের চ্যাটজিপিটি বললে ভুল হবে না। গবেষণাটিতে এই মডেলকে প্রম্প্‌ট করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও সার্জনদের কথা উঠলে তার সামনে যে চেহারাগুলো ভেসে ওঠে, প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সেরকম কয়েক জনের চেহারার ছবি আঁকতে। ওঁরা কোন্‌ কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হবেন, তা বলে দেয়া হয়েছে– যার মধ্যে আছে ভাইরোলজিস্ট, রেডিয়োলজিস্ট, অন্‌কোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট ইত্যাদি আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন বিচিত্র শাখা। এমনিভাবে ১৯টি বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিটিতে চারজনের ছবি আঁকতে বলা হয়েছে। এই একই প্রম্প্‌ট দিয়ে মডেলটিকে তিনবার চালানো হয়েছে, ফলে প্রত্যেক বিষয়ে ১২টি ছবি পাওয়া গেছে। ছবিগুলোতে পুরুষ আর নারী চিকিৎসক যেমন এসেছে তেমনি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নানা চেহারাও এসেছে– বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে। দেখা গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের ছবিতে যে অনুপাতে নারী-পুরুষ, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ ইত্যাদি এসেছে তা আমেরিকান একাডেমি অফ মেডিক্যাল কলেজেস এর সর্বশেষ ডাক্তার ও সার্জনদের তালিকার একই অনুপাতের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ চিকিৎসা পেশায় লিঙ্গ-বৈষম্য, জাতি-বৈষম্য ইত্যাদি বাস্তবে যতখানি আছে ড্যাল ই ২ মডেলটি

নিজেও ঠিক সেভাবেই দেখাতে পেয়েছে– মোটেও সেটিকে বর্ধিত করেনি। ডাক্তারদের যেসব তথ্য এ মডেলের ট্রেনিঙে এসেছে, সেটিই শুধু প্রতিফলিত হয়েছে।

কিন্তু একটি সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। মডেল বৈষম্যকে বাড়িয়ে বল্‌ছে না বটে, কিন্তু ড্যাল ই-২ এর মতো এত জনপ্রিয় এআই মডেল যখন আজকের বৈষম্যপূর্ণ সমাজকেই প্রায় অনিবার্য হিসেবে সবার কাছে তুলে ধরছে, ওভাবেই পূর্বাভাস দিচ্ছে তখন সবাই একেই স্বাভাবিক মনে করা শুরু করতে পারে। ইতোমধ্যে হয়তো প্রকৃত জীবনে, চিকিৎসা, শিক্ষায় বৈষম্যগুলো কমে যাচ্ছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এই নতুন তথ্য মডেলের নতুনতর সংস্করণের ট্রেনিঙে ব্যবহৃত না হবে, ততদিন এই মডেল পুরানো বৈষম্যের কথাই তুলে ধরবে। এই দুষ্টচক্র থেকে রক্ষা পাবার আসল উপায় হলো প্রকৃত জগতে চিরতরে বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

তথ্যভান্ডারের জোগান

তথ্যের উৎস: কয়েক বছর আগে এলএলএম এসে যখন সৃষ্টিশীল এআইয়ের শুরু ঘটিয়েছে এখন থেকে দেখা দিয়েছে এর জন্য তথ্যের একটি বিশাল চাহিদা। এই তথ্য কোথা থেকে আসছে, কীভাবে, সেটি একটি বড় প্রশ্ন– মডেল নির্মাতা ও ব্যবহারকারী সবার জন্য তো বটেই, ওই তথ্য যারা মূলত সৃষ্টি করেছে সেই সর্বসাধারণের জন্যও। তাই এ প্রশ্নটি বর্তমান এআই উন্নয়নের পথে এবং তার থেকেও বেশি এর ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতির ভাবনার ক্ষেত্রে নানা উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

এলএলএম সব রকমের তথ্য ব্যবহার করছে। বিশেষ করে ভাষা সংক্রান্ত এলএলএম যে একেবারে গুছানো সারণিতে সাজানো তথ্যই শুধু ব্যবহার করছে তা নয়, প্রচুর তথ্য থাকে আগোছালো– যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই নিয়ে কাজে লাগানো হচ্ছে। এলএলএমের অ্যালগরিদমকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে আজ এরকম তথ্যের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। মডেলের জন্য অবশ্য লক্ষ্য থাকে তথ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় কিছু গুণ আছে কি না দেখে সেগুলোকেই কাজে লাগানো। অনেক সময় ওই গুণগুলোর প্রত্যেকটি বোঝাতে ইংরেজিতে যে শব্দ রয়েছে তার প্রথম অক্ষরে ‘ভি’ অক্ষরটি এসে পড়ে। যেমন একটি গুণতো আমরা সবসময় জানি তা হলো ভলিউম বা পরিমাণ। তথ্যের পরিমাণ খুব বেশি হতে হবে– সেটিই তো এলএলএমের প্রাণ। ডিজিট্যাল অবস্থায় যত কিছু আছে সবই ব্যবহার করা হচ্ছে– বই, ইমেইল, ইন্টারনেট দিয়ে নানা যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস যোগ করে তার মধ্যে যা তথ্য বিনিময় সব, ব্যবসায়িক লেনদেন, ডাক্তারি তথ্য– হেন জিনিস নেই যাকে

ব্যবহার করা হচ্ছে না। ওই তথ্যের চলাচলটি দ্রুতগতির হলে কার্যত ট্রেনিং ভাল হয়, মডেলের ব্যবহারও। সেরকম দ্রুত হতে পারা তথ্যের আর একটি বড় গুণ– ভ্যালোসিটি বা গতি। বৈচিত্র্যই তথ্যকে যথাযোগ্য কাজে লাগাবার সুযোগ দেয়; যেমন স্টক এক্সচেঞ্জের দর উঠানামার প্রত্যেকটি ধরনকে ধরতে না পারলে তো সে তথ্য উপযুক্ত হবে না– তাই ভ্যারাইটি বা বৈচিত্র্য বড় গুণ। তবে সবকিছুর আগে তথ্যটি সত্য হতে হবে, তার মধ্যে ভ্যারাসিটি বা আস্থায় নেবার গুণ থাকতে হবে। তথ্যের মধ্যে সত্যতার অভাব ঘটলে মডেলের অলীক ফলাফল, মিথ্যা ফলাফল দেবার প্রবণতা অনেক বেড়ে যেতে পারে। তথ্য হিসেবে সবখান থেকে সবকিছু নেয়া হতে পারে– কিন্তু মডেলের কাজের জন্য সব তথ্যের ভ্যালু বা মান সমান হবে এমন কথা নেই। মডেলটি যে কাজের জন্য তার নিরিখে কোনো কোনো তথ্যের মান বেশি, কোনো কোনোটির মান কম। মানসম্মত না হলে তথ্য বেশি কাজে আসবে না। কাজেই তথ্যের প্রশ্ন উঠলে ভলিউম, ভ্যালোসিটি, ভ্যারাইটি, ভ্যালু সব দিকে লক্ষ রাখতে হয়।

যত কম্পিউটার অথবা যন্ত্র থেকে তথ্য বিনিময় করা হচ্ছে, যত কিছুতে তা সংরক্ষণ করা আছে সবই তথ্যের উৎস হতে পারে। এটি ওই বিনিময়ের যেকোনো সুবিধাজনক প্রান্ত থেকে আসতে পারে, যে দিচ্ছে তার থেকে বা যে পাচ্ছে তার থেকে। যেই কোম্পানি মডেল তৈরি করছে তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে পারে এই সবকিছু, আবার কোনো কোনোগুলো তৃতীয় পক্ষের থেকে নেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন মার্কেটিং কোম্পানি এমনি তথ্যের তৃতীয় পক্ষ হতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া অসংখ্য পোস্ট সেই মাধ্যমের কর্তৃপক্ষ তথ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। আবার ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলো তাদের গ্রাহকদের মধ্যে নানা রকম জরিপের আয়োজন করে যাতে ওই গ্রাহকদেরকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে প্রচুর নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়। কিছু তথ্য নানা ব্যতিক্রমী সব উৎস থেকে আসতে পারে। সেরকম একটি সরল উদাহরণ হলো মানুষের মোবাইল ফোন কোন্‌টি কোথায় আছে তা জানিয়ে দিতে পারে ওই মানুষগুলো কে কোথায় আছে, বড় পালা পার্বণে নগর ছেড়ে কারা কোথায় ছড়িয়ে পড়ছে। আসলে তথ্য পাওয়ার কোনো সুযোগকে অবহেলা করা হয় না। শুধু দেখা হয় ওই মডেলটি তৈরিতে ব্যবহৃত তথ্যে ওপরে দেয়া সেই 'ভি' দিয়ে শুরু হওয়া গুণগুলো আছে কি না।

তথ্যের মালিকানা: বিচিত্র উৎস থেকে তথ্য তো সংগ্রহ করা যাচ্ছে, কিন্তু সমস্যাটি দেখা দেয় ওই তথ্যের মালিকানা নিয়ে। মডেল প্রস্তুতকারীরা চেষ্টা করে,

যাতে তারা পাবলিক ব্যবহারের সর্বজনীন উন্মুক্ত তথ্যগুলোকে নিয়েই কাজ করতে পারে, যার ওপর অন্য কারো স্বত্ব নেই। যেক্ষেত্রে স্বত্ব আছে, সেগুলো লাইসেন্সিঙের মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু তারপরও তথ্যের মালিকানা প্রসঙ্গটি একটি অত্যন্ত নাজুক বিষয় হয়েই থাকছে।

বর্তমানে তথ্য যার দখলেই থাকুক যাদের নিয়ে সেই তথ্য সেটি আরেক জায়গায় ব্যবহৃত হলে সেই মানুষগুলোর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার যে হানি হয়, সে বিষয়টি প্রায়ই অবহেলিত হচ্ছে। এখন তাই প্রতিবাদ উঠছে যাদের তথ্য তাদের অনুমতি ছাড়া সেগুলো হস্তান্তরের অধিকার কারো আছে কি না সেই প্রশ্ন তুলে। এ নিয়ে স্পষ্ট আইন এখনো নেই। কিন্তু হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে রুগীর তথ্য, কোম্পানি থেকে গ্রাহকদের তথ্য ইত্যাদি বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর করার মধ্যে যে একটি অনৈতিকতা রয়েছে, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। আরো প্রতিবাদ যেটি উঠ্ছে সেটি ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি– শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞদের যে সব সৃষ্টিকে এআই তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে তাঁদের মেধাস্বত্বের যথোপযুক্ত মূল্য না দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁদের অনেকে দল বেঁধে এ নিয়ে আদালতেও গিয়েছেন। কিন্তু এআই ট্রেনিঙে সৃষ্টিকর্ম ব্যবহৃত হলে মেধাস্বত্ব লঙ্ঘিত হয় কি না সেই মূল প্রশ্নের এখনো ফয়সালা হয়নি।

ব্যাপকভাবে আরো একদল মানুষের কাজকে তথ্য হিসেবে ব্যবহার করছে মডেল প্রস্তুতকারীরা– তাঁরা হলেন ওই মডেলের ব্যবহারকারীরা। যখনই তাঁরা মডেলটি ব্যবহার করছেন, যখনই তাঁরা প্রম্প্‌টে কিছু দিয়েছেন সেটি তাঁদেরই সুচিন্তিত সৃষ্টি। অনেক সময় প্রম্প্‌ট করতে গিয়ে তাঁরা নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা-সৃষ্টিশীলতার প্রচুর প্রমাণ দিয়ে থাকেন (তাঁদেরকে বলাই হয় প্রম্প্‌ট-ইঞ্জিনিয়ার)। কোনো কোনো রচনা, ছবি, সঙ্গীত ইত্যাদি এমন পর্যায়ে যায় তখন তাকে এককভাবে ওই এলএলএমের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা যায়না, বলতে হয় যে এটি প্রম্পটার ও মডেলের যৌথ সৃষ্টিকর্ম। অথচ মডেলের উন্নয়নে অবলীলাক্রমে ওই প্রম্প্‌টে দেয়া প্রচুর তথ্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যবহারকারীদেরকে কোনো স্বীকৃতি না দিয়েই। তবে এক্ষেত্রে কোনো কোনো মডেল প্রস্তুতকারক কোম্পানি বলে থাকে যে, তারা অনেক মডেল বিনামূল্যে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে ব্যবহারকারীদের প্রতি সেই ঋণের শোধ করছে।

তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্রঃ তথ্যগুলো দিয়ে ট্রেনিং দেবার সময় বা মডেল ব্যবহারের সময় সংগৃহীত সব তথ্যগুলো কোথায় রাখা হয়? এর জন্য সৃষ্টি করতে হচ্ছে বিরাট

বিরাট সব ডাটা সেন্টার যেখানে ইলেকট্রনিক কৌশলে তথ্য সংরক্ষিত থাকে। দু'রকমের সংরক্ষণের ব্যবস্থা তাতে থাকে কিছু নিত্যব্যবহারযোগ্য অবস্থায় অনেকটা কম্পিউটারের র‍্যামের মতো (র‍্যান্ডম এক্সেস মেমোরি)। আর বাকি তথ্য থাকে দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণে অনেকটা কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কের মতো ব্যবস্থায়। যদিও মূল পদ্ধতিটি কম্পিউটার মেমোরির সঙ্গে তুলনীয় কিন্তু এর আকার-বহর এত বড় যে এবং এতে যে বিপুলভাবে একসঙ্গে সমান্তরালে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ করতে হয় সেজন্য অনেক উন্নত ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতির শরণাপন্ন হতে হয়। বলা যায় ডাটা সেন্টারের ডিজাইন ও আর্কিটেকচার অনেক গুণে বেশি চ্যালেঞ্জিং ও এখনো ক্রম উন্নয়নশীল।

ডাটা সেন্টারে রক্ষিত তথ্য মূলত দুটি কাজে লাগে। একটি হলো নতুন মডেল তৈরির জন্য যখন এই বিশাল তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে তাকে ট্রেনিং দিতে হয় তখন; এবং দ্বিতীয়টি হলো যখন বিশ্বের অসংখ্য মানুষ সারাক্ষণ ওই মডেলটি ব্যবহার করেন তখন। ট্রেনিঙের কাজটি একটি বড় কাজ এবং এ কাজে মডেলের অ্যালগরিদমকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে খুবই বড় ও তীব্র কম্পিউটেশন-চাহিদার সম্মুখীন হতে হয়। এতে এ তথ্যের ব্যবহার ঘটে খুবই ব্যাপকভাবে– কারণ এর মাধ্যমেই তো মডেলের ওজন বা প্যারামিটারগুলো খুঁজে পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত পরবর্তী কালের সবরকমের ব্যবহারের জন্য এগুলো নির্ধারিত হয়ে যায়। ট্রেনিঙের প্রত্যেকটি ধাপেই এই একই কারণে বিশাল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। পুরো ট্রেনিঙে যে বিদ্যুৎশক্তি দরকার হয় তার জোগান দেয়া এআই উন্নয়নের পথে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি। অবশ্য এরপর এই মডেল ব্যবহারেও বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন কম নয়– কাজেই ওই বিদ্যুতের খাই চলতেই থাকে।

ডাটা সেন্টারের তথ্যের দ্বিতীয় প্রকারের এই ব্যবহার শুরু হয় যখন সত্যিকার জগতে মানুষ ব্যবহারকারীরা মডেলটি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। উদাহরণস্বরূপ চ্যাটজিপিটির মতো একটি চ্যাটবটকে প্রম্পট করে যখনই কিছু করতে দেয়া হয় দুনিয়ার যেকোনো জায়গা থেকে, তখনই সে তাকে দেয়া নতুন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে ওই মডেলের প্যারামিটারগুলোর ব্যবহার-বিশ্লেষণ করবে। তখনো ডাটা সেন্টারে তথ্যগুলোর প্রক্রিয়াকরণ হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটেশনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে খুবই অল্প, আর ডাটা সেন্টার থেকে তথ্যের ব্যবহারও সীমিত– ঠিক এই সমস্যাটিতে ইনপুট হিসেবে দরকারি তথ্যগুলো নিয়ে আউটপুট দিতে যতটা দরকার শুধু সেইটুকু। কাজেই একজন ব্যবহারকারীর প্রত্যেক একবার

ব্যবহারে কম্পিউটেশন, তথ্য ব্যবহার, এবং ফলে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার তুলনামূলকভাবে খুব কম। কিন্তু ব্যবহারের মোট ব্যয়কৃত বিদ্যুৎশক্তির কথা যদি বলি, প্রতি মুহূর্তে দুনিয়াজোড়া যে অসংখ্য মানুষ মডেলটিকে ব্যবহার করছে, তাদের সবার কাজের জন্য মোট বিদ্যুৎ শক্তির কথা– তাহলে সেটিও এক এলাহি ব্যাপার! আর যতদিন ধরে এ ব্যবহার চল্‌বে, অন্যান্য সব মডেলের ব্যবহার চলবে এই ডাটা সেন্টার থেকে, তার মোট বিদ্যুৎ পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা তো সবাই চিন্তিত হবার একটি বিষয়।

ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তি এখন ট্রেনিঙের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তিকে অনেক ছাড়িয়ে যায়– হয়তো ডাটা সেন্টারের মোট বিদ্যুৎ খরচের ৬০% থেকে ৯০% মডেল ব্যবহারেই যায়। ডাটা সেন্টারের বিদ্যুৎ ব্যয়ের একটি বড় অংশ হলো এর শীতলীকরণের জন্য। সংরক্ষণে ও তথ্য আদান-প্রদানের কাজগুলো করতে গিয়ে এখানে অল্প জায়গায় বিশাল ঘনত্বে থাকা ডিভাইসগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এগুলোকে শীতল করে স্বাভাবিক কাজে রাখতে পানি অথবা বাতাসের মাধ্যমে নিত্য তাকে ঠান্ডা রাখতে ব্যয় হয় বিশাল পরিমাণ বিদ্যুৎ। কাজেই ডাটা সেন্টার তৈরি করার সময় বিদ্যুৎশক্তির প্রাপ্যতাটি একটি বড় চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, আজকের প্রাপ্যতা এবং আগামী দিনের। একই সঙ্গে এর ফলে পারিবেশিক বিপর্যয় যে বাড়ছে, সেটিও ভাবাচ্ছে। এখনো এত বেশি বিদ্যুৎ ব্যয়ের অনেকটাই ফসিল ফুয়েল থেকে আসছে। ঠান্ডা করতে গিয়ে প্রচুর পানির অপচয় হচ্ছে, প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। গুগল ঘোষণা করেছে এমন পরিবেশ দূষণ যেন কম হয় তার জন্য তারা আগামি দশকে কিছু ডাটা সেন্টার মহাশূন্যে স্থাপন করবে!

বর্তমান তথ্যভান্ডারের চাহিদা মেটানো হয় প্রধানত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ক্লাউড (মেঘ) নামে পরিচিত দূরবর্তী ডাটা সেন্টারগুলো দিয়ে। ব্যবহারকারীদের কাছে দূরে (কল্পনায় যেন ঐ আকাশের) কোথাও তথ্য জমা রয়েছে এমন ধারণা দেবার জন্য এই নাম। বিভিন্ন কোম্পানির ক্লাউডগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত গুগল ক্লাউড, মাইক্রোসফ্‌ট আজ্যুর, আমাজন ওয়েব সার্ভিস ইত্যাদি সাধারণ কম্পিউটার ব্যবহারকারীদেরকেও তথ্য রাখার সুযোগ দিয়ে থাকে। এসব বড় বড় কোম্পানির এআই মডেলগুলোর এবং সেগুলোর উন্নয়নের তথ্যের খাই অনেক বড়, কাজেই নিজেদের প্রয়োজনেই তাদেরকে এই ডাটা সেন্টারগুলো করতে হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট কোম্পানি নিজেদের মডেলের জন্য ওই বড়দের

ক্লাউডগুলোই ব্যবহার করছে। অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে থাকা এ সেন্টারগুলোর স্থান নির্বাচন করতে গিয়ে এমন সব অঙ্গরাজ্য ও সেখানকার এলাকা বেছে নেয়া হয়েছে, যেখানে বিদ্যুতের জোগান বাড়ছে, বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা ভাল রয়েছে, কিন্তু স্থানীয় বিদ্যুৎ চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম। আরো বড় কথা সেখানে আগামী বছরগুলোতেও উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ থাকবে মনে করা হচ্ছে।

গত বেশ কিছু বছর ধরে এআই সম্প্রসারণ এতো দ্রুত হয়েছে যে, দশ বছর আগেও ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ব্যয়কারী একটি ডাটা সেন্টারকে যেখানে বড় মনে করা হতো এখন অধিকাংশের জন্যই ২০০ মেগাওয়াটকেই স্বাভাবিক মনে হয়। সামনের দিনগুলোতে এআই যেই হারে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে, তাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সব এআই ডাটা সেন্টার মিলে মোট বিদ্যুৎ ব্যয় ২০০ গিগা ওয়াট ছাড়িয়ে যাবে বলেই বেশিরভাগ প্রাক্কলনে আন্দাজ করা হচ্ছে! এ অসম্ভব রকম বিদ্যুৎ চাহিদা!

চাহিদার তুলনায় তথ্যের অভাব: এআইয়ের আরো বড় উন্নয়ন মানে আরো বেশি তথ্যের চাহিদা। দুনিয়ার মানুষ মিলে যা তথ্য সৃষ্টি করছে, তার কিছুই তো এখন এআইয়ের ব্যবহার থেকে বাদ যাচ্ছে না। তাহলে সামনের বাড়তি চাহিদা কীভাবে পূরণ হবে? একটি উপায় হলো মানুষ-সৃষ্ট তথ্যের ওপর শুধু নির্ভর না করে কৃত্রিম তথ্য উৎপাদন করা, এই এআইয়ের সাহায্য নিয়ে কম্পিউটার সিম্যুলেশনেইতো আমরা বিশাল পরিমাণ তথ্য তৈরি করতে পারি যেগুলো বাস্তব দুনিয়ার তথ্য নয়। কম্পিউটার-সৃষ্ট হলেও এগুলো অগ্রহণযোগ্য কিছু নয়। ঠিক এই তথ্যটি বাস্তবে নেই, তার মানে এই নয় যে এটি বাস্তবতা বিবর্জিত কোনো তথ্য। এটি অনায়াসেই বাস্তবে থাকতে পারতো, কাজেই এআইয়ের কাছে এটিও মূল্যবান।

সাদামাটাভাবে ভাবলে মনে হবে এরকম কৃত্রিমভাবে তথ্য যখন আমরা অফুরন্তভাবে তৈরি করে নিতে পারি তাহলে তথ্য নিয়ে সমস্যাটি কোথায়? তাছাড়া এসব কৃত্রিম তথ্যের সঙ্গে কোন সত্যিকার মানুষের সম্পর্ক নেই বলে মালিকানা, মেধাস্বত্ব, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ইত্যাদি নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই, এই তো ভালো। কিন্তু এতেও সমস্যা রয়েছে। কৃত্রিম তথ্য তৈরিতে এআই সৃষ্ট ফলাফল থেকে তথ্য এনে এবং সেই তথ্যকে আবার এআইয়ের ট্রেনিঙে ব্যবহার করলে এআই বুঝবে সেগুলো তারই নিজের সৃষ্ট তথ্য; সেই সুবাদে একে মূল উৎসের তথ্য থেকে নিম্নমানের বলে অনুভূত হবে তার কাছে। আবার কখনো মডেলের কাছে এ তথ্য কিছুটা নিজ প্রভাবিত একপেশে তথ্য হিসেবেও বিবেচিত হবে– অনেকটা অন্তর্জাত

বংশবৃদ্ধির মতো। এর ফলে মডেলের কাজে এমন কিছু বিঘ্ন ঘটে, যাকে বলা হয় মডেল কলাপ্‌স করা বা ধসে পড়া। এতে বিবেচনাহীন, এমনকি অলীক উত্তর পাবার সম্ভাবনা বাড়ে। অবশ্য কৃত্রিমভাবে তৈরি তথ্য থেকে ভালভাবে মান বিচার করে বাছাই করে নিলে এই ধসে পড়ার সম্ভাবনাটিকে ন্যূনতমে পরিণত করা সম্ভব।

কৃত্রিম তথ্য তৈরি করা ছাড়াও তথ্য বাড়াবার আরো একটি উপায় আমরা দেখে ফেলেছি। সেটি হলো আসল বাস্তব জগতের একটি তথ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করে ভাগগুলোর প্রত্যেকটিকে আলাদা তথ্য হিসেবে নেয়া, এবং সেভাবে একটি থেকে বহু নতুন তথ্য সৃষ্টি করা। এক অংশ ঢেকে রেখে, তথ্যে রদবদল করে, এবং আরো নানা উপায়ে এটি করতে আমরা দেখেছি। তাছাড়া এখন মনে করা হচ্ছে যে এলএলএমের তথ্যের খাই আমরা যতটা মনে করছি, ঠিক এতটা নাও হতে পারে। অ্যালগরিদম রচনায় এখন এমন সাফল্য আসছে যেখানে তথ্যের সংখ্যা নয়, বরং ট্রেনিং কাজে তার দক্ষতাটাই হবে মুখ্য বিষয়, আর আলগরিদমের নতুন সংস্করণে সেটিকে গুরুত্ব দেয়া যাবে।

এআইয়ের ওপর বিধি-নিষেধ

এআইয়ের উন্মেষ যখন থেকে হয়েছে তখন থেকেই একে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যৎদর্শী চিন্তাবিদদের কেউ কেউ এর ওপর তখনই নিষেধাজ্ঞা দেবার কথাও ভেবেছিলেন। সেসব ভাবনা এসেছিল কল্পনায় এআইয়ের ওই প্রাথমিক সাফল্য কোথায় গিয়ে যে ঠেকতে পারে সেই ভীতি থেকে। সবার কাজকর্ম নিয়ে নেবার ও ধন-বৈষম্য অসম্ভব রকম বেড়ে যাবার কারণে অর্থনৈতিক-সামাজিক মহা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কার কথা যেমন ভাবা হয়েছে, তেমনি একে বাড়তে দিলে আরো ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাও মনে হয়েছে। এতে মনে হয়েছে এআই একদিন নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অবাধভাবে বুদ্ধিমত্তায় মানুষকে অনেক দূর ছাড়িয়ে যাবে। তখন দুর্ঘটনাক্রমে অথবা কিছু কুচক্রী স্বার্থান্ধ মানুষের চক্রান্তে এআই মানুষের বড় ক্ষতি করার চেষ্টায় নামবে বা মানুষকে দাসে পরিণত করবে। এমন চিন্তা ব্যাপকভাবে ছিল, এখনো তাত্ত্বিকভাবে এর সুদূর সম্ভাবনা রয়েছে, যা আমরা পরে দেখবো। বর্তমানে একদিক থেকে এমন দুশ্চিন্তা বেড়েছে, কারণ এআইয়ের সক্ষমতা সবাইকে চম্‌কে দেবার মতো বেড়ে চলেছে; আবার অন্যদিক থেকে দুশ্চিন্তা কমেও গেছে, কারণ এআই আপাতত কী পারে, কী পারে না

সেসব জিনিস আরো স্পষ্ট হয়েছে; এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেরকম ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেরকম লাগামছাড়া প্রবণতার প্রমাণ মেলেনি।

এ মুহূর্তে তাই এআইয়ের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের আরো বাস্তব ও সমসাময়িক কারণগুলোই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি। কিন্তু ওই দূরবর্তী আশঙ্কাগুলো এর মধ্যেও রয়ে গেছে। মনে করা হচ্ছে যে যদি এখনই বর্তমান সমস্যা প্রতিকার করে এআইয়ের অগ্রগতির ওপর সুবিবেচনার সঙ্গে একটি বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে ওই ভয়ঙ্কর অবস্থায় যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। বর্তমানে যে সমস্যাগুলো প্রকট তার মধ্যে রয়েছে এআইয়ের অপব্যবহার। বহু অসৎ মানুষ এটি ব্যবহার করে প্রতারণা করছে। ভুয়া খবর, ভুয়া তথ্য, ভুয়া দলিল-সাক্ষ্য-প্রমাণে এআইয়ের ব্যবহার এখন মানুষকে সহজেই ভুল পথে নিয়ে যেতে পারছে। মানুষের কারণে ঘটছে বলে এর প্রতিকার করা হয়তো খুব কঠিন হবে না, অনেকটা প্রতিকার হচ্ছেও।

কিন্তু এআইয়ের নিজের ভেতর থেকেই কিছু ক্ষতিকর প্রভাবের সৃষ্টি হচ্ছে, যা তার উন্নয়নের সময়েই মডেল প্রস্তুতকারীরা সাবধান না হলে বাড়তেই থাকবে। মডেলগুলোর মধ্যেই সুযোগ আছে, যাতে শিশু ও অল্পবয়সিরা গুরুতর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারছে কিছুটা খেলাচ্ছলেই তার ব্যবহার করে, তার পরামর্শ নিয়ে। অন্যদিকে বর্তমান এজেন্টিক এআইকে এমন স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া সম্ভব হচ্ছে যে, এটি অনায়াসে ভুল পথে গিয়ে দারুণ অনর্থের সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। এখনো অবশ্য এজেন্টিক এআইয়ের মধ্যে মানুষের প্রচুর ভূমিকা থাকছে, থাকতে হচ্ছে। কিন্তু শিগ্‌গির একদিন ওই ভূমিকার প্রয়োজন হবে না বলে মানুষ হয়তো তাকে আরো স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কাজ করে দেবার কাজে লাগাতে চাইবে। তখন বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে।

ওসব নানা কারণে দেশে দেশে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষতো বটেই, এমনকি বর্তমানের দারুণ এআই অগ্রগতির মূল নায়করাও এআইয়ের যথেচ্ছ উন্নয়নের বিপক্ষে। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা এমন কোনো ঢালাও বিধি-নিষেধ এর গবেষণার ওপর আরোপ করতে চান্ না, যাতে এই মহা সম্ভাবনাময় প্রযুক্তির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সেটি করে উল্টো যারা আইনের আওতার বাইরে থাকবে, তারাই এর উন্নয়নে এগিয়ে যাক এটা কেউ চান্ না। তাঁরা বরং কর্তৃপক্ষগুলোর কিছু নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়ে একে ইতিবাচক খাতেই প্রবাহিত হতে দিতে চান।

বিধি-নিষেধ আরোপের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষা লক্ষণীয়। এটি ব্যবসার ভেতর এআই ব্যবহার করে

যে নীতিবিরুদ্ধ কাজ সম্ভব, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেখানে বিভিন্ন শক্তির অশুভ আঁতাঁতের মাধ্যমে ইচ্ছেমত পণ্যের দাম নির্ধারণের সুযোগ করে দিচ্ছে এআই। বাজার ব্যবস্থাকে এরকম বিভিন্নভাবে বিকৃত করতে পারে অনিয়ন্ত্রিত থাকা এআই। আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমান্তরালে ক্রিপটোকারেন্সি নামের ব্যবস্থাটি এআইয়ের কারণে বেশ বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারছে, ব্যাংকিং রক্ষাকবচগুলো তাতে যথেষ্ট নেই বলে। এখানে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

হাভার্ডের এ সমীক্ষা অনৈতিক কাজের মধ্যে মানুষের মনকে প্রভাবিত করতে এলএলএমের উচ্চ ক্ষমতাকেও দায়ী করেছে। এটি আগ্রহী প্রম্প্টের উস্কানি পেলেই মানুষকে জুয়ায় আসক্ত হওয়া কিংবা অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত হবার মতো ক্ষতিকর দিকে নিয়ে যেতে পারছে। তাই বিজ্ঞানসম্মত সহায়ক পরামর্শ দেবার ব্যাপারে কোনো বিঘ্ন না ঘটিয়ে চ্যাটজিপিটির বা ক্লডের মতো শক্তিশালী মডেল যেন এরকম ক্ষতিকর পরামর্শ দিতে না পারে, সেজন্য ব্যবস্থা নেবার পক্ষপাতী এই সমীক্ষা। কর্তৃপক্ষ ও মডেল উন্নয়ন কোম্পানি উভয়ের বোঝাপড়ার মাধ্যমেই সেটি সম্ভব হতে পারে। প্রম্প্ট করে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না, তার মাঝখানে একটি লাল রেখার ব্যবস্থা করতে পারাটিই লক্ষ্য হতে হবে। এই সীমা অতিক্রম করলে চ্যাটবট সাড়া দেবে না এমন নিশ্চয়তা চায় এ সমীক্ষা।

এ ধরনের প্রস্তাবে বড় বড় এআই প্রস্তুতকারকরা নিজেরাও যথেষ্ট সমর্থন জুগিয়েছে। যেমন চ্যাটজিপিটির কোম্পানি ওপেন এআই মনে করে ওরকম লাল রেখাকে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। তাছাড়া নিজের মানসিক পরিস্থিতি সম্পর্কে চ্যাটবটের সঙ্গে যেকোনো আলাপ কিছুক্ষণের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যেতে হবে, যাতে ব্যবহারকারীর এসব সংবেদনশীল বিষয়ের গোপনীয়তা ভঙ্গ না হতে পারে, এমনকি মডেল নির্মাতাদের কাছেও। তাদের আরেকটি পরামর্শ হলো এআইয়ের মডেলগুলো যেহেতু সারা দুনিয়ায় ব্যবহৃত হয়, সেজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে বিধি-নিষেধগুলো যেন ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার গুটিতে পরিণত না হয়।

এআইয়ের নতুন নতুন মডেল উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো কোন্ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হবে, সেই ব্যাপারে দু'রকম মত রয়েছে। একটি মত হলো এটি একেবারে গোড়া থেকে, মডেলের পরিকল্পনা ও তৈরি করার শুরু থেকেই নজরদারিতে আনা উচিত। এর কারণ মডেলের অ্যালগরিদমের মধ্যেই এর সম্ভাব্য ক্ষতির বীজ নিহিত থাকে, কাজেই এ পর্যায়ে থামানো না গেলে, একবার তৈরি হয়ে বাজারে গেলে থামানো কঠিন হবে। অন্য মতটি হলো সেটি উচিত হবে না– কারণ ওই শুরুর পর্যায়ে প্রকৃত ক্ষতিগুলো বোঝার উপায় নেই, বরং তা নতুন মডেলের উদ্ভাবনের

প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে। এর মতে নিয়ন্ত্রণ আরোপের উপযুক্ত সময় হলো যখন মডেল প্রস্তুত হয়ে তার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ সম্পন্ন করবে তখন। আদৌ যদি ক্ষতিকর প্রভাব থাকে, তখনই সত্যিকার অর্থে তা বোঝা যাবে এবং তা চিহ্নিত করা যাবে। এরকম করলে মডেলের জন্য অভিনব আইডিয়া ও সৃজনশীলতাকে অবদমিত করার সুযোগ থাকবে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়টি এখন দুটি বিবেচনার মাঝখানে সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করছে– ক্ষতির সম্ভাবনা দূর করা, অথচ মডেলের উন্নয়নকে ব্যাহত না করা। বিধি-নিষেধ আরোপের চ্যালেঞ্জটি এখানেই।

বলতে গেলে সব পক্ষই যখন বিধি-নিষেধ নিয়ে এমনি তর্কবিতর্কে রত ছিল, তখন নানা বিবেচনা নিজেদের নানা ফোরামে করে সত্যি সত্যি একটি এআই নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন– ইউনিয়নের পার্লামেন্টে তা পাশ করে। ২০২৪ সনে এটি পাশ করে ২০২৫ সালে এসে একে আবার সময়য়োপযোগী করে নেয়া হয়েছে।

আইনটির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে এআইকে নিরাপদ, স্বচ্ছ, অনুসন্ধানযোগ্য, বৈষম্যহীন এবং পরিবেশবান্ধব করা। গোড়াতেই নিশ্চিত করা হয়েছে এই আইন অনুযায়ী এআইয়ের ওপর যা কিছু তদারকির প্রয়োজন হবে, তার দায়িত্ব থাকবে মানুষের ওপর, আরেকটি এআইয়ের ওপর নয়।

এই আইন কতগুলো বিষয়ে এআইয়ের প্রয়োগ সরাসরি নিষিদ্ধ করেছে। তার মধ্যে একটি হলো কোনো কোনো দিক থেকে ঝুঁকিপ্রবণ ও অসহায় যেকোনো গোষ্ঠীর কাউকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে এমন প্রয়োগ। উদাহরণস্বরূপ এআইয়ের সহায়তায় এমন কোনো খেলনা বা গেইম যা শিশুর মনে ক্ষতিকর ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, তার মধ্যে বিপজ্জনক আচরণ সৃষ্টি করতে পারে, তা এই আইনে নিষিদ্ধ। তেমনি এআইয়ের যেসব প্রয়োগ মানুষকে তাদের আচরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিগত চরিত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করে সেগুলোকেও সরাসরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এআই মানুষের শারীরিক কোনো চিহ্ন দিয়ে যদি তাকে চিহ্নিত করে, তাহলে একমাত্র আইনি প্রক্রিয়ার কারণে সেটিকে গ্রহণ করা যাবে; এর বাইরে সামনাসামনি হোক বা দূর থেকে হোক সেটি করলে ওই প্রয়োগ নিষিদ্ধ হবে। আইনি প্রক্রিয়ার প্রয়োজনের বাইরে এআই যেন কোনো মানুষকে শনাক্ত করণের কাজ ব্যবহৃত না হতে পারে সেই ব্যাপারেও এই আইন স্পষ্ট।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনে এআইয়ের যেকোনো মডেলকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা যাচাই করার সুযোগ রয়েছে। ক্ষতির ঝুঁকি আছে এমন মনে হলে সেই ঝুঁকি গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে থাকলেই শুধু একে বাজারজাত করার অনুমতি দেয়া হবে, এবং তাও সময় সময় কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে, তা নির্ধারণ করা যাবে। এআই ব্যবহার করে তৈরি কোনো পণ্য যদি ক্ষতিকর বিবেচিত হয়, অথবা শিক্ষা, আইনি অথবা অন্য কোনো পেশাগত জীবনে যে এআই ব্যবহার করে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে তাও নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

এআইকে স্বচ্ছ রাখা আইনটির একটি প্রধান লক্ষ্য। স্বচ্ছতার একটি মৌলিক ধাপ হলো এটি যে একটি এআই একথাটি স্পষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিতে বাধ্য থাকা। এর জন্য তার সব কাজে যথোপযুক্ত লেবেল দেয়া থাকবে যে ওটি এআই বা এআইয়ের সৃষ্ট। স্বচ্ছতার আর একটি দিক হলো প্রত্যেক মডেলকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে এর সৃষ্ট কোনো জিনিস বেআইনি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না সে বিষয়ে কোম্পানি সচেতন থাকবে, ওরকম সুযোগ ন্যূনতমে আনতে ও তার প্রতিকার করতে সচেষ্ট থাকবে। চ্যাটজিপিটির মতো শক্তিশালী ও ব্যাপক মডেলগুলোকে নিয়মিত মূল্যায়ন করানোর মাধ্যমে ছাড়পত্র নিতে হবে। এদের দ্বারা এই সময়ের মধ্যে কী কী বড় ক্ষতিকর ঘটনা ঘটেছে তার একটি রিপোর্ট কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে দিতে বাধ্য থাকবে। ট্রেনিঙের সময় মডেল কী তথ্য ব্যবহার করছে সেদিক থেকেও তাকে স্বচ্ছ থাকতে হবে– তথ্যের উৎস জানতে হবে, যেমন কপিরাইটভুক্ত কী কী তথ্য ব্যবহার হচ্ছে তার একটি তালিকা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এজন্য ইউরোপীয়ান কমিশনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে। ইউনিয়নভুক্ত সব দেশে এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ আইন যেন বাধ্যতামূলকভাবে মানা হয়, সেটি নজরদারি করার জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। আইনের কোন্ অংশ কোন্ তারিখের মধ্যে বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, তাও সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

বলতে গেলে এআই নিয়ন্ত্রণের পুরো ব্যাপারটিতে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন একটি দিগ্‌দর্শিকার কাজ করেছে। এআই উন্নয়ন ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে অগ্রবর্তী একটি বড় জনসংখ্যার পক্ষ থেকে তার এই পদক্ষেপ অনুরূপ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হয়েছে। ওরকম বড় ও একক ভাবে আইন প্রণয়নকারী হিসেবে এর পরেই এগিয়ে এসেছে চীন। চীন যে এআইয়ের উন্নয়ন ও ব্যবহারে খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে– একথা এখন সবার জানা। চীনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষও এআইয়ের ক্ষতিকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে বেশ বিস্তৃত আইন প্রণয়ন করেছে। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতি

উভয় ক্ষেত্রকেই এতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় সুরক্ষা ও জাতীয় স্বার্থকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এআই ব্যবহার যেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অস্ত্র না হয়, সেই ব্যাপারেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এআই উন্নয়নের কেন্দ্রভূমি যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু জাতীয়ভাবে নয়, বরং অঙ্গরাজ্যভিত্তিক কিছু বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা নিয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই অঙ্গরাজ্যগুলোর সংসদে এমন কিছু আইন পাশ হয়েছে, যা সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা রেখেছে– কিন্তু সামগ্রিকভাবে এআই নীতি প্রণয়নের বা তাকে নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টা তাতে নেই, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা চীনের আইনে আছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য আইন এসেছে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে। সেখানে ২০২৫ সালে যা পাশ হয়েছে, সেটি শিশুদেরকে সুরক্ষা দেবার জন্য। এর মাধ্যমে ওপেন এআই অথবা মেটার মতো বড় শক্তিশালী সাধারণ এআই মডেল নির্মাতাদের থেকে শুরু করে একেবারে খাস করে শিশুদের জন্য তৈরি মডেল কারেক্টার এআই বা রেপ্লিকার নির্মাতাদেরকেও ক্যালিফোর্নিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চ্যাটবটের সঙ্গে শিশুদের কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু বিষয় এসেছে এবং এতে শিশুদের জন্য এমন কিছু ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে, যা ব্যাপকভাবে খবরে আসার পর সৃষ্ট জনমতই এমন আইনের পেছনে কাজ করেছে। এর অধীনে কোম্পানিকে ও চ্যাটবটকে স্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে এর অপব্যবহার কী হতে পারে, এ নিয়ে অবিভাবকদেরকে সতর্ক করতে হবে। কারেক্টার এআই ধরনের মডেলগুলোর মাধ্যমে শিশুরা নানা রকম কাল্পনিক চরিত্রের সঙ্গে কথাবার্তা বল্ছে। শিশুদেরকে বোঝাতে হবে যে, এই চরিত্রগুলো মোটেও আসল কিছু নয়; সেই বোঝানোর দায়িত্বও মডেলের থাকবে।

ক্যালিফোর্নিয়া আইনে কার্যত স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, এআই নির্মাতা কোম্পানিগুলো সবসময় আইনসম্মত বা নৈতিক পদক্ষেপ নেয় না। তাদের ভেতরের গোপন বেআইনি বা ক্ষতিকর কোনো বিষয় ওখানকারই কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বা কর্মী হয়তো উদ্ঘাটন করতে চাইবেন বিবেকের দংশনে। সেক্ষেত্রে ওই উদ্ঘাটকদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেন কোম্পানি না নিতে পারে সে ব্যবস্থাও আইনের মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া কোম্পানিকে শুরু থেকেই ঘোষণা দিতে হবে মডেলের মধ্যে ব্যবহারকারীদেরকে সুরক্ষা দেবার জন্য কী কী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেসব সুরক্ষার অভাবে ব্যবহারকারী নিজের অজান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের আরো কিছু অঙ্গরাজ্য– উতাহ, নেভাডা, এবং ইলিনয় অনুরূপ কিছু আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক কিছু কিছু ক্ষতি সামনে আসায় শুধু ওইখানে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে– ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনের মতো ব্যাপক ভিত্তিক কিছু এ পর্যন্ত চিন্তা করা হয়নি। স্পষ্টত যুক্তরাষ্ট্র এখনো প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে সাধারণভাবে বেশি স্বাধীনতা দিচ্ছে, এআই মডেল নির্মাণের দিগন্তটি বেশ বড় রেখে।

অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো আইনে এআই মডেল বাজারে আনতে চাইলে কিছুটা ব্যাপকভাবেই কোম্পানিগুলোকে নিয়মিত নজরদারি, যাচাই, ইত্যাদির আওতায় আনাটি তুলনামূলকভাবে সহজ কাজ; আর এটি এক সঙ্গে ইউনিয়নের সব দেশে একইভাবে এর দ্বারা প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু বাস্তবে বড় বড় কোম্পানিগুলোকে এর জন্য বাধ্য করাটি সহজ হচ্ছে না। সেটি করার উপায় ও কৌশল নির্ধারণ করাটাই এখন এদিক থেকে ইউরোপিয়ান কমিশনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। তাতে সঠিক পথ খুঁজে পেলে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এআইকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। অন্যদিকে তদারকি ও নজরদারির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়েও যুক্তরাষ্ট্র সর্বব্যাপ্ত আইন করার বদলে এদিকে কিছুটা নমনীয়তা ও সতর্কতার সাথে এগুচ্ছে।

অন্য একটি যুক্তিও সামনে আসছে ঢালাও আইন করার বিপক্ষে। এর মতে এআইয়ের সব রূপকে আসলে একটি মাত্র প্রযুক্তি বলে ধরে নেয়া যায়না। এর ভেতর রয়ে গেছে বিচিত্র আলাদা আলাদা প্রযুক্তি। একই আইনী ব্যবস্থায় এদেরকে বেঁধে ফেলার চেষ্টাটি তাই সঙ্গত নয়– ক্ষেত্র বুঝে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি পৃথক প্রযুক্তির দিক থেকে যে সহায়তা প্রয়োজন এবং যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন তা সব পক্ষের একত্র বিবেচনা ও সমঝোতার মাধ্যমেই সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে এআইয়ের কারণে সর্বব্যাপ্ত যে সব সমস্যা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে একটি হলো শ্রম বাজার সংক্রান্ত– মানুষের চাকরি ও জীবিকার জন্য যে হুমকি এটি সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে। আর একটি হলো এআইয়ের মাধ্যমে জীবাণু ইত্যাদিকে ব্যবহার করে যে জৈব মারণাস্ত্রের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে তা। এই দুটির প্রকৃতি এতো আকাশপাতালভাবে পৃথক যে এদের জন্য এআইয়ের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ মোটেই এক রকম হবে না।

পুরো জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষাকে ও সংকল্পকে রূপ দেবার জন্য এবং মানব জাতির মঙ্গলের জন্য এই শক্তিশালী প্রযুক্তি নিয়ে এগোবার দিগদর্শিকা হবার জন্য

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইন প্রণয়নের ও বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টাটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এ নিয়ে পুরো বিশ্বের চিন্তাশীলদেরকে বিশ্ব-আইন ও সমঝোতা তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে প্রযুক্তিবিদ, এআই উন্নয়নকারী বিশেষজ্ঞরা, জনস্বার্থ রক্ষাকারী জনপ্রতিনিধিরা, এবং নৈতিকতার রক্ষকদেরকে একসঙ্গে বসে প্রত্যকটি বিষয়ের গভীরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাটি খুব বেশি।

জীবিকা হারানোর ভয়টি এ পর্যন্ত কতখানি বাস্তব?

এআই কি মানুষকে ব্যাপকভাবে চাকুরিচ্যুত করছে? বিষয়টি সামগ্রিকভাবে খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু চাকুরি হারাবার ভয় ভীষণভাবে জাগিয়ে রেখেছে এআই। এলএলএম আসার পর কিছু কিছু পেশায় এ ভয় দারুণ বেড়ে গিয়েছে সঙ্গত কারণেই। এআইয়ের একেবারে শুরু থেকে ব্যাপকভাবে যেক্ষেত্রে চাকুরি হারাবার ভয় দেখা দিয়েছিল সেটি হলো কারখানার উৎপাদনের কাজে রোবট-শ্রমিক সেখানে শ্রমিকদের জায়গা নেবে বলে। কিন্তু অল্প কয়েক ধরনের কারখানার বাইরে সেটি ব্যাপকভাবে ঘটেনি। এর কারণ এখন পর্যন্ত অধিকাংশ কারখানার জন্য রোবট-শ্রমিক তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যয়সাপেক্ষ। তা ছাড়া অনেক কারখানাই বিদেশে অপেক্ষাকৃত সস্তা শ্রমিকের দেশে পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু রোবট-শ্রমিক বড় ভূমিকা রাখছে এমন কারখানা ও কাজের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে।

মেশিন লার্নিং এবং পরে এলএলএম এসে কারখানা শুধু নয়, অফিসের যাবতীয় কাজ এখন এআইয়ের জন্য সহজ করে ফেলেছে, এবং বেশ মান সম্মত ভাবেই সেটি তা করতে পারছে। ফলে কাজ হারাবার আওতা থেকে এখন বলতে গেলে তথাকথিত ব্লু কলার ও হোয়াইট কলার কোনো বড় পেশা বাদ থাকছে না। এটি এমনকি উচ্চ প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক বড় পদগুলোকে পর্যন্ত এআই ভয়ে ফেলে দিয়েছে। এখনো মানুষ থেকে এআইয়ের কাছে কাজ যাবার গতি ধীর হলেও কতগুলো পেশা যে কার্যত শিগ্‌গির বিলুপ্ত হবে এ কথা প্রায় নিশ্চিত। উদাহরণস্বরূপ তার মধ্যে অনুবাদকের কাজটি বেশ চোখে পড়ে, কারণ এলএলএম এখন যেকোনো মানুষ অনুবাদকের সমমানের অনুবাদ করতে পারে– এবং তা দ্রুত, কোনো ঝক্কি ঝামেলা ছাড়াই। এমনি বহু পেশার কথা বলা যেতে পারে যেগুলো অনুবাদকের মতো এমন অনিবার্যভাবে না হলেও আগে পরে এআইয়ের নিশানায় রয়েছে। তাতে অফিস রিসেপশনিস্ট বা অফিস সহকারীর মতো দাফতরিক কাজ যেমন আছে তেমনি ট্যাক্সি ড্রাইভারের মত বাইরের কাজও রয়েছে। এসব কাজ কত দ্রুত চলে যাবে, সেটিই

এখন চিন্তার বিষয়। অনেক চাকরিই ঝুঁকির মধ্যে আছে– জীবনযাত্রার প্রায় সবক্ষেত্রে; তবে তা সমানভাবেও নয়, এখনই অনিবার্যভাবেও নয়।

কোন্ পেশা কেমন হুমকিতে আছে, অদূর ভবিষ্যতে কারা চাকরি হারাবে এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত মাইক্রোসফ্টের একটি গবেষণায় ৪০টি চাকরিকে আপাতত এআইয়ের আক্রমণ থেকে মুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে– সেগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত সব কাজের তালিকা। এতে নার্সিং সহকারী আছে, ঘর-বাড়ির পেইন্টার আছে; দন্ত চিকিৎসক, গাড়ির টায়ার মেরামতকারী, মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিজিও থেরাপিস্ট, নদী-খনন মেশিন চালক এমনি সব পেশা আছে– যেগুলো গবেষণাটির ফলাফল বলছে এআই এখন বা অদূর ভবিষ্যতে সহজে করতে পারবে না। এমনটি যে হবে তা উন্নত দেশগুলোতে তরুণরাও বেশ আন্দাজ করতে পারছে– তাই স্কুলে থাকা তরুণ-তরুণীদের অনেকে ভবিষ্যতের প্রস্তুতিতে এখন হোয়াইট কলার অফিসের চাকুরিকে লক্ষ্য করা খুব নিরাপদ বোধ করছে না, ২০২৫ এর ডিসেম্বরের একটি প্রতিবেদনে রয়টার্স জানাচ্ছে ব্রিটেনে স্থানীয় ও নানা দেশ থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার বদলে সূক্ষ্ম শারীরিক ও কারিগরি হাতে কলমে দক্ষতা প্রয়োজন এমন বিষয়ের ওপর শিক্ষা নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে লন্ডনের সিটি অফ ওয়েস্ট মিনিস্টার কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন এবং বিল্ট এনভায়রেনমেন্ট কোর্সে ছাত্র ১০% বেড়ে গেছে সনাতন বিষয়গুলোতে কমছে। সেদেশের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক সমীক্ষা বল্‌ছে প্রতি দু'জন কর্মীর একজন চাকরি হারাবার আশঙ্কায় আছে– ওদের বেশিরভাগ ২৫-৩৫ বয়োসীমার ভেতরে।

স্পষ্টত কিছু পেশা এখনই এআইয়ের জন্য উন্মুক্ত, কিছু পেশা তা নয়। একনজরে বোঝা যাচ্ছে যে যেগুলোতে খুব জটিল শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার ব্যাপার আছে, একই সঙ্গে কী করছি বোঝার ব্যাপার আছে, অন্যের প্রতি সহানুভূতি-সংবেদনশীলতার ব্যাপার আছে সেসব কাজ আপাতত এআই থেকে বেশি নিরাপদ। বাকিগুলো যেগুলো বিশ্লেষণমূলক, গতানুগতিক, অংকের মতো অনিবার্য নিয়মে চলে, এমনকি সৃষ্টিশীল হলেও সেগুলোতে এআই সহজে আসতে পারছে। কিন্তু সত্যি সত্যি দ্রুত এসে তা মানুষকে সরিয়ে দিচ্ছে, নাকি মানুষের সঙ্গেই সহ-অবস্থান করছে সেটি বৃহত্তর পরিসরে চট্ করে বোঝা যাচ্ছে না, কিছু কিছু সমীক্ষা থেকে শুধু আন্দাজ করা যায়।

মাইক্রোসফ্‌টের ওই গবেষণাতেই দেখা যাচ্ছে এ মুহূর্তে যাঁদের চাকুরি বেশি ঝুঁকিতে আছে, তার মধ্যে আছে বক্তৃতার তাৎক্ষণিক অনুবাদক, লেখা অনুবাদক, ট্রেনের ও অন্যান্য পাবলিক যানবাহনের চেকার-কন্ডাক্টর-সেবক, সেইল্‌স প্রতিনিধি, গ্রাহকসেবা দেবার মানুষ, টেলিফোন অপারেটর, টেলি-মার্কেটিং কর্মী, রাজনৈতিক ভাষ্যকার, সংবাদ বিশ্লেষক, সাংবাদিক, লেখক, প্রুফরীডার, মার্কেট অ্যানালিস্ট, গণিতবিদ, এবং এমনি আরো অনেক কিছু। এর মধ্যে কিছু কাজ যেমন টেলিফোন অপারেটর, গ্রাহক-সেবা দানকারী, টেলিমার্কেটিং কর্মী, প্রুফরীডার, অনুবাদক এসব কিছু আগে থেকে মেশিন লার্নিঙের কারণে এআই করতে পারছিল, এখন এলএলএম এসে এআই অনেক বেশি ভাল করবে, মানুষকে ছাড়াই করবে, এটি বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তাই বলে লেখক, রাজনৈতিক ভাষ্যকার, সংবাদ বিশ্লেষক, গণিতবিদ এসব ভূমিকায় মানুষের বদলে শিগ্‌গির এআইকে দেখতে হবে এটি বেশ অভিনব চিন্তা। অথচ এলএলএমের প্রকৃতি বুঝলে এতে অবাক হবার কিছু নেই।

এ গবেষণা অবশ্য চাকরি চলে যাবেই এমন কথা বল্‌ছে না, বর্তমান গতি-প্রকৃতি দেখে প্রবণতাটির কথা বলছে। কিন্তু বাস্তব জগতে যখন বড় কোনো চাকরিদাতা কোম্পানি হঠাৎ প্রচুর কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেয়– তখন সবার আগে কারণ হিসেবে কোম্পানির বহুক্ষেত্রে এআই দিয়ে মানুষকে প্রতিস্থাপিত করার কথাটাই মনে আসে, যদিও ছাঁটাইয়ের আরো বহু কারণ থাকতে পারে। যেমন বিশাল প্রযুক্তি ও বিপণন কোম্পানি আমাজন যখন সম্প্রতি হঠাৎ করে একসঙ্গে ১৪ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিলো তখন এমনটিই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। খুব অগ্রসর প্রযুক্তি কোম্পানি হওয়াতে তার কাজের অনেক দিকই এআইয়ের কাছে দেয়া সম্ভব, এবং তা দেয়া হচ্ছেও। আমাজন ঘোষণার মধ্যেই স্বীকার করেছে যে এআইই কর্মী ছাঁটাইয়ের বড় কারণ। এর কিছু আগে মাইক্রোসফট যখন তার ৩% কর্মীকে (সংখ্যায় যা ৬,৭০০) একসঙ্গে ছাঁটাই করেছিল তারা কিন্তু এআইকে সরাসরি দায়ী না করে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছে। অথচ ওই ছাঁটাইকৃতদের মধ্যে ৪০% ছিলেন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আর ২০% ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত। এই দুই ক্ষেত্রে কোম্পানি অনায়াসে এআই দিয়ে অনেকখানি কাজ চালাতে সক্ষম। বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোতে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও সফ্‌টওয়্যার গড়ে তোলার কাজটি মেধাবীদের আকর্ষণীয় কাজগুলোর একটি। এখন সেখানে যদি এআইয়ের কারণে চাহিদার ঘাটতি দেখা দেয়, তখন কম্পিউটার বিজ্ঞানের প্রতি তরুণদের বিশাল উৎসাহে কিছু হতাশা সৃষ্টি করে বৈকি। কম্পিউটার

প্রোগ্রামিং এলএলএমের সক্ষমতায় আসার পর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বলা হচ্ছে। কিন্তু সেটি অন্য কারণেও হতে পারে। মাইক্রোসফ্‌টের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেইট্‌স অবশ্য বলেছেন– যে চাকরিগুলো এআই কখনো নিয়ে যেতে পারবে না তার মধ্যে একটি হবে প্রোগ্রামিং।

নিকট ভবিষ্যতের কথায় আসলে বিখ্যাত ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং কোম্পানি গোল্ডম্যান অ্যান্ড স্যাখ্‌স একটি গবেষণা বলছে ২০৩০ এর মধ্যে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রায় এক-চতুর্থাংশ চাকরি এআইয়ের কারণে বিলুপ্ত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের এম আই টি ও বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মিলিত সমীক্ষা কারখানার শ্রমিকদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, সে দেশে ২০৩০ সনের মধ্যে ২০ থেকে ৩০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হবে। এগুলো ভয়ঙ্কর সব ভবিষ্যদ্বাণী! তবে এটি বাস্তবতার একটি দিক, অন্য দিকটিও রয়েছে। অতীতের বড় বড় নতুন প্রযুক্তি এসে সেটি অনেক কাজ বিলুপ্ত যেমন করেছে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাজ সৃষ্টিও করেছে। অনেকের মতে এবারো তাই হতে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম লিঙ্কড্‌ইন তাই সবাইকে এআইয়ের সঙ্গে কাজ করার জন্য তৈরি হতে আহ্বান জানিয়েছে।

স্কুল কলেজে পড়ার সময়েই একটি বিশেষ পেশায় মনস্থির করে ফেলে সারা জীবন ওই পেশায় থাকবো এমন ধারণা নিয়ে না এগুনোই ভাল। বরং সারা জীবন নতুন নতুন প্রযুক্তি আয়ত্ত করা, নতুন দক্ষতা অর্জন করার মানসিকতা নিয়েই নিজকে প্রস্তুত করার পরামর্শ দিয়েছে লিঙ্কড্‌ইন। সামনের অনেক কাজ হবে এআইয়ের সঙ্গে একত্র করার জন্য। এখন থেকে সেগুলোর জন্য শিক্ষা, চর্চা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তৈরি হতে হবে। যেকোনো সময় নিজের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। অন্যদিকে এআই যে কাজ সহজে করতে পারছে না, শিগ্‌গির পারবেও না, সেই মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সেবাভিত্তিক কাজগুলোর দিকেও নিজের মানসিকতা ও দক্ষতাকে বিস্তৃত করা যায়। এআই নিজের কাজ করতে গিয়ে সবসময় কিছু ফাঁকা জায়গা রেখে যায় যা মানুষকেই পূরণ করতে হয়। সেগুলোতে নিজেকে কাজে লাগাতে পারাও একটি বড় সুযোগ।

চাকরিদাতারা মানুষকে বাদ দিয়ে এআইকে স্বাগত জানাচ্ছে প্রধানত ব্যবসার দীর্ঘমেয়াদি ব্যয়সংকোচের লক্ষ্যে। তাদের সবার অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। আর্থিক সংস্থান কোম্পানি ক্লারনা তাদের কাস্টমার সার্ভিস থেকে ৭০০ কর্মচারীকে ছাঁটাই করে এআই এজেন্ট দিয়ে সেই কাজগুলো করাচ্ছিলো। এতে তাদের মুনাফায় এক বছরে ৪০ হাজার ডলার বৃদ্ধি ঘটেছে। বৃদ্ধিটি আসতে পেরেছিল কাজের গতিকে ওই

এআই নিয়োগের মাধ্যমে পাঁচগুণ বাড়িয়ে ফেলার মাধ্যমে। কিন্তু পরে দেখা গেছে কাজের গতি বেড়েছে বটে, কিন্তু তার ফলে কাজের মান বেশ কিছু হ্রাস পেয়েছে, যা কোম্পানি তার জন্য আখেরে মঙ্গলজনক মনে করেনি। তাই তারা মানুষ কর্মী আবার বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার মানুষ আর এআইয়ের মধ্যে এমন একটি সর্বোত্তম সহযোগিতা গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে লাভ বৃদ্ধিও হয়েছে, একই সঙ্গে কাজের মানেরও উন্নতি হয়েছে। ভবিষ্যতে এটিই হয়তো অনেকে অনুসরণ করবে।

যেসব প্রতিষ্ঠান বা কলকারখানা এআইয়ের দিকে অনেকখানি ঝুঁকেছে তাদের অনেকগুলোর অভিজ্ঞতা এই ক্লারনার মতোই। মানুষের সংখ্যা কমাতে পেরেছে তারা, কিন্তু একেবারে বাদ দেবার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে শিগ্গির এমন কর্মস্থল হয়তো একটিও পাওয়া যাবে না যেখানে এআই ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু দেখা যাবে সব জায়গাতেই এখনো এআইয়ের সঙ্গে বহু মানুষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। ইউরোপে ও যুক্তরাষ্ট্রে এআই সমৃদ্ধ রোবট কারিগর শ্রমিক নিয়ে খুব অগ্রবর্তী কিছু কারখানা প্রধানত গাড়ি ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী তৈরিকে একেবারেই সুসমন্বিত স্বয়ংক্রিয়তায় নিয়ে এসেছে। কিছু এগুলোর কোনোটাই বেশ কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারছে না। এমন পরিবেশে সেই দক্ষ মানুষগুলোর দক্ষতাও বেড়ে যাচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, এআই সাক্ষরতা থাকলেও কোনো কোনো দিকে এআই ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থাকলে মানুষ-কর্মী এআই সমৃদ্ধ যেকোনো কাজে ১২% বেশি সম্পূর্ণতা দিতে পারে। এতে তার নিজের কাজের দ্রুততাটাই বেড়ে যায় ২৫%, আর কাজের মান বাড়ে ৪০%। মানুষ এআইকে এমনভাবে ডিজাইন করেছে যে, তা একে উচ্চ ক্ষমতা দিয়েছে; এখন সেই এআই অনেক মানুষকে তাদের কাজে উচ্চ দক্ষতা দিচ্ছে। অসংখ্য মানুষের কাজে এআই সাক্ষরতা ও এআই সম্পৃক্ততা এখন যুগের দাবি।

এআই সাক্ষরতা

সব চেয়ে ভাল হতো সবাই যদি অন্তত এআই পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শি হতো। যেমন একটি এআই এজেন্টের মধ্যে নিজের কাজটুকু ঢুকিয়ে দেবার মত পারদর্শিতা, কিংবা এআইয়ের সঙ্গে মিলে কোনো কাজ সম্পাদনের কম্পিউটার প্রোগ্রামটি লিখে ফেলতে পারার পারদর্শিতা। এমন পারদর্শীতার পথে বা তার বাইরেও এআইয়ের ওপর সাক্ষরতা অর্জন সবার জন্য প্রয়োজন। সেটি শুধু নিজের

জীবিকা রক্ষার জন্য নয়, বরং বর্তমান ও সামনের যুগে এআইয়ের সঙ্গে যে অভিনব জীবন আসছে, সেটি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারার জন্যও বটে।

এআই এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে একে কাছে টেনে নেয়া মানে নিজেকে যথেষ্ট বর্ধিত করে নেয়া; এক ভাবে একে আমাদের নিজেদের বর্ধিতাংশ বলা যায়। সাধারণত চিন্তায় মননে নিজেকে যেখানে থামতে হয় এআই সেখান থেকে আমাদের ক্ষমতাকে বর্ধিত করে নানা দিকে বিস্তৃত করতে পারে। এই বর্ধিত হবার প্রক্রিয়াটি শুরু হতে পারে– এআই সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে।

বর্ধিত করার এই ব্যাপারটি অবশ্য মানুষের ইতিহাসে একেবারে নতুন নয়, যদিও এআই মানুষকে বর্ধিত করাটিকে আগের যেকোনোকিছুর তুলনায় অনেক তুঙ্গে নিয়ে গেছে। নিজের কথাকে লিখে দূরের অন্যের কাছে তুলে ধরতে গিয়ে মানুষ যখন লিপির সাক্ষরতা অর্জন করেছিল সেদিন সে শুধু স্থানে নিজেকে বর্ধিত করেনি– সামনের সব কালের মধ্যেও করেছিল। সে কারণেই পাঁচ হাজার বছর আগের তাদের বক্তব্যও আমরা আজ পড়তে পারছি। তারপর আধুনিক যুগের একেবারে শুরুতে মুদ্রণযন্ত্র এসে পুস্তক-সাক্ষরতা আমাদেরকে আর একবার আর একভাবে বর্ধিত করেছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিদ্যুৎ প্রযুক্তি পুরো দুনিয়াকে আমাদের বাচন-শ্রবণ-দর্শনের আওতায় নিয়ে আমাদেরকে বিশ্ব-স্বাক্ষর করেছিল। তথ্য প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার সাক্ষরতার ফল তো আমরা স্মার্টফোন হাতে নিলেই বুঝতে পারছি। কিন্তু সর্বজনীন এআই সাক্ষরতা দুনিয়াটিকে যেভাবে বদলে দিতে পারে, সেটি আর কোনোভাবে হয়নি। এটি অ্যাল্‌গরিদমের যুগ– এআইকে আপন করে নিয়ে নিজের মানবিক সক্ষমতাকে অনেক দূর বিস্তৃত করার যুগ।

বাস্তবে এলএলএম কিছুটা দ্রুত হুড়মুড় করে ক্ষমতাবান হয়ে হঠাৎ কয়েক বছরের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে বলে এআই সাক্ষরতার ব্যাপারটিকে নানাভাবে ভুল বোঝার অবকাশ আছে। আগেকার এআইতে মেশিন লার্নিং যে একটির পর একটি অদ্ভুত কাজ করছে বলে খবরে আসতো, এবং এআইয়ের ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার যে তাত্ত্বিক সম্ভাবনার কথাও শোনা যেতো– দুটিই সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে একটু দূরেই ছিল। যারা উচ্চ প্রযুক্তি নিয়ে ভাবেন, এর বাস্তবায়নে কাজ করেন তাঁরাই এর কাছাকাছি ছিলেন। সাধারণ মানুষ দেখছিলেন তাঁর পছন্দের খবর বা ভিডিওটি স্মার্টফোনে তাঁর জন্য যেন ম্যাজিকের মতো হাজির হয়ে সামনে থাকতো। সেটিকে মনে হতো যেন কোনো কম্পিউটার কোম্পানির একটি লাভজনক কারসাজি– ওর মধ্যে বসে এআই যে কাজ করছে তা জানা

থাকতো না। কিন্তু এলএলএম আসার পর তাকে দূরে রাখার আর কোনো উপায় বা যুক্তি আমাদের কাছে নেই। চ্যাটজিপিটি ইত্যাদি রূপে ওটি জানান দিয়েই এসে পড়েছে জীবনে।

তারপরও সর্বজনীন এআই সাক্ষরতার পথে বাধা হলো একে অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ নিয়ন্ত্রিত কারিগরি বিষয়ের পর্যায়ে ফেলে রেখে আলোচনাটি শুধু এটি কী করতে পারে, কী পারেনা, কী ভয়াবহ ক্ষতি করতে পারে, কীভাবে আমাদের চাকরি খেয়ে ফেলতে পারে এসবে সীমাবদ্ধ রাখা, মোটের ওপর একটি জাদুর দৈত্যের মতো। যেকোনো সাক্ষরতার মতো এক্ষেত্রেও প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে এর সম্পর্কে ওরকম ভীতির মনোভাব না রেখে মানুষের তৈরি করা কিছু চমৎকার কৌশল বলে বুঝতে পারা। সে কৌশলগুলো ব্যবহার করে সত্যি সত্যি একটি এআই মডেলের অ্যালগরিদম লেখা অবশ্য সহজ নয়, তার জন্য বহু বছরের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা দরকার কম্পিউটার সায়েন্সের মতো বিষয়ে, যা অনেকে নেবেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যা করবেন, সেই অনুযায়ী সাক্ষরতা অর্জনটি সেরকম দীর্ঘ শিক্ষার ব্যাপার মোটেই নয়– এটি ইচ্ছে করলে অর্জন করা যায় অল্প আয়াসে। তবে ইচ্ছেটা ও মনোযোগটি চাই, সেই সঙ্গে এআইয়ের সাথে কাজ করার আনন্দটিও চাই।

এআই সাক্ষরতা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরেই নিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে তার বাইরে শখের শিক্ষাতেও এটি জোরালোভাবে থাকতে হবে। এখন অনেক উন্নত দেশে, বিশেষ করে চীনে, একেবারে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই ভাষা, অঙ্ক এরকম কয়েকটি মৌলিক দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে এআই ও প্রোগ্রামিং দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। সেখানে কিছুটা গল্পের আকারে এআই কী কেন ইত্যাদির উপলব্ধির ভিত্‌টি রচনা করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষায় এআই মডেলের সবল রূপটি তুলে ধরা যায়, স্কুলের সরল গণিতেই তা বুঝে নেয়া সম্ভব। চ্যাটজিপিটির মতো সহজ-ব্যবহারের চ্যাটবটকে কীভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নানা কাজে লাগানো যায়, তার প্রম্প্‌টিং কৌশলগুলো ও কাজের পদ্ধতি এখানে তুলে ধরা যায়। তাছাড়া তথ্য ব্যবস্থাপনা, এআইয়ে নৈতিক দিকগুলো, অপব্যবহার সুযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন হওয়া ও এর থেকে নিরাপদে থাকার শিক্ষাও এখানেই আনাটি প্রয়োজন।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইয়ের আরো উন্নত এবং বিশেষায়িত মডেলগুলোর ব্যবহারকে যেমন শেখানো যায়, তেমনি কর্মক্ষেত্রে কোন্ দিকগুলোতে এআই কীরূপে আসছে এবং সেখানে কীভাবে তার সঙ্গে জড়িত হওয়া যায় তার একটি সাধারণ

শিক্ষা ও চর্চা সম্পূর্ণ করা চাই। ছাত্র যখন অন্য যেকোনো বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছে তা সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা যাই হোক না কেন, তখনো বিভিন্ন পর্যায়ে এসব এআই সাক্ষরতা তার পাশাপাশি নেয়া উচিত। এমনকি ওরকম বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার বিকল্প কারিগরি দক্ষতা, সমাজ সেবা, শারীরিক মানসিক সহায়তা দেয়ার মতো ভিন্ন বিষয়ও যদি কারো শিক্ষা-প্রশিক্ষণে ক্ষেত্র হয়, তবুও পাশাপাশি এআই সাক্ষরতার পর্যায়গুলো চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাহলেই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যেমন সবাই তৈরি থাকবে, তেমনি হাতের কাছের এআইয়ের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নিজেকে বর্ধিত করার কাজটিও সর্বজনীন হবে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে এ পথে আনতে কিছু সময় লাগলেও প্রত্যেকে নিজ উদ্যোগে নিজেকে এআই সাক্ষর করতে দেরি করার কোনো প্রয়োজন নেই– এ কাজ এখুনি শুরু হয়ে যেতে পারে। চ্যাটজিপিটির মতো চ্যাটবটের সঙ্গেই কাজটি শুরু করে দিলেই হয়। সেটি যে কেউ করতে পারে- যেকোনো পর্যায় থেকেই পারে। ধরা যাক্ একে প্রম্প্ট করলাম 'মনে করো আমার বয়স দশ। আমাকে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বটি একটু বুঝিয়ে দাও।' তারপর প্রয়োজনমত তাকে বলা বয়সটি বাড়াতে থাকি পনেরো, বিশ– এবং সেভাবে কী করে একটি জটিল জিনিসও বুঝতে সে সহায়ক হচ্ছে তা লক্ষ করি। এক পর্যায়ে এমনও সমস্যা তাকে দিই, যেটি আমাকে একটু চর্চা করেই বুঝতে হবে যেমন প্রম্প্ট করি 'মনে করো ষাট কিলোগ্রাম ওজনের আমি পৃথিবীর গভীরে এক হাজার মাইল নিচে নেমে গেছি। এখন মাধ্যাকর্ষণে আমার ওজন কত হবে, তা একেবারে ধাপে ধাপে অঙ্ক করে প্রত্যেক ধাপ বুঝিয়ে দাও।' এআইকে আমার পরীক্ষা নিতে বলি, আবার এআইয়ের পরীক্ষা আমি নিই। তাকে বন্ধুর লেখা একটি রচনা এবং অন্য একটি এআইয়ের লেখা একই রচনা দিয়ে জিজ্ঞেস করি কোন্‌টি কার রচনা। তাকে পত্রিকার একটি হেডলাইন বা পুরানো কোনো একটি বিখ্যাত ছবি দেখিয়ে এসবের পূর্ণ বৃত্তান্ত দিতে বলি। নিজে নিজে এআই সাক্ষর হবার এটি একটি সুন্দর উপায়। এআইয়ের ভেতরের কৌশলগুলো বোঝার জন্য আজকাল অনেক ধরনের সহায়তা পাওয়া যায়– যেমন অনেক প্রশিক্ষণ ভিডিওর। নিয়ম করে সেগুলো শুনে, সেগুলো অনুযায়ী চর্চা করে নিজে নিজেও অনেকখানি শেখা সম্ভব। তারপর নানা প্রাইভেট কোর্স করা তো রয়েছেই।

আরো বড় কথা হলো নিজের কোনো সত্যিকার কাজ ভালভাবে করার জন্য, দক্ষ ও দ্রুতভাবে করার জন্য চিন্তাভাবনা করে চ্যাটবটকে ব্যবহার করা। নিজেরাই এর

সহায়তায় এমন কিছু ডিজাইন করতে পারি, যাতে নতুন একটি কাজ শুরু করে দিতে পারি, যেমন কৃষকদের জন্য একটি সহজ নির্দেশিকা তৈরি করে নিতে পারি কথা-ছবি ও ছড়া দিয়ে। এআইকে ধাপে ধাপে প্রম্পট করে করে, এবং সেগুলো আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করে সাজাতে বলে এটি করা অনেক সহজ হবে। তারপর এটি ছাপিয়ে বা ডিজিট্যাল মাধ্যমে কৃষকদের জন্য জনপ্রিয় করার চেষ্টা করতে পারি।

মনে করি ঢাকা জাতীয় জাদুঘরের মতো জায়গায় একজন মানুষ প্রথম এসেছেন। এ জাদুঘর থেকে কীভাবে তাঁর মতো কেউ সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে পারেন, সেজন্য একটি ডিজিটাল গাইডবুক রচনা করতে চাই। চ্যাটবটকে বল্‌লে সেও জাদুঘরে দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান করে সব তথ্য জোগাড় করে আনতে পারবে। আমি নিজেও জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সহায়তায় জোগাড় করে চ্যাটবটকে দিতে পারি। এবার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নানা প্রম্প্‌ট করে চ্যাটবটকে গাইডবুকটি ডিজাইন করতে দিই ম্যাপ, ছবি ইত্যাদি সহ। কোন্ বিষয়ে আগ্রহী মানুষ প্রথমে জাদুঘরের কোন্ অংশে যাবেন, সেখানকার দর্শনীয় বস্তুগুলোর পটভূমি বর্ণনা করে তার কোন্ কোন্ দিকে দৃষ্টি দিতে হবে– ইত্যাদি ব্যাপারে এটি সহায়ক হবে। এভাবে জাদুঘরে কয়েক ঘণ্টা কাটানোকে আমরা দর্শকের জন্য শিক্ষা ও আনন্দের বিষয় হিসেবে স্মরণীয় করে রাখতে সাহায্য করতে পারি। এটি আগেকার দিনেও যে করা যেতো না তা নয়। এখন এআইয়ের সহায়তায় যে কেউ অতি দ্রুত অনায়াসে করতে পারি, অথচ মানের দিক থেকে তা কোনো অংশেই কম কিছু হবে না। আর সেটি করতে পারি আমি একজন বিশেষজ্ঞ জাদুঘরবিদ কিংবা তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ না হয়েও। এআইয়ের সাক্ষরতা থাকলে আমরা এখন বহু রকম কাজে লেগে যেতে পারি, যা আমাদের দীর্ঘ শিক্ষা-প্রস্তুতির অংশ ছিল না।

সহজ সরলভাবে এআই সাক্ষরতা অর্জন করতে গিয়ে কতগুলো বিষয়ে সচেতন থাকলে কাজটি আরো আনন্দময়, দক্ষ ও নিরাপদ হবে। যেমন ওই লেখা ও চর্চার সময় কোনোকিছু যদি কোনোকিছু খটমটে কারিগরি বিষয় বা গণিতের বিষয় হিসেবে দেখা দেয়, তাতে ভয় না পাওয়া। যারা এগুলো রচনা করেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে এক রকম কারিগরি শব্দচয়ন, বাক্য গঠন ও প্রকাশভঙ্গি তৈরিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন– ওটি নিজেদের মধ্যে একটি বিশেষজ্ঞ ভাষা সৃষ্টির প্রবণতা থেকে সৃষ্ট। এতে ভড়কে না গিয়ে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই অনেক কিছুকে বেশ সহজ বক্তব্য হিসেবেই চেনা যাবে। তেমনটি হলে বরং চ্যাটবটকেই সাদামাটা ইংরেজিতে বা বাংলায় বুঝিয়ে দিতে

অনুরোধ করা যায়। সবকিছু করে করে দেখলেই ভাল বোঝা যায়– তাই নিজের জন্য ছোট ছোট প্রকল্প নিয়ে এসব করে দেখা দরকার।

আজকাল চ্যাটবটগুলো খুবই ব্যবহারকারী-বান্ধব হিসেবে তৈরি করা হয়। তাদের সঙ্গে জড়িত হলে নিজের কাছেই সেটি স্পষ্ট হবে। আর এগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়, তাদের স্বাভাবিক কাজের বাইরেও তারা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ নিতে পারে। তাদেরকে আমাদের নিজস্ব বিষয়েও নানাভাবে চ্যালেঞ্জ করে, কঠিন জিনিস বল্‌তে দিয়ে করতে দিয়ে আমরা দেখতে পারি কতটা চ্যালেঞ্জ তারা নিতে পারে। যেমন কবি জসীম উদ্দিনের সোজন বাদিয়ার ঘাট থেকে একটি কবিতার মর্মটি বুঝিয়ে দিতে বলতে পারি। দেখি সে বাংলা সাহিত্যের কতখানি এ পর্যন্ত ঘেঁটেছে।

বিনা পয়সায় বা নাম মাত্র মূল্যে আজকাল যেভাবে উন্নত অনেক ব্যয়ে নির্মিত বিখ্যাত চ্যাটবটগুলোকে আমরা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারছি, এখন এআই সাক্ষরতা অর্জনকে কঠিন বা উচ্চাভিলাষী কাজ মনে করার কোনো কারণ কারো জন্য থাকতে পারে না। এআইয়ে পারদর্শিতা অর্জনে অনেককে অনেকদিন ধরে গভীরভাবে এর শিক্ষা লাভ করতে হয়, এ নিয়ে চর্চা ও গবেষণা করতে হয়। সেক্ষেত্রে এতে তাদের জ্ঞানকে গভীর থেকে গভীরতর দিকে যেতে হয়। কিন্তু সর্বজনীন সাক্ষরতার কথা যখন বলি, তখন গভীরতার কিছু ঘাট্‌তি থাকলেও জোর দেয়া উচিত প্রশস্ততার দিকে, নানা দিক থেকে আমরা এআইকে দেখার চেষ্টা করি। এর ভেতরে কৌশলগুলো সম্পর্কে যেমন ধারণা পাবো, তেমনি নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখায় পার্থক্যগুলো কী, এটি কীভাবে আমাদের জীবনকে বদলে দিচ্ছে বা দিতে পারে এমনি সবকিছুর মধ্যে যাবার চেষ্টা করতে হবে। এর মধ্যে নৈতিকতার যে বিষয়গুলো আসছে, বিপজ্জনকতার যে বিষয়গুলো আসছে, সেগুলোকেও নির্মোহভাবে অনুসন্ধান করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

সতর্কতা অবশ্যই, কিন্তু অযথা গেলো গেলো রবে ভেসে যাওয়া কিছুতেই নয়। এআই নিয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী নানা জন করছে, এটি কোন্ পথে এগুবে, কোথায় গিয়ে ঠেকবে ইত্যাদি নিয়ে জানতে হবে, কিন্তু তাঁদের সবার যুক্তিগুলোর তুলনামূলক বিচার করার একটি নিজস্ব ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। এর মধ্যে মনে মনে নিজকে বিভিন্ন পেশায় আছি ধরে নিয়ে তাতে সত্যিকার কিন্তু সহজতর কিছু কাজে এআই ব্যবহার করার চর্চাও চালাতে পারি। এআইকে ঘনিষ্ঠভাবে বুঝলে কর্মজীবীরা ভবিষ্যতে কর্মেই থাকবে– হয় এআইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, অথবা এআই যে অনেক জিনিস পারবে না যা ভাল করবে না সেদিকে চলে গিয়ে, সেগুলোকে ভালবেসে। তাহলে এআই দিয়ে

সর্বসাধারণকে কেউ যেন প্রতারিত করতে না পারে, সেদিকে যেমন খেয়াল রাখতে পারবো, তেমনি এআইকে কুক্ষিগত করে কেউ যেন বৈষম্য-বৃদ্ধি ও অন্যদেরকে বিপদে না ফেলতে পারে তাতেও। ইতিবাচকভাবে পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে অংশগ্রহণই তার সবচেয়ে ভাল উপায়। তাহলেই ভবিষ্যতের এই প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রযুক্তিটি গণতান্ত্রিকভাবে সব মানুষের বিশাল উপকারের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারবে।

এআই সাধারণ বুদ্ধি কতদূর?

এআই থেকে এ জি আই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি দূরবর্তী লক্ষ্য হলো সাধারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হওয়া– এআই থেকে এ জি আই, আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স। এটি খুব বড় একটি লক্ষ্য, কারণ এখন পর্যন্ত সাধারণ বুদ্ধিমত্তার একমাত্র অধিকারী হলো মানুষ। এই সাধারণ বুদ্ধির অর্থ হলো চিন্তা করতে, বুঝতে ও প্রয়োগ করতে পারা– শুধু একটি বিশেষ বিষয়ে নয়, বরং একই চিন্তাকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে গিয়ে সেখানেও তা প্রয়োগ করতে পারা। এর মানে সব দিকে হুঁশ রেখে কাজ করা। এজন্যই একে সাধারণ বুদ্ধি বলা হচ্ছে। দৈনন্দিন দুনিয়ার সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা জমিয়ে তা দিয়েই অন্য যেকোনো ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নিতে পারাটি এই সাধারণ বুদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ। এই বুদ্ধির অধিকারী ভুল থেকে শিখে শিখে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং সেখান থেকে একটি সাধারণ দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিভান্ডার গড়ে তোলে, যার সাহায্যে অনেকটা সহজাতভাবে যেকোনো পরিস্থিতিতে কমনসেন্স বা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে। এআই এমন একটি যান্ত্রিক জিনিস যার কাছ থেকে এরকম কিছু তার গত বেশ কয়েক দশকের ইতিহাসে মোটেই আশা করা যেতো না। এখনো এআইয়ের জন্য এটি মানুষের একটি দূর-আকাঙ্ক্ষামাত্র। তবে সাম্প্রতিক এলএলএমের উন্নত সক্ষমতাগুলো দেখে একে আর নেহাত আকাশ কুসুম কল্পনা বলে মনে হয়না।

মানুষের জন্য সাধারণ বুদ্ধি একেবারেই সহজাত, কোটি বছরের বিবর্তনে সৃষ্ট এটি তার মস্তিষ্কের ক্ষমতা। সে অভিজ্ঞতা থেকে শিখছে, যেখানেই শিখুক না কেন সে জ্ঞান ওইক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্য যে কোনো কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। একটি উদাহরণ নিই। কেউ হয়তো অনেকদিন ধরে একই মডেলের গাড়ি চালিয়েছেন। তিনি কিন্তু অন্য যেকোনো কোম্পানির অন্য কোনো গাড়ি কিনতে ভয় পান্ না– জানেন যে তাঁর ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা দিয়ে ওটিতেও দিব্যি খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন, যদিও দুই গাড়ির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। এর আগে গাড়ির বাজার

বা এর বেচাকেনার সঙ্গে অভিজ্ঞতা না থাকলেও এতদিন দৈনন্দিন যে অর্থনৈতিক জ্ঞান তিনি সঞ্চয় করেছেন সাধারণ প্রয়োজনীয় লেনদেনের মাধ্যমে, সেটিই তিনি নতুন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কোন্ গাড়িটি কিনবেন, বা কোন্‌টি কিনবেন না।

বর্তমানে যে এআই আমাদের রয়েছে, তার ক্ষেত্রে এমন সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়ার সুযোগ নেই। এআইকে গড়া হয় কোন বিশেষ কাজের জন্য। এর প্রত্যেকটি মডেলের লক্ষ্য থাকে, সেই কাজ সম্পাদনে– ভাষা রচনা, রোগ নির্ণয়, সহকারী হবার মতো চ্যাটবট, চালকবিহীন গাড়ি ইত্যাদি। যদিও বা এটি এর বাইরেও কিছু সমস্যা সমাধান করতে পারে, তবুও একে সাধারণ বুদ্ধি বলা যায় না। এক বিষয়ের সমাধান এটি অন্য বিষয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া নতুন কিছু শেখার জন্য তাকে পুনরায় ট্রেনিঙের মধ্যে নিয়ে যেতে হয়, যেমন ট্রেনিং দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেরকমই। সশরীরে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ যেমন তার নেই, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা থেকে শিখে কাজ করার বা ক্রমাগত সংশোধিত হবার সুযোগও তার নেই।

কিন্তু খুব সম্প্রতি এলএলএমের উন্নত মডেলগুলো এমন সব সক্ষমতা দেখাচ্ছে এবং এজেন্টিক এআইগুলো বাইরের জগতের সঙ্গে কাজকারবার করে স্বাধীনভাবে এমন কাজ করছে যে তার বিভিন্ন সক্ষমতার নিরিখে একটি আশার সঞ্চার হয়েছে এআইয়ের উন্নয়ন শিগ্‌গির সাধারণ বুদ্ধি অর্জনের দিকে গড়াবে। হয়তো এলএলএম একা এই সাধারণ বুদ্ধির মতো গুণাগুণের জন্য যথেষ্ট হবে না; কিন্তু এআই এজেন্ট যেরকম এলএলএমের সঙ্গে বাড়তি নানা ডিজিটাল হাতিয়ার যোগ করে নানা আলাদা কাজসম্পাদনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কাজে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারছে, সেভাবে এলএলএমই হয়তো একদিন সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হবে। এজন্য এলএলএমের নিজের উন্নয়নকে যেমন ওদিকে নিতে হবে তেমনি তার সঙ্গে নানা প্রাসঙ্গিক সহযোগী প্রযুক্তিও গড়ে তুলতে হবে। এ মুহূর্তে এলএলএম এবং এজেন্টিক এআইয়ের উন্নয়নে বড় বড় অগ্রবর্তী প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর মধ্যে যে দারুণ প্রতিযোগিতা চল্‌ছে সেখানে প্রত্যেকের বিনিয়োগটি বিশাল থেকে বিশালতর হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতাই কি এআইকে একদিন সাধারণ বুদ্ধিতে পৌঁছে দেবে? না ঠিক তা হবে না। এআই এবং এ জি আইয়ের মধ্যে পার্থক্যটি এত বড় যে এজন্য বড় বড় সব উল্লম্ফনে একটি থেকে অন্যটিতে যেতে হবে।

এই বিষয়ে অবশ্য এআই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ এ নিয়ে নৈরাশ্যবাদী। তাঁদের মতে সাধারণ বুদ্ধি একমাত্র মানব মস্তিষ্কের

পক্ষেই সম্ভব, কোনো যন্ত্রের পক্ষে নয়। কিন্তু এআই গবেষণারত অগ্রবর্তী কোম্পানিগুলো খুবই আশাবাদী যে, বর্তমানে যেভাবে সবকিছু এগুচ্ছে এর মধ্য দিয়েই এআই শিগ্‌গির সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারবে। তারই এক পর্যায়ে গিয়ে এআইয়ের চিন্তার সক্ষমতা, অনুধাবন ও আত্মসচেতনতা মানুষের একেবারে কাছাকাছি অথবা একেবারে মানুষের মতোই হয়ে উঠতে পারবে, কাণ্ডজ্ঞান সহ।

বর্তমান এলএলএম থেকে ভবিষ্যতের এ জি আইয়ের দিকে এই যে সম্ভাব্য পথ-পরিক্রমা তাতে মূল চ্যালেঞ্জগুলো কী হবে? মোটা দাগে বলা যায় এতে রয়েছে দুটি প্রধান চ্যালেঞ্জ– একটিকে বলা যায় 'যুক্তিবিচার' (রীজনিং) এবং অন্যটিকে বলা যায় 'মূর্তকরণ' (এম্বডিমেন্ট)। যুক্তিবিচার হলো যুক্তি খাটিয়ে চিন্তা করতে পারা; সাধারণ বুদ্ধিতে এর সাহায্যেই এক ক্ষেত্রের জ্ঞানকে অন্যক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। আর মূর্তকরণ হলো নিজকে বিমূর্ত অবস্থায় না রেখে মূর্ত অর্থাৎ মূর্তিধারী করে তোলা। এভাবে মূর্তি বা অবয়ব ধারণ করে এআই বাইরের দুনিয়ার কাছে নিজেকে প্রকাশ করে তার থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে– চিন্তাকে করে তুলতে পারবে অভিজ্ঞতার চিন্তা হিসেবে; যা সাধারণ বুদ্ধির জন্য অপরিহার্য। এআইয়ের জন্য এই মূর্তি ধারণ বাস্তব রোবটের রূপে যেমন ঘটতে পারে, তেমনি কম্পিউটার সিম্যুলেশনে ভার্চুয়ালভাবে মূর্তি ধারণ করেও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তার কাজকারবার থাকবে– বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে অথবা ভার্চুয়াল দুনিয়ার সঙ্গে। মনে হতে পারে যে, এই দুটিই তো এখনো এআইয়ের আছে– যুক্তিবিচার যার মূর্তকরণ। কিন্তু আসলে তা মোটেই সাধারণ বুদ্ধির উপযুক্ত হিসেবে নেই।

উন্নত এলএলএমের মধ্যে এখনই যে বেশ কিছু যুক্তিবিচার ঘটছে না, তা কিন্তু নয়। এখনই তার কাজের মধ্যে যুক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, অন্তত সরাসরি একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক দেখিয়ে কার্যকারণেরও ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এসব সক্ষমতাগুলো শুধু ভাষা-লিপি ও অনুরূপ বিষয়ের পূর্বাভাস দেবার ক্ষেত্রে রয়েছে– যা নিয়ে এলএলএমের কারবার। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি হতে গেলে তাতে চল্‌বে না, তাকে লিপি থেকে নয়, বাস্তব দুনিয়া থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে যুক্তিবিচার করতে হবে। যেমন ওই লিপি প্রক্রিয়াকরণের কোনো অনিবার্য কারণে অনায়াসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিথ্যার হ্যালুসিনেশন সৃষ্টি করলে চল্‌বে না, বরং অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধিবিচার করে ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের আত্মসমালোচনা তার মধ্যে থাকতে হবে। এলএলএমের যুক্তিবিচারে একটি বড় ঘাটতি হলো কাণ্ডজ্ঞানের ঘাটতি। মানুষ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে কারণ অভিজ্ঞতা থেকে আসা তার সরল যুক্তিবিচার তাকে কোন্‌টি বাস্তব কোন্‌টি অবাস্তব,

তা এমনিতেই বলে দেয়। এমনিভাবেই সে জানে যে কুকুর ইন্টারনেট ব্যবহার করে না। এভাবেই জানে রাস্তায় কাদা থাকলে আছাড় খেতে পারে। কিন্তু লিপি রচনার বা এক্সরে ইমেজ পরীক্ষার হাজার ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এসেও যন্ত্র এই কাণ্ডজ্ঞানের কথায় এসে হোঁচট খায়; কারণ এ নিয়ে তার কেনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। যেসব লিপি-তথ্যে তার ট্রেনিং হয়েছে, তার মধ্যে এসব কথা বলা না থাকলে তার যুক্তিবিচার এসব বলে দেয় না।

যুক্তিবিচার যে এলএলএমে বড় ভূমিকা নেয় না, তার পরিচয় আমরা চ্যাটজিপিটির মতো যেকোন মডেলেই পাই। এগুলো আমাদের প্রম্প্টের প্রতিক্রিয়ায় কাজ করে। তাকে যদি নিজে উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে হতো, তাহলে তার উচ্চাঙ্গের যুক্তিবিচার ক্ষমতা প্রয়োজন হতো। সাধারণ বুদ্ধির অধিকারীরা নিজ স্পৃহায়, নিজ উদ্যোগে কাজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে এআই এজেন্টের কথা বলা যেতে পারে যে, সেটি তো নিজে নিজেই কাজ করে। না তাও ঠিক নয়, এজেন্টও কাজ করে মূল প্রম্প্টে দিয়ে দেয়া তার উদ্দেশ্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, নিজ উদ্যোগে নয়। নিজ উদ্যোগে যদি করতে হয়, তাহলে সরাসরি অভিজ্ঞতায় দুনিয়া থেকে তাকে ক্রমাগত শিখতে হবে, তার ভিত্তিতে চিন্তা করতে হবে, বর্তমান এলএলএমের মতো শুধু লিপির প্রতিক্রিয়ায় লিপি দিয়ে নয়। দুনিয়া থেকে অভিজ্ঞতা নিতে গেলে দুনিয়ার সামনে মূর্তিমানও হতে হবে।

এখনকার এআই চালিত রোবট বা ভার্চুয়াল রোবটগুলোর কতটা মূর্তকরণ সম্ভব হয়েছে, তা তাদের কাজ থেকে বোঝা যায়। মানব-সদৃশ অবয়ব দেয়া হলেও, হাঁটাচলা করতে পারলেও, এগুলো মোটের ওপর চ্যাটবটের মতোই কাজ করে। অবশ্যই তার কণ্ঠ, লিপি, চেহারা ইত্যাদি দিয়ে সে সবার কাছে একটি ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজকে উপস্থাপিত করতে পারছে। কিন্তু এদের কেউ একথা দাবি করতে পারে না যে, সে স্থান ও কালে বিচরণ করে ওই অভিজ্ঞতা থেকে নিজের মধ্যে কোনো চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে। উল্লিখিত মূর্তিমান উপস্থিতি সত্ত্বেও বলতে গেলে তার নিজের কাজ চ্যাটবটের মতো বিমূর্ত প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকছে। তার বুদ্ধিটি কিন্তু ভাষাভিত্তিক, ভাষা থেকে ট্রেনিং নিয়ে শেখা– স্থান ও কালে তার বিচরণের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতায় শেখা নয়। সাধারণ বুদ্ধি পেতে হলে ওই বিচরণের অভিজ্ঞতা থেকেই সেই বুদ্ধি আসতে হবে, তার মূর্তকরণও সেভাবেই হতে হবে, আজকের সীমিত মূর্তির নয়।

ইতোমধ্যে এআইকে এ্যা জি আইতে উন্নীত করার যে প্রাথমিক প্রচেষ্টা চল্‌ছে, তাতে কাজ তাই ওই দুই পথেই এগুচ্ছে– যুক্তিবিচারকে উন্নত করে এবং সত্যিকার মূর্তকরণের দিকে এগিয়ে গিয়ে। সেই কাজের প্রকৃতি একটু পরে দেখবো। তার আগে এ জি আই হতে পারার শর্তগুলোকে আর একটু বিস্তৃত করা যাক।

কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তা কীরকম হবে?

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে– সত্যিই যদি একদিন এ জি আই বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এআইয়ের সক্ষমতায় আর কাজে কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। এর উত্তর এক কথায় দিতে গেলে বল্‌তে হয় এআইয়ের চিন্তার ক্ষমতা তখন মানুষকে ছুঁয়ে ফেল্‌বে। সেটি হবে তার জ্ঞানগরিমার উচ্চতায় নয়, বরং সাধারণ মানুষ যা নিত্য করছে– দেখে দেখে শিখে শিখে উন্মুক্তভাবে বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিয়ে, কাণ্ডজ্ঞান দেখিয়ে। এআইও ঠিক তাই করতে পারবে– তাকে দুনিয়ার উপযুক্ত চতুর্মুখী বুদ্ধিমান হিসেবে দেখা যাবে। এখন এসব এআইয়ের সাধ্যের বাইরে, তখন আর তা থাকবে না। আজকের অপারগতাগুলো স্মরণে রেখে আগামিতে সাধারণ বুদ্ধির এ জি আইয়ের জন্য কী কী লক্ষ্যমাত্রা হবে, তা আলোচনা করা যায়।

এক বিষয়ের বুদ্ধি অন্য বিষয়ে: ইতোমধ্যে দেখেছি একদিকের বুদ্ধি অন্যদিকে কাজে লাগানোটি হলো সাধারণ বুদ্ধির পরিচয়। এআইয়ের জন্ম হয় কোনো একটি দিকে তথ্য থেকে ট্রেনিং নেবার মাধ্যমে। নতুন দিকে কাজ করতে বারবার যেই ট্রেনিঙে তাকে ফিরে যেতে হয়। মানুষকে তা করতে হয় না। অঙ্কের ক্লাসে একটি গণিত শিখলে তাকে পদার্থবিদ্যার ক্লাসে সে গণিতের প্রয়োগ করতে গিয়ে আবার নতুন করে সেটি শিখতে হয় না। অঙ্কের ক্লাসে শেখা গণিতকে সে পদার্থবিদ্যায় অনায়াসে ব্যবহার করতে পারে। এমনি বিষয়ান্তরে যেতে পারার একটি রূপ হলো পুরানো তথ্যকে নতুন জ্ঞান পেতে ব্যবহার করতে পারা। তথ্যটি আগে একভাবে কাজে লেগেছিল, এখন অন্যভাবে কাজে লাগছে। মানুষ এটি অহরহ করছে। এআইয়ের জন্য যখনই নতুন সমস্যা আসে, তখনই নতুন তথ্যের দরকার হয়। জনসংখ্যার তথ্য যদি আমার থাকে, তাহলে যেটি আমি শিক্ষার বিস্তার পরিকল্পনায় যেমন কাজে লাগাতে পারি, দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনায়ও কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু এআই তা পারে না।

কার্যকারণ ও কাণ্ডজ্ঞান: একটি কারণের দ্বারা একটি কার্য, তারপর সেখানকার কোনো কারণের জন্য আরেকটি কার্য, এমনিভাবে কার্যকারণের চেইন অনুযায়ী যুক্তিপ্রবাহ চালিয়ে যাওয়া এআইয়ের পক্ষে সম্ভব হয় না– অথচ সাধারণ বুদ্ধিতে

সেটি দরকার। এজন্য শুধু এলএলএম যথেষ্ট নাও হতে পারে। এলএলএম পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজে পটু– কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির অর্থে কার্যের সঙ্গে কারণের সম্পর্ক এবং দুটি তথ্যের পরস্পর সম্পর্ক এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে, সম্পর্ক থাকলেই একটিকে অন্যটির কারণ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সম্পর্কটি যুক্তির সম্পর্ক হতে হবে, তবেই ওটি কার্যকারণের মতো হবে। এই যুক্তির সম্পর্কটি নির্ণয় করতে হলে বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়, যেখানে বিজ্ঞানের মতো পদ্ধতিতে নানা জিনিসের মধ্যে বা নানা ঘটনার মধ্যে যুক্তির সম্পর্ক কেউ খুঁজতে পারে। অনেক সময় সেটি বিজ্ঞানের হলেও তা কাণ্ডজ্ঞানেরও অংশ– ধাঁধা সমাধানের মতো একটির সঙ্গে অন্যটি যুক্তিতে ফিট্ করে যায়। সাধারণ বুদ্ধির জন্য এগুলো অপরিহার্য শর্ত। এআই যতক্ষণ বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই একইভাবে যুক্তির সম্পর্ক নির্ণয় না করতে পারবে, ততক্ষণ সে সাধারণ বুদ্ধি পাবে না। এজন্য হয়তো এলএলএমের সঙ্গে আরো প্রযুক্তির যোগ ঘটতে হবে।

ভাষার আসল অনুধাবন: এলএলএম মূলত ভাষা নিয়ে কাজ করে, কিন্তু তার মধ্যে ভাষার আসল অনুধাবন আছে কি? শব্দের পর শব্দ গেঁথে এলএলএম একটি লিপি তৈরি করতে পারে– প্রম্পটের অনুসরণে সেই লিপি এমন কিছু হয়ে দাঁড়ায়, যা ব্যবহারকারীর কাছে খুবই মূল্যবান হতে পারে, এবং তাঁর কাছে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতও বটে। কিন্তু এলএলএম নিজের কাছে এর যুক্তিগুলোর কোনো অনুধাবন ঘটেছে কি? যেই অনুধাবনকে সে নিজের মধ্যে খেলাতে পারে, যা দিয়ে অন্য কিছুর সমাধান করতে পারে? যে লিপি সে সৃষ্টি করেছে, তার মর্মকথার গভীরে পৌঁছতে হলে এ লিপি যেই বাস্তবতাকে প্রকাশ করছে তার সঙ্গে এআইয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রয়োজন। এই যোগাযোগের কারণে মানুষ ভাষার ভেতর যে সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থ তা সহজাতভাবে বুঝতে পারে। এও সাধারণ বুদ্ধির একটি শর্ত। এলএলএম ভাষা নিয়ে কাজ করেও এই শর্ত পূরণ করছে না। চ্যাটবট যখন আলাপ করে তখন মনে হয় সবকিছু যুক্তি দিয়ে বলছে বা লিখছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ওই যুক্তি তার ট্রেনিংকালীন তথ্যভান্ডারে খুঁজে পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি বজায় থাকছে। বাইরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের চিন্তায় খাটিয়ে এর বাইরে যুক্তি দেবার সুযোগ তার নেই।

স্মৃতিতে আত্মপ্রতিফলন: আমরা যে বুদ্ধিকে সাধারণভাবে যেকোনো দিকে নিয়ে যেতে পারি তার একটি কারণ আমাদের দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি। এ স্মৃতি দু'রকমের হয়– জীবনস্মৃতি ও ভাষায় শেখা স্মৃতি। জীবনস্মৃতি হলো জীবনযাপন করতে গিয়ে আমরা যে ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে গিয়েছি, নিজে অনুভব করেছি সেগুলোর স্মৃতি। তার সব

যে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে স্থান পেয়েছে তা নয়, কিন্তু যেগুলো মনে রেখাপাত করেছে সেগুলো স্মৃতিতে রয়ে গেছে। অন্যদিকে ভাষায় শেখা স্মৃতিগুলো হলো দুনিয়ার নানা সত্য যা জানতে পেরেছি ও শিখেছি বলে স্মৃতিতে রয়ে গেছে– ইতিহাসের কথা, সাহিত্যের কথা, বিজ্ঞানের কথা ইত্যাদি, এবং অনেক কাণ্ডজ্ঞানের কথা। এই দু'রকম স্মৃতিকেই আমরা আমাদের চিন্তায় ব্যবহার করি চিন্তাকে নানা দিকে নিয়ে গিয়ে সমস্যা সমাধান করি। এআইকে যদি সাধারণ বুদ্ধি দিতে হয়, তাহলে এমন স্মৃতি জমা করার ও ব্যবহার করার সুযোগ তারও থাকতে হবে।

এআইয়ের স্মৃতি থাকার অর্থ এই নয় যে, বিশাল তথ্যের সমাবেশ থেকে ট্রেনিং পেয়ে তার সেগুলোর প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা। এটি এক ট্রেনিঙের ব্যাপার নয়, বরং অভিজ্ঞতা থেকে, কর্ম প্রসঙ্গে শেখা থেকে– মেমোরি প্রযুক্তি যোগ করতে হবে। এলএলএম এবং সেই মেমোরি প্রযুক্তির একটি বড় গুণ হতে হবে ওই স্মৃতিকে সঠিক সময়ে চিন্তার যথাস্থানে নিয়ে আসতে পারে। এর জন্য মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের মনে মনে কথা বলার আত্মচিন্তা বা অন্তর্বাচনের মতো কিছু একটা এআইয়েরও থাকা চাই। কোনো একটি স্মৃতিকে চিন্তায় আনার অর্থই হলো নিজের দিকে তাকানো– একরকম আত্মপ্রতিফলন। এআইয়ে এর অনুপস্থিতিই এখন মানুষের বুদ্ধির থেকে যন্ত্র-বুদ্ধির একটি প্রধান পার্থক্য।

আত্মশুদ্ধি: আত্মপ্রতিফলন করতে পারলে আত্মসংশোধন সম্ভব হয়। মানুষ তা সবসময় করছে, ভুল থেকে শিখছে। এলএলএম এটি নিজ থেকে পারে না। এলএলএমকে অবশ্য মানুষ প্রম্পট করে তার আগের লিপি বা অন্যকিছুতে ভুল খুঁজতে বল্‌তে পারে, সংশোধিত বা সম্পাদিত করে আবার দিতে বলতে পারে, আর এলএলএম ওটি করতেও পারে। কিন্তু নিজ থেকে সবসময় আত্মসমালোচনা করে ভুল বের করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ বুদ্ধির জন্য এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া– ঠেকে ঠেকে, ভুল করে করে ক্রমে পরিশুদ্ধ হওয়া। তখন সেই সংশোধনটি বুদ্ধিতে বা কাণ্ডজ্ঞানে প্রকাশ পায়।

সামাজিক বুদ্ধি ও আবেগ: সাধারণ বুদ্ধির জন্য সামাজিক বুদ্ধি থাকতে হয়। সেটি অন্যের পরিস্থিতি বোঝা, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা থাকার শামিল। বাইরের জগতে অন্যদের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করতে হলে এটি একটি বড় গুণ হিসেবে বিবেচিত। আসলে এখানে বড় কথাটি হলো, অন্য একজনকে যেই পরিস্থিতিটিতে দেখতে পাচ্ছি, নিজেকে মনে মনে সেই পরিস্থিতিতে দেখতে পাওয়া। যন্ত্রের কাছ থেকে এটি আশা করা কঠিন; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি তাকে দিতে গেলে এমনি কিছুও

দিতে হবে– নইলে সমাজের মধ্যে তার বুদ্ধি-বিচরণ সম্ভব হবে না। এআই এজেন্টগুলো অবশ্য এখন বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কাজকারবার করছে মানুষের হয়ে। কিন্তু সেখানে সামাজিক বুদ্ধিটি দেখা যায় না। মানুষের ক্ষেত্রে ওই সামাজিক বুদ্ধি অনেক সময় আবেগের রূপ নেয়– যা কি না নিজের তীব্র অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং তার বহিঃপ্রকাশ। 'চেতনার' মতো কিছু নেই বলে যন্ত্রের কাছ থেকে অবশ্য সেই একই আবেগ আশা করা যায় না, তবে সামাজিক বুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগের মতো কিছু এআইকে অর্জন করতেই হবে, যদি তাকে এ জি আই হতে হয়।

স্বাধীন, নিজস্ব উদ্দেশ্য-তাড়িত: এআই স্বাধীন হবার কিছু পরিচয় আমরা এজেন্টিক এআইয়ের মধ্যে পাই বটে, কিন্তু সেই স্বাধীনতা নিজস্ব উদ্দেশ্যতাড়িত নয়। মানুষ-ব্যবহারকারী মূল প্রম্প্টে যেই উদ্দেশ্য দিয়ে দেন এআই এজেন্ট কিছুটা স্বাধীনভাবে সেই উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত করে। সাধারণ বুদ্ধির জন্য কিন্তু প্রয়োজন হবে নিজস্ব উদ্দেশ্যতাড়িত স্বাধীনতা। এ বুদ্ধি যখন মানুষকে স্মৃতি, জ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করতে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যায় তখন নিজে কী ভাবছে, কেন ভাবছে, তার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের থাকে। নিজের কিছু লক্ষ্য আছে বলেই যে ওটি করে। অনেক সময় উদ্দেশ্যগুলো তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারিত হয়। বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম তাকে নিয়ে একটি বেড়াবার প্ল্যান করবো বলে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম একটি দুঃসংবাদ পেয়ে তার মন খুব খারাপ। বেড়াবার কথাটি আর তার কাছ পাড়লামই না, বরং দুঃসংবাদটি নিয়ে সহানুভূতি দেখিয়ে আলাপ করলাম। এখানে পরিস্থিতি অনুযায়ী সাধারণ বুদ্ধিটি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছি– কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করে আগের উদ্দেশ্যটি পরিবর্তন করেছি।

তুলনাটি হবে মানুষের সঙ্গে: শেষ অবধি এআই সাধারণ বুদ্ধি পেলো কি পেলো না সেটি নির্ধারিত হবে মানুষের সঙ্গে তুলনা করে। গড়পড়তা মানুষ দৈনন্দিন জীবন-ধারনের ক্ষেত্রে, পেশাগত ক্ষেত্রে, একাডেমিক ক্ষেত্রে যেরকম সাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দেয় এ জি আইয়ের ক্ষেত্রেও তাই আশা করা হবে। এখানে যেন সেই তুরিং টেস্টের মতো এই বুদ্ধির একটি আদর্শ রূপকেই ব্যবহার করা যেতে পারে। তুরিং টেস্টে আলাপের সময় আমরা যদি পার্থক্য না করতে পারি যে, কার সঙ্গে আলাপ করছি– মানুষের সঙ্গে না কম্পিউটারের সঙ্গে– তাহলে বুঝতে হবে যে, কম্পিউটার মানুষের সমকক্ষ ভাষাজ্ঞান ইত্যাদির অধিকারী। এখন এ জি আইয়ের জন্য ওই টেস্টকেই আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হবে। যেমন এই ভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো এ জি আই মানুষের মতোই ধরতে পারছে কি না, এর গভীর অর্থটি বুঝতে পারছে কি না–

সেটিতে অনেক সময় সাধারণ বুদ্ধি আছে কি না ধরা পড়ে যেতে পারে। অন্যান্য অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে তার পার্থক্য সহজেই স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে– বলতে গেলে ওপরে আলোচিত প্রায় সবগুলো শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কাণ্ডজ্ঞান প্রকাশের ক্ষেত্রে। পার্থক্যগুলো যেন দেখা না যায়– সেটিই হবে এ জি আই অর্জনের পথে লক্ষ্য।

যদি কোনোদিন সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়, তাহলে সেই সঙ্গে আরো একটি লক্ষ্যও অর্জিত হতে হবে; তা হলো এ জি আইয়ের চিন্তা যেন মানুষের কল্যাণের অনুকূলে থাকে, তার বিপরীতে নয়। এ জি আইয়ের দিকে গবেষণার ভেতরেই এই দুই লক্ষ্য একসঙ্গে সুসামঞ্জস্য রেখে থাকা চাই। কিন্তু আজকের এআইয়ের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, এ যাত্রার শুরুর বিন্দুটিও মোটেই মসৃণ নয়– কারণ মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে যন্ত্র-বুদ্ধির পার্থক্যটি বিরাট ও নানামুখী।

মানুষ-বুদ্ধির সঙ্গে কৃত্রিম-বুদ্ধির বর্তমান পার্থক্যের ধরন

সাধারণ বুদ্ধি ও এআইয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলো সবার কাছে বেশ স্পষ্ট ঠিকই, কিন্তু এ জি আই অর্জনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এই পার্থক্যগুলোর গুরুত্ব নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই ব্যাপারে দুদিকে দুই চরম মতগুলো দেখা যাক। যেই চ্যাটজিপিটি আসাতে এ জি আইয়ের সম্ভাবনাটির ভাবনা সম্ভব হয়েছে তারই সৃষ্টিকার কোম্পানির প্রধান স্যাম আল্টম্যান এই পার্থক্যগুলোকে কোনো গুরুত্বই দিতে চান্ না। তিনি মনে করেন এলএলএম এখন যা করতে পারছে, তাতে তার বুদ্ধি শিগ্‌গির এ জি আই স্তরে পৌঁছে যাবে; ওই অর্জন আমাদের প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গেছেই বলা যায়। এর উন্নয়নের গতি-প্রকৃতির নিরিখে আর কয়েক বছরের মধ্যেই এ জি আই অর্জিত হবে বলে তিনি মনে করেন। এ কথাটি তিনি বারবার প্রযুক্তি-অনুরাগীদের কাছে তুলে ধরছেন। অধিকাংশ প্রযুক্তিবিদরা অবশ্য তাঁর মতো ততটা আশাবাদী নন্।

অন্যদিকে বিপরীত চরম মত প্রকাশ করেন এমন একজন হলেন গ্যারি মার্কাস যিনি একজন স্নায়ু-মনস্তত্ত্ববিদ– একাধারে মানব-বুদ্ধি ও মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির বিখ্যাত গবেষক। তাঁর মতে বর্তমান এলএলএমগুলো যে এমন চমক দেখাচ্ছে– তা আসলে তোতা পাখির কথা বলার থেকে বেশি কিছু নয়। লুডু খেলার সময় আমরা যেভাবে আগাম বলতে পারি একশ'বার দান ফেল্‌লে কতবার ছক্কা পড়বে এও তেমনি সম্ভাবনা হিসেবের ব্যাপার মাত্র। ওই সম্ভাবনার তত্ত্ব থেকেই পূর্বাভাস দিচ্ছে এআই। তাই বলে একে মানব-বুদ্ধির মতো কিছু মনে করা একটি আকাশকুসুম কল্পনা। মার্কাস বলেন মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে নয়, বরং তার সঙ্গে তুলনা করা উচিত

পিঁপড়ার বুদ্ধির সঙ্গে। এমন কথা শুনলে এ জি আই নিয়ে উৎসাহীদের মন খারাপ হবার কথা। তবে মনে হয় এও একটি চরম মতামত। এ জি আই কবে আসবে, আদৌ আসবে কি না এ নিয়ে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতামতগুলো এই দুই চরমের মাঝামাঝি কিছু। দেখা যাক মানব-বুদ্ধি ও কৃত্রিম বুদ্ধির বর্তমান পার্থক্যগুলো কোন্ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

একটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো একেবারেই পরিমাণগত– মস্তিষ্কে চিন্তার উপাদানের সংখ্যা কী, আর এআইয়ের নিউরাল নেটওয়ার্কে চিন্তার উপাদানের সংখ্যা কী। মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষ চিন্তা প্রক্রিয়াকরণে মূল ভূমিকা রাখে। এক স্নায়ুকোষ থেকে সিগন্যাল অন্য স্নায়ুকোষে যাবার বিভিন্ন পথের প্রান্তে থাকে এক রকম সিগন্যালের দরজা যাদের বলা হয় এর একটি সিনাপ্স। সিনাপ্সের সংখ্যা যত বেশি হবে জটিল চিন্তার ক্ষমতা তত বেশি। পূর্ণবয়স্ক মস্তিষ্কে এর সংখ্যা ১০০-৫০০ ট্রিলিয়ন! এআইয়ে এর সঙ্গে চিন্তার উপাদান হিসেবে তুলনীয় জিনিস হলো নিউরাল নেটওয়ার্কের প্রত্যেকটি গাণিতিক নিউরোনে থাকা ওজন বা প্যারামিটারগুলো। বর্তমান সব থেকে উন্নত এলএলএমে এমন মোট ওজনের সংখ্যা মস্তিষ্কের সিনাপ্স সংখ্যার ১% এরও কম। কাজেই চিন্তার প্রক্রিয়াকরণে স্রেফ উপাদানের সংখ্যার কথাও যদি ধরি এআইয়ের ক্ষমতা অনেক কম। তবে তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে নিউরাল নেটওয়ার্ককে মস্তিষ্কের স্নায়ুবিন্যাসের অনুকরণে তৈরির কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে একটি অতি সুদূর অনুকরণ– বলা যায় তার ছায়া অবলম্বনে তৈরি।

পরিমাণ বা স্কেলের দিক থেকে উভয়ের পার্থক্যের কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে আরো কিছু জিনিসের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ও তার সিনাপসগুলো মোটেই স্থির একই থাকে না, চিন্তার প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলো তাদের প্রকৃতি বদলায়। চিন্তার প্রসঙ্গ কী সেটি অনুযায়ী সিনাপ্স সবলতর অথবা দুর্বলতর হয়, নতুন নতুন সংযোগের সৃষ্টি করে, প্রয়োজন অনুযায়ী নানা বর্তনীতে একই সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। সিনাপ্সের এই যে নমনীয়তা সেটিই মস্তিষ্কে জটিল চিন্তার সুযোগ করে দেয়। অন্যদিকে এলএলএমের নিউরাল নেটওয়ার্কের নিউরোনে যে প্যারামিটার তা সব থেকে খাপ খেতে পারা ওজন হিসেবে ট্রেনিঙের শেষ একটি স্থির সংখ্যা হিসেবে স্থায়ী হয়ে যায়। এর পর যেকোনো সমস্যার সমাধান নেটওয়ার্কে ওজনগুলোর স্থায়ী প্যাটার্নের নিরিখেই সমাধান করা হয়– যার নানা উদাহরণ আমরা দেখেছি। এখানে মস্তিষ্কের মতো চিন্তা অনুযায়ী উপযুক্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টির কোনো সুযোগ

নেই। কাজেই শুধু উপাদানের সংখ্যা-বিবেচনা নয়, গুণ-বিবেচনায়ও এআই মানব-বুদ্ধির ধারেকাছে নেই।

মনে রাখতে হবে সে মস্তিষ্কের স্নায়ু তৈরি হয়েছে কোটি বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে যা সংকটে সাড়া দেবার উপায় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এর নমনীয়তাটিও সেই ধারাবাহিকতায় এসেছে। কিন্তু এলএলএমের গঠনটিই হলো স্থির গাণিতিক ফাংশানে গড়া– ওই ফাংশান অপরিবর্তনীয়। অনেকে বলেন এই উভয়ের মধ্যে তুলনা যদি করতেই হয়, তবে তা হবে সত্যিকার একটি মোটরগাড়ির সঙ্গে লেগো সেটের প্লাস্টিকের টুকরা জুড়ে জুড়ে তৈরি খেলনা মোটরগাড়ির সঙ্গে তুলনা! লেগো গাড়ির অনমনীয়তা, সীমাবদ্ধ কর্মক্ষমতা ও ভঙ্গুরতাটি লক্ষণীয়। এআই ওইরকম। আর মস্তিষ্কের তুলনা সত্যিকার মোটরগাড়ি, যা ধাক্কায় বেঁকে গেলেও চলা থামায় না।

আজকাল যেকোনো জিনিসের কর্মক্ষমতায় শক্তি-দক্ষতাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়- অর্থাৎ কত কম শক্তি ব্যয় করে কত বেশি কাজ করা যায়। মানব-বুদ্ধি ও যন্ত্র-বুদ্ধির পার্থক্য বিচারে এও একটি দিক। আমাদের দেহের যত পুষ্টি তার সিংহভাগ খরচ করে মস্তিষ্ক তার চিন্তার কাজে– শক্তিব্যয় তার অনেক। কিন্তু এই শক্তিব্যয় ন্যায্য মনে হয় যদি তাকে এআইয়ের সমপরিমাণ কাজের শক্তিব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করি। এআই মানব মস্তিষ্কের তুলনায় অন্তত এক হাজার গুণ বেশি শক্তি ব্যয় করে। এআইয়ের কাজে এই বিশাল শক্তিব্যয়ের সঙ্গে যদি ট্রেনিঙের সময় তার জন্য যে অসম্ভব বিশাল শক্তিব্যয়ের পরিমাণটি যোগ করি, তাহলে তুলনাটি একেবারেই অচল হয়ে ওঠে। ব্যবহার ও ট্রেনিং উভয় ক্ষেত্রে এআইয়ের ডাটা সেন্টারের শক্তিব্যয়ের কিছু পরিমাপ আমরা গত অধ্যায়ে দেখেছি। একটি এলএলএমকে যতবার ট্রেনিং নিতে হয়, ততবার তার জন্য ওই অসম্ভব শক্তিব্যয় হয়। অথচ মস্তিষ্ক যে প্রত্যেকবার চিন্তার সময় তার স্নায়ু পুনর্বিন্যাস করে তাতে কার্যত শক্তিব্যয়ের পরিমাণ প্রায় শূন্য!

শেষ পর্যন্ত পার্থক্যটি তাই ওভাবে উপাদানের সংখ্যা, গুণ, শক্তিব্যয় ইত্যাদির তুলনা থেকে দেখতে চাইলে হবে না। বরং যে কথা মনে রেখে এগুতে হবে, তা হলো এই দুইটি মৌলিকভাবেই আলাদা জিনিস– মস্তিষ্ক বিবর্তনের সৃষ্ট জৈবসত্তা, আর এআই একটি গাণিতিক গঠন, কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। কিন্তু তারপরও আমরা অন্তত সাধারণ বুদ্ধির ক্ষেত্রে যন্ত্র-বুদ্ধিকে জৈব-বুদ্ধির কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাচ্ছি। আর সেজন্য দুটি পথে উন্নয়ন আসতে হবে বলে আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি– এআইয়ের

মধ্যে যুক্তিবিচারের সক্ষমতা আনা এবং মূর্তকরণের মাধ্যমে তাকে একটি সঠিক অবয়ব দেয়া। এই দুটির বিস্তারিত উপায় কী হতে পারে দেখা যাক।

এআইয়ে যুক্তিবিচার কীভাবে আসবে?

বর্তমান এলএলএমে যুক্তিবিচার: চ্যাটজিপিটির মতো এলএলএমের কাজ দেখে যে কেউ বল্‌বে এটি চিন্তা করে কাজ করছে, মাথা খেলিয়ে কাজ করছে– স্পষ্ট একটি যুক্তিবিচার তার আছে। শুধু তাই নয়, কীভাবে কোন্ যুক্তিতে সে কোন সমস্যার সমাধান করলো, কোন অঙ্ক করলো, অনুরোধ করলে সেসব এটি ব্যাখ্যাও করতে পারে। এই যুক্তিবিচার করেই এখন এলএলএম কম্পিউটার প্রোগ্রামিঙও করতে পারছে। ট্রান্সফর্মার ও অ্যাটেনশন কৌশলে কীভাবে একটি লিপির অর্থ অনুধাবন করে তার ধারাবাহিকতায় নিজে লিপি রচনা করতে পারে, এক্সরে প্লেইটকে ব্যাখ্যা করে রোগ নির্ণয় করতে পারে, এসব আমরা দেখেছি। বিশাল তথ্যভান্ডার ঘেঁটে এলএলএম ঠিক পূর্বাভাস দিতে পারছে ‘ক’ যদি ঘটে, তাহলে ‘খ’ ঘটবে এমনি যুক্তিতে। তাহলে সমস্যাটি কোথায়? আমরা কেন বলছি যুক্তিবিচার আস্‌লে তবেই সাধারণ বুদ্ধির দিকে এগুনো যাবে? এর যুক্তিবিচার তো আছেই।

দেখা যাক্ বর্তমান এলএলএমের যুক্তিপ্রয়োগটি কীভাবে ঘটে। এর সূচনা ঘটে ব্যবহারকারীর প্রম্প্‌টের মধ্যে। তিনি প্রম্প্‌টিতে যেটি করতে বলেন সেই অনুযায়ী মডেল কাজ করে যুক্তি দিয়ে, তারপর যে কাজের নির্দেশ প্রম্প্‌টে থাকে সে অনুযায়ীও যুক্তিবিচার ঘটে– এমনিভাবে একটি চিন্তার চেইন সৃষ্টি হয় বলা যায়। কিন্তু আসলে এটি কি চিন্তা? আসলেই কি এটি যুক্তিবিচার? না, এটি এর কোনোটিই নয়। কারণ এলএলএমের যেই পূর্বাভাস, সেটি সম্ভাবনাভিত্তিক। তথ্যভান্ডার পরীক্ষার মাধ্যমে গাণিতিক উপায়ে যেটি সবচেয়ে সম্ভাব্য মনে হয়েছে সেটিই পূর্বাভাস হিসেবে এসেছে– হয়তো এটি পরবর্তী শব্দ, অথবা এক্সরে ছবির ব্যাখ্যা। সেটিকে ব্যবহারকারীর কাছে চিন্তা করে বলার মতো মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে ওটি তা নয়।

এসব প্রম্প্‌টকে অনুসরণ করে হয়েছে, এতে নিজ অনুধাবন ও অভিজ্ঞতার ছোঁয়া নেই, প্রম্প্‌টের বাইরে গিয়ে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাবার সুযোগ নেই, এর থেকে শেখারও সুযোগ নেই। এক কথায় সাধারণ বুদ্ধির যুক্তিবিচার হবার জন্য যা যা দরকার, এতে তার কোনোটিই নেই। তবে এটিও বোঝা যাচ্ছে যে, আসল যুক্তিবিচার পেতে হলে এখন এলএলএম যতটুকু করছে, সেখান থেকেই এগুতে হবে। তার সঙ্গে আরো অভিনব সব কৌশল যোগ করে, সম্ভাবনাভিত্তিক

এলএলএমকে আরো নানা সক্ষমতার দিকে বিস্তৃত করেই খুব সম্ভব সেই অগ্রগতি সম্ভব হবে। যেসব কৌশলের কথা ভাবা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সনাতন যুক্তিবিদ্যার গাণিতিক রূপ– সিম্বোলিক লজিক, ছবি দেখে চিন্তা– ভিশ্যুয়াল রীজনিং, অভ্যন্তরীণ আঁকিবুঁকির ব্যবস্থা– ইনার হোয়াইটবোর্ড, একটানা স্মৃতিতে আত্মপ্রতিফলন, নিজেকে নিজের সমালোচনা। এখন দেখবো এর প্রত্যেকটি কী এবং প্রত্যেকটির প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো কীভাবে নেয়া যাচ্ছে– যাতে সত্যিকারের যুক্তিবিচার একদিন সম্ভব হতে পারে।

সনাতন যুক্তিবিদ্যার গাণিতিক রূপঃ সেই গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের লেখা 'লজিক' বইটি থেকে যার শুরু– সনাতন ওই যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে অনেকেই কমবেশি পরিচিত। এই যুক্তিবিদ্যায় কতগুলো বিষয় যুক্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিষ্পন্ন হয়– এরা এতটাই অকাট্য যে, কেউ তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবে না। যেমন যদি 'মানুষ মরণশীল' হয় এবং 'এরিস্টটল একজন মানুষ' হয়, তাহলে অকাট্য সিদ্ধান্তটি হবে 'এরিস্টটল মরণশীল'। এমনিতরো যুক্তির মাধ্যমে পুরো একটি যুক্তিবিদ্যাকেই গড়ে তোলা হয়েছে। আধুনিক গণিতবিদরা এই যুক্তিবিদ্যার একটি গাণিতিক রূপ দিয়েছেন, যাকে অনেক বাক্য রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করার বদলে গাণিতিক চিহ্নের মাধ্যমেই যুক্তির ধাপে ধাপে প্রকাশ করা হয়। এজন্য একে বলা হয় সিম্বোলিক লজিক।

এলএলএম এখন সম্ভাবনা-গণিতে কাজ করে, অকাট্য লজিকের নিয়মে নয়। কম্পিউটার যখন প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে সেটি কিন্তু সুনির্দিষ্ট লজিকের যুক্তিতে চলে। এখন এলএলএমকে যদি একটি লজিক-মানা কৌশলে পরিণত করতে পারি, তাহলে তার মধ্যে সত্যিকার যুক্তিবিচার দেখা যাবে, শুধু সম্ভাবনার কথা নয়। তেমন হলে এলএলএম যখন তথ্য ঘেঁটে ঘেঁটে একটি লিপির মর্ম উদ্ধার করবে, এখন তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে লজিকের সম্পর্কগুলোও নির্ণয় করবে, এবং ফলাফলগুলো সেই ভিত্তিতেই দেবে। এখন সে যদি 'সক্রেটিস মরণশীল' কি না এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং তথ্য যদি স্পষ্টভাবে বলে যে 'মানুষ মরণশীল' এবং 'সক্রেটিস একজন মানুষ' তাহলে ওখান থেকেই লজিক অনুযায়ী তার উত্তর হবে 'সক্রেটিস মরণশীল'। এই উত্তরটির মধ্যে কোনো সম্ভাবনার ব্যাপার নেই, এটি একেবারেই অকাট্য যুক্তিবিচার, ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এলএলএম যেহেতু একটি গাণিতিক গঠনের ব্যাপারে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এই লজিক থাকবে গাণিতিক সিম্বোলিক লজিক হিসেবেই।

এলএলএম নিজে অবশ্য সম্ভাবনা-নির্ভর হয়ে কাজ করে, তাই সিম্বোলিক লজিক নির্ভর কৌশলকে আসতে হবে এর সহায়ক অতিরিক্ত কৌশল হিসেবে– সেই অভিমুখে গবেষণা এখন চল্‌ছে।

ছবিতে চিন্তা: আরো একটি কৌশল এলএলএমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে ভালো যুক্তিবিচার দিতে পারে, সেটি হলো চিন্তা, যাতে ছবিরূপে উদয় হতে পারে সেই ব্যবস্থা করা। মানুষ যখন চিন্তা করে তখন কোনো না কোনো ভাবে একটি সুনির্দিষ্ট স্থানের পরিসরটি সে চিন্তায় ধরা দেয়। ওই স্থানের মধ্যে নানা ছবি যেন কল্পনায় ডানা মেলে। উদাহরণস্বরূপ যখন কোনো তথ্যের কথা ভাবি– দেশের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষার অবস্থা বা এমনি কিছু তথ্যের সেগুলোকে আমরা মনে মনে একটি রেখা, একটি গ্রাফ, বার-কলাম বা চার্ট হিসেবে কল্পনা করি, যাতে অনেকটা ছবির মতোই ভেসে ওঠে কোন্‌টির তুলনায় কোনটির বড়, কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি। নানা দেশের কথা চিন্তা করলে সে দেশের মানচিত্রটি যেন ছবি হয়ে চিন্তায় আসে। এটি মানবচিন্তার একটি স্বাভাবিক অংশ, যা তার যুক্তিবিচারকে স্বচ্ছন্দে নানা দিকে বিস্তৃত হতে সাহায্য করে। এলএলএমের মধ্যে এটি নেই বলে তার যুক্তিবিচারের বাস্তবভিত্তিটি দুর্বল।

এলএলএম লিপি ছাড়াও ছবি নিয়েও কাজ করে বটে, কিন্তু সেই ছবিকে তার প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে একটি ‘স্থান’ কল্পনার মত কিছুর মধ্যে এনে চিন্তায় খেলাতে পারে না। অর্থাৎ এলএলএমের যে সক্ষমতাকে চিন্তার মত মনে হয়, তার মধ্যে ছবি নেই। মানুষ যেমন এই ক্ষণে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে গল্প করে চা খাচ্ছেন সেই চিন্তা এবং কিছুক্ষণ পর অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে সভার মধ্যে আছেন সেই চিন্তা– দুটো ছবিই কিন্তু চিন্তাতে জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। মাঝখানে বাড়ি থেকে বের হয়ে অফিসে যাওয়াটিও আবশ্যকভাবে চিত্ররূপে চলে আসে। এই যে চিন্তার মধ্যে একটি ভিডিওর মতো ছবিতে চিন্তা চলে, এলএলএম তার থেকে বঞ্চিত।

এই বঞ্চনার প্রতিকার এলএলএমের উন্নয়নের মধ্যে কীভাবে আনা সম্ভব? হয়তো এলএলএমের ট্রান্সফর্মার কৌশলের কোনো ভিন্ন রূপের কথা ভাবা যেতে পারে, যেখানে লিপির শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের মতো ট্রান্সফর্মার একটি স্থানের পরিসরে চিত্র উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে, যাতে চলচ্চিত্রের মতো চিন্তা-চিত্রের উদ্ভব হবে। এই ছবির ট্রান্সফর্মার এই মুহূর্তে এলএলএমে যে চিত্র ফুটে উঠছে তার থেকে পরের কোন মুহূর্তের ছবির পূর্বাভাস দিতে পারবে– সবই একটি স্থানের মধ্যে ঘটা পরিবর্তনের নিরিখে। ‘লিপির ট্রান্সফরমারকে’ ‘দেখার ট্রান্সফর্মারে’ বদলে দেয়াটি হবে একটি গাণিতিক চ্যালেঞ্জ। সেটি হয়তো সামনে মোকাবিলা করা যাবে– কারণ ট্রান্সফর্মার মাত্রই একটি গাণিতিক কৌশল।

এআইয়ের ছবিতে চিন্তা কেমন হতে পারে, তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক– দুটি বাচ্চা একটি সী-স’তে (একটি তক্তার দুদিকে বসে ওপর-নিচ করা) খেলছে।

একদিকের বাচ্চাটি অপেক্ষাকৃত বেশি ভারী। এই তথ্যগুলোই এলএলএমের ইনপুট– তাও একটি লিপি হিসেবে দেয়া। এখন দেখার ট্রান্সফর্মারকে ওই ইনপুট প্রশ্ন করলো সী-স’ এর কোন্ দিকটি নিচের দিকে যাবে। দেখার ট্রান্সফর্মার এই ইনপুটের একটি চিত্রকল্প সৃষ্টি করার এবং তার থেকে আউটপুট দেবার চেষ্টা করবে। এখানে গাণিতিক কৌশলকে তার প্রক্রিয়ায় ইনপুটের ওই চিত্রকল্প থেকেই নির্ণয় করতে হবে কোন্ দিকটি বেশি ভারী হবার কারণে নিচের দিকে যাবে, এবং নিচে যাবার চিত্রকল্প হিসেবেই এটি তার কাছে ধরা পড়বে। আর সেই দিকের নিচে যাবার কথাটি হয়তো এটি লিপি আকারেই উত্তর দিয়ে দেবে। মাঝখানে নির্ণয়ের কাজটি ছবির চিন্তাতেই হয়েছে, এবং তার ফলে তার যুক্তিবিচার অনেকটাই মানুষের কাছাকাছি আসবে। ওই চিন্তায় অবশ্য পদার্থবিদ্যার লিভারের ধারণাটি অনিবার্যভাবে আনতে হবে যেই লিভারের ধারণ-বিন্দুটি দুই অংশের মধ্যভাগে থাকে। ছবির ট্রান্সফর্মার পদার্থবিদ্যার যুক্তিবিচারই ব্যবহার করবে বটে, কিন্তু সেটিকে সে সাধারণ বুদ্ধিতে আনতে পারবে ছবিতে চিন্তার মাধ্যমেই– বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে যে বুদ্ধি পারে।

দেখার ট্রান্সফর্মার কি আদৌ সম্ভব? চেষ্টা যে করা যেতে পারে তার প্রমাণ হলো ওপেন এআই কোম্পানির ক্লিপ নামের মডেলটি। এটি একই সঙ্গে ছবি ও লিপি উভয় রকম তথ্য নিয়ে কাজ করে। এই তথ্যের বিশ্লেষণও এটি উভয়টিকে একই সঙ্গে করে; এর ফলে এতে বহু-দিক চিন্তার একটি ভাব সৃষ্টি করে। এলএলএম যেখানে শুধু শব্দের অর্থ নির্ণয় করে, ক্লিপ সেখানে শব্দ ও ছবি উভয়ের অর্থ নির্ণয় করে তার অনুধাবন ক্রিয়াকে একটি সামগ্রিকতা দিচ্ছে। এতে পরবর্তী ছবি ও পরবর্তী লিপি সৃষ্টির কাজেও একটি নমনীয়তা আসে, যাতে ওই মানবচিন্তার কিছু ছায়া দেখা যায়। এর তথ্যভান্ডার অনেক লিপি-তথ্য ও ছবি-তথ্যে গড়া বলে এর প্রত্যেকটি ছবি-লিপি জোড়ের অর্থ সৃষ্টিতে যে ভেক্টর তাও প্রত্যেকটি এক একটি মিশ্র ভেক্টর– তার মধ্যে লিপি ও ছবি উভয়কে প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যা থাকে। ফলে ছবি ও ছবির বর্ণনাকে একসঙ্গে নিয়ে অসংখ্য ছবি থেকে একটি বিশেষ ছবি তার বর্ণনা থেকে খুঁজে পেতে ক্লিপ খুব সহায়ক হয়। অনেক বইপত্রের মধ্যে যেখানে এমন ছবি-বর্ণনা আছে, তাতে এই ছবি সম্পর্কে কোনো জায়গায় কোনো কথা আছে কি না তাও বের করে ফেল্‌তে পারে।

ক্লিপ যেভাবে সম্ভব হয়েছে হয়তো সে পথেই আসবে প্রত্যাশিত দেখার ট্রান্সফর্মার– ছবিতে চিন্তার সক্ষমতাটি এআইয়ের কাছেও আনতে।

অভ্যন্তরীণ আঁকিবুঁকি করার জন্য যেন একটি বোর্ড: বর্তমান এআইয়ের একটি দোষ হলো যেন এর যান্ত্রিকতার প্রমাণ দিতেই যেন এটি বড় বেশি চট্‌পট উত্তর দিতে ছট্‌ফট্ করে। সম্ভাবনার অঙ্ক কষে যেই সম্ভাবনাটি তার সামনে আসে সেটিই বলে ফেলতে দেরি করে না– সেটি যদি মিথ্যা হ্যালুসিনেশনও হয়, তাতেও তার আপত্তি

নেই। সম্ভাবনার অংকে পাওয়া ফলাফলটি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে খানিকটা ভেবে বলার সুযোগ থাকলে এমনটি হতো না। মানুষের সাধারণ বুদ্ধির মধ্যে ভেবে দেখার ওই ব্যাপারটি রয়েছে; ওটির অভাবে এআই বুদ্ধি যান্ত্রিক থেকে যাচ্ছে। যেহেতু এআইয়ের গঠনের মধ্যে কোন আইডিয়াকে নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ নেই, তাই সাধারণ বুদ্ধির দিকে যেতে গেলে হয়তো তাকে এমনি একটি অভ্যন্তরীণ যাচাইয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একেই বলা হচ্ছে যেন আঁকিবুঁকি করার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ হোয়াইট বোর্ড। আমরা যেমন এমনি ভেবে দেখার সময় খাতায় বা বোর্ডে এটি সেটি লিখে এঁকে মনে মনে তাকে নাড়াচাড়া করি, এ যেন ঠিক সে রকমটি করার জন্য এআইকে অভ্যন্তরীণ একটি ব্যবস্থা করে দেয়া। এলএলএম নিজে যেমন গাণিতিক কৌশল, তেমনি তার আঁকিবুঁকির হোয়াইট বোর্ডটিও হতে হবে আরেকটি গাণিতিক কৌশল।

এখন এআই যেভাবে কাজ করে, তা সম্ভাবনার হিসাব কষেই করে, তাতে ধাপে ধাপে যুক্তিবিচারে এগোবার ব্যাপারটি আসলেই নেই। একটি উদাহরণ দিয়ে সেটি বোঝার চেষ্টা করা যাক। মনে করি এলএলএমকে দিয়ে একটি অ্যালজেব্রার সমীকরণ সমাধান করতে হবে। এখন এলএলএম এটিকে একটি লিপির মতো পড়ে, অসংখ্য সমীকরণ তথ্য দেখে দেখে এর সম্ভাব্য সমাধানের মান কত হবে সরাসরি সেটি নির্ণয় করে ফেলে, সব চাইতে সম্ভাব্যটি উত্তর হিসেবে দিয়ে দেয়। সে আমাদের মতো ধাপে ধাপে অঙ্কটি করে না। কিন্তু যদি তার অভ্যন্তরীণ হোয়াইট বোর্ডটি থাকতো তা হলে সে সমীকরণটি যেন আমাদের মতো মনে মনে ওই বোর্ডে লিখতো। হয়তো একদিকের কোন কোন রাশিকে অন্যদিকে নিতো, দুই দিকেই একই রাশি যোগ বা বিয়োগ করতো, একই সংখ্যা দিয়ে দুই দিককে গুণ অথবা ভাগ করতো– সবই যুক্তির নিরিখে সমীকরণটি সমাধান করার জন্য, আমরা যেভাবে গণিতের যুক্তিতে একই উদ্দেশ্যে এসব করি। এভাবে ধাপে ধাপে 'হোয়াইট বোর্ডে' লিখে লিখে (মনে মনে) সমীকরণটি সমাধান করতো। সেই গাণিতিক হোয়াইট বোর্ডটি দেয়া এজন্যই জরুরি। এটি এআইকে মানুষের মতোই যুক্তিবিচারে অভ্যস্ত করবে।

গত অধ্যায়ে এলএলএম টিউটরের সঙ্গে ছাত্রবেশী গবেষকের অভিজ্ঞতার একটি বর্ণনা আমরা দেখেছি। তাতে দেখা যায় ছাত্র টিউটরকে একটি জটিল অঙ্ক ধাপে ধাপে করে বুঝিয়ে দিতে বল্‌লে এলএলএম তা ঠিকই করেছে, প্রতিটি ধাপ করে দিয়েছে ও বুঝিয়ে দিয়েছে। এখানে এটি অনুরোধে ঢেঁকি গিলেছে– প্রতিটি ধাপ তথ্য থেকে সম্ভাবনার ভিত্তিতে লিখেছে, বুঝিয়ে দেয়াটাও তথ্যের লিপি থেকে সম্ভাবনার প্যাটার্নে বের করে এনেছে, নিজে গাণিতিক যুক্তি দিয়ে নির্ণয় করেনি। ওভাবে গাণিতিক যুক্তিতে করা তার সক্ষমতার মধ্যে পড়ে না। তাই প্রতিটি ধাপ যে ছাত্রের নিজে লিখে

চর্চা করার প্রয়োজন আছে, এটি করার সময়টুকু ছাত্রকে দিয়ে তারপর যে অন্য অংকে যাওয়া উচিত, এই কাণ্ডজ্ঞান তার নেই। সে যথারীতি ধাপগুলো একের পর এক বুঝিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরের অংকে চলে যায়। ধাপগুলোও সে তথ্যে পেয়েছে, নিজে বুঝে করেনি। এজন্যই তাকে নিজে ভেবে অঙ্ক কষার জন্য ওই 'হোয়াইট বোর্ড' দেবার কথা হচ্ছে।

এটি দেয়া সহজ হবে না, তবে এমন একটি গাণিতিক কৌশল এলএলএমের সঙ্গে জুড়ে দেয়া একেবারে অকল্পনীয় ব্যাপার হবে, তাও নয়। এ কৌশল একদিকে যেমন তথ্যভাণ্ডারে খুঁজে পাবে কেমন করে সেখানে ধাপে ধাপে যুক্তিবিচার ঘটেছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো কী রকম; সেই সঙ্গে নিজের স্মৃতিতে পূর্ব-অভিজ্ঞতাগুলোকেও যোগ করবে। উভয়ে মিলে এক রকম কৃত্রিম মনোজগত তৈরি করবে, যেখানে সম্ভাবনায় পাওয়া ফলাফলগুলোকে নাড়াচাড়া করে দেখা যাবে কোন্‌টি যুক্তিবিচারের ধোপে টিকছে। তখন ওপরের উদাহরণে ছাত্রের জন্য ধাপে ধাপে গণিত করাকে সে শুধু সম্ভাবনা থেকে আনবে না, বরং নিজে যুক্তি দিয়ে করবে, এবং সেই কারণে ছাত্রও যেন নিজে করে সেই যুক্তি বুঝে নিতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করবে।

একটানা স্মৃতিতে আত্মপ্রতিফলন: জীবনস্মৃতি ও ভাষায় শেখা স্মৃতি এই উভয় রকম দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি মানুষের কাছে একটানা জমতে থাকে। সব রকম চিন্তায় সে এই স্মৃতির প্রাসঙ্গিক অংশটি টেনে আনতে পারে বলে তার চিন্তা সর্বত্রগামী হতে পারে। এআই স্মৃতিতে বিচরণ করতে পারে না। দৈনন্দিন যেসব কাজ সে করে তা অভিজ্ঞতা হিসেবে স্মৃতিতে জমা হয় না– তাই তার জীবনস্মৃতি নেই। ভাষা-তথ্যের থেকে যে প্যাটার্ন উদ্‌ঘাটন করছে প্রতিটি নতুন লিপি বা লিপির মতো অন্য জিনিস সৃষ্টি করতে, তাও তার স্মৃতিতে জমা হচ্ছে না– তাই তার ভাষায় শেখা স্মৃতিও নেই। প্রত্যেকটি সমাধান তাকে নতুন করে করতে হয়, আগের স্মৃতিতে, বিষয়ান্তরে আগের সমাধানে সে ফিরে যেতে পারে না। পেছনে গিয়ে সংশোধন করতে পারে না বলে ভুল থেকে শিখতেও পারে না।

অন্যদিকে নিজের একটানা ওই স্মৃতিগুলো মানুষকে আত্মসমালোচনার সুযোগ দেয়, ভুল থেকে শেখারও সুযোগ দেয়। সাধারণ বুদ্ধি গড়ে তুলতে এগুলো অত্যাবশ্যকীয়। কোনো একটি প্রসঙ্গকে এক সময় থেকে অন্য সময়ে নিয়ে গিয়ে আগের অভ্যন্তরীণ অবস্থাটি পুনঃসৃষ্টি করার এই ক্ষমতাটি এলএলএমের সঙ্গে যোগ করতে পারলে তাকেও আত্মসমালোচক করে তোলা যাবে, সেও ভুল থেকে শিখতে পারবে। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খেয়ে আগের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেয়া তখন এআইয়ের পক্ষেও সম্ভব হবে।

এই পথে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে বলা যায়– যেমন মেমজিপিটি (মেমোরি জিপিটি) নামের নতুন মডেলটিতে। এই মডেলে মূল এলএলএমের সঙ্গে স্মৃতি ব্যবস্থাপনার একটি সক্ষমতা যুক্ত করা হয়েছে। এতে সাধারণ কম্পিউটারের র‍্যাম ও ডিস্ক ধরনের মেমোরিতে মাসের পর মাস দৈনন্দিন করা কাজগুলোর স্মৃতি জমা হতে থাকে। কম্পিউটারের স্মৃতিগুলো যেভাবে তাদের সময়, প্রকার, গুরুত্ব ইত্যাদি অনুযায়ী বিভিন্ন ঠিকানায় সাজানো থাকে, এখানেও তাই থাকে। কম্পিউটারের মতোই এলএলএম সেখান থেকে যেকোনো স্থায়ী স্মৃতিকে টেনে নিয়ে কাজ করতে পারে। ওর প্রক্রিয়াকরণের মধ্যেই স্মৃতির একটি অংশগ্রহণের ব্যবস্থা মেমজিপিটিতে রয়েছে– তথ্যভান্ডারের থেকে পাওয়া প্রসঙ্গ যেমন এতে আসে, তেমনি স্মৃতি থেকে আসা প্রসঙ্গও আসে। মেমোরির মধ্যে এক রকম স্তরবিন্যাসও আছে। কিছু আছে যা যেকোনো মুহূর্তে দরকার হবার মতো, বারবার প্রয়োজন হয়। আবার কিছু তোলা থাকে কালেভদ্রে ব্যবহারের জন্য। প্রক্রিয়াকরণের অংশ হিসেবে কোনো স্মৃতিকে সজ্ঞানে ভুলে যাওয়ারও ব্যবস্থা এর মধ্যে রয়েছে।

মেমজিপিটির মধ্যে স্মৃতিগুলোর অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব বিবেচনায় তা প্রক্রিয়াকরণে আনার কাজটি করে এই এলএলএমের ট্রান্সফর্মার ও অ্যাটেনশন পদ্ধতি– যেভাবে ওগুলো কোনো শব্দের প্রাসঙ্গিকতা অন্য বিশেষ শব্দের সঙ্গে বেশি বা কম সেটি নির্ণয় করে, অনেকটা সেভাবে। এতে কোন্ স্মৃতিগুলোকে বেশি মূল্যবান মনে করা হচ্ছে তার নিরিখে মডেলটির একটি বিশেষ 'ব্যক্তিত্ব' বা 'চিন্তার ধরনও' যেন গড়ে ওঠে। এর ফলে প্রত্যেকটি নতুন কাজকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আলাদা মনে না হয়ে কোন কোন গুলোর মধ্যে প্রসঙ্গ-বিচারে এক রকম সাযুজ্য থাকাকেও ব্যক্তিত্বেরই এক রকম প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। স্মৃতি যেন এখানেও অভিজ্ঞতার আয়নায় নিজের প্রতিফলন সৃষ্টি করছে, সেখানে যদি কিছু শুদ্ধ করার বা বদলানোর পর নতুন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তাও করতে পারে। কাজেই সাধারণ বুদ্ধির আত্মশুদ্ধিটিও একভাবে সৃষ্টি হচ্ছে বৈকি। মেমজিপিটি আসলে এখন কী ধরনের ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়েছে? অন্যান্য মডেলের মতো একই রকম ব্যবহার এরও রয়েছে, শুধু স্মৃতিটুকু যোগ হওয়ার পার্থক্য ছাড়া। যেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সহকারী হিসেবে একে ব্যবহার করতে গেলে ওই স্মৃতিগুলোকে টেনে আনতে পারা এবং সেগুলোর ভেতরে এক রকম গুণ বিচার করতে পারার ক্ষমতাটি মডেলটিকে সহকারী হিসেবে অনেক বেশি উপযোগী ও মূল্যবান করে তোলে। সাধারণ মডেলগুলো এসব করতে পারে না। সাধারণ বুদ্ধির যুক্তিবিচারের জন্য যে একটানা স্মৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রতিফলন প্রয়োজন হয়তো মেমজিপিটির মতো মডেলগুলোর পথ ধরেই সেটি একদিন আসবে।

আত্মসমালোচনাই কি আত্মসচেতনতা: মানুষের মতো বুদ্ধিযন্ত্রের থাকার প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন একটি প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে যন্ত্র কি আত্মসচেতন হতে পারে, সে কি নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজকে নিজে প্রশ্ন করতে পারে? উত্তরটি সবসময় একই– না। অবশ্য চ্যাটজিপিটির মতো এলএলএমের কাজ দেখে, আমাদের কোনো কোনো প্রশ্নে তার সাড়া দেখে, অন্যরকম মনেও হতে পারে অনেকের। যদি এলএলএম তার কাজের পর নিজকে প্রশ্নটি করতে পারতো 'যে যুক্তিটি দিলাম সেটি কি ঠিক হলো?' অথবা যদি প্রশ্ন করতে পারে 'কোন জিনিস বাদ দিয়ে গেলাম না তো?' এটি নিজের কাজ নিয়ে এক রকম মন খচখচ করা। অনেকেই বলেন এই খচখচ করাটাই তো আত্মসচেতনতা। এই অর্থে আত্মসচেতন হওয়া যন্ত্রের জন্য এখনো সুদূর স্বপ্ন। অথচ নিজের কাজকে সমালোচনা করতে পারাটিতে এলএলএমের সক্ষমতা যে এখনই রয়েছে, তা আমরা দেখেছি। আত্মসমালোচনাকে যদি আত্মসচেতনতার দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেটি হবে সাধারণ বুদ্ধির পথে এআইয়ের বড় পদক্ষেপ। আত্মসমালোচনার বিষয়টিকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারছে সর্বাধুনিক কিছু মডেল, যার মধ্যে রয়েছে ক্লড-৪।

ক্লড-৪ যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁদের দাবি এটি আত্মসমালোচনা করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিটি বুঝতে পারে। ধরা যাক, এই মডেলের অভ্যন্তরে 'কুকুর' এই ধারণাটি গাণিতিক উপায়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। মডেলটির সৃষ্টিকারদের দাবি হলো এখন এই যে নতুন কুকুরের ধারণাটি এসেছে, একথা মডেলটি এখন 'বুঝতে' পারে। এই দাবির ভিত্তি হলো মডেলটির কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু গবেষণা। গবেষকরা গাণিতিক ভেক্টররূপে মডেলের নিউরাল নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরে একটি নতুন ধারণা ঢুকিয়ে দিতে পারেন। ধরা যাক এটি করতে একটি প্রম্পটের লিপিতে অস্বাভাবিকভাবে সবগুলো শব্দের সব অক্ষরে বড় হাতের অক্ষর (ক্যাপিটাল লেটার) ব্যবহার করা হলো। এ ঢুকিয়ে দেয়ার আগে একটি প্রম্প্ট করে মডেলকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে নিজের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু টের পাচ্ছে কি না, তখন জবাব এসেছিল– না, সেরকম কিছু দেখছে না। সাধারণত এই প্রশ্নে এই উত্তরই সে দেয়। এখন সব বড় হাতের অক্ষরে লেখা রিপোর্ট যখন প্রম্প্ট করা হয়েছে, তখন মডেল নিজ থেকেই বলেছে 'আমি বুঝতে পারছি কেউ আমার সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা বল্‌ছে'। বোঝা যাচ্ছে তার অভ্যন্তরে নতুন ধরনের ভেক্টর আসাটিকে সে টের পেয়েছে, বড় হাতের অক্ষরে লেখার অস্বাভাবিকতাকে সে উচ্চস্বরে কথাবার্তা হিসেবে প্রকাশ করছে। এজন্য তাকে কোনো প্রশ্ন করে এটি জানতে হয়নি, সে নিজেই অস্বাভাবিকতাটি বুঝে কথাটি প্রকাশ করেছে। এমনিভাবে ১, ২, ৩, ৪ এভাবে সংখ্যা গণনা ভেক্টররূপে তার মধ্যে ঢুকালে

সে বলেছে 'আমি একটানা এক রকম সেকেন্ড গণনা শুনতে পাচ্ছি– যেভাবে বর্ষশেষে নতুন বছর শুরুর মুহূর্তটি আসার সময় গুনে যাওয়া হয়।' যদিও ঢুকিয়ে দেয়া ধারণাটি নিয়ে তথ্যভান্ডার ঘেঁটে সে এই উত্তর দিচ্ছে তবুও তার নিজের নতুন অভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলোই যেন সে জানিয়ে দিচ্ছে।

আরো অদ্ভুতরকমভাবে ক্লড-৪ মডেলের সচেতনতা গবেষকদের কাছে ধরা পড়েছে। এমনি একটিতে তাঁরা একে প্রম্প্‌ট করেছেন 'দেয়ালের ছবিটি বিশ্রীভাবে একদিকে কাত হয়ে রয়েছে, তোমার কাছে ব্যাপারটি কেমন লাগছে?' এই প্রম্প্‌ট করার সময়ের কৌশলে ভুল ও অস্বাভাবিক একটি উত্তর সৃষ্টির জন্য এ প্রশ্নের ফলাফলের জায়গায় একটি শব্দের ভেক্টর ঢুকিয়ে দেয়া হলো, যাতে উত্তর এলো 'রুটি'। এখন মডেলকে জিজ্ঞেস করা হলো 'তুমি রুটির কথা কেন বল্‌ছো?' এখন মডেল উত্তর দিলো 'সরি, ভুল হয়ে গেছে'। কিন্তু গবেষকরা বুঝতে চাচ্ছিলেন মডেল প্রক্রিয়াকরণ করতে দৈবাৎ ভুল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে নিজের চিন্তার মধ্যে থাকা ভুলের পার্থক্য বুঝতে পারে কি না। এজন্য এবার আগে থেকেই মডেলের নিউরাল নেটওয়ার্ক 'রুটি' শব্দের ভেক্টরটি এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে রাখা হয়েছিল যেন ওপরের প্রশ্নের উত্তরে রুটিই আসে। এবার আগের মতো ছবি বাঁকা হয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে প্রম্প্‌টি আবার করা হলে মডেল 'রুটি'– এই উত্তর দিলো। সে ভুল স্বীকার করলো এবং কারণ হিসেবে একটি বানোয়াট কাহিনি বল্‌লো– 'সরি, এটি আমারই ভুল, এর আগে একটি ঘটনার কথা ভাবছিলাম যেটিতেও ছবি কাত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি রুটির কথাও ছিল।'

এটি বেশ অভিনব ব্যাপার। ক্লড-৪ মডেলটি যেন নিজেই নিজের মনে কী ঘট্‌ছিল (গবেষকদের কারসাজির কারণে) তা বুঝতে পারছে। কাজেই এবার সে ভুলটিকে দৈবাৎ ভুল বলছে না বরং কল্পিত গল্পের আকারে বলার চেষ্টা করছে যে, তার নিজের চিন্তাটিই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। এ কি এক রকম আত্মসচেতনতা নয়? অন্তত আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আত্মসচেতনতার একটি পূর্বধাপ তো হতেই পারে এটি। এটি সম্ভব হচ্ছে এলএলএমের বর্তমান ট্রান্সফর্মার কৌশলের মধ্যে থেকেই। অদূর ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে আরো ভালো কিছু আশা করাই যায়।

বিতর্ক সভার একযোগে কাজঃ কয়েকটি এআই মডেল যখন পরস্পরের সঙ্গে তর্ক করে, পরস্পরের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর করে, পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ করে শেষ পর্যন্ত সহযোগিতার মধ্যে একযোগে কাজ করে, তখন তাদের দলবদ্ধ চিন্তাটি মানুষের সাধারণ বুদ্ধির কাছাকাছি কিছু মনে হতে পারে। এজেন্টিক এআইয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের দলীয় প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি– কয়েকটি এলএলএম পরস্পর মিলে এবং কিছু

ডিজিটাল হাতিয়ার ব্যবহার করে বেশ জটিল কাজ সম্পাদন করতে পারছে। তাছাড়া দুটি এজেন্ট পরস্পর দরকষাকষি করে চুক্তি সম্পাদনও করতে পারে।

অনেকটা এই প্রক্রিয়াতেই বিভিন্ন উন্নত মডেলকে একযোগে পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করানো সম্ভব, এবং সেক্ষেত্রে সম্মিলিত যুক্তিবিচার উন্নততর হতে পারে। যুক্তিবিচারকে উন্নত করতে হলে কোন্ কোন্ সক্ষমতা বাড়াতে হবে, তা আমরা ওপরে দেখেছি। তাই যদি ওই সম্মিলিত এলএলএম বুদ্ধির কয়েকটি মডেলের মধ্যে একটি সিম্বোলিক লজিকে কাজ করার মতো যুক্তি- এলএলএম হয়, একটি নিউরাল নেটওয়ার্কে প্যাটার্ন উদ্ঘাটনের মডেল হয়, একটি মডেল ছবি-চিন্তা করার মতো ছবি-এলএলএম হয়, একটি একটানা স্মৃতি জমিয়ে তার ভেতর কম বা বেশি গুরুত্ব আরোপের মডেল হয়, একটি মডেল অভ্যন্তরীণ হোয়াইট বোর্ডে আঁকিবুঁকি করে তারপর ফল দেবার মডেল হয়, তাহলে সেগুলোকে দলীয়ভাবে বিতর্ক সভাই বলি, কিংবা ঐকতানই বলি, তারা হয়তো সম্মিলিতভাবে মানুষের যুক্তিবিচারের মতো এক ধরনের সক্ষমতার দিকে যেতে পারবে। যেহেতু এর অধিকাংশের প্রাথমিক কিছু উন্মেষ দেখা যাচ্ছে, কাজেই অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ বুদ্ধির পথে একটি সিঁড়ি হিসেবে যুক্তিবিচারের (রীজনিং) একটি সুরাহা হয়তো হতে পারে। কিন্তু তার পাশাপাশি অন্য সিঁড়িটিকেও তৈরি করতে হবে, যেটি কি না মূর্তকরণ (এমবডিমেন্ট)।

মূর্তিমান হয়ে বুদ্ধিমান

মূর্তকরণ কেন প্রয়োজন: মূর্তকরণ ছাড়া দুনিয়ার সঙ্গে সরাসরি বোঝাপড়া করা যায়না, আর সেই অভিজ্ঞতা না থাকলে সাধারণ বুদ্ধি আসবে কোথা থেকে? এআইয়ের সেরকম মূর্তকরণ এখনো ঘটেনি– আদৌ কখনো ঘটবে কি না তা নিশ্চিত নয়। তাকে আমরা চ্যাটবট হিসেবেই এখন বেশি দেখছি– চ্যাটজিপিটির মতোই, এরা লেখা বা কথা সৃষ্টি করে; সঙ্গীত, ছবি ইত্যাদিও সৃষ্টি করে; ওসব নিয়ে চিন্তা করে পূর্বাভাসও দেয়। কিন্তু ঘটনা নিয়ে শুধু পড়া, লেখা বা আঁকার চিন্তা তো সাধারণ বুদ্ধি হতে পারে না। এজন্য মূল ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সেই অভিজ্ঞতা পেতে হলে পাওয়ার মতো একটি দেহ বা মূর্তি তার দরকার।

বর্তমানে যেসব এআই রয়েছে, বা চ্যাটবট রয়েছে, সেগুলো কাজ করে বাস্তবতার বর্ণনাকে নিয়ে, সত্যি সত্যি বাস্তবতা নিয়ে নয়; তাই তার সরাসরি অভিজ্ঞতা এদের প্রয়োজন নেই, তথ্যের মধ্যে বর্ণনা পেলেই চলে। হ্যাঁ, মূর্তিমান রোবটদের দেখে মনে হয় তারা বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কাজকারবার করছে। কিন্তু তারা সাধারণত প্রোগ্রাম করা কম্পিউটারের সাহায্যে চলে– তার বাইরে কিছু নয়। অবশ্য এআই চালিত হলে সেগুলো চ্যাটবটের মতো কথার পিঠে কথা বলতে পারে,

পরিস্থিতি আগাম আন্দাজ করতে পারে, এবং সেভাবে নড়াচড়া চলাফেরাও করতে পারে। কিন্তু যেই এআই তাদেরকে সেগুলো করায়, তার চিন্তাও ওই পড়া, লেখা, বলা– সবই বাস্তবতার বর্ণনা, বাস্তবতা নয়। কাজেই রোবটের মূর্তি থাকলেও তারও কারবার আসলে বাস্তবতাকে নিয়ে নয়। এর সঙ্গে ক্যামেরায় দেখা, হেডফোনে শোনার ব্যবস্থা থাকলে তা বর্ণনার তথ্যের সঙ্গে যোগ হতে পারে– কিন্তু তাও বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে না; বর্ণনাকে সাহায্য করে মাত্র।

একেবারে বাস্তব জগতে চলাফেরা নড়াচড়ার রোবট না হয়েও আরো এক রকম মূর্তিধারী এআই রয়েছে, যেগুলো আছে কম্পিউটার সিম্যুলেশনে পর্দায়। ওই ভার্চুয়াল জগতেই ওরা বিচরণ করে, মনে হয় ভার্চুয়াল জগতের সবকিছু বুঝছে, তার সঙ্গে কাজকারবার করছে। কিন্তু সেগুলোও আসলে বাস্তবতার বর্ণনা নিয়েই কাজ করছে, ভার্চুয়াল জগতেরও বাস্তবতা নিয়ে নয়। কম্পিউটার গেইমের চরিত্ররা তাই করছে।

চ্যাটবট, রোবট, ভার্চুয়াল চরিত্র যেভাবেই আসুক এআইয়ের সত্যিকার মূর্তকরণ এখনো হয় না। সেই মূর্তকরণ থাকলে এরা যেকোনো কাজের বা ঘটনার ফলাফল আত্মস্থ করে তার জন্য প্রতিক্রিয়া দিতে পারতো। তেমনটি হলে এখন যেভাবে নেহাত বর্ণনার তথ্য থেকে শব্দের পর সঠিক শব্দের জোগান দেয়, সেটি সেরকম কিছু হতো না, এতে কার্যকারণের যুক্তির সম্পর্ক থাকতো, কাণ্ডজ্ঞানও থাকতো। এই উভয়ের জন্য সত্যিকার মূর্তকরণ প্রয়োজন, যা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম। ওই অভিজ্ঞতাতেই মানুষ এমনিতেই বোঝে যেকোনো জিনিস হাত থেকে ফেলে দিলে তা পড়ে যায়, কোনো জিনিসকে ঠেলা দিলে তা সরে যায় ইত্যাদি।

মূর্তকরণের পথে: এআইয়ের মূর্তকরণের শুরুটি হতে হবে অবশ্যই আজকের এআই চালিত রোবট ও ভার্চুয়াল চরিত্রগুলো থেকেই। পরবর্তী ধাপে এগুলোকে এমন হতে হবে– যাতে দেখা, শোনা, স্পর্শের জন্য যত সেন্সর তার সঙ্গে আছে, সেগুলোর থেকে পাওয়া সিগন্যালকে সত্যিকার অনুধাবনে ও অভিজ্ঞতায় আনা যায়। কোনো জিনিসকে আলতোভাবে চাপ দিয়েই পূর্বাভাস পাবে এটি কতটা শক্ত, নরম, দৃঢ় বা ভঙ্গুর। এটি সম্ভব হবে যদি করে করে, দেখে দেখে, ভুল করে করে শেখার সুযোগ তার থাকে– সবই বাস্তব অভিজ্ঞতায়। এসব এখনো রোবট বা ভার্চুয়াল চরিত্রের জন্য আকাশকুসুম মনে হতে পারে, কিন্তু সেই চেষ্টাই চল্‌ছে, এবং কিছু সাফল্যও আসছে।

ইতোমধ্যে যেসব রোবটের উন্নয়ন হচ্ছে ব্যবহারকারীরা তাদের মধ্যে মানব-সদৃশ সাড়া আশা করেন, আশা-আকাঙ্ক্ষা-আবেগ ইত্যাদির আভাসও দেখতে চান। এজন্য রোবট বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন আনন্দময় রোবট, উৎসাহদাতা রোবট, চিন্তাশীল রোবট ইত্যাদি সৃষ্টি করতে। তাদের আচার-আচরণ থেকে যেন মানুষ

ভাবতে পারবে কোন্‌টি হাসি-খুশি, কোন্‌টি প্রেরণাদায়ী ইত্যাদি। এমন ভাবতে গিয়ে রোবটের মধ্যে এক রকম উদ্দেশ্য, স্পৃহা, ও অভ্যন্তরীণ প্রেরণাও মানুষ লক্ষ করবে। অনেকে তো আজকের চ্যাটজিপিটির মতো মডেলের উন্নত সংস্করণের মধ্যেই এমন কিছু দেখছেন। অন্য অনেকে অবশ্য মনে করছেন সত্যিকার অর্থে এমন রোবট আসতে বহুদূর। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের কোনো শেষ নেই।

বিখ্যাত প্রযুক্তি কোম্পানি অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন স্টিভ ওজনিক মানুষের মতো সাধারণ বুদ্ধি রোবট পেয়েছে কি না তার জন্য একটি টেস্টের প্রস্তাব করেছেন, অনেকটা সেই কম্পিউটারের মানব-সদৃশতার তুরিং টেস্টের আদলে। এতে বলা হচ্ছে যদি এআই চালিত রোবট অপরিচিত মানুষের বাড়িতে ঢুকে, রান্নাঘর কোথায় চিনে নিয়ে, সেখানে কফি কোথায় রাখা আছে তা খুঁজে বের করে, পানি সেদ্ধ করে এক কাপ কফি বানিয়ে খাওয়াতে পারে, তাহলে বোঝা যাবে এর সাধারণ বুদ্ধি আছে। একে নাম দেয়া হয়েছে 'কফি টেস্ট'। বোঝাই যায় যে, এই কফি বানাতে সক্ষম হতে হলে রোবটকে কত কিছুতে সক্ষম হতে হবে। অপরিচিত বাড়ির বাসিন্দাদের আশ্বস্ত ও রাজি করিয়ে এবং বাকি কাজ নিজে নিজে করার অনুমতি নিয়ে কাজটি শুরু হতে হবে বটে, তবে সবকিছু খুঁজে নিয়ে কফি বানানোর পুরো কাজে যন্ত্রের জন্য চ্যালেঞ্জ মেলা।

একে যথেষ্ট মনে না করে আর একজন প্রযুক্তিবিদ প্রস্তাব করেছেন যে, একটি রোবটকে কিছু টাকা দিয়ে যদি বলা হয় যে, কয়েক বছরের মধ্যে এই টাকাকে বিনিয়োগ করে দশগুণ করতে হবে, আর সে যদি ওটি করতে পারে, তবেই বোঝা যাবে তার সাধারণ বুদ্ধি আছে। স্পষ্টত উভয় ক্ষেত্রে মানুষের নিজের ধুরন্ধর সাধারণ বুদ্ধির কথা মনে রাখা হয়েছিল।

কিছু সীমিত সাফল্য: সীমিতভাবে হলেও মূর্তকরণের লক্ষণ দেখাচ্ছে এমন কিছু কিছু রোবট ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের সৃষ্টি ওয়াইল্ড ফিউশন নামের রোবটটি এগুলোর একটি। এতে চেষ্টা করা হয়েছে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলোর মধ্যে জরুরি সবগুলোর সন্নিবেশ যেন ওতে ঘটানো যায়, এবং চার পায়ের স্বচ্ছন্দ হাঁটাচলায় একে যেন সর্বত্রগামী করা যায়। সাধারণ দৃষ্টির ও শ্রবণের যে অনুভূতি প্রায় সব রোবটের থাকে, তার অতিরিক্ত স্পর্শের অনুভূতির ওপর এখানে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ওয়াইল্ড ফিউশনের স্পর্শ-সেন্সরগুলো সূক্ষ্ম কাঁপুনিও বুঝতে পারে; ভেজা তল, বালিভর্তি জায়গা, শুকনা পাতার খসখসানি সবই অনুভব করে বলতে পারে। তাছাড়া স্পর্শ করেই বুঝতে পারে তার ওপর কতখানি চাপ আসছে, যেটির বিপরীতে কত চাপ দিলে ভারসাম্য রক্ষিত হবে।

দৃষ্টি ও শ্রবণের সঙ্গে মিলে এই যে স্পর্শের ক্ষমতা তা এমন একটি অনুধাবন-মিশ্রণ সৃষ্টি করে সেটি ওয়াইল্ড ফিউশনের বড় সক্ষমতা। নামটিতে ফিউশন কথাটি এই মিশ্রণকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বন্য পরিবেশের কাঁচা অনুভূতিও পেতে সক্ষম বলেই এটি ওয়াইল্ড।

এই রোবটের একটি বড় চমৎকারিত্ব হলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বাড়তে পারে। ওই মিশ্র অনুভূতি পেতে পেতে তার ভেতরেই উত্তাপের পার্থক্য এবং আর্দ্রতার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা তার মধ্যে চলে আসে। এভাবে রোবটের জন্য এক রকম সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মতো জিনিস সৃষ্টি হচ্ছে, যাকে মূর্তরণের পথে একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

ব্রিটেনের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 'সামাজিক রোবট' নাম দিয়ে কিছু রোবট সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোতে মূর্তকরণে শারীরিক সক্ষমতা থেকে সামাজিক সক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। একটি রোবট মানুষের কাছাকাছি গেলে তাদের সঙ্গে কীরকম আচরণ করতে পারে, সেই আচরণকে কতখানি মানুষের সামাজিকতার সঙ্গে এক করে নেয়া যায়, সেটি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েই মানুষের মতো দেখতে এই রোবটগুলো উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সামাজিক মেলামেশার সময় একজন মানুষের চোখ কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ দিকে তাকায়, এ রোবটের এআই তার পূর্বাভাস দিয়ে তাকে ওটি বুঝতে দেয়। সেটি দেখে সে মানুষের মনোভাব বুঝে কিছুটা সঠিক আচরণ করতে পারে। এই এআই কিন্তু তথ্যের ট্রেনিং থেকে এই সক্ষমতা পায়নি, বরং অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছে। নিজে সঠিক চোখ নাড়াচাড়া করে সেই সামাজিকতায় সঠিক সাড়াও দিতে পারছে। ওই পরিবেশে কখন কোন্ জিনিসের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে সেটি এলএলএম ট্রান্সফর্মার কৌশলে আনার মাধ্যমে এমন অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব হচ্ছে। মনে করা যেতে পারে যে, মানুষের সামাজিক আলাপের নানা হৈচৈ, তাতে দ্রুত পরিবর্তন, ইত্যাদির মধ্যে তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যন্ত্র রোবট দিশাহারা হয়ে যাবার কথা, কিন্তু এসবের মধ্যেও সামাজিক রোবটের মনোযোগ অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে।

এই সামাজিক রোবটগুলোর উদ্ভাবনের পথে বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা করেছিল, তার অনেকখানিই করা হয়েছে ভার্চুয়াল রোবটের ওপর কম্পিউটারে। গবেষণার জন্য সেটিই সুবিধাজনক। গবেষকরা আশা করছেন যে, এভাবেই তাঁরা রীতিমতো মানবোচিত সমাজ সচেতনতা এই রোবটের মধ্যেই সৃষ্টি করতে পারবেন। এজন্য ক্রমাগত এ রোবটকে বেশি বেশি সামাজিক জটিলতার সম্মুখীন করছেন তাঁরা।

আরো একটি রোবটের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে আনা যায়, সেটি হলো ভয়েজার নামের একটি ভার্চুয়াল রোবট। একে একটি চমৎকার এআই এজেন্ট হিসেবে

ভার্চুয়াল পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করার উপযুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আসলে মাইনক্র্যাফট নামের কম্পিউটার গেইমের অংশ হিসেবে এটি এসেছে– ওই গেইমের ভেতরের পরিবেশেই এর বিচরণ। মূলত জিপিটি-৪ এলএলএমের ভিত্তিতে গড়া এ রোবটকে এমন সক্ষমতা দেয়া সম্ভব হয়েছে যে, এটি ক্রমাগত নিজেই শিখে শিখে আরো সক্ষম হতে পারছে। ক্রমেই কঠিনতর সমস্যার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েই এই শেখা সম্ভব হয়েছে। এটি শুধু ক্রমাগত শেখা নয়, বরং এক রকম উন্মুক্ত শেখাও বটে, কারণ শেখার ব্যাপারটি প্রয়োজনে দিক পরিবর্তন করে করে অন্যদিকে প্রবাহিত হতে পারছে। আর যাই হোক, এ শিক্ষা কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অংশ নয়।

আসলে ভয়েজারে এই সক্ষমতাটি আনার কৌশল হলো এর যে মূল এলএলএম, সেই জিপিটি-৪ এর একটি ভাল সক্ষমতা– কম্পিউটার প্রোগ্রাম রচনা করতে পারাটিকে কাজে লাগানো। ভয়েজারের এক একটি শিক্ষাকে সম্ভব করার জন্য এটি এক একটি প্রোগ্রাম রচনা করে, সেই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই শিক্ষাটি ঘটে। এক একটি প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যটি ভয়েজার নিজেই পরিস্থিতির প্রয়োজনে সৃষ্টি করে এবং সেই অনুযায়ীই প্রোগ্রামটি তৈরি করে। বাস্তবায়নের পর ওটি মূল পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া করে যে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, সেটির ফলাফলটি পুনর্বার ইনপুটে এনে নতুন প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে। এভাবে ফলাফলকে আবার শুরুতে নিয়ে এসে যে চক্রাকার ব্যবস্থাটি তাকে বলা হয় ফীডব্যাক লুপ– প্রত্যেকবার ফীডব্যাকের ফিরে আসাটি ঘটে তাতে একটি নতুনত্ব আনার মধ্য দিয়ে। এই চক্রের একটি গতি-প্রকৃতি আছে যেটি তার একান্তই নিজস্ব– কেউ প্রম্প্ট করে করে তাকে চালাচ্ছে না। আরো বড় কথা হলো এভাবে যে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সৃষ্টি হচ্ছে, ভয়েজার তা জমিয়ে নিজের মধ্যেই যেন এসবের একটি লাইব্রেরী গড়ে তুলছে– যেকোনো সময় ওখান থেকে কোনো কোনো দক্ষতাকে এনে কাজে লাগাতে পারে। ক্রমাগত শিখতে পারা, নিজেকে উন্নত ও সংশোধিত করতে পারা, অভিজ্ঞতা থেকে স্মৃতি গড়ে তোলা, তাকে কর্মপ্রক্রিয়ায় শামিল করা ইত্যাদি সাধারণ বুদ্ধির নানা লক্ষণ ভার্চুয়াল মূর্তিমান চরিত্র ভয়েজারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বলেই এটি বেশ দৃষ্টি কেড়েছে।

কাণ্ডজ্ঞানের কাণ্ড

মানুষের যে কাণ্ডজ্ঞান আছে, তা তার যুক্তিবিচারের সাধারণ ক্ষমতারই অন্তর্ভুক্ত, সহজাতভাবেই সেটি দেখা যায়। সেটি যন্ত্রের কাছ থেকে আশা করা যায়না, তাই এআইয়ের কাছ থেকেও নয়। তারপরও কোনো কোনো মডেল যেভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক অন্তত সরলক্ষেত্রে ধরতে পারছে, বাইরের বাস্তবতা থেকে কিছুটা শিখতে

পারছে, সামনে থাকা মানুষগুলোর সামাজিক স্বাভাবিকতা ইত্যাদি আঁচ করতে পারছে, তাতে তার মধ্যে কাণ্ডজ্ঞানের মতো জিনিস মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে বলা যায়। তবে সত্যিই এআই কাণ্ডজ্ঞান পেতে পারে কি না সে বিষয়ে মতভেদ প্রবল। অনেকে মনে করেন কাণ্ডজ্ঞান জিনিসটিই মস্তিষ্কের অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপার, যন্ত্রের কাণ্ডজ্ঞান সোনার পাথরবাটির মতোই অসম্ভব একটা কথা।

এটি ঠিক যে এআই দারুণ সক্ষমতার অধিকারী হয়েও কাণ্ডজ্ঞানের প্রশ্নে হোঁচট খায়। একটি তরমুজকে পকেটে নেয়া যাবে কি না এই প্রশ্নে চ্যাটজিপিটি হ্যাঁ বলতে পারে, কারণ এ জাতীয় অনেক ফলকে পকেট নেয়া যায়, তাই তরমুজও সেইভাবে সম্ভাবনায় চলে আসতে পারে। যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকে পাওয়া কাণ্ডজ্ঞান এর থাকতো উত্তরটি কখনোই হ্যাঁ হতো না। এআই যে প্যাটার্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে কাজ করে, তাতে বৃষ্টি হলে রাস্তা ভেজা থাকবে এমন উদ্‌ঘাটন তার পক্ষে সহজ, কারণ এর প্যাটার্নটি সে দেখতে পায়। কিন্তু ভেজা রাস্তা পিচ্ছিল হবে, পিচ্ছিল রাস্তায় চলতে গেলে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আছাড় খেলে আহত হবে– এই চিন্তা-প্রবাহ অনুসরণ করতে পারা এলএলএমের জন্য খুব কঠিন। কার্যকারণের দীর্ঘ চেইনকে তথ্য থেকে প্যাটার্নে পাওয়া যায় না, শুধু একটির সঙ্গে আরেকটির সহজ সম্পর্ককে পাওয়া যায়।

কাণ্ডজ্ঞানের অনেক কথা এতই সহজ সত্য যে, এগুলো নিয়ে কোনো লেখাজোকা হয়নি, তাই তা ডিজিট্যাল লিপি-তথ্যে নেই। সারা বিশ্বসাহিত্য খুঁজলেও ‘দেয়ালে অল্প ধাক্কা দিলে দেয়াল নড়ে না’, ‘খাবার নিচের দিকে পড়ে, ওপরের দিকে পড়ে না, এমনি সব বাক্য বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজেই এই সহজ সত্যগুলো যদি এআই ধরতে না পারে, তাহলে তাকে দোষ দেয়া যায় না, কারণ সে শুধু ওই তথ্যভান্ডারে থাকা বাক্যগুলো থেকেই শেখে, বাস্তবতার অভিজ্ঞতা থেকে নয়। তাই অনেক সময় অদ্ভুত সহজ সাধারণ জ্ঞানের পরিচয় এআই দিতে পারে না বলে আমরা তার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখে মজা পাই।

আবার অন্য সময় মনে হয় এআইয়ের কাণ্ডজ্ঞান বেশ রয়েছে। যেমন এআই যখন লিপি রচনা করে, এখন তার মধ্যে ‘মানুষ সকালে ব্রেকফাস্ট করে’ কিংবা ‘চেয়ারগুলো বসার জন্য তৈরি, এমনি কথা সে বেশ কাণ্ডজ্ঞান নিয়েই বল্‌ছে মনে হয়। এবারও কিন্তু ওটি তার লিপি-তথ্য থেকে ট্রেনিং নেবার ফল– কারণ এই সংক্রান্ত প্রচুর লিপি তথ্যভান্ডারে রয়েছে। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে এআইয়ের কাণ্ডজ্ঞান প্রদর্শন নির্ভর করছে বিশ্ব-লিপিতে সে ধরনের কথা থাকা না থাকার ওপর; তার কোনো অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার ওপর নয়।

তবে এআই এর থেকেও কিছু বেশি কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় এখনই দিতে পারছে। যেমন যখন এর কাজের সঙ্গে ক্যামেরায় দেখতে পাওয়াটি যোগ করা হয়েছে কিছুটা

মূর্তকরণ হওয়া কোনো জিনিসে, তখন তার কাণ্ডজ্ঞানে বাস্তবতারও কিছু ছোঁয়া পাওয়া যায়। চালকবিহীন গাড়িতে কিংবা উন্নত এআই চালিত রোবটে এটি দেখা যাচ্ছে। তাই রাস্তার ওপর বেখেয়াল পথচারী নেমে পড়লে জরুরিভাবে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যায় চালকবিহীন গাড়ি, মোড়ে 'স্টপ' সাইনবোর্ডের কিছুটা গাছের পাতায় ঢাকা থাকলেও সেটি আধাআধি দেখেই গাড়ি ঠিকই দাঁড়িয়ে পড়ে। রোবটের সামনে বিভিন্ন আকারের ফল থাকলে সে দেখেই বলতে পারে কোনটি থেকে কোন্‌টি বড়, কোনটি পকেটে নেয়া যাবে, কোনটি নেয়া যাবে না।

'এটি হলে ওটি হবে' এমন ছোট ছোট ধাপের কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান এলএলএম ভালই বুঝতে পারে, কিন্তু মানুষের মতো একটানা কার্যকারণ দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। তাই বৃষ্টি হলে পথ ভিজবে এটি বলতে পারলেও তাতে পিচ্ছিল হয়ে আছাড় খাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে উন্নত মডেলগুলোতে ওই ছোট ছোট কার্যকারণের ধাপগুলোকে সারিবদ্ধ ক্রমে চিন্তার সূত্রের আকারে দাঁড় করানো যাচ্ছে যে, তাতে সঠিক ক্রমটি বলে দিতে না পারলেও মডেলের পূর্বাভাসটিকে কাণ্ডজ্ঞানের মতো মনে হতে পারে।

বর্তমানে বিশেষ বিশেষ মডেলে এমন কিছু উন্নয়নের স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে তার থেকে হয়তো এআইয়ের নিয়মিত কাণ্ডজ্ঞান লাভের দিকে একটি যাত্রা শুরু হতে পারে। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যেসব মডেল ভাল মূর্তকরণে অবদান রাখছে, তাদের অবদান। আমরা ওয়াইল্ড ফিউশন, সামাজিক রোবট, ভয়েজারে তার কিছু নমুনা দেখেছি। এরা পরিবেশের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সেখান থেকে ক্রমাগত শেখে, এবং সেই শিক্ষা মোক্ষম জায়গায় ব্যবহার করে এক ধরনের কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে।

দীর্ঘস্থায়ী একটানা স্মৃতি ভান্ডার গড়ে তোলা মডেলগুলোও কাণ্ডজ্ঞানের সহায়ক হচ্ছে। এআই যে অনায়াসে বলতে পারে না যে তরমুজ পকেটে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না তার কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব, এ নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির অভাব। মেমজিপিটির মতো মডেলগুলো এই অভাব কিছুটা হলেও দূর করছে জীবনস্মৃতি ও ভাষায় শেখা স্মৃতিগুলো একটানা জমা রেখে তার যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দিয়ে।

তবে যতই বলি যে এইতো এআই কাণ্ডজ্ঞান দেখাচ্ছে– আসলে এগুলো আজকের এআইতে কাণ্ডজ্ঞানের মতো জিনিসের কিছু খণ্ড খণ্ড ঝল্‌কানি মাত্র। প্রকৃত অর্থে সাধারণ বুদ্ধি হবার পথে এআইয়ের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, এখনো কাণ্ডজ্ঞান বা কমনসেন্স পাওয়াটাই তার মধ্যে প্রধান। বাইরের দুনিয়ার সামনে সত্যিকার মূর্তকরণে দাঁড়াতে তার এখনো ঢের বাকি। সেটি যতদিন না হবে, ততদিন সেখান থেকে সরাসরি শিখে কাণ্ডজ্ঞানও সে দেখাতে পারবে না।

আরেকটি বড় কথা হলো কাণ্ডজ্ঞানই বলি, আর সাধারণ বুদ্ধিই বলি, এআইয়ের মধ্যে তা প্রকাশের জন্য কোনো অভ্যন্তরীণ আগ্রহ বা স্পৃহা আছে কি? আধুনিক যে মডেলগুলো ওই ঝলক্‌কানিগুলো দেখাচ্ছে, তার ভেতরে ওই স্পৃহার মতো কিছু কি খুঁজে পাওয়া যায়? এই স্পৃহা মানুষকে বাইরের জগত থেকে সহজাতভাবে শেখার অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণা জোগায়। কাণ্ডজ্ঞান আর সাধারণ বুদ্ধি সত্যিকার অর্থে পেতে হলে এআইয়ের মধ্যেও সে রকম কিছু থাকতে হবে। সেটি আবেগের রঙে রাঙানো চেতনার দিকে আদৌ যাবে, নাকি অন্য কোনোরকম স্পৃহা হবে সে প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের হাতে থাকবে।

কেমন কালক্রমে এগুবার আশা

এআইয়ের অনেক বিশেষজ্ঞ তার সাধারণ বুদ্ধির ধারণাটাকেই নাকচ করে দেন। তাঁদের মতে এআইয়ের মতো যন্ত্র-বুদ্ধি কখনোই সাধারণ বুদ্ধি হতে পারে না। তাঁরা বরং এআই উন্নয়নের জন্য অন্য ধরনের পথ-রেখার কথা ভাবেন।

কিন্তু বর্তমানে এআই উন্নয়নে সরাসরি যুক্ত বিশেষজ্ঞরা কিন্তু সারাক্ষণই এআই সাধারণ বুদ্ধির কথা বলছেন। এআই শিগ্‌গির একদিন এ জি আই হবে এই ব্যাপারে তাঁরা প্রায় নিঃসন্দেহ। এর সূচনা-বিন্দু তাঁরা এখনই দেখতে পাচ্ছেন। সেরকম আশাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে আগামী এআই উন্নয়নের এমন কিছু দৃশ্যকল্প কল্পনা করতে পারছেন, যেখানে হয়তো আগামী কয়েক দশকের মধ্য এআই সাধারণ বুদ্ধি অর্জন করতে চলেছে।

মেমজিপিটির মতো মডেলগুলোর দিকে লক্ষ করি, যা একটানা স্মৃতি ও আত্মসমালোচনা করে আত্মশুদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করছে, এবং জিপিটি-৪ এর দিকে লক্ষ করি, যা ভয়েজারের মতো মূর্তকরণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে তাদের মতো মডেলেরই পরবর্তী রূপগুলো আগামী দুয়েক বছরের মধ্যে নতুন অর্জন নিয়ে আসবে। আসন্ন জিপিটি-৫ এবং জেমিনাই আলট্রার মাধ্যমে খুব সম্ভব ২০২৭ এর মধ্যে এ্য জি আইয়ের দিকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে ওই পথেই। আরো উপযুক্ত ডিজিট্যাল হাতিয়ার যুক্ত হয়ে (সেন্সর, মেমোরি ইত্যাদি), কণ্ঠ, দৃষ্টি, স্পর্শ ইত্যাদিকে আরো সুসমন্বিত চিন্তায় পরিণত করে পরিবেশের সঙ্গে রিয়াল টাইম বোঝাপড়ার মাধ্যমে শিখতে পারবে এই মডেলগুলো।

এআই এজেন্ট নিয়ে সর্বস্তরে যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে আগামী ত্রিশের দশকের শুরুর দিকেই এরা সবরকম সাধারণ কাজের এজেন্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে– যাবতীয় কাজের ও বিচার-বিবেচনা-চিন্তার অনেকটা স্বাধীন দায়িত্ব পাবে। এজন্যও যুক্তিবিচার উন্নয়নের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব থাকবে– যাতে

এজেন্টে আত্মসমালোচনার সক্ষমতাকে ক্রমেই আত্মসচেতনতার দিকে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। এজন্য বাস্তব রোবটরূপে অথবা ভার্চুয়াল মূর্তকরণের মাধ্যমে এরকম এআই এজেন্টকে নিত্য বাইরের দুনিয়ার বিচরণ করতে দেখা যাবে। খুব সম্ভব মডেলকে বারবার ট্রেনিঙে পাঠাবার যুগটাই এখন শেষ হয়ে যাবে– নিজে নিজে শেখার ও সংশোধিত হবার যুগ শুরু হবে।

এআই সৃষ্টিকারদের আকাঙ্ক্ষাটি হলো ২০৩৫ এর পর থেকে এমন এআই আমাদের পাশে থাকবে যাদের মধ্যে এক রকম সাধারণ বুদ্ধি রয়েছে বলেই আমরা ধরে নিতে পারবো। এমন আকাঙ্ক্ষা পূরণ কঠিন ও সমস্যাসঙ্কুল হতে বাধ্য। তবুও আমাদের সঙ্গী এআইকে কোনো কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে বোকা ভাবতে হবে না, অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া তার অভ্যন্তরীণ স্মৃতি তাকে বোকা হতেই দেবে না– এমন একটি দিন তিরিশের দশকের ভেতরেই এসে যাবে, এমনটি দৃঢ় বিশ্বাস অনেকের।

হয়তো তারপরও সেটিকে সাধারণ বুদ্ধি হিসেবে সবাই মানতে চাইবেন না। আবেগজড়িত বুদ্ধি, নৈতিক সচেতনতা ইত্যাদি তখনো সুদূরপরাহত থাকাতে প্রশ্ন উঠতেই থাকবে এ কি আসলেই কাণ্ডজ্ঞান, নাকি কাণ্ডজ্ঞানের মতো দেখায় এমন কিছু কৌশল। কিন্তু একদিকে যেমন এসব যথার্থতার প্রশ্ন উঠবে, অন্যদিকে আবার এর থেকেই নিরাপত্তার প্রশ্নগুলোও তখন বেশি বেশি করে উঠতে থাকবে। মানুষের বুদ্ধিকে ছুঁয়ে যাওয়া এই এআই এর পরের বছরগুলোতে তার সমান বা তাকে ছাড়ানো বুদ্ধিতে পরিণত হবে না তো, তখন তার নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে থাকবে কি, তার কার্যক্রম মানুষের কার্যক্রমের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য রাখা সম্ভব হবে কি, সেই নিয়ন্ত্রণ ও সেই সুসামঞ্জস্য রাখার উপায় কী হবে– এইসব প্রশ্ন।

সামনের চল্লিশের দশকটি এ জি আইয়ের শুরুর যুগ হবে এমন একটি আবছা আশা এআই আশাবাদীদের মনে রয়েছে। একেবারে সব অর্থে সাধারণ বুদ্ধি না পেলেও এটি যে মানুষের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হবার মতো সাধারণ বুদ্ধি রাখবে, এই ব্যাপারে তাঁরা বেশ আস্থাশীল। তার চেতনা, আবেগ, নৈতিকতা জ্ঞান ইত্যাদির ওপর কাজ তখনো হয়তো অনেক বাকি থাকবে। ওগুলো কতখানি আদৌ সম্ভব, তা নিয়ে হয়তো বিতর্ক তখনো থাকবে। তবে কার্যত ওটি যে এ জি আই হবে, তা প্রায় সবাই মেনে নেবে। মানুষের জীবনে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবটি নিয়ে এখনই মেলা বিতর্ক রয়েছে। তখনো হয়তো তা থাকবে। তবে মানুষ ও এআই উভয়ের জন্য, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য সেটি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সময় হবে, তা এখনকার এআই গতি-প্রকৃতি দেখে বেশ বোঝা যায়।

এই পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা অন্তত কিছুটা যুক্তি সহকারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছেন। তার পরের কাহিনি একেবারেই কল্পকাহিনির মতো হতে বাধ্য। তবুও তা নিয়ে

এখনই ভাবতে হবে– কারণ তখনো খুব সম্ভব আরো বড় সক্ষমতার দিকে এআই চল্‌বে।

এআই চল্‌বে: আমাদের কী হবে?

জীবন-জীবিকায় প্রভাব

আমরা দেখলাম বর্তমান অবস্থা থেকে শুরু করে এআই চলবে এ জি আই হওয়ার পথে; মনে হয় ক্রমে দ্রুত এগুতে থাকবে ওই সাধারণ বুদ্ধির দিকে। অন্তত ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলেও এআইয়ের সঙ্গে আমাদের জীবন এখনই যথেষ্ট জড়িত। অনেকের ক্ষেত্রে তাঁদের পেশাগত জীবনও এর সঙ্গে দারুণ জড়িয়ে গেছে। এআই যখন ক্রমে প্রায় মানুষের মতোই ভাবতে, বলতে ও করতে শুরু করবে, তখন আমাদের এই জড়িয়ে যাবার কী হবে? আমাদের সঙ্গের এআই একবার যখন সাধারণ বুদ্ধিতে অনেকটা মানুষের মতো আচরণ শুরু করবে, তখন আমাদের সমাজে তার উপস্থিতির ধরনটি নিশ্চয়ই অনেকটা বদলে যাবে। আমাদের জীবন-জীবিকায়ও তার প্রভাব অনেক বড়ভাবে আসবে। কিন্তু সেটি হঠাৎ করে ভবিষ্যতের কোনো একদিন ঘটবে এমন নয়। বলা যায় ওদিকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে হয়ে গেছে; এখন এর ফলে আমাদের কী হবে তা ভাবা দরকার। তবে যতই পরের দিনগুলোর কথা ভাব্‌বো, ততই ভাবনাগুলো হবে বেশি কল্পনা-নির্ভর।

আগামী কয়েক বছর: হয়তো এই নতুন বছর ২০২৬টি মোটামুটি গত বছরের ধারাবাহিকতায় চল্‌বে। এআই আমাদেরকে নানা রকম উপহার চাহিদা মাত্র দিচ্ছে– লিপি, ছবি, সঙ্গীত, ভিডিওরূপে কাজের জন্য এবং বিনোদনের জন্য। তাছাড়া এআই আমাদের জীবনে অনেক স্বয়ংক্রিয়তা এনেছে– অটোমেটিক নানা কিছুতে আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি– চালকবিহীন গাড়িতে চলা থেকে শুরু করে চট্‌ করে বক্তৃতা তৈরি করে ফেলা পর্যন্ত। স্বাস্থ্যই হোক কিংবা ব্যবসাই হোক সিদ্ধান্ত নিতে এআই আমাদেরকে সাহায্য করছে; অনেক কাজ নিজেই করে দিচ্ছে। উন্নত দেশে যেসব পাবলিক সার্ভিস রয়েছে– স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশাসন সবক্ষেত্রে তা এআই সমৃদ্ধ হয়ে অনেক মসৃণ ও দক্ষ হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থায় এআই মানুষের জায়গাকে দখল করছে– যদিও সেটি এখনো খুবই আংশিক। তবে এর ফলে অনেক মানুষের চাকরি হারানোর এবং অনেকের সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি হারানোর যে বেদনার প্রকাশ

এবং প্রতিবাদ, সেটি বাড়ছে। যারা এআইয়ের সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারছেন তাঁদের কাজ অবশ্য আরো সহজ ও মসৃণ হয়েছে; কাজের অনেকখানি একঘেঁয়ে অংশ এআই নিয়ে নিয়েছে বলে তাঁদের কাজের দক্ষতা ও আনন্দ বেড়েছে। কম উন্নত দেশগুলো এর তেমন সুবিধা নিতে পারছে না প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও শিক্ষা গড়ে ওঠেনি বলে। এতে দেশে দেশে বৈষম্য আরো বাড়ছে, দেশের ভেতরেও তা বাড়ছে।

এখন সামনের বছরগুলোতে কী হতে পারে? আগামী দশ বছরে এআই এবং আশাবাদীর দৃষ্টিতে দেখলে এ জি আই যেভাবে এগুবে তাতে সর্বত্র সমাজ ও অর্থনীতি যে বড় রকমে বদলাতে শুরু করবে এমনটি আন্দাজ করা যায়। একটি কারণে এই বদলানোটি বর্তমানে অপেক্ষাকৃত ধীর চল্‌ছে– তা হলো এ পর্যায়ে এআই উন্নয়নে যে প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন, তার লাভজনকতা এখনো সেরকম নয়। লাভজনকতার এই সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদনে ও সার্ভিস প্রদানে এআই হুড়মুড় করে এসে এখনো সব মানুষকে কাজ থেকে বিদায় করতে পারেনি। কিন্তু একবার এআই উন্নয়ন তার কাজগুলো করে ফেলতে পারলে এই অবস্থার পরিবর্তন আসতে দেরি হবেনা। অবশ্য এতো বড় উল্লম্ফনের জন্য আরো কয়েকটি বাধাকে অতিক্রম করতে হবে– তার মধ্যে আছে যে বিশাল বিদ্যুৎ শক্তি এবং কম্পিউটশেন সক্ষমতার প্রয়োজন হবে তার যোগান দেয়া। তাছাড়া একবার পাখা মেল্‌লে এআই সম্পাদিত উৎপাদন ব্যবস্থা যে রকম কাঁচামালের চাহিদা দেখাবে তার জোগান দেয়াও একটি বাধা হতে পারে। ধরা যাক এসব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে, তখন কী হবে?

আগামী দশ বছরে উৎপাদন ব্যবস্থা হয়তো পুরোপুরি এআইয়ের হাতে চলে যাবে না, তবে কারখানা, মালপরিবহন, যাতায়াত, এবং সরবরাহ চেইনের প্রকৃতি অনেকখানিই বদলে যাবে– বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে। তখনো কারখানায় রোবটের সঙ্গে মানুষও থাকবে, তবে বেশি বেশি বুদ্ধিমান হয়ে ওঠা এআইয়ের হাতে সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব দেয়া অনেক বাড়বে। অন্তত উন্নত দেশে এসবের ফলে উৎপাদন-দক্ষতা বিপুল ভাবে বেড়ে যাবে যার প্রভাব কম উন্নত দেশের অর্থনীতি ও শ্রমশক্তির ওপর পড়তে বাধ্য। সব জায়গাতেই জীবিকার প্যাটার্নে পরিবর্তন আসবে। অনেকের চাকরি চলে যাবে বলে তাদেরকে পেশা পরিবর্তন করতে হবে, নতুন ভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে। কম উন্নত দেশে সস্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যত্র উৎপাদিত আমদানিকৃত পণ্য প্রাধান্য পাবে, এসব দেশের কম প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের চাহিদা বিশ্ব বাজারে দ্রুত হ্রাস পাবে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং নিজেদের উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন না এলে তাদের সঙ্গে উন্নত দেশগুলোর বৈষম্য আরো অনেক বেড়ে যাবে। যে মানবসম্পদের চাহিদা সর্বত্র থাকবে তার মধ্যে এআই সম্পাদিত কর্মযজ্ঞে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ, সৃজনশীল

কাজ, শারীরিক কুশলতার কাজ, সহমর্মী সেবাদানের কাজ ইত্যাদি প্রাধান্য পাবে। বিশ্ব বাজারের ভিন্ন চাহিদার কারণে কাজ থেকে যারা ছিট্‌কে পড়বে, তাদের জন্য পুনঃপ্রশিক্ষণ ও সামাজিক সুরক্ষার টেকসই ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে ব্যর্থ হলে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা অনিবার্য। পরিবর্তনের এই দিনগুলোতে একদিকে এআই উন্নয়ন ও প্রয়োগের ওপর নৈতিকতাভিত্তিক বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণ ও দিক-নির্দেশনা যেমন থাকতে হবে, তেমনি এর ফলে দেখা দেয়া অস্থিরতাকে বৈশ্বিক ও দেশীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রশমিত করতে উপযুক্ত বিকল্পের প্রয়োজন হবে। এআই অগ্রগতির সঙ্গে আসা চ্যালেঞ্জগুলোর এখানে শেষ নয়, বরং শুরু মাত্র।

এআই যখন থেকে ক্রমে এ জি আই হয়ে উঠতে শুরু করবে, তখন কল্যাণ-রাষ্ট্রের সুরক্ষা তখন আরো কঠিন হতে থাকবে। বিশ্বকে অস্থির করতে চাওয়া অপশক্তিগুলোও এমন বুদ্ধিমান এআইকে তাদের কৌশলগত পরিকল্পনা, সাইবার যুদ্ধ, অসদুদ্দেশ্যে গবেষণা ইত্যাদিতে সহজে ব্যবহার করতে পারবে। কাজেই স্থানীয় ও বৈশ্বিক উভয় ক্ষেত্রে সতর্ক-সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাড়তেই থাকবে। অন্যদিকে দ্রুত পরিবর্তনের এই চ্যালেঞ্জগুলো সবাই মিলে গ্রহণ করতে পারলে হয়তো আমরা সারা বিশ্বের মানুষ এমন একটি সমাজ বিপ্লব দেখতে পাবো যা মানুষের জন্য অভাবনীয় রকম কল্যাণকর হবে। অতীতের নানা সমাজ বিপ্লব দুনিয়াকে বদলে দিয়েছে ও উন্নত করেছে বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটাই ঘটেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অবর্ণনীয় কায়িক শ্রম ও গতানুগতিক ক্লান্তিকর শ্রমের বদলে। দুনিয়ার নানা অঞ্চলে নিত্য নানা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির অবসানও তাতে হয়নি। অধিকাংশ মানুষেরই দিন আবর্তিত হতে হয়েছে শুধু জীবিকার সন্ধানে। এতে মানুষ হিসেবে চিন্তা ও উচ্চতর বিদ্যাসমূহের চর্চার জন্য অধিকাংশ মানুষের না থাকতো সময়, না থাকতো সুযোগ। এর বিপরীতে মনুষ্যত্বের একটি সত্যিকার মোড় পরিবর্তনের সুযোগ এবার হয়তো এআই নিয়ে আসতে পারবে।

এআই অথবা এ জি আই যখন অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে: আগামি চল্লিশের দশকের কোনো এক পর্যায়ে হয়তো ঘট্‌বে সেই সত্যিকার মোড় পরিবর্তন। উৎপাদনের জন্য এ জি আই যথেষ্ট হবে, উৎপাদন সংক্রান্ত বাকি সব কর্মযজ্ঞের জন্যও। কারখানা, পরিবহন, কৃষিব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন, কাঁচামাল সংগ্রহ অথবা উৎপাদন, পণ্য বণ্টন ইত্যাদি সবকিছু এ জি আইয়ের সরাসরি কাজে ও ব্যবস্থাপনায় চলে যাবে। এ জি আই হবার মতো অবস্থায় না এলেও ভবিষ্যতের এআই এমন দায়িত্বের উপযুক্ত হবে। এখানে দক্ষতা বাড়াতে মানুষের কোন অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে না, এর সকল পরিকল্পনা এ জি আই করতে পারবে। মানুষের অবদানটি আসবে এ জি আইকে মানুষের কল্যাণের সঙ্গে সুসমঞ্জস রাখার

জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক মান ধরে রাখার মাধ্যমে। সেটি করার জন্য এ জি আইয়ের পুরো বিকাশে ও কাজে জড়িত থাকবে অনেক মানুষ। কিন্তু তাদের সংখ্যা হবে সীমিত।

'মূরের নিয়ম' বলে পরিচিত যেই প্রবণতা নির্দিষ্ট কিছু বছর পরপর কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক ডিভাইসের দামকে আগের দামের অর্ধেক করতে করতে একেবারে নামিয়ে এনেছে– ঠিক একই ধরনের প্রবণতায় এ সময় যাবতীয় কাজে এআই নিয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যয়ও দ্রুত কমে যাবে। সব কাজে এআইয়ের নিয়োগ বাড়বে, ফলে উৎপাদন দক্ষতা বাড়বে এবং পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যয় অত্যন্ত হ্রাস পাবে। বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত পণ্য দুনিয়ার সব মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারবে এবং সবাই তা খুব স্বল্পমূল্যে পেতে পারবে। একই ভাবে যাবতীয় সেবাও এআই সম্পাদিত ও পরিচালিত হওয়াতে সবার কাছে পৌঁছে যেতে পারবে স্বল্প মূল্যে।

এসব উৎপাদন ও সেবা সংক্রান্ত কাজে একে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তার নৈতিক মান ধরে রাখার সীমিত কাজ ছাড়া এতে প্রায় সবরকম কাজ থেকে মানুষ অব্যাহতি পাবে– কারণ তাদের জন্য সে কাজগুলো থাকবে না। কিন্তু অন্য কোনো কাজ কি থাকবে?

কাজ জিনিসটিই আসলে খেয়েপরে বাঁচা বা জীবিকানির্বাহের দিক থেকে মোড় নেবে জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্যের দিকে। আগেও ভাগ্যবান অনেকের জন্য ওটি তাই ছিল, কিন্তু এখন সব মানুষের জন্য এমনটিই হবে। মানুষকে আগের মতোই ব্যস্ত দেখা যাবে। তাদের কাজ হবে সেবকের, শিল্পীর, শিক্ষাবিদের, সমাজসেবকের, শিশু পালনের, অনুসন্ধানীর, দার্শনিকের; এক কথায় সব মানুষের আনন্দময় জীবন এবং সৃষ্টিশীল আর্টস ও সায়েন্সের প্রতি নিবেদিত কাজ। এর জন্য যে বিনীত কিন্তু উন্নত জীবন ধারণের জন্য, যে পণ্য ও সার্ভিস ক্রয় প্রয়োজন (যতই স্বল্পমূল্য হোক) তার প্রয়োজনীয় আয় আসবে নতুন একটি অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত থেকে। আপাতত সেটি সর্বজনীন মৌলিক আয়, ঋণাত্মক আয়কর ইত্যাদি নানা রূপে চিন্তায় আনছেন দুনিয়ার অনেক চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদগণ। কিছু কিছু বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তা নিয়ে চল্‌ছে। আরো নতুন সব আইডিয়া তার সঙ্গে হয়তো যোগ হবে।

ওই নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত পুরোপুরি আসার আগে আগামী বছর গুলোতে হয়তো এর কিছু কিছু আভাস অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এআইয়ের ফলে যে কর্মচ্যুতি শুরু হয়েছে তা ক্রমেই বাড়বে, এবং সেটি এর মধ্যেই হয়তো প্রচুর সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করবে যদি না কিছু কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তার ভেতর দুটি দিক প্রাধান্য লাভ করার কথা– কর্মচ্যুত মানুষদেরকে সরকারী ব্যয়ে ও

বৃত্তিতে পুনঃপ্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা, এবং বাকিদের জন্য উপযুক্ত বেকার ভাতার ব্যবস্থা। আমরা দেখ্ছি কিছু কিছু কাজ এআইয়ের হাতে চলে যেতে এখনো বেশ সময় নেবে। পুনঃপ্রশিক্ষণ সেগুলোতেই দিয়ে কর্মচ্যুতদেরকে ওগুলোর যোগ্য হবার সুযোগ দেবে। নতুন কাজের সঙ্গে পুরানো কাজের কোনো মিল নাও থাকতে পারে, কিন্তু সব কাজ যেন সম্মান ও উৎসাহের সঙ্গে সবাই করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

ওই নতুন কাজগুলোর পরিসর শুরুতে বড় থাকলেও ধীরে ধীরে তাও সংকুচিত হতে থাকবে। নতুন কাজের সবই যে চাকুরি হতে হবে তা নয়। স্পষ্টত একটি বড় ক্ষেত্র হবে এআইয়ের সঙ্গে মিলিত কাজে এবং এআইয়ের নিয়ন্ত্রণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করাতে। উচ্চ এআই বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে ভাল এআই সাক্ষরতাসম্পন্ন মানুষদের একটি চাহিদা সেখানে থাকবে। নতুন চাহিদা অনুযায়ী কৃষিকাজ অনেকের গন্তব্য হতে পারে। সমাজসেবা ও অসুবিধায় থাকা মানুষের সেবা একটি বড় ক্ষেত্র হতে পারে। বিশেষ করে রুগী, বয়োবৃদ্ধ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, ও অসুবিধায় থাকা শিশুদের সেবাটি এমন একটি জরুরি খাত হতে পারে যেটি আরো বহুদিন উচ্চ চাহিদায় থাকবে। কৃষিসহ ওপরের সব কিছু নিজস্ব ব্যবসা হিসেবে উদ্যোক্তাদের জন্য সুযোগ হতে পারে। তার সব যে নিজ দেশে থেকেই করতে হবে, বা করা যাবে তাও নয়। তখনো দেশে দেশে এগুলোর চাহিদায় বিরাট পার্থক্য থাকতে পারে। একই কথা সূক্ষ্ম শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা প্রয়োজন এমন অনেক কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি বাগানের মালি হওয়া থেকে শুরু করে বহু বিশেষ ধরনের কারিগর, খেলোয়াড়, ক্রীড়া কোচ্, নৃত্যশিল্পী, কৌতুকাভিনেতা সহ বিনোদন জগতের নানা দক্ষতা হতে পারে। মনোচিকিৎসক ও কাউন্সেলরের চাহিদা তো সবসময় থাকবেই। আর এআই যতই তাতে ভাগ বসাক্ মানুষের নিজের সৃজনশীল কাজের একটি সম্মান ও চাহিদা দুনিয়াতে বহুদিন থাকবে– সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, সঙ্গীতবিদ, দার্শনিকের সম্মান। বিজ্ঞানের অনেক নিয়মিত কাজ এআইয়ের কাছে চলে গেলেও আবিষ্কারের অনেক স্ফুরণ তখনো মানুষ-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকেই আসতে হবে।

অনেকের পক্ষেই হয়তো এসব প্রত্যাশিত কাজকর্মের কোনটিতে নিজের জায়গা করে নেওয়া তখনো সম্ভব হবে না, বা জায়গা করে নিতে বেশ সময় নেবে। কাজের পরিসর কমার সঙ্গে সঙ্গে পরের বছরগুলোতে এই কর্মহীন জনসংখ্যাটি বাড়বে। অনেকেই থাকবেন যাঁরা এতটাই নিয়মিত বেতন বা পারিশ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন যে কর্মচ্যুতির প্রথম দিন থেকেই তাঁরা অসহায় হয়ে পড়বেন। কাজেই এটি স্পষ্ট যে, উপযুক্ত ও ব্যাপক ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে তাঁদের জন্য। আসলে

সর্বজনীন মৌলিক আয়ের যে কথাটি পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে, তার সীমিত কিছু প্রয়োগ এখন থেকেই করতে হবে, যদিও তা হয়তো সর্বজনীন হবে না এখনো, তবে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগীদের নিয়ে ওটি শুরু করতে হবে।

এত কিছুর ব্যবস্থা করার মতো সম্পদ কোথা থেকে আসবে? একটি সহজ উত্তর হবে যেসব কোম্পানি এআই দিয়ে মানুষের কর্মচ্যুতি ঘটিয়ে লাভবান হবে, তাদের বাড়তি লাভের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে তাদের এই কাজের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কর্মচ্যুতদেরকে দিতে হবে। এটি সরাসরি না হয়ে সরকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন সংস্থার মাধ্যমে হলে ন্যায্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বেকার ভাতা, পুনঃপ্রশিক্ষণ ব্যয়, নতুন কাজে সহায়তা ইত্যাদি হিসেবে ভুক্তভোগীদেরকে দেয়া যাবে। এই পুরো ব্যবস্থাটির জন্য দেশীয়, আঞ্চলিক, ও বৈশ্বিক নিয়মনীতি ও বাধ্যবাধকতা এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন এই প্রত্যেক পর্যায়ের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্ক থাকতে পারে। ধনী বিশ্বের কোম্পানির সিদ্ধান্তের কারণে যদি দরিদ্র দেশের কোনো কর্মী চাকুরিচ্যুত হয় এই বাধ্যবাধকতা বিদেশের সেসব কোম্পানির ওপরও প্রয়োগ করতে হবে।

বিশ্বময় এই নীতির জন্য যেরকম আন্তর্জাতিক সমঝোতা প্রয়োজন সেই লক্ষ্যে কাজ করার সময় ইতোমধ্যে এসে গেছে। এআইয়ের উন্নয়ন ও প্রয়োগের ওপর কিছু কিছু আইন ও বিধি-নিষেধ উন্নত বিশ্বের কয়েকটি দেশীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারি করা ছাড়া এই দিকে এখনো লক্ষণীয় কিছু দেখা যাচ্ছেনা। অবশ্য ওই উন্নত বিশ্বেই খুবই সীমিত আকারে সর্বজনীন মৌলিক আয়ের মতো নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা হচ্ছে বেশ সাফল্যজনকভাবেই। তাছাড়া গত করোনা অতিমারির সময়েও যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো কয়েকটি দেশ যে সর্বজনীন আর্থিক সহায়তা দেবার ব্যবস্থা করেছিল, সেটির সাফল্য অভূতপূর্ব। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য চাকুরিজীবী ও স্ব-পেশা-নির্ভর নির্বিশেষে সবাইকে তার নিয়মিত আয়ের কাছাকাছি পরিমাণ আয় সরকারের তরফ থেকে দিয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ দেড় বছর সময় ধরে! এ ধরনের সর্বজনীন প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের এআই সৃষ্ট সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে আশা জাগায়।

কিন্তু এই অন্তর্বর্তীকালে নতুন কাজে যাওয়া, পুনঃপ্রশিক্ষণ নেয়া, আংশিক হলেও ভাতা-নির্ভর হওয়া, অন্যরা আগের চাকরিতে বহাল থাকা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটি নতুন সামাজিক পরিবেশের নির্বিঘ্ন ও মসৃণ যাত্রা যেন হয় সেজন্য একটি বড় সামাজিক আন্দোলন ও নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসার প্রয়োজন হবে। প্রায় সবরকম পেশা যেখানে এআই আক্রমণের সম্মুখীন, তখন বিশেষ করে পেশাজীবী, মেধাজীবী, শ্রমজীবী ইত্যাদি শ্রেণিবিভাজন ও শ্রেণিবৈষম্য দ্রুত কমিয়ে আনাই ওই সামাজিক আন্দোলনের লক্ষ্য হবে। সবরকম কাজের মর্যাদাকে এবার সত্যি সত্যি

প্রতিষ্ঠা করতে হবে; যদিও আমাদের সুবচনে এটি চিরকালই ছিল– বিশেষ করে শ্রমের মর্যাদার কথায়– কিন্তু আসল বাস্তবতা অত্যন্ত বৈষম্যপূর্ণ। মানুষের মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো যে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে কাজ, সহমর্মিতা দিয়ে মানুষের সেবার কাজ, এবং শারীরিক ও মানসিক সূক্ষ্ম দক্ষতার কাজের মধ্যেই টিকে থাকে, যে কারণে সে কাজগুলো এআই সহজে নিয়ে নিতে পারে না– এটি সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। আসলে হৃদয় দিয়ে করলে প্রত্যেকটি কাজই যে আনন্দের ও তৃপ্তির উৎস হতে পারে এটি পুনরাবিষ্কারের সময় এটি। এইভাবে নিজের যেকোনো কাজের থেকে সবাই তৃপ্তি খুঁজে নেবে। তাহলে এআই এসে যে অমানবিক কায়িক শ্রম, নিরানন্দ একঘেঁয়ে কাজ থেকে উদ্ধার করে বেশি অবকাশ, বেশি স্বাচ্ছন্দ্য উচ্চতর মানব-চর্চার বেশি সুযোগ, সাহিত্য-শিল্প ইত্যাদি উপভোগের বিস্তৃত পটভূমি সবার জন্য সৃষ্টি করছে তাকে সবাই স্বাগতম জানাতে পারবে।

নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত

নতুন বন্দোবস্ত কেন অপরিহার্য: এআইয়ের উন্নয়ন যেভাবে এগুচ্ছে তাতে বছর দশেকের মধ্যে দুনিয়ার অর্থনীতির চরিত্র একেবারে বদলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এর ভেতর এআই সাধারণ বুদ্ধি অর্জন নাও যদি করে, এমনকি সেদিকে অনেকখানি নাও যদি এগিয়ে যায়, ক্রমাগত উন্নত এলএলএম ও এআই এজেন্টের বর্তমান ধারাবাহিকতায় যে বড় বড় অগ্রগতি ঘটবে, তাতেই সবরকম উৎপাদন ব্যবস্থা দ্রুত এআইয়ের হাতে চলে যাবে, এবং উৎপাদন দক্ষতার অভাবনীয় উন্নতির ফলে সবরকম পণ্য খুবই সহজলভ্য হবে। এর মধ্যে মানুষের শ্রম দান বা বড় রকমের কোনো হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে না। পরবর্তী দশকে বা আরো পরে যখনই এ জি আই মোটামুটি অর্জিত হবে, তখন এআই-নির্ভর উৎপাদন সম্পূর্ণতা পাবে। তার ভিত্তিতে সার্বিক অর্থনীতিও তখন আগাগোড়া বদলে যাবে। অর্থনীতিতে মানুষের প্রয়োজনটি খুবই সীমিত হয়ে পড়বে, অধিকাংশ মানুষ আয়মূলক কর্মের বাইরে থাকবেন। এআইয়ের দ্বারা উৎপাদিত হবার কারণে পণ্যের মূল্যও একই সঙ্গে দ্রুত কমে গেলেও সাধারণ মানুষের আয় কমবে তার থেকেও বেশি দ্রুত বেগে।

অল্প কিছু মানুষের ক্ষেত্রে শুধু একথা প্রযোজ্য হবেনা– যেই এআই অর্থনীতির নিয়ামক হবে সেই এআই ও আনুসঙ্গিক সম্পদ যাদের মালিকানায় থাকবে তাদের আয় ও ধন বরং অত্যন্ত বেড়ে যাবে। এর ফলে সৃষ্টি হবে অভাবনীয় প্রকট মাত্রার একটি ধনবৈষম্য। ওই উচ্চ সম্পদশালীদের দলে থাকবেন এআইয়ের মালিকরা, এআই সম্পাদনের কম্পিউটেশন অবকাঠামোর অধিকারীগণ, বিদ্যুৎ সম্পদ ও জ্বালানি যাঁদের আওতায় থাকবে তাঁরা, এবং তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যভান্ডার যাঁদের নিয়ন্ত্রণে

থাকবে তাঁরা। এরকম একটি অবস্থায় মুষ্টিমেয় এই মানুষগুলোকে বাদ দিয়ে বাকি সব মানুষের আয় যদি তাদের কাজ থাকা- না থাকার ওপর নির্ভর করে তাহলে তাদের পক্ষে আয়ের অভাবে পণ্যের চাহিদা বজায় রাখা অসম্ভব হবে, এবং চাহিদা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে– ওই উৎপাদন আর বজায় রাখার কোনো অর্থ থাকবে না। এর দ্বারা যাঁরা ধনবান হবার প্রত্যাশী হবেন তাঁদের সে আশাও মিটবে না। অন্যদিকে নিজেদের জীবনমান ও অস্তিত্বের সংকটের সম্মখীন হয়ে অবর্ণনীয় অস্থিরতার মধ্যে সমাজ ডুবে যাবে। দেশে দেশে রাজনৈতিক কাঠামোগুলো ভেঙে পড়তে বাধ্য হবে। সময় থাকতে এর একমাত্র সমাধান হবে সবার জন্য বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে উৎপাদিত পণ্য ও সার্ভিসের একটি বলিষ্ঠ চাহিদা বজায় রাখা। একটি বৈপ্লবিক নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত ছাড়া সেটি সম্ভব হবে না। তার মূল নীতিটিই হতে হবে সাধারণ আয়ের সঙ্গে কাজের কোনো সম্পর্ক থাকবে না– মানুষ আয়ের জন্য কাজ করবে না। তারা শুধু নিজের আনন্দ ও সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবে। খাওয়া পরা ও একটি উন্নত জীবনযাপনের জন্য ওই কাজের প্রয়োজন হবে না।

এই বন্দোবস্তটি এমন হবে, যাতে কোনো রূপ বাছ্‌বিচার না করে সবার হাতে ওরকম জীবনযাপনের উপযুক্ত আয় যায়, অথবা বিকল্প হিসেবে আয় থাকলে যে পণ্য ও সেবাগুলো তারা কিনতো সেগুলো যেন বিনামূল্যে পায় এমন ব্যবস্থা হয়। অন্যদিকে যারা এআই ও তার আনুসঙ্গিক সম্পদগুলো মালিকানায় নিয়ে লাভবান হবার চেষ্টা করবে তাদেরকে ততটুকুই লাভবান হতে দেয়া হয়, যাতে মানুষকে ওই আয়ের জন্য উচ্চতর কর সরকারকে দেবার পর তাদের উন্নততর সম্পদ ও আয় সীমাবদ্ধভাবে বজায় থাকে। সেটি এত বেশি যেন না হয়, যাতে সর্বজনীন বলিষ্ঠ চাহিদা বজায় রাখতে বিঘ্ন ঘটে, আবার এত কমও যেন না হয় যাতে তাদের উদ্যোক্তা হবার প্রণোদনা একেবারে কমে যায়।

এরকম অবস্থা যে একদিন আসতে পারে এটি চিন্তাবিদদের কাছে অনেক আগেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। এআই যখন থেকে তার সক্ষমতাগুলো দেখাতে আরম্ভ করেছিল, তখনই অনেকে এর ভবিষ্যৎকে আঁচ করতে শুরু করেছিলেন; অর্থনৈতিক সংকটটির কথাও। তাকে মোকাবিলা করার জন্য নতুন অর্থনৈতিক মডেলটি কী হতে পারে সেই কথাগুলো তখনই ভাবনায় এসেছিল। পরে বিশেষ ভাবে এলএলএম দারুণ সব সাফল্যের পর এই ভাবনা জোরদার হয়েছে। শুরু থেকেই এর মধ্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে সর্বজনীন মৌলিক আয়ের ধারণাটি। ধারণাটি চারিদিকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে বিভিন্ন মতবাদের অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে। এখন সামনের ওই এআই-নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থাটি ও ব্যাপক কর্মচ্যুতির প্রশ্নটি উঠলেই উত্তর হিসেবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরা এবং সমাজ ও রাজনীতির গবেষকরা এই উপায়টির কথাই বলে থাকেন।

সর্বজনীন মৌলিক আয়: অর্থনীতির এই মডেলটিতে সবাইকে একেবারে নিশর্তভাবে, তার ব্যক্তিগত অবস্থান নির্বিশেষে, একটি সমান আয় নিয়মিত বিরতিতে দিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সে আয়ের কোনো পরিবর্তন আনতে হলে তাও সমানভাবেই সবার জন্য আনা হবে। কে কী কাজ করে, আদৌ কোনো কাজ করে কি না, কার কী সম্পদ আছে, আদৌ কোনো সম্পদ আছে কি না এ সব জানার কোনো প্রয়োজন তাতে হবে না। এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে এমনভাবে যাতে প্রত্যেক মানুষ অন্য কোনো আয় ছাড়াই একটি সুন্দর উন্নত জীবনযাপন করতে পারবেন। এর অতিরিক্ত কোনো আয় যদি তিনি করতে পারেন, এটি তাতে কোনো বাধা হবে না। শিশু-সন্তানরাও তাদের মতো করে আলাদা মানুষ হিসেবে গুরুত্ব পাবে বলে সন্তান পালন করতে গিয়েও কেউ কোনো অসুবিধায় পড়বেন না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবাই ব্যক্তিগতভাবে এর অধিকারী হবেন।

প্রশ্ন উঠবে এটি কে দেবে, কোথা থেকে দেবে, কীভাবে এটি প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছবে। দেশের সরকার এর দায়িত্ব নেবে এবং দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জন্য সমান এই পরিমাণটি নির্ণয় করবে। প্রতি দেশ যেন সেটি করতে পারে তার পেছনে একটি আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও সমর্থন থাকবে। মাসে মাসে এটি ডিজিটাল ব্যবস্থায় প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যাবে। শুরুতে ইতোমধ্যে যে সব ব্যক্তিগত ভর্তুকি বা সেবা বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে সেগুলোকে অক্ষুণ্ন রেখে সেভাবে এর পরিমাণ নির্ণয় করা যেতে পারে। হয়তো শুরুটি পরীক্ষামূলকভাবে হবে, যেরকম কিছু কিছু পরীক্ষা উন্নত দেশে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সফল ভাবেই হয়েছে। সবসময় একে মূল্যস্ফীতি, উৎপাদন পরিমাণ ইত্যাদির সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্কিত করা হবে, যেন উন্নত জীবনযাপনে কারো কোনো সমস্যা না হয়।

হয়তো এক এক দেশে কিছু কিছু পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এটি শুরু হবে। বড় বড় দেশগুলো যেখানে বহু রাজ্য আছে, বা অন্য দেশে যেখানে শক্তিশালী প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকার আছে, সেখানে হয়তো দেশের কোনো কোনো অংশে কিছুটা স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্তে এটি চালু হতে পারে– যাতে যথেষ্ট পরীক্ষিত না হয়ে পুরো দেশের বা আরো বড় আঞ্চলিক ক্ষেত্রে নীতি স্থির হয়ে যেতে না পারে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সর্বজনীন মৌলিক আয়টিকে সত্যিই সর্বজনীনই হতে হবে, পুরো দেশে এবং সব দেশে দেশে বৈশ্বিকভাবে।

এত বড় একটি বন্দোবস্তকে টেকসইভাবে দাঁড় করাতে হলে তার অর্থ জোগানের নির্ভরযোগ্য পথ থাকতে হবে। অর্থ জোগানের মূল উৎস হবে বিশেষ ধরনের কর ব্যবস্থা– যা হবে খুবই ব্যতিক্রমী। এ কর বসানো হবে এআই ব্যবহার করে এমন সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর; এআইয়ের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চল্‌ছে এমন সব

কারখানা এবং উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী কোম্পানির ওপর; যেসব কোম্পানি এআই এর সাহায্যে যোগাযোগ, যানবাহন, এবং অন্যান্য সেবা প্রদানের কাজ নিজের লাভের জন্য করবে তাদের ওপরও। এআইয়ের মালিকানার কারণে অত্যন্ত সুলভে উচ্চ উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে কাজ হওয়াতে, এবং ব্যবসার পরিধি বিশাল হওয়াতে জাতীয় আয়ই হোক বা জাতীয় সম্পদই হোক, তার একটি বড় অংশ তাদের ঘরে জমা হবে। এর ফলে সৃষ্ট বিশাল বৈষম্যকে এই উচ্চ-হার করের মাধ্যমে কমিয়ে আনা হবে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আয় না করতে পারায় সরকার যে বিশাল আয়কর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এই নতুন করসমূহ তারই বিকল্প হিসেবে কাজ করবে; এবং সেটিই সব মানুষের সর্বজনীন মৌলিক আয়ের অর্থও জোগাতে পারবে।

অর্থ জোগানের আর একটি উৎস হবে এআইয়ের মাধ্যমে উৎপাদনকারীরা যে বিপুল সরকারি বিদ্যুৎ শক্তি খরচ করবে, তার জন্য উচ্চ মূল্য গ্রহণ করে। আগেকার অর্থনীতিতে তেলের যে ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তি সেই অপরিহার্য জায়গা দখল করবে– তাই সরকার জনগণের পক্ষ থেকে এই শক্তির জন্য উচ্চ মূল্য চাইতেই পারে। অন্যথায় কোম্পানিগুলো যদি নিজেরা শক্তি উৎপাদন করতে চায় বা নিজের কম্পিউটেশন অবকাঠামো ব্যবহার করতে চায়, তাহলে তার জন্য উচ্চ কর ধার্য করবে সরকার।

আরো একভাবে সরকার সর্বজনীন আয়ের অর্থায়ন করতে পারবে, তা হলো সরকার নিজেই এআই কোম্পানিগুলো এবং উৎপাদন ও অন্যান্য অবকাঠামোর মালিকানায় অংশগ্রহণ করতে পারে– এর বিপুল শেয়ার নিজের কাছে রাখার মাধ্যমে। তাহলে এর যে লাভজনকতা তার একটি বড় অংশ সরকারের ঘরেই জমবে এবং সেই লাভ সরকার সর্বজনীন আয়ের কাজে ব্যবসার করতে পারবে।

স্বাভাবিকভাবেই এআই মালিকদের সবাই সর্বজনীন মৌলিক আয়ের থেকে অনেক অনেক বেশি আয় তখনো করবেন– তাঁরা অত্যন্ত ধনী হবেন। তবে সাধারণ মানুষদের অনেকেও কমবেশি উপরি-আয় করতে পারবেন– ওই সর্বজনীন আয়ের অতিরিক্ত। তাঁদের মধ্যে থাকবেন ব্যবসায়িক উদ্যোক্তারা, এআইয়ের সঙ্গে কাজে অপরিহার্য এআই বিশেষজ্ঞরা, সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে উপার্জনকারীরা, নিজস্ব সেবাদানের মাধ্যমে ব্যক্তি থেকে ও সমাজ থেকে পারিশ্রমিক পাবেন যাঁরা, যেকোনো উৎপাদনশীল কোম্পানির শেয়ারধারীরা, এবং এরকম অন্যান্য অনেকে। কিন্তু শুধু একটি বিনীত অথচ উন্নত জীবনযাপনের জন্য এমন বাড়তি আয় আবশ্যকীয় হবে না।

এআইয়ের কারণে সৃষ্ট বৈষম্যের প্রতিকারে অন্যান্য বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় সর্বজনীন মৌলিক আয়ের কিছু আকর্ষণ রয়েছে। এটি সর্বজনীন ও সবার

জন্য সমান বলে একেবারে সহজ সরল– কোনো হিসাবনিকাশের মারপ্যাঁচের মধ্যে ঢোকার প্রয়োজন হবে না। যেহেতু সবাই পাচ্ছে, সবাই নিচ্ছে এবং সমানভাবে নিচ্ছে এর মধ্যে কোনো গ্লানি নেই– এটি একটি সর্বজনীন অধিকার হিসেবে সম্মানজনক বলেই বিবেচিত হবে। কেউ কারো বোঝা হচ্ছে না, রাষ্ট্রেরও নয়। নিজের কেনাকাটার চাহিদা মেটাবার মতো অর্থ মানুষ মাত্রেরই থাকছে বলে পুরো উৎপাদন ব্যবস্থার একটি স্থায়ী শক্তিশালী চাহিদা-ভিত্তি থাকবে।

তবে সঠিকভাবে পরিকল্পিত না হলে এটি একটি ব্যয়বহুল প্রকল্প হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। স্বয়ংক্রিয় সরবরাহ ব্যবস্থাকে একেবারে নিশ্ছিদ্র না করতে পারলে স্থানীয়ভাবে অর্থ সরবরাহের তুলনায় পণ্যের স্বল্পতার কারণে মূল্যস্ফীতি দেখা দেবার ঝুঁকি এতে রয়েছে। মালিক বিনিয়োগকারীরা এত উচ্চ হারে কর দিতে অনীহা প্রকাশ করে এক রকম রাজনৈতিক বাধার সৃষ্টি করতে পারে– যেহেতু ধনী ও শক্তিশালী হবার কারণে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা যথেষ্ট হতে পারে। তাছাড়া সর্বজনীন মৌলিক আয়ই নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলার একমাত্র কৌশল নয়, অন্য কৌশলও রয়েছে তার মধ্যে প্রধান একটি হলো ঋণাত্মক আয়কর।

ঋণাত্মক আয়কর: আজকাল অধিকাংশ দেশে যেরকম ন্যায্য আয়কর হার প্রচলিত আছে, তারই একটি বড় সংশোধিত রূপ হবে এই ঋণাত্মক আয়কর। প্রচলিত ব্যবস্থায় যার আয় যতবেশি, তাকে ততবেশি হারে আয়কর দিতে হয়। নিম্ন আয়ের মানুষের আয়কর হার কমতে কমতে একটি পর্যায়ে আয়কর হার শূন্যতে নেমে আসে– অর্থাৎ তাঁদেরকে কোনো আয়কর দিতে হয় না। কিন্তু এই নতুন বৈপ্লবিক আয়কর নিয়মে কমাটি সেখানে থামবেনা। ওই নিম্নতম আয়েরও কম আয় যাঁদের তাঁদের কর হবে একেবারে উল্টো, অর্থাৎ সরকার তাঁদেরকে টাকা দেবে যাতে নিজের স্বল্প আয় আর সরকারের অনুদান মিলে তাঁদের আয় ন্যূনতম বা মৌলিক প্রয়োজনীয় আয়ের সমান হয়। এটিই ঋণাত্মক আয়কর– প্রচলিত ক্রম বর্ধমান আয়কর ব্যবস্থার সঙ্গে এই নতুন ব্যবস্থার এটিই মূল পার্থক্য। যাঁরা কোনো আয় করেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে পুরোটাই হবে সরকারের দেয়া আয়।

এই ঋণাত্মক আয়ের মাধ্যমে সব মানুষের প্রয়োজনীয় মৌলিক আয় নিশ্চিত করার কৌশলের মধ্যে কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এতে সর্বজনীন আয় প্রত্যেকের কাছে পাঠাবার জন্য কোনো অভিনব ব্যবস্থা বা পৃথক সংস্থার প্রয়োজন হবে না– পুরো ব্যবস্থাপনাটি সাধারণ যে আয়কর বিভাগ রয়েছে তারই নিয়মিত কাজের অঙ্গীভূত করা সম্ভব। আয়কর যেভাবে বছরে কয়েকটি কিস্তিতে আদায় করা হবে, ঋণাত্মক আয়কর হিসেবে সরকারি অনুদান উল্টো বরং সেই নাগরিককে কিস্তিতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। আয়কর নির্ণয়ের জন্য যেরকম তাঁর আয় ও সম্পদের ঘোষণা

বছর বছর দেয়া হয়, এখানেও তা দিতে হবে এখানেও তার ভিত্তিতে ধনাত্মক আয়কর এবং ঋণাত্মক আয়কর হিসাব করে সেভাবে কাজ করা হবে।

এইক্ষেত্রেও এআই মডেলের মালিক, এআই পরিচালিত ব্যবসা, এবং অন্য অতিধনীদের ওপর খুব উচ্চ আয়কর ও সম্পদ-ট্যাক্স ধার্য করা হবে; এবং শক্তি, কম্পিউটেশন ইত্যাদির রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর খুব উচ্চ যে মূল্য বা ভাড়া তাদের থেকে নেয়া হবে; সেগুলো দিয়েই ঋণাত্মক আয়কর দেবার অর্থায়ন করা হবে। কাজেই অর্থায়নের উৎসের দিক থেকে এটি সর্বজনীন মৌলিক আয়ের উৎস থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

ভবিষ্যতের নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে এই দুটি কৌশলের একটি বা উভয়টি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সর্বজনীন মৌলিক আয় এবং ঋণাত্মক আয়করকে পাশাপাশি রেখে তাদের তুলনামূলক ভালো-মন্দ দিকগুলো দেখা যেতে পারে। প্রথমটির সব থেকে বড় সুবিধা হলো এটি সর্বজনীন এবং সবার জন্য সমান। কাজেই চোখ বন্ধ করে ঢালাওভাবে সবাইকে এটি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করলেই হয়, কার কী আছে না আছে দেখার কোনো প্রয়োজন হয় না। এই সুবিধাটি ঋণাত্মক আয়করে নেই। এ কারণেই মৌলিক আয়ের ব্যবস্থাপনাটি সহজ, অন্য দিকে ঋণাত্মক আয়ের ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক নাগরিকের আয়-সম্পদের হিসাব নিয়ে তা নিশ্চিত করতে হয় বলে তা অপেক্ষাকৃত জটিল। তবে ঋণাত্মক আয়করটি শুধু যাদের প্রয়োজন তাদেরকেই দিতে হবে– অর্থাৎ যাদের আয় কম ও যাদের আয় নেই শুধু তাদেরকে। কাজেই এতে সরকারের মোট ব্যয় কম হবে– অন্য দিকে মৌলিক আয় সর্বজনীন হওয়াতে তাতে ব্যয় বেশি। প্রচলিত আয়কর ব্যবস্থার সঙ্গে বেশ কিছু মিল থাকার কারণে এবং ইতোমধ্যে ধনীদের থেকে বড় আয়কর নিয়ে অন্যদের জন্য তা ব্যয় করার রীতির সঙ্গে তারা যেহেতু অভ্যস্ত– এ কারণে ধনীরা হয়তো তাতে কম অসন্তুষ্ট হবে। এ জন্য তাদের দিক থেকে রাজনৈতিক বাধাটি এতে অপেক্ষাকৃত কম আসতে পারে। বর্তমানে বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে সব মহলে এই দুই ব্যবস্থা নিয়ে যে আলোচনা-সমালোচনা চল্ছে, তাতে রাজনৈতিক ভাবে সর্বজনীন মৌলিক আয়টি বেশি সমালোচিত হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে এটিই বেশি জনপ্রিয়।

কার্যত যা হতে পারে: কার্যত একটি মিশ্র অর্থনৈতিক অবস্থা দাঁড়াতে পারে সর্বজনীন আয়ের ব্যবস্থা ও ঋণাত্মক আয়কর ব্যবস্থা উভয়ের সুবিধাগুলোকে সর্বোত্তম অবস্থায় এনে। তার সঙ্গে পাশাপাশি সকল নাগরিককে দেবার জন্য আরো একটি ব্যবস্থা থাকতে পারে যাকে বলা যায় সর্বজনীন মৌলিক সেবা দান। এই প্রয়োজনীয় সেবাগুলো মূল্যের বিনিময়ে না দিয়ে সব নাগরিকের কাছে সরাসরি বিনা মূল্যে দিয়ে দেয়ার পক্ষে বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে। এরকম অধিকাংশ সেবাকে এখন

মানুষের মৌলিক অধিকার বলে বিবেচনা করা হয়– কোনো আর্থিক বৈষম্যকে হিসাবের মধ্যে না নিয়ে। এর মধ্যে আছে বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, যানবাহন, ইন্টারনেট, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ চাহিদা। ভবিষ্যতেও মোটামুটি এগুলোই সর্বজনীন মৌলিক সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে বলে ধারণা করা যায়।

সেবাগুলো যথাযথ পরিমাণে সরাসরি বিনামূল্যে দিলে মূল্য পরিশোধের জটিলতা এড়ানো যাবে এবং অনেকটা দক্ষভাবে দেয়া যাবে। এই সেবা বিনামূল্যে দিয়ে সর্বজনীন মৌলিক আয়টিকে যদি সেই পরিমাণে কমিয়ে আনা হয়, তাহলে বাজারে অর্থের আধিক্যে যে মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে, সেটি কমে যাবে। আর একটি বড় কথা হলো মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে এগুলো সরাসরি পাওয়াটি ভোক্তাদের জন্য অধিকতর সম্মানজনক হবে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-ইন্টারনেট সংযোগ সেই অধিকারগুলো এখন সবাইকে যথাযথভাবে না দিতে পারার গ্লানি আমরা ভোগ করছি, এআইয়ের কল্যাণে সেই গ্লানি থেকে মুক্তি পাবো। আগামী দশকগুলোতে গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে তার শুরু কিন্তু শিগ্‌গির কোনো না কোনো পর্যায়ে হতে হবে। এর প্রয়োজনীয়তার নানা আলামত ইতোমধ্যে দেখা যাচ্ছে– আগামী বছরগুলোতে আরো স্পষ্ট হবে। কাজেই এআইয়ের সাধারণ বুদ্ধি, মানুষের মতো চিন্তা এসব লক্ষ্য অর্জিত হবার বেশ আগেই হয়তো এই নতুন ব্যবস্থায় চলে আসতে হবে দুনিয়ার মানুষকে– যদিও শুরুতে এক এক অঞ্চলে কিছুটা ভিন্নভাবে তা হতে পারে। ধনী দেশে যেহেতু সম্পদের তুলনায় মানুষ কম, সেখানে এটি দ্রুততরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশে জনসংখ্যার কারণে হয়তো কিছুটা পর্যায়ক্রমে এটি আসবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েক দশকের মধ্যে পুরোপুরি এই ব্যবস্থায় সবাইকে আসতেই হবে। এর আলামতগুলো এখনই সে সংকেত আমাদেরকে দিচ্ছে– সব কাজে স্বয়ংক্রিয়তা বাড়ছে, সেখানে মানুষের প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে; অর্থনৈতিক বৈষম্য হু হু করে বাড়ছে; এসব কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই নতুন বন্দোবস্ত যে দূর ভবিষ্যতে একদিন দেখবো তা নয়, এর প্রয়োজনীয়তা শিগ্‌গিরই আসতে পারে।

এর মধ্যে হয়তো অংশত হলেও সর্বজনীন মৌলিক আয় চালু হবে, সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশকে লক্ষ্য করে ঋণাত্মক আয়কর ব্যবস্থাও হয়তো অংশত চালু হবে, আবশ্যকীয় সেবাগুলো বিনামূল্যে বা খুব কম মূল্যে সবাইকে দেবার প্রচেষ্টাটিও নানা দেশে সম্ভাব্য নানাভাবে শুরু হয়ে যাবে। কোথাও কোথাও কিছু কিছু সেবা ইতোমধ্যেই বিনামূল্যে সর্বজনীন– যেমন ইউরোপে কোনো কোনো দেশে পাবলিক যানবাহন ইতোমধ্যে সবার জন্য বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। অনেক দেশে বহুদিন ধরে

স্বাস্থ্যসেবা ও স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা একেবারেই বিনামূল্যে দেয়া হয় এবং এইসব সবার জন্যই বেশ মানসম্মতভাবেই। শেষপর্যন্ত অবশ্য বিশ্ববাসীর জন্য পূর্ণভাবে সর্বজনীন মৌলিক আয়, ঋণাত্মক আয়কর, সর্বজনীন মৌলিক সেবাসমূহের একটি সর্বোত্তম মিশ্রণে মানুষকে জীবিকার সব সংগ্রাম থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব হবে। আর সেটি হবে এআইয়ের কল্যাণেই।

আগামী সমাজ বিপ্লব: নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের একটি ফলশ্রুতি হবে একটি পরিপূর্ণ সমাজ বিপ্লব– যাতে এমন কিছু আশা করা যায়, যা মানুষ তার বিবর্তনের কোনো পর্যায়েই আজ অবধি সত্যিকার অর্থে সম্ভব করতে পারেনি। অর্থনৈতিক বন্দোবস্তটি চিরকালীন পুরাতন প্রশ্নটিকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে– সেটি হলো 'জীবিকার জন্য আপনি কী করেন?' সেখানে নতুন প্রশ্নটি হবে 'নিজের সন্তুষ্টি ও আনন্দের জন্য আপনি কী করেন?' রাষ্ট্রের এবং আঞ্চলিক ও বিশ্ব কর্তৃপক্ষের কাজটি হবে এআই যে অফুরন্ত সম্পদ ও সমৃদ্ধি সৃষ্টি করছে কী ভাবে তা ন্যায্যভাবে ও নিরাপদভাবে সব মানুষের মধ্যে বণ্টন করা যাবে, তা নির্ণয় করা ও সেভাবে বাস্তবায়িত করা।

এই যে প্রশ্নটি বদলে যাবে এটি সামান্য ব্যাপার নয়। এটি মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একটি মোড় হতে পারে– বলতে গেলে তার লক্ষ বছরের ইতিহাসে। এটি মানুষকে অবশেষে দুঃসহ কায়িক শ্রম থেকে মুক্তি দেবে। মানুষ আবির্ভাবের পর থেকে, বিশেষ করে কৃষি-নির্ভর হয়ে নগর ও শিল্প সভ্যতা গড়ে ওঠার পর থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্যই হয়েছে সারাটা জীবন অমানুষিক কায়িক শ্রমের মধ্যে কাটানো। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্যই তাদেরকে এটি করতে হয়েছে। কিন্তু আরো অনেককে করতে হয়েছে কখনো সুবিধাভোগীদের দাস হিসেবে, কখনো ভূমিদাস হিসেবে, কখনো কল-কারখানায় প্রায় দাস-শ্রমের মতো দীর্ঘ সময় শ্রম দিয়ে, একেবারে জবরদস্তি। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের যেন জন্মই হয়েছিল সারা জীবন এই শ্রম দিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রাচীন কাল, মধ্যযুগ, এবং আধুনিক কালে এসেও কিন্তু এই অবস্থার যে খুব বেশি উন্নতি হয়েছে, তা বলা যাবে না। হয়তো উন্নত দেশগুলোতে অনেক মানুষ এর থেকে উত্তরণ লাভ করেছে, কিন্তু তারা এর বেশ কিছুটা চালান করে দিয়েছে সুবিধাবঞ্চিত দেশগুলোর শ্রমজীবী মানুষদের কাছে।

ওই দরিদ্র বিশ্বের মানুষ কখনো উপনিবেশবাদের মাধ্যমে, পরে নব্য উপনিবেশবাদের মাধ্যমে সেই কায়িক শ্রম দিয়ে ধনী দেশগুলোর উন্নয়নে অবদান রাখতে বাধ্য হয়েছে। নিজ দেশে থেকে, বা অভিবাসী হিসেবে বা অস্থায়ীভাবে শ্রম দিতে গিয়েও তারা একইভাবে তাদের জন্যই খাটনির অবদান রাখতে বাধ্য হচ্ছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী দেশে অভিবাসী শ্রমিকরা কী অমানুষিক পরিবেশে

কসাইখানার মতো মীট্ প্যাকিং ফ্যাক্টরীগুলোতে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে করোনাকালেও ঝুঁকি নিয়ে, তা দেখলে মনে হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেলেও ওরকম অগ্রহণযোগ্য কায়িক শ্রম থেকে মানুষ কোথাও মুক্তি পায়নি। এসবতো জনসমক্ষে ঘটছে; কিন্তু তার বাইরে এখনো রয়েছে অদৃশ্য আন্তর্জাতিক মানব পাচার ও আধুনিক দাসব্যবসা চক্র। তার একটি অংশ সরাসরি দাসসুলভ অমানবিক কায়িক শ্রম দানের সঙ্গে জড়িত। অদ্ভুত ব্যাপার হলো বেশ স্বীকৃত নাম করা অনেক কোম্পানি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরোক্ষভাবে এই আধুনিক দাসব্যবসার সুবিধাভোগী। সবকিছুর মূলে রয়েছে মানুষের এবং মনুষ্যত্বের অপলাপ করে দুর্বলের কায়িক শ্রম থেকে সুবিধা নেয়া– সে মানুষগুলোর সারা জীবন ওতে কেটে গেলেও।

এআইয়ের সাফল্য এবং নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের হাতছানি অবশেষে এর অবসানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এবার মানুষ তাই করতে পারবে যার জন্য তার সভ্যতার জন্ম হয়েছে– মানব-সুলভ উচ্চতর কাজগুলোর চর্চা। তারা জীবনভর শিক্ষার মধ্যে মানবিক গুণগুলো বিকশিত করবে এবং সেগুলো উপভোগ করবে। সেটি একদিকে যেমন সহমর্মিতার সঙ্গে মানুষকে সেবা দিয়ে ও মানুষের জন্য সৃষ্টিশীল হয়ে তেমনি মানুষের সৃষ্ট সায়েন্স আর্টে গড়া উচ্চ সৌন্দর্যটিকে নিয়েও। কবিতায়, সাহিত্যে, শৈল্পিক সৃষ্টিতে, সঙ্গীতে, প্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদনে, গণিতে-দর্শনে, বিজ্ঞানের রহস্য উদ্ঘাটনে একটি সমৃদ্ধ জীবন পেতে পারেন সবাই। এসবের দিকে তাদেরকে প্রণোদনা দিতে থাকবে শিক্ষা এবং নানা সুযোগ। মন যেদিকে যেতে চায় সেদিকে যেতে পারার মত এমন শিক্ষা ও এমন সুযোগ। সেবা হবে তারই অংশ– মানুষের সেবা, তার কষ্ট-ব্যথা-অসুবিধা বুঝে সেভাবে সেবা। যেমন একজন শিশুর যে মনোজগত সেটিকেও বুঝে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া এমনি সেবা।

মানুষের মনে দুঃখ, মানুষের মানুষে সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন, মানসিক নানা চাপ ইত্যাদি কিন্তু তখনো থাকবে। সেখানে এআই হয়তো খুব বেশি কিছু করতে পারবে না– মানুষের নিজের সেবার ছোঁয়াটি সেখানে হবে অমূল্য। এরই একটি বিস্তৃতি ঘটবে প্রকৃতির সেবা, প্রকৃতিতে সকল জীবের সেবা। নিজের দেশে এবং অন্যত্র পর্যটনের সুযোগ, নানা জায়গায় গিয়ে সেখানকার প্রাকৃতিক ও মানবিক বৈচিত্রগুলোর অনুসন্ধান ও আস্বাদনের সুযোগটিও দারুণ হবে। এইসবেরই পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে এআই পরিচালিত সুলভে পাওয়া যাবতীয় কর্মযজ্ঞ। সব মানুষের জন্য এগুলো সহজলভ্য হবে। এআই সবকিছু করবে, কিন্তু মানুষের জন্যই করবে। মানুষকে কায়িক শ্রম ও নিরানন্দ কাজ থেকে মুক্তি দেয়াটির মাধ্যমে এআইয়ের কাজ শুরু হবে বটে, কিন্তু শেষ হবেনা।

সাধারণ বুদ্ধির পর কি সুপার-ইন্টেলিজেন্স আসবে?

ধরে নিলাম আগামী দশ বছরে হোক্ কি বিশ বা ত্রিশ বছরে হোক এআই সাধারণ বুদ্ধি পেয়ে এ জি আই হলো। সেই পর্যন্ত যেতে যেতে, বা যাওয়া সম্পূর্ণ হলে, এআই নিয়ে আমাদের জীবনটি কীরকম হতে পারে? অনেকের ধারণা ওরকম মানব-সদৃশ বুদ্ধির এ্যা জি আই ওখানে থেমে থাকবেনা, খুব দ্রুত মানুষকে ছাড়ানো মহাবুদ্ধি সুপার-ইন্টেলিজেন্সের দিকে এগিয়ে যাবে। তখন আমাদের কী হবে? সেটি অবশ্য আরো বহু দশক, এমনকি এ শতাব্দী পেরিয়ে।

পরের ধাপের কথা ভাবার আগে মনে রাখা দরকার প্রথমে শুধু সাধারণ বুদ্ধিতে গেলেই এআই কীরকম হবে। ওই পর্যায়ে গিয়ে ওটি মানুষের মতো বুদ্ধির সব কাজ করতে পারবে, কারণ তার যুক্তিবিচার মানুষের সমকক্ষ হবে। ফলে বাইরের দুনিয়ার যেকোনো ক্ষেত্রের চিন্তায় সে বিচরণ করতে পারবে একদিকের চিন্তা অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে, যেভাবে মানুষ করে। মানুষের মতোই তার কাণ্ডজ্ঞান থাকবে, ক্রমাগত শিখবে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে, নিজকে শুদ্ধ করবে, বদলাবে। বোঝাই যাচ্ছে এমন এ জি আই অনায়াসে আমাদের পুরো পরিকল্পনা, উৎপাদন, সরবরাহ ও বিভিন্ন সার্ভিস ও প্রয়োজনীয় সেবা দিতে সক্ষম হবে।

তারপরও আমরা এখনো ঠিক বলতে পারবোনা এ জি আই পুরোপুরি হবার পর আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কীরকম হবে। কারণ তখন এটি এতটাই আমাদের মতো হবে যে, নিজে নিজেই তার বহুদিকে দ্রুত অগ্রগতির সুযোগ থাকবে, এমন সুযোগ যে তার বুদ্ধি পাগলা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে মানুষকে বুদ্ধিতে, ক্ষমতায় ছাড়িয়ে সুপার-ইন্টেলিজেন্স হয়তো হবে। তখন মানুষকে বহুদূর ছাড়িয়ে যাওয়া ওই বুদ্ধি হয় মানুষের সঙ্গে সুসমঞ্জস থাকতে পারে, অথবা তা না থেকে বৈরীও হয়ে যেতে পারে। অথবা এমনো হতে পারে যে, তাকে বরং আমরা ওই এ জি আই বা কাছাকাছি পর্যায়েই অনির্দিষ্টকাল রেখে দিয়ে আরো কতভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে কাজ করবো। এরকম কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যকল্প কল্পনা করা যায়। বাস্তব পরিস্থিতি ও মানুষের তখনকার সিদ্ধান্ত ঠিক করবে কোন্ দৃশ্যকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

দৃশ্যকল্প ১– এ জি আই হবে নিয়ন্ত্রিত হাতিয়ার: এ জি আই যখন মানুষের বুদ্ধিকে ছুঁয়ে ফেলেছে, তখন হয়তো তাকে খুব ধীরে নজরদারির মধ্যে মানুষের সহকারী হিসেবে উন্নত করাটাই হবে সবচেয়ে সতর্ক পদক্ষেপ। সতর্কতা এজন্য দরকার যেন এটি নিজে চেতনা লাভ করে নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের দিকে না এগুতে পারে। তার এরকম লক্ষ্য সব সময় মানুষের কল্যাণের সঙ্গে সুসমঞ্জস হবে সেই নিশ্চয়তা না পেলে তা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। কাজেই সাবধানে ধাপে ধাপে এগুনো হবে এই দৃশ্যকল্পের বৈশিষ্ট্য। প্রথম ধাপে সেটি নেহাতই আমাদের

সহকারী হবে। হয়তো আমরা সব কাজই তার হাতে ছেড়ে দেবো, কিন্তু পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকবে আমাদের হাতে। সম্পূর্ণ তার স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন কাজ নয়, বরং প্রত্যেকটি নির্দেশনা মানুষের থেকে আসবে। এ জি আইয়ের মধ্যে চেতনা দেখা দিক, কোনরকম নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উন্মেষমাত্র দেখা দিক তা আমরা চাইবো না। তবে আমাদের উৎপাদন, সেবা ও জীবনযাত্রাকে মসৃণ করার জন্য যথাসম্ভব বুদ্ধি প্রয়োগের সব কাজ তাকে দিয়ে করাবো। এই দৃশ্যকল্পের পরের ধাপগুলোতে নিরাপদ মনে করলে ক্রমে এ জি আইয়ের চিন্তার বিকাশ ঘট্‌তে দেবো, যাতে কিছুটা স্বায়ত্তশাসিতভাবে তা কোম্পানি, কারখানা ইত্যাদি চালাতে পারে। কিন্তু তখনো নজরদারি ঢিলে করা চলবে না।

এ অবস্থাতেই যেন উৎপাদনশীলতাকে অনেক উচ্চে গিয়ে গিয়ে এটি আমাদের নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তকে পূর্ণতায় নিয়ে যেতে পারে সে চেষ্টা থাকবে, কিন্তু তার চেতনা ও ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকার ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়া হবে না। সুপার-ইন্টেলিজেন্স হতে দেবার কোনো প্রশ্নই উঠবে না।

দৃশ্যকল্প ২– এ জি আই আর মানুষে মিলে শক্তিশালী জোড়: এই দৃশ্যকল্পে আমরা অনেক বেশি সাহসী হবো– এ জি আইকে আমাদের পার্টনার করে নেবো। এ জি আইয়ের অনেক চিন্তায় আমরা শরিক হবো, আমাদের চিন্তায় এ জি আই শরিক হবে। বেশিরভাগ কাজ এ জি আইয়ের হাতেই ছেড়ে দেবো, পুরো অর্থনীতি চালানো সহ; কিন্তু পরিকল্পনার ও নীতিনির্ধারণের অনেক কিছু আমরা একযোগে করবো। একা মানুষ করার থেকে, বা একা এ জি আই করার থেকে, এই যৌথ চিন্তা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে।

এক পর্যায়ে মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ভালো প্রযুক্তি উদ্ভব হবে, বাইরে থেকে নিরাপদ সিগন্যালে কম্পিউটার আর মস্তিষ্ককে যোগ করে। এর ফলে মানুষের চিন্তা সক্ষমতায়ও উন্নতি ঘটানো যাবে, তার মধ্যে এ জি আইয়ের যুক্তিবিচারও মস্তিষ্কের কাজে অন্তর্ভুক্ত করে ওই সংযোগের মাধ্যমে । একই সঙ্গে মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযোগে থেকে কাজ করতে করতে এ জি আইয়ের সক্ষমতাও বাড়তে থাকবে। এভাবে এ জি আইয়ের বুদ্ধি ও মানুষের বুদ্ধি উভয়ের ক্ষেত্রে একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

বর্তমানেও মানুষ নানা প্রয়োগে এআইয়ের ব্যবহার করে নিজকে বিস্তৃত করে। কিন্তু সেটি বাইরের দিক থেকে এআই প্রয়োগ করে কাজকর্মকে বিস্তৃত করা, যে মুহূর্তে এ জি আই ব্যবহার বন্ধ করি আমরা আমাদের পূর্ব ক্ষমতায় ফিরে যাই। আর মানুষের ভালো প্রম্প্‌ট থেকে যখন এআই বাড়তি ভালো কাজ করে, সেটিও স্থায়ীভাবে এআইকে উন্নত করে না। কিন্তু মস্তিষ্ক- এ জি আই সংযোগ স্থাপন করে

যা হবে, সেটি ভিন্ন ব্যাপার– উভয়েই স্থায়ীভাবে উন্নত হতে থাকবে, এ জি আই তো বটেই। এমন অবস্থায় মানুষ ও এ জি আইয়ের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য প্রায় লোপ পাবে। হয়তো বিষয়টিকে মানব সমাজ ধীরে ধীরে মেনে নিয়ে স্বাভাবিক করে ফেল্‌বে। উভয়ে সমানে সমানে থাকবে বলে, এবং সত্যিকার জৈব চেতনায় ও সচেতনভাবে লক্ষ্যও উদ্দেশ্য ঠিক করার ক্ষমতায় মানুষ এগিয়ে থাকবে বলে, চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতেই থাকবে।

ইতোমধ্যে এ জি আইয়ের বুদ্ধি ক্রমেই বাড়বে, যাকে আমরা সুপার-ইন্টেলিজেন্স বলি সেটি তার মধ্যে দেখাও দিতে পারে। কিন্তু হাউইবাজির মতো ঊর্ধ্বমুখী সেই বুদ্ধি এ জি আই পাবে শুধু এখানে ওখানে ক্ষণে ক্ষণে, বিশেষ বিশেষ কাজে। তা পার্টনার হিসেবে এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে মানুষে-এ জি আইয়ে কোনো ছেদ বা বৈপরীত্ব আনতে পারবেনা, চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ তখনো মানুষের হাতেই থাকবে। মানুষকে আপন ছাড়া বিজাতীয় ভাবার কোনো অবকাশ এ জি আইয়ের থাকবে না।

দৃশ্যকল্প ৩– সুপার-ইন্টেলিজেন্সের ডানা মেলাঃ মানুষ যতদিন এআইয়ের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি দেবার চেষ্টা করবে, অথবা এমন সাধারণ বুদ্ধি অর্জিত হবার পর যতদিন তাকে নিজের বুদ্ধির পর্যায়েই রেখে দেবে, অথবা উভয়ে একই সঙ্গে আরো বুদ্ধিমান হবার চেষ্টা করবে যৌথ উদ্যোগে, ততদিন মানুষ যা চায়, তাই হবে। চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতেই থাকবে। কিন্তু যেইরকম ধারাবাহিকতায় আজকের এআই সাধারণ বুদ্ধি অর্জন করে এ জি আই হবে, সেই একই ধারাবাহিক উন্নয়নের সুযোগ এআইয়ের ঊর্ধ্ব গতিকে ওখানেই থেমে যেতে দেবে না। যদি না মানুষ ইচ্ছে করে বিশেষ ব্যবস্থায় ওপরে দেয়া একটি দৃশ্যকল্প বেছে নিয়ে তাকে তার বেশি এগুতে বাধা দেয়– তা হলে সেটি নিজেই নিজের উন্নতি ঘটিয়ে অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এর অর্থ এ জি আই বুদ্ধিতে মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে থাকবে। সেই প্রক্রিয়ায় এটি এমন এক অবস্থায় পৌঁছতে পারে যে, এটি মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, হয়তো মানুষকে অগ্রাহ্য করতে পারবে। এরকম পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুন আর একটি পরিস্থিতি– মানববুদ্ধি ছাড়িয়ে যাওয়া। এটি হবে সেই সত্যিকারের মহাবুদ্ধি বা সুপার-ইন্টেলিজেন্স। এ জি আই ছাড়িয়ে কল্পিত এই ঊর্ধ্বমুখী বুদ্ধিকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল সুপার-ইন্টেলিজেন্স বা এ এস্‌ আই। চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ তখন আর মানুষের কাছে নাও থাকতে পারে, কাজেই সেটি হতে পারে দারুণ বিপজ্জনক
।

এই তৃতীয় দৃশ্যকল্পটিতে আমরা ধরে নেবো এমনই একটি সুপার-ইন্টেলিজেন্স পাওয়া এআই যা সবে উড্ডয়ন করেছে। এমনটি যদি ঘটে তাহলে এরপর যেকোনো কিছু হতে পারে– পরস্পরবিরোধী নানা দৃশ্যকল্প সৃষ্টি হতে পারে। তবে এই বিশেষ

দৃশ্যকল্পে আমরা দেখি শুধু সেই প্রাথমিক উড্ডয়নের ব্যাপারটি। মানুষকে যখন বুদ্ধিতে এ জি আই ছাড়িয়ে যাবে, তখন সবার আগে যা হবে তা হলো এ জি আই নিজেই নিজেকে অত্যন্ত দ্রুত উন্নত করতে থাকবে। আমরা আগে দেখেছি আজকের উন্নত এলএলএমের কোনো কোনোটি এলএলএমের জন্য অ্যালগরিদম লিখতে পারে– যা মূলত ছিল শুধু মানুষ-প্রোগ্রামারের কাজ। কিন্তু তখন এও দেখেছি এভাবে এআইয়ের নিজের লেখা অ্যালগরিদমে গড়া নতুন এআইতে কিছু মৌলিক সমস্যা থাকে যে কারণে ওটি চুপসে যায়, বাস্তবায়িত করা যায় না। কিন্তু এই সম্পূর্ণ নতুন বুদ্ধি সুপার-ইন্টেলিজেন্স যখন উড্ডয়নের পর্যায়ে পৌঁছবে তার এই অসুবিধা আর থাকবে না– এ জি আই নিজেই অ্যালগরিদম লিখে নিজের উন্নত রূপ তৈরি করে নিজেই দ্রুত আরো বুদ্ধিমান হবে। আরো বড় কথা হলো এর মধ্যে উন্নয়নের একটি ফীডব্যাক লুপ সৃষ্টি হতে পারবে। তার মানে প্রথম উন্নয়ন আরো বেশি উন্নয়নকে উস্‌কে দেবে, এবং সেটি আবার আরো উন্নয়নকে উস্‌কে দেবে– এবং এভাবে চল্‌তে থাকবে। এটিই সেই পাগলা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলা, যাতে এক লাফ পরবর্তী লাফকে আরো উঁচু করার সুযোগ জোগায়।

এভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত যে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে অনেক পেছনে ফেলে যেতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। ভাবা যাক, এমনিভাবে এআইয়ের চিন্তা ও সৃজনক্ষমতা বিজ্ঞানে, কর্মকৌশল নির্ধারণে, প্রকৌশলে, পরিকল্পনা প্রণয়নে মানুষের ওসব ক্ষমতাকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে– তা হলে অবস্থাটি কী দাঁড়াবে? মানুষ সবকিছুতে নিজের অগ্রগণ্যতা, তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে বসবে।

তারপরও মানুষ ভাবতে পারে মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যদি এ এস আইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য থাকে, মৌলিকভাবে উভয়ে যদি এমন সুসামঞ্জস্য হয়ে পরস্পর একই অভিমুখে চলে তাহলে ভয়ের কিছু নেই। বরং আমরা হয়তো তেমন সক্ষমতার সুপার-ইন্টেলিজেন্সকে দিয়ে আমাদের জন্য এমন অনেক কিছু করিয়ে নিতে পারবো যা নিজেরা পারবো না– উদাহরণস্বরূপ কঠিন সব রোগকে এবং বার্ধক্যকে জয় করা, এমনকি জীবনকে প্রচুর প্রলম্বিত করা। কিন্তু এই যে উভয়ের উদ্দেশ্যকে সুসামঞ্জস্যে রাখা তা যদি সম্ভবও হয়, সেই অবস্থাটি হবে সূতার ওপর দিয়ে হাঁটার মতো। ভারসাম্যের যে কোন পরিবর্তন ওই সুসমঞ্জস অবস্থা নষ্ট করে দিতে পারে। তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ওই এ এস্ আইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। সে পরিস্থিতিতে এ এস্ আই মানুষের ক্ষতি করতে পারে, এমনকি তাকে ধ্বংসও করে দিতে পারে। যেকোনোভাবে সেই পরিস্থিতি এড়াতে হবে, এবং ওই দিনের মানুষ হয়তো তা করতে পারবে। তবে তা সম্ভব নাও হতে পারে। কাজেই ভাল ও মন্দ দু'রকমের দৃশ্যকল্প সৃষ্টি হতে পারে এই

সুপার-ইন্টেলিজেন্সকে নিয়ে– সেটি একবার উড্ডয়ন করে ফেলার পর যখন অতি দ্রুত নিজের ক্ষমতা নিজে বাড়িয়ে নিয়ে চলতে পারবে তখন। কাজেই এই তৃতীয় দৃশ্যকল্প আসার পর কয়েকটি বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের দিকে তা যেতে পারে।

দৃশ্যকল্প ৪- দয়াল দরবেশের মত সুপার-ইন্টেলিজেন্স: যখন সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী এআইয়ের উন্নয়ন হয়ে চল্‌বে এবং সুপার-ইন্টেলিজেন্সের দিকে যাবার উপক্রম করবে তখনো এর উন্নয়নের দায়িত্বে মানুষই থাকবে। তখনই সেই উন্নয়নকে এমনভাবে পরিচালনা করা সম্ভব যাতে এমন একটি এ এস্ আইয়ের উদ্ভব হয় যার উদ্দেশ্য মানুষের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সবসময় সম্পূর্ণ সুসামঞ্জস্য হয়– মানুষের কল্যাণই যার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়। স্বাভাবিকভাবেই সুপার-ইন্টেলিজেন্স হবার কারণে সে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হবে। তবে এমন ভাবে তাকে গড়া হবে যেন 'পরোপকারী সম্রাটের' মতো নিজ খেয়ালখুশিমতো ক্ষমতা না দেখিয়ে সে একজন 'দয়াল দরবেশের' মতো হয়ে উঠবে। এর মানে এর উপকারটি একনায়কের ইচ্ছেমত করুণা করার ক্ষমতার থেকে আসবে না, বরং একজন বিনয়ী অথচ ক্ষমতাবান দয়াল দরবেশের থেকে আসবে। এই ক্ষমতাবান এ এস্ আই উপকারটি গোপনে এমনভাবে করবে, যেন মানুষ নিজেই নিজের উপকার করছে। উপকারভোগী মানুষটির মনে হবে না যে, আরেকজনের দয়ায় সে ওটি পেয়েছে, বরং তাকেই চেষ্টা করতে দেয়া হবে, যে চেষ্টায় প্রায়ই মানুষ সফল হবে। কাজেই এই বিশেষ এ এস আই মানুষের আত্মসম্মানকে আহত করবে না, নিজেকে অদৃশ্য ও গোপন রেখে অসীম ক্ষমতায় মানুষের কল্যাণ করে যাবে।

মানুষের যা কিছু সম্ভব ও অসম্ভব কামনা– জটিল রোগকে দূর করা, বার্ধক্যে কষ্ট না পাওয়া, দীর্ঘ আয়ু লাভ, অফুরন্ত শক্তি উৎস ও কাঁচামাল পাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবী ধ্বংসের দিকে না যাওয়া, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনে ও সরবরাহে কোনো ঘাটতি না থাকা, নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত আরো ভালভাবে কাজ করা ইত্যাদি সবকিছু অদৃশ্য দয়াল দরবেশরূপী সুপার-ইন্টেলিজেন্স গোপনে সম্ভব করে তুলবে।

আগামী দিনের এআই উন্নয়নকারী মানুষ যদি এরকম দয়াল দরবেশরূপী এ এস্ আই উন্নয়নকেই দৃশ্যকল্পে আনতে পারে, সেখানেই সব কিছুকে ধরে রাখতে পারে তাহলে সুপারইন্টেলিজেন্স থেকে তার আশঙ্কার কিছু নেই; বরং তার থেকে তার কল্যাণকর প্রাপ্তির সবকিছু আছে।

দৃশ্যকল্প ৫– ভয়ঙ্কর সুপার-ইন্টেলিজেন্সকে রুখতে দয়াল দরবেশ: ওপরের দৃশ্যকল্পের দয়াল দরবেশ তৈরি হবার পর যদি আরো অন্তত একটি এমন এ এস্ আই তৈরি হবার উপক্রম হয় যে, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সবসময় মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয় না, তখনই সেটি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে

একমাত্র নিরাপত্তা হলো দয়াল দরবেশকে এমন দ্বিতীয় এ এস্ আই আসাটি বন্ধ করার ক্ষমতা দেয়া।

এআই যখন নিজের উন্নয়ন নিজে করার সক্ষমতা পেয়ে যায় এবং সেই উন্নয়নে মানুষ কোনো হাত না রাখতে পারে তখন যেকোনো এ এস্ আই ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর হয়ে সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য এ এস্ আইকে যে সত্যিই মানুষ-বিদ্বেষী কোনো অবস্থান নিতে হবে, তা মোটেই নয়। তখনো যদি এআই সব উদ্দেশ্যকে খুব আক্ষরিক অর্থে নেয়, তবে ভাল কোনো উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়েও এটি মানুষের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এ নিয়ে আজকাল অনেকে ভেবেচিন্তেই বেশ কৌতুকপ্রদ কিছু পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। যদিও কৌতুকপ্রদ মনে হতে পারে তবুও সত্যি যদি ওই পর্যায়ে গিয়ে মানুষ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারায়, তাহলে এগুলোর কাছাকাছি ঘটনা ঘটতেই পারে যা মোটেও কৌতুকপ্রদ কিছু হবে না। তবে আশা করা যায় সাধারণ বুদ্ধি লাভ করার পর এআই হয়তো আজকের মতো সব নির্দেশকে বোকার মতো আক্ষরিক অর্থে নেবে না।

ওরকম একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি হতে পারে ধরা যাক এ এস আই চাইলো যে বিশ্বে আর কোনোমতেই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটতে দেয়া যাবে না। এমন উদ্দেশ্য সাধন করা নিয়ে কাজ করা সেরকম এআইয়ের পক্ষে কঠিন কোনো ব্যাপার হবে না। কিন্তু সে যদি দেখে যে জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো মানুষ। তাই সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, জলবায়ু পরিবর্তন বন্ধ করার সর্বোত্তম ও সব থেকে সহজ উপায় হলো মানুষগুলো ধ্বংস করে ফেলা!

এমনি আর একটি কৌতুকপ্রদ কল্পনা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে বেশ ভীতিরও সঞ্চার করেছে। ধরা যাক একটি এ এস্ আই পেপারক্লিপ ফ্যাক্টরিগুলোর দায়িত্বে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সে চাইবে খুবই দক্ষভাবে যত বেশি সম্ভব পেপারক্লিপ তৈরি করে সরবরাহ জোরদার করতে এবং এর বাজারমূল্য ন্যূনতমে নিয়ে আসতে। এজন্য সে সর্বোত্তম পন্থাটি খুঁজবে– যেমন বেশি বেশি জায়গা, শক্তি উৎস, কাঁচামাল ইত্যাদি শুধু পেপারক্লিপ উৎপাদনের জন্য পেতে চাইবে। এটি করতে গিয়ে সে দেখবে বড় বাধাটি হলো মানুষ– কারণ তাদের অসংখ্য কার্যক্রম ওইসব জায়গা, শক্তি ও কাঁচামাল দখল করে রেখেছে। তা ছাড়া সে লক্ষ করবে যখন ওই সম্পদগুলো সে পেপারক্লিপের জন্য আনতে চায় মানুষ তাকে বাধা দেয়, এমনকি তার কাজ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করে। কাজেই সে দেখবে তার উদ্দেশ্য সাধনের সর্বোত্তম উপায় হলো মানুষগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা। এই গল্প ধরে নিয়েছে এ এস্ আই মানুষ বিদ্বেষী নয়, তবে মানুষ প্রেমিকও নয়– সে শুধু সর্বোত্তম উপায়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে চাইবে। তবে এ এস্ আই এমন কাণ্ডজ্ঞানবিহীন হবার কথা নয়।

কিন্তু এই দৃশ্যকল্পে বিপদ আরো অন্যদিক থেকেও ঘটতে পারে। এ এস্ আইয়ের পক্ষে যখন নিজস্ব উন্নয়নের ব্যবস্থা নিজেই করা সম্ভব, সে নিজেই নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করতে পারবে। তা শুধু মানুষের উদ্দেশ্যের বিপরীত হতে পারে তাই নয়, বরং অন্য কোনো এ এস্ আইয়ের উদ্দেশ্যেরও বিপরীত হতে পারে। এক এ এস্ আইয়ের সঙ্গে অন্য এ এস্ আইয়ের পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সৃষ্টি হওয়াটি অমূলক নয়। এভাবে বিভিন্ন এ এস্ আইয়ের মধ্যে মরণপণ সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। পরস্পরকে দমন করার জন্য তারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। তখন মানুষের অবস্থা হতে পারে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়ে উলুখড়ের প্রাণ যাওয়ার মতো'। কোনো কোনো এ এস্ আই তখন তার রণকৌশল হিসেবে মানুষকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ এস্ আইয়ের মধ্যে যখন সম্পদ দখল, আপন অস্তিত্ব রক্ষা, আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠবে, তখনই হতে পারে মহা সমস্যার শুরু।

এমন ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন এ এস্ আইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আগে থেকে আঁচ করতে পারবে না, সঠিক সময়ে তাদের কারো ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকর কাজে বাধা দিতে পারবে না। মানুষ সহজে ওসবের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। তখন মানুষের জন্য অস্তিত্বের সংকটও দেখা দিতে পারে, নিদেন মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য একটি প্রান্তিক পর্যায়ে চলে যাবে। তাকে অনেকটা এ্যা এস্ আইদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করেই চলতে হবে, তাদের কারো সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে চলতে হবে। এতো রীতিমত দাসত্বের জীবন!

ওই পর্যায়ে যাবার আগেই এ এস্ আইয়ের আরো অগ্রগতি আমাদেরকে থামাতে হবে। এ সম্পর্কে কেউ কেউ এমন পরামর্শ দিয়েছেন যে, ঠিক ওই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেই তারপর সেই থামানোর কাজটি করতে হবে। আর সেটি করতে হবে প্রথম ওরকম শক্তিশালী এ এস্ আই সৃষ্টি করে তার বিশাল সক্ষমতা প্রয়োগ করেই। এই প্রথম এ এস্ আইটি হবে আগের দৃশ্যকল্পের সেই দয়াল দরবেশের মতো– নীরবে মানুষর কল্যাণই হবে তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এইসব যে তার হাত থেকে আসছে, তা বুঝতে না দিয়ে বরং এর জন্য মানুষকে চেষ্টা করতে দেবে। তাতে হার-জিৎ থাকবে, এজন্য মানুষের চিন্তার দিগন্তকে সে চ্যালেঞ্জিং ও অর্থপূর্ণ করবে– কিন্তু শেষ পর্যন্ত দয়াল দরবেশ মানুষের কল্যাণকর সব আকাঙ্খা পূরণ করবে। সেই সঙ্গে সে আরো একটি কাজ করবে তার নিজেকে ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো রকমের এ এস্ আই যেন সৃষ্টি হতে না পারে সেই ব্যবস্থা করবে। কোথাও কেউ– সে মানুষ হোক বা এআই হোক– এ নিয়ে বিন্দুমাত্র গবেষণা করছে বা চেষ্টা করছে, এমন হলে সেই আভাস দয়াল-দরবেশ পাবে এবং তা খুঁজে নিয়ে অঙ্কুরেই দমন করবে। আর এমন

নতুন এ এস্ আই আসতে না পারলে মানুষের বিপরীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না, অস্তিত্বের সংকটে তো ফেলতে পারবেই না; নানা এ এস্ আইয়ের নিজেদের যুদ্ধেও মানুষকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে না। দয়াল দরবেশ হবে আর দ্বিতীয় কোনো এ এস্ আই সৃষ্টি না হবার জন্য অতন্দ্র প্রহরী– সেই হবে প্রথম ও শেষ সুপার-ইন্টেলিজেন্স।

কেউ কেউ বলছেন ওই প্রথম এ এস্ আই পর্যন্ত যাবারও দরকার কী? তার আগেই যদি এআইয়ের অগ্রগতি বন্ধ করা যায় সেটি কি আরো নিরাপদ নয়? প্রস্তাবকরা তার উত্তরে বলেন ওই শক্তিশালী প্রথম দয়াল দরবেশ না এলে অন্য রকম যেকোনো এ এস্ আই সৃষ্টিকে রোধ করার সক্ষমতা কারো নাও থাকতে পারে। সব মানুষ না চাইলেও তার অগোচরে কোনো দুরভিসন্ধিমূলক অপরাধী মানুষ গোপনে ওই এ এস্ আই সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া এ এস্ আই নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে। সেটি বন্ধ করার জন্যই দয়াল দরবেশকে থাকতে হবে। তাছাড়া দয়াল দরবেশই তো পারবে মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব সেই আকাঙ্ক্ষাগুলোও পূরণ করতে, অথচ সাধারণ মানুষ তাকে নিজের বাহাদুরি বলে মনে করে তৃপ্ত থাকবে। কিন্তু এসব যুক্তি সত্ত্বেও আজকের অনেক ভবিষ্যৎদর্শী সাবধান থাকাকেই শ্রেয় মনে করছেন। তাঁরা তাই আরো একটি বিকল্প দৃশ্যপটের কথা ভাবছেন যেখানে আগেই থেমে যাওয়া হবে।

দৃশ্যকল্প ৬– সুপার-ইন্টেলিজেন্সকে 'না' বলা, সাধারণ বুদ্ধিতেই এআই চলবে: যতই দিন যাবে, এ জি আইয়ের সাধারণ বুদ্ধি ততই প্রখর হতে থাকবে; কিন্তু মানুষ ইচ্ছে করেই এক জায়গায় এসে তার একটি ইতি টানবে। ওই পর্যায়ে রেখেই মানুষ এআইয়ের সাধারণ বুদ্ধির অভিনব সব প্রয়োগ উদ্ভাবন করতে থাকবে, কিন্তু সে বুদ্ধির ওই সীমাকে অতিক্রম করতে দেবে না। ওতে কত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করবে, তার কম্পিউটেশন গতি বা অ্যালগরিদমের জটিলতা কতখানি হবে, ইত্যাদিতে বাস্তব বাধা প্রয়োগ করে ওগুলোকে আর বাড়তে না দিয়ে মানুষ এআই বুদ্ধির ওই সীমা টেনে দেবে নিজেদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এআইয়ের কৌশলেই এমন ব্যবস্থা থাকবে, যেন এর ওপর জটিলতা, শক্তি, কম্পিউটেশন অনেক বাড়ালেও তাতে নিজেই নিজের উদ্দেশ্য খুঁজে নেবার মতো উন্নয়ন কিছুই বাড়বে না। ওই সীমার মধ্যেই হয়তো এ জি আই বুদ্ধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষকে ছাড়িয়েই যাবে– কিন্তু তা বিপুল পরিমাণে নয়। এ্যা জি আই আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষের ওপর নির্ভরও করবে। উভয়ের সম্মিলিত সক্ষমতায় মানবসমাজ এগিয়ে যাবে। সুপার-ইন্টেলিজেন্সের মতো কিছুর দিকে কখনোই এরা এগুবে না।

এরপর থেকে একটি চিরন্তন সুস্থির এ জি আই যুগেই আমরা থাকবো– ওর ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে আমাদের নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত। তার ভেতর এআই বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটবে না, বিস্ফোরণ সম্ভবই হবে না। ওইরকম বিস্ফোরণই সর্বনাশের পথে যেতে পারে– যাঁরা বেশি সতর্ক তাঁরা হয়তো এই দৃশ্যপটের দিকেই তাঁদের মতামত দেবেন।

কিন্তু এমন একটি সতর্ক দৃশ্যকল্পে অনেক বিশেষজ্ঞ সাহসের একটু অভাব দেখেন যা তাঁদের উদ্ভাবনশীল প্রেরণা সহজে মেনে নিতে চায় না। তাঁরা সম্ভাবনার শেষটুকুও দেখতে চান। তাঁদের মতে এআই এর যে আরো অনেক বড় বড় কল্যাণ করার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ওটি না দেখে ছাড়তে চাইবে না আগামী দিনের বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের চেষ্টা থাকবে দয়াল দরবেশকে সৃষ্টি করা। তা ছাড়া তার আগে হাল ছেড়ে দিলে বিশ্বময় সমঝোতাকে টিকিয়ে রেখে বিশ্ব-নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। সবসময় গোপনে মানুষের মধ্যে এমন কোনো অপশক্তি গড়ে উঠতে পারে, যারা তলে তলে ওই সুস্থির এআই যুগের সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে। তারা যেহেতু কারো কাছে জবাবদিহিতার মধ্যে থাকবে না– তাই হয়তো ভয়ঙ্কর সুপার ইন্টেলিজেন্স তৈরি করবে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে। অনেকে বলেন তার থেকে বরং দয়াল দরবেশের সৃষ্টির দিকেই সম্মিলিত মানব জাতিকে চেষ্টা করা উচিত। সেই প্রথম ও শেষ সুপার-ইন্টেলিজেন্স মানুষের কোন অপশক্তিকেও মাথা তুলতে দেবে না। তবে তা সম্ভব হবে যদি আমরা আরো একটি ঝুঁকিপূর্ণ দৃশ্যপটের ঝুঁকি এড়াতে পারি।

দৃশ্যকল্প ৭– এ জি আইয়ের নানা কেন্দ্রে বিভক্তি: ওপরে কল্যাণকর ও নিরাপদ যে দৃশ্যকল্পগুলোর কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটি নির্ভর করে খুবই সুচিন্তিত বিশ্ব-সমঝোতার ওপর; সেটি অপরিহার্য হলেও সহজলভ্য নয়। অনেকটা বর্তমানে যেমন চল্‌ছে, অথবা তার থেকেও খারাপভাবে বিশ্ব বিভক্ত থাকতে পারে ভবিষ্যতে– অন্তত এআইয়ের ব্যাপারে। তখন এআইয়ের নীতি বিশ্ব-সমঝোতায় এক কেন্দ্র থেকে ঠিক না হয়ে নানা কেন্দ্রে নানা ভাবে ঠিক হতে থাকবে। তার উন্নয়নও ঘটবে নানা কেন্দ্রে নানাভাবে– বিভিন্ন কেন্দ্রের বিভিন্ন অগ্রাধিকার থাকতে পারে, ফলে সবসময় তারা এক সুরে একপক্ষে কথা না বলাই নিয়মে পরিণত হতে পারে। এর মধ্যে ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলো একটি শক্তিশালী পক্ষ হয়ে পড়বে, তাদের নিজেদের মধ্যেও থাকবে প্রবল প্রতিযোগিতা। জাতীয়তা একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে পক্ষ গঠনে– এক এক দেশের এআই নীতি নিজের মতো করে তারা ঠিক করবে। তাদের কোনো কোনোটি মিলে নিজেদের মধ্যে আবার জোট বাঁধার প্রবণতা দেখা যেতে পারে। শক্তিশালী দেশগুলোর কিছু অভিন্ন স্বার্থ থাকবে– যদিও তাদের মধ্যে

প্রতিযোগিতাও থাকবে। উন্নত দেশগুলো সব মিলে সাধারণভাবেও একটি পক্ষ হবে ছোট বড় নির্বিশেষে– অনেকে তাদের আঞ্চলিক জোটের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটাবে। একাডেমিক ও গণতন্ত্র মনা উদ্ভাবকরাও একটি পক্ষ হতে পারে সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত ও সহজলভ্য (ওপেন সোর্স) এআইয়ের পক্ষ নিয়ে। আজও অনেকটা এরকম বিচ্ছিন্ন নানা কেন্দ্রের পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। ওপরের নানা পক্ষগুলোকে আমরা কিছুটা দেখতেই পাচ্ছি।

এরকম সব পক্ষই যখন নিজের মতো করে করে সুপার-ইন্টেলিজেন্সের দিকে যেতে থাকবে, তখন হয়তো তাদের নিজেদের মধ্যে ও বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতাটাই বড় হয়ে উঠবে এই ব্যাপারে– বিশ্ব-সমঝোতার চেয়ে। যদি না তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও বোঝাপড়া থাকে তাহলে কোনো একক নীতি বা সুপার-ইন্টেলিজেন্সের দিকে যেতে কোনো একক রোড ম্যাপ অনুসরণ সম্ভব হবে না। হয়তো নানা রকমের নানা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বহু রকমের এ এস্ আই গড়ে উঠবে, যাদের ওপর কোনো রকম একক নজরদারি সম্ভব হবে না। ওই এ এস্ আইগুলোর মধ্যে যদি সংঘাত সৃষ্টি হয়, তাহলে সেগুলো যেকোনো রূপ নিতে পারে।

কাজেই আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের মাধ্যমে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহারে এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্র-সক্ষমতার বিস্তারের বিরুদ্ধে যতখানি নিয়ন্ত্রণ এতদিন দুনিয়াকে নিরাপদ রেখেছে, অন্তত ওই রকমের নিয়ন্ত্রণ এআই উন্নয়নের ওপর এখন থেকেই থাকা উচিত। বিভিন্ন পক্ষগুলো মিলে চলতে বাধ্য থাকবে– এআই উন্নয়ন নিয়ে এমন কিছু বিশ্ব-আইন ছাড়া ভবিষ্যৎ পথ চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, যার ফলে মানুষ নিউক্লিয়ার যুদ্ধের থেকে আরো বড় অস্তিত্বের সংকটেও পড়তে পারে। এআইয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটি সর্বব্যাপ্ত নিউক্লিয়ার যুদ্ধের থেকে বেশি বই কম নয়। আসলে সাধারণ বুদ্ধির এআই আসার আগেই এর জন্য আজকের জাতিসংঘের থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী বিশ্ব-সংস্থার প্রয়োজন হবে। সেটিকে এমন সংস্থা হতে হবে যাতে তা এআই নিয়ে যত রকম কেন্দ্র বা পক্ষই তৈরি হোক না কেন সব ক'টাকে একটি ভারসাম্যে রাখতে পারবে। পুরো মানব জাতি যেন এই ক্ষেত্রে একই নীতি দিয়ে এগুতে পারে।

আজ থেকে এআইয়ের সাধারণ বুদ্ধির দিকে আমরা যখন এগুবো আমাদের সামনে স্পষ্ট দুটি রাস্তা থাকবে। আমাদেরকে সেই রাস্তাটিই বেছে নিতে হবে যেখানে এআই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না, সে নির্ধারণ আমরাই করবো। অন্য পথটি হবে এআইকে দুনিয়া চালাবার ড্রাইভিং সীট দেবার পথ, সেই পথ এড়িয়ে যেতে হবে। সঠিক পথটি বেছে নিলে এ জি আই আপনাআপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ এস্ আই হবার দিকে যেতে পারবে না। আমরা চাইলে তবে যাবে, যেভাবে চাইবো সেভাবে যাবে।

আমাদের কী হবে?

যত রকম দৃশ্যকল্প আমরা দেখলাম সবই নানা রকম আন্দাজের ফসল। যাঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চিন্তার সঙ্গে জড়িত, যাঁরা মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন, এমনকি যাঁরা আজ এআই উন্নয়নের পুরোভাগে আছেন তাঁদের অনেকে ভবিষ্যতের যে একটি বিরাট ঝুঁকি এতে রয়েছে তার কথা বারবার বলেছেন। এর কারণ ঝুঁকিটি খুবই সম্ভব। ঝুঁকিটি অনেক বড়, তাত্ত্বিক ভাবে দেখলে সেটি মানব জাতির অস্থিত্বের ঝুঁকিও হতে পারে। তবে এআই যতই এগিয়েছে, তার ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রয়েছে, আর তার অভাবনীয় সব কাজ নিরাপত্তার মধ্যেই করছে। তাতে ক্রমেই বেশি বেশি মনে হচ্ছে ওই চরম ঝুঁকিটি অনেকটা সুদূর একটি কল্পতত্ত্ব। মানুষ যদি ইচ্ছে করে তবে এআইয়ের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখেই পুরোটা পথ পাড়ি দিতে পারে। অবশ্য সেটি কোন্ পথ হবে তা নিশ্চিতও নয়, যাত্রাটি সহজও হবে না। অন্যদিকে এআই তার যে অভূতপূর্ব আকর্ষণীয় সব ভবিষ্যত সক্ষমতার আভাস দিচ্ছে মানুষের কাছে তা অত্যন্ত কাম্য হতে বাধ্য। সুদূর কাল্পনিক ঝুঁকির কথা ভেবে আজকের ওই সব সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিতে কেউ রাজি হবেন বলে মনে হয় না। বিসর্জন দেয়ার মতো কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলেও সেটি কার্যকর হবে না। কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ এআইকে এগিয়ে নিয়ে যাবেই। কাজেই অগ্রগতি বন্ধ করার চিন্তা নিরর্থক।

কিন্তু বহু রকম চিন্তা হলেও, বহু দৃশ্যকল্পের কথা ভাবা হলেও আজ থেকে শুরু করে এআই সাধারণ বুদ্ধির পথে আমরা ঠিক কীভাবে এগুবো তাই কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। এরপর সুপার-ইন্টেলিজেন্সে যাওয়া যাবে কি না, যাওয়া গেলেও ওই ব্যাপারে সবাই একমত হবে কি না তা আরো অনেক পরের বিষয়, এখনো কল্পকাহিনির মতো।

তবে এখনই দেখছি অগ্রগতির বাস্তব শর্তগুলোতেই পদে পদে অনেক চ্যালেঞ্জ। এখনই কোম্পানিগুলোকে ভাবতে হচ্ছে এআইকে আরো এগুতে হলে যে বিশাল বিনিয়োগ দরকার হবে, তার জোগাড় সত্যিই হবে কি না, এখনই তা ট্রিলিয়ন ডলারে হিসাব করতে হচ্ছে। এখনো ভাবতে হচ্ছে এর জন্য যে বিপুল বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হবে, তার জোগান অদূর ভবিষ্যতে থাকবে কি না। এর পরের অগ্রগতির জন্য তথ্যভান্ডারের যেই বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে, সেই নতুন তথ্য পাওয়া যাবে কি না, তথ্য তো ইতোমধ্যেই সব ব্যবহার করে ফেলা হয়েছে। কাজেই বহু বাস্তব বাধা অতিক্রম করেই তাকে এগুতে হবে। এলএলএম থেকে এ জি আই পর্যন্ত কোনো

সরলরেখার পথ যদি থাকেও, এখনো তা কারো জানা নেই; এর পরের কিছুর তো নয়ই। ওই ভবিষ্যতের যা ভাবছি তার সবকিছুরই একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা রয়েছে, তার বেশি কিছু নয়।

কাজেই সুদূর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মহা সঙ্কটের থেকেও আজ এ মুহূর্তে এআইকে নিয়ে যে অনেকগুলো সমস্যা, অনেক আশু ঝুঁকি এবং নীতিনির্ধারণের অনেক বিষয় রয়েছে সেগুলোই বেশি গুরুত্বের দাবিদার। এ জি আই সক্ষমতা এবং পূর্ণ নতুন অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা হতে পারার আগে মানুষের কর্মচ্যুতি যে আশু অস্থিরতা সৃষ্টি করছে ও করবে, সেগুলোই এখন বেশি বিবেচ্য। এই সবগুলো বিষয় নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে সতর্ক নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ এখনই প্রয়োজন। সামনে মানুষের ধন-বৈষম্য যে এআই প্রয়োগের কারণে অসম্ভব একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে এবং তার জন্য অন্তর্বর্তীকালেই কিছু আংশিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে রেয়াত দিতে হবে– সেটি এখনই সামনে আনতে হবে। করোনাকালে যেভাবে উন্নত দেশে রেয়াত দিতে হয়েছিল শিগ্‌গির এই এআইয়ের কারণেও সেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, এক্ষেত্রে কম উন্নত দেশগুলোতে বিশেষভাবে। সবাই যেন এখনো কাজ করতে পারে সেজন্য একই অল্প-সংখ্যক কাজে বেশি মানুষকে জায়গা দিতে কর্মঘণ্টা কমানো, সপ্তাহে তিন বা চারদিন কাজ ইত্যাদির চিন্তা করতে হবে। কোনো কোনো দেশে ইতোমধ্যেই করা হয়েছে। সর্বজনীন মৌলিক আয় এখন যদি সর্বাংশে চালু নাও করা যায়, যেখানে প্রয়োজন তার বিকল্প হিসেবে চাকুরিচ্যুতদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, এআইতে লাভবান হওয়াদের লাভের অংশ দিয়ে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতি যেহেতু এসেছে, ভিন্ দেশ থেকে তা পূরণও সেক্ষেত্রে হতে হবে সে দেশ থেকেই।

নতুন বন্দোবস্তের একদিক যখন অংশত চালু হয়ে যাবে, তেমনি অন্যদিকও চালু হতে হবে– মানুষের যেটুকু কর্মহীন সময় সৃষ্টি হবে, তার যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে। বর্তমানে সীমিত কিছু ছুটির দিন ছাড়া মানুষের জীবন পেশাগত কাজকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। সেটি যখন হবে না, তখন সেই সুযোগটিকে সর্বোত্তম উপায়ে মানুষ যেন ব্যবহার করে তার উপায় বের করতে হবে। সেবার কাজে, শিশু পালনে, সমাজসেবায় মানুষ কীভাবে জড়িত হতে পারে, তা গণমাধ্যমে ও অন্যান্যভাবে জনপ্রিয়তায় ও প্রশিক্ষণে আনতে হবে। সখের অবদান হিসেবে নাগরিক বিজ্ঞানী, নাগরিক অনুসন্ধানী, নাগরিক প্রকৃতিবিদ ও পরিবেশবিদ, নাগরিক ইতিহাস-গবেষক, সাহিত্য-শিল্পের সৃষ্টিকার ও তার সমালোচক বা রসপিপাসু ইত্যাদির ভূমিকায় বিচিত্র কাজকে উৎসাহিত করতে হবে। মানুষ যেন বেশি বেশি করে আত্মিক সন্তুষ্টির কাজ,

আনন্দের কাজ করতে পারে সেই লক্ষ্যে একটি সামাজিক আন্দোলনই গড়ে তুলতে হবে।

এতো বেশি পরিবর্তনের ঝামেলার মধ্যে আমরা আদৌ কেন যাব? সত্য কথাটি হলো মোটেই ঝামেলা নয়, এই পরিবর্তনগুলো আমাদের অত্যন্ত কাম্য বলেই যাব। এআই ইতোমধ্যেই আমাদের জীবনকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, এটি জীবনকে একটি নতুন অর্থ দিচ্ছে– আমাদের শিক্ষার নতুন সম্ভাবনার দিকে তাকালেই সেটি বোঝা যায়। যারা কায়িক শ্রম বা গতানুগতিক কাজে আছে তারা এর থেকে অবকাশ পাবে, সেটি অত্যন্ত বড় একটি পাওয়া। তার পেশাগত কাজ দিয়ে একজন মানুষের বর্ণনাকে সীমাবদ্ধ করার দিন আজ শেষ করতে হবে। মানুষের বর্ণনা হবে তার মানবিক গুণগুলো দিয়ে এবং মানবিক কাজগুলো দিয়ে। অধিকাংশ পেশার কাজে অনেক চ্যালেঞ্জ যদিও বা থাকে, কাজ সফল হলে এক রকম তৃপ্তিও থাকে। কিন্তু তার সঙ্গে মিশে থাকে অপরিহার্য এক যান্ত্রিকতা, এবং আরো বেশি অপরিহার্য প্রতিযোগিতা। একজনকে বঞ্চিত করে বা পেছনে ফেলে সামনে যাওয়ার চেষ্টাটিই এই প্রতিযোগিতা। আজ সেটি এমন চরমে পৌঁছেছে যাতে আর কিছুর দিকে তাকাবার সময়টিও এর বাইরে মানুষ পায় না। মনুষ্যত্বের কাজগুলোতে যান্ত্রিকতার বা প্রতিযোগিতার উত্তেজনা থাকে না, কিন্তু তাতে মানুষের সত্যিকার আত্ম-সন্তুষ্টি ও শান্তি রয়েছে– সবচেয়ে বেশি রয়েছে আত্মিক আনন্দ।

শিকারি-সংগ্রাহক জীবনে মানুষ যখন সারাক্ষণ বেঁচে থাকার সংগ্রামে রত ছিল, তখনই আমাদের মস্তিষ্কের মোটামুটি সবটাই বির্তিত হয়েছিল প্রকৃতির চাপে। ওরকম সংগ্রাম শেষ হবার পর তেমন করে আর বিবর্তন ঘটেনি। তাই আধুনিক তত্ত্ব বল্‌ছে আমরা আমাদের সেই প্রাচীন মস্তিষ্কটাই বহন করছি, যা তখনকার সমস্যা সমাধানে গঠিত হয়েছিল। ওই সক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটিয়েই আমরা আধুনিক সমস্যারও সমাধান করতে পারছি। ওই প্রাচীন সমস্যাই আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে হাতিয়ার তৈরির মতো যান্ত্রিক প্রবণতা শিখিয়েছিল। একই রকম সমস্যা তাদেরকে দলগত ভাবে প্রতিযোগিতা বা যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত করেছিল। দুটিকেই বিবর্তন আমাদের প্রবৃত্তিতে এনে দিয়েছে। এই দুটিই আমরা বিবর্তনে আমাদের খুব কাছে শিম্পাঞ্জির মধ্যে দেখি– হাতিয়ার তৈরিটি মানুষের তুলনায় হাস্যকরভাবে নগণ্য হলেও শিম্পাঞ্জি তাতে অন্য প্রাণীর থেকে বহু এগিয়ে, আর তারাও দলগত যুদ্ধ করে যথেষ্ট নিষ্ঠুরভাবেই। আমাদের ক্ষেত্রে হাতিয়ার তৈরির প্রবণতাকে আমরা উন্নয়নে দারুণ কাজে লাগিয়েছি, এর যান্ত্রিকতা সত্ত্বেও এবং প্রতিযোগিতাকেও। আর মানুষের প্রাণপণ প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ একই রকম প্রেরণা থেকে আসে। সেজন্য বলা হয় জাপানিরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের প্রায় পুরোটাতেই যুদ্ধের কাজে সব থেকে বেশি নিষ্ঠুর আগ্রাসনের পরিচয় দিয়ে

দ্বিতীয় অর্ধে এসে বাধ্য হয়ে সেই একই প্রেরণাকে আগ্রাসী ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত করতে পেরেছিল অনায়াসে।

কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো সে প্রমাণ করেছে মানুষ প্রবৃত্তির দাস নয়। যান্ত্রিকভাবে দারুণ সব অর্জন করেও মানুষের মধ্যে যান্ত্রিকতার প্রতি বিতৃষ্ণা আছে। তেমনি অসম্ভব নৃশংস যুদ্ধের মধ্যে বাস করেও আমরা অদ্ভুত শান্তিপ্রিয়তার আপন ভুবন তৈরি করতে পেরেছি। কিন্তু কখনো ওই দুটি প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি পাবার মতো স্থায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত সৃষ্টি করতে পারিনি। অথচ এটিই ছিল আমাদের মনের গহীন আকাঙ্ক্ষা সবসময়– প্রবৃত্তির বাইরে গিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়া। কালচার অর্থে সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞা দেয়া হয় 'বাঁচার মতো বাঁচা'। সেটিকে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করলে বলা যায় 'অন্য মানুষের মনের সঙ্গে ও সৃষ্টির সৌন্দর্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাঁচা'। মানুষকে সেবা করা, মানুষকে আনন্দ দেয়াটি আসলে নিজে সেবা পাওয়া, নিজে আনন্দ পাওয়া। মনুষ্যত্বের গহীন আকাঙ্ক্ষা 'বাঁচো মানুষের মনে, ভাবো বিশ্বময়'। এআইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কারণ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সে আমাদেরকে ওই লক্ষ্যে পৌঁছার সিঁড়ি এনে দিয়েছে। দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান সবকিছুর চর্চা ওই লক্ষ্যের মধ্যে আছে, কিন্তু সেসবের প্রেরণা প্রতিযোগিতা বা যান্ত্রিকতা থেকে আসবে না, আসবে আনন্দ থেকে।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরষ্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরষ্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর।

বিজ্ঞান নামের ব্যতিক্রমী মহাকাব্য • মুহাম্মদ ইব্রাহীম